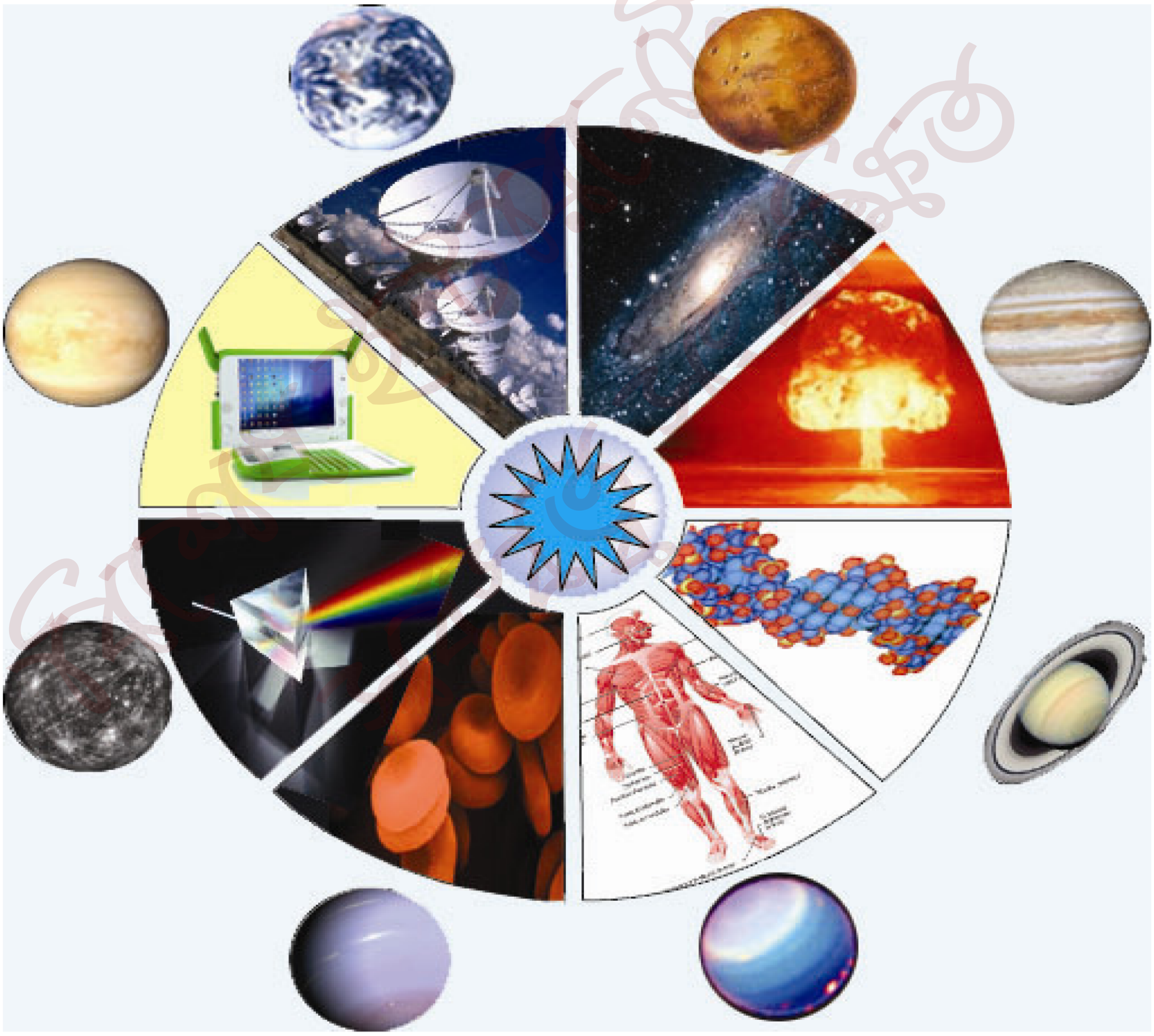
বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর শীর্ষক বক্তৃতামালা

বক্তা : ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
Diploma in Science & Technology, England



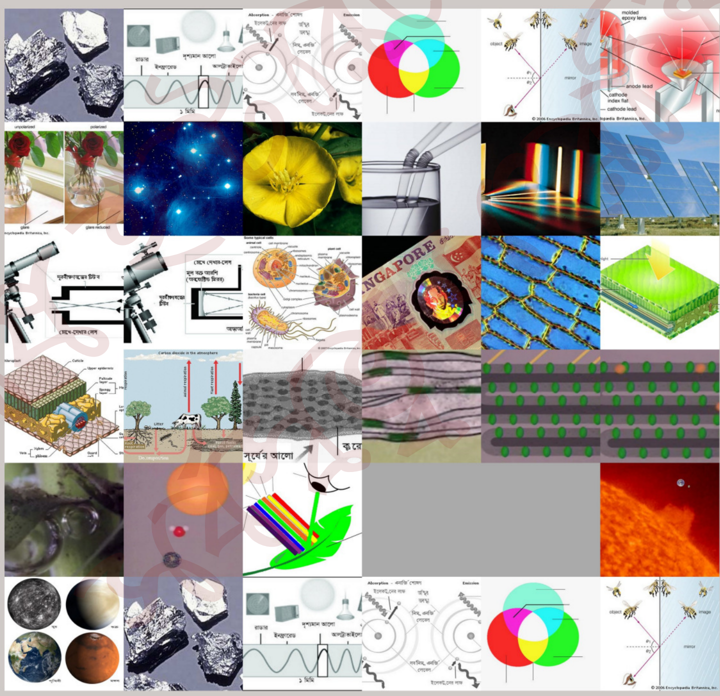
লেকচার নোট্স

লেকচার নোট্স

বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর শীর্ষক বক্তৃতামালা
১-২০

বক্তা : ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
Diploma in Science & Technology, England



KAA Publication

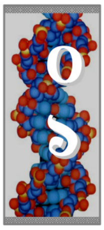
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার পয়েন্ট, সিলেট।

বিষয়সূচি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

বক্তৃতা ১ : ভূমিকা

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ! জ্ঞানান্বেষী ছাত্রবন্ধুরা! আপনাদের সবাইকে এই **'বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান'** লেকচারে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। আমি ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী। আজকের এই ভূমিকা থেকে শুরু করে আগামী ছয় মাসের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের উপর আমার নিজের মধ্যে সংরক্ষিত জ্ঞানটুকু আপনাদের মন-মস্তিষ্কে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালাবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সকলেই ধৈর্যশীল, মনোযোগী শিক্ষার্থী। তবে ঘাবড়ে যাবেন না! বিজ্ঞান বিষয়টি আসলে তেমন কঠিন কিছু নয়- যা আমাদের অনেকে ধারণা করে থাকি। আসলে বিজ্ঞান হলো অতিশয় চিত্তাকর্ষক একটি বিষয়। সৃষ্ট জগৎ ও এর কার্যকারিতা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সুচিন্তিত ও প্রণালীবদ্ধ উপায়ে গবেষণা ও আবিষ্কারের নামই হলো বিজ্ঞান।

এই পৃথিবীর বুকে মানুষের আবির্ভাবের পর থেকেই বৈজ্ঞানিক গবেষণার শুরু। কিয়ামত না ঘটা পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। এর কারণ হলো, মানুষ স্বভাবগতভাবে জ্ঞানান্বেষী। স্বাভাবিক এই প্রবণতা থেকে সুদূর অতীতে মানুষ জগৎ সম্পর্কে অনেক কাল্পনিক কথা আবিষ্কার করেছে। এরপর একদল চিন্তাশীল মনীষীর আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা ভাবলেন, জগৎ সম্পর্কে 'সঠিক' তথ্যাদি আবিষ্কার করার জন্য প্রয়োজন কিছু সুচিন্তিত প্রণালী। এতে থাকবে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও গাণিতিক সমর্থন। অর্থাৎ কোন বিশেষ বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের মূলে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থাকতে হবে। এই 'সিস্টেমেটিক' বা প্রণালীবদ্ধ গবেষণার নামই বিজ্ঞান।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুদীর্ঘ ইতিহাসের উপর আলোচনা এই বক্তৃতামালার উদ্দেশ্য নয়। আজকের বিজ্ঞান কি বলে, সেটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। ছাত্রবন্ধুরা একথা বিনাপ্রশ্নে স্বীকার করবেন, বিজ্ঞান ও এর নির্যাস- 'প্রযুক্তিবিদ্যার' উপর এ যুগের শ্বসমাজ নির্ভরশীল হয়ে ওঠেছে। বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা নিভৃত পল্লীগাঁয়েও আজ

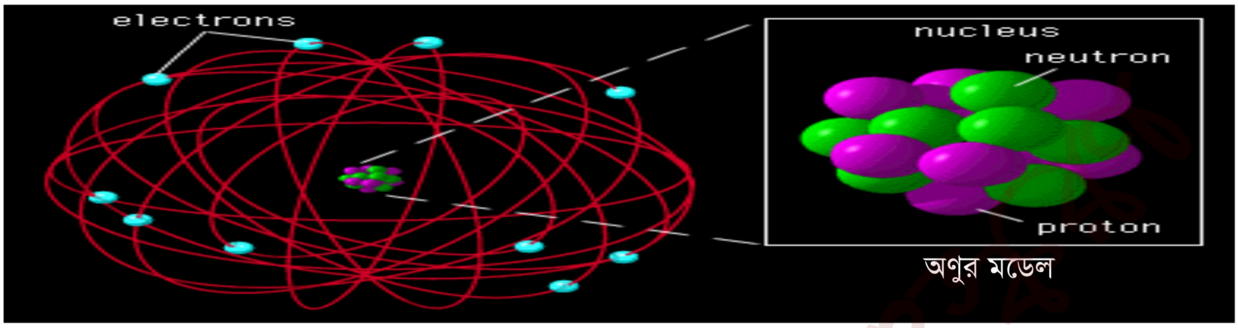
আধুনিক বিজ্ঞানের ছোঁয়া লেগেছে। সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চমক ও অত্যাশ্চর্য ক্রিয়া-কলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফিল থাকা 'পুকুরে সাঁতার কাটাবস্থায় পানি সম্পর্কে না জানার সমান'। তবে অবশ্যই, এ থেকে এটা বুঝতে নেই- সবাই বিজ্ঞানী ও প্রযৌক্তিক হতে হবে! প্রথমত: পেশাদার বিজ্ঞানী কিংবা প্রকৌশলী হওয়া দেশের অন্তত বড় একদল- আর আমার মতে এ দেশের উচ্চশিক্ষিত সমাজের অধিকাংশের জন্য জরুরী। অন্যথায় দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন আজকের 'চরম প্রতিযোগিতামূলক' বিশ্ববাজারে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত: আমাদের চোখের সামনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমাহার, চমক, কলা-কৌশল, ব্যবহার, কার্যকারিতা ইত্যাদি সচরাচর ঘটছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ছাত্রবন্ধুদের সবাইকে নিজের পকেটে হাত রাখতে অনুরোধ জানাচ্ছি। না, চিন্তার কারণ নেই। আমি আপনাদেরকে টাকা বের করার কথা বলছি না! এই খানক্বার সেবামূলক কার্যাদি পরিচালনার জন্য আর্থিক অনুদান-প্রার্থনা অন্য সময় করবো। তবে পকেটে হাত দিয়ে আমার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি যদি না-ও পান- বাধা নেই। যদি টাকা মিলে, তাতেও আমার উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হবার নয়।

আমি আশা করছি, সবার পকেটে একটি মোবাইল সেট থাকবে। আর এর বদলে যদি টাকা থাকে তাহলেও অসুবিধা নেই। উভয়টির মধ্যেই আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কারসাজি বিদ্যমান। আপনাদের হাতে এই ভূমিকার একটি পত্র প্রদান করেছি। লেখাটুকুর একটা অক্ষরও হাতে-কলমে লিখি নি। বিশ্বব্যাপী তথ্যাদি আদান-প্রদানের সর্বাধুনিক মাধ্যম কম্পিউটার দ্বারা পুরো লেখাটি কম্পোজ করেছি, স্ব-লিখিত বানান পরীক্ষক সফট্ওয়ার দ্বারা পরীক্ষা-নীরিক্ষা শেষে প্রিন্টার দিয়ে একটি মাস্টার কপি বানিয়েছি। এরপর আরেক অত্যাধুনিক যন্ত্র, 'ফটো কপিয়ার' মেশিন দ্বারা অনেক ডুপলিকেট কপি করে আপনাদের হাতে দিয়েছি। এ কাজগুলো আমাদের অনেকের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন স্বাভাবিক কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হয়ে পড়েছে। আমরা ভাবিই না, উল্লেখিত ক'টি কাজ আঞ্জাম দিতে যেসব টেকনোলজির সাহায্য নিয়েছি তা কতো বিরাট ও অত্যাশ্চর্য! বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া আজ আমাদের জীবনের কত গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে তা আশাকরি ছাত্র-বন্ধুদের আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

যাক! এবার আসুন আমরা এই বক্তৃতামালার উপর আরো কিছু আলোকপাত করি। প্রথমত নিম্নোক্ত ক'টি মৌলিক বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উপর আমাদের প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত থাকবে:

ক. বস্তুজগৎ: মৌলিক গঠনপ্রণালী।
খ. পদার্থবিজ্ঞান: বস্তুজগতের মিথস্ক্রিয়া।
গ. মহাকাশবিজ্ঞান: গঠনপ্রণালী ও মৌলিক গতিবিধি।
ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান।
ঙ. জীববিদ্যা: পরিচিতি ও কার্যকারিতা।
চ. গণিত শাস্ত্রের গুরুত্ব।

উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ের উপর এক বা ততোধিক বক্তৃতা থাকবে। প্রত্যেক লেকচারের সাথে অবশ্যই ছাত্রবন্ধুদেরকে একেকটি 'লেকচার নোট' দেওয়া হবে। এই নোটে সংশ্লিষ্ট বক্তৃতার বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তাকারে লিপিবদ্ধ থাকবে। আশা করা যায়, ছাত্রবন্ধুদের জন্য আমার মুখের কথা, কম্পিউটার স্ক্রীন ও হুয়াইট বোর্ডে যা লিখবো তা হৃদয়ঙ্গম করতে এ নোট সহায়ক হবে। উপরের ছ'টি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় আজকের এই প্রথম ভূমিকা-সর্বস্ব বক্তৃতা। সুতরাং আসুন, বাকী সময়টুকু উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ের উপর মৌলিক ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করে কাটিয়ে দিই। কেমন? আমার কথাগুলো মনোযোগসহ শ্রবণ করুন। প্রয়োজনে নিজের খাতায় নোট লিখবেন। নীচে বাকী বক্তব্যের খসড়া লিখে দিয়েছি। এখন তা পাঠ করবেন না। বক্তৃতা শেষে প্রয়োজনে অতিরিক্ত বুঝতে যেয়ে পরে আপনার নিজের মুক্ত-সময়ে এ কথাগুলো অধ্যয়ন করুন।

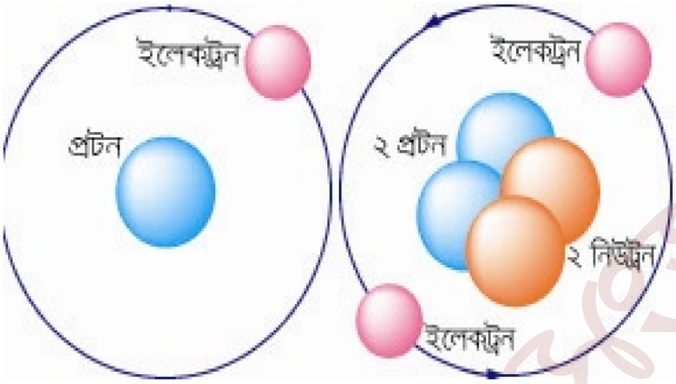


অণুর মডেল

ক. বস্তুজগৎ : মৌলিক গঠনপ্রণালী

দৃশ্যমান বস্তুজগতটি কিসের তৈরী? সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অংশ কি যার সমন্বিত ফলাফল এ জগৎ? কিভাবে এসব বস্তু অস্তিত্বশীল আছে? এ পর্যন্ত ক'টি মৌলিক পদার্থ আবিস্কৃত হয়েছে? ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব আমরা এই প্রথম পাঁচটি বক্তৃতায় উপস্থাপন করবো। আমরা দেখাবো: মেটার মূলত অণু-পরমাণু দ্বারা সৃষ্ট। পদার্থ থেকে পদার্থে মূল পার্থক্য অণু বা এটমের মধ্যস্থ ক'টি পরমাণু আছে, তার উপর নির্ভরশীল। যেমন: হাইড্রোজেন হলো স্বভাবের সর্বাপেক্ষা সাদামাটা পদার্থ। এটি সাধারণত রংহীন গ্যাস আকারে অস্তিত্বশীল। এটা গঠিত হয়েছে একটি মাত্র প্রটন ও একটি ইলেকট্রন কণা দ্বারা। জগতব্যাপী এই সাধারণ পদার্থই সর্বাধিক বেশী বিদ্যমান। সূর্যসহ প্রতিটি তারার মৌলিক পদার্থ হলো এই হাইড্রোজেন গ্যাস। হাইড্রোজেন এটমের কেন্দ্রে প্রটন নামক কণাটির অবস্থান। এর চতুর্দিকে একটি মাত্র ক্ষুদ্রতম ইলেকট্রন ঘুর্ণনরত আছে। বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরী হয় এরূপ একাধিক এটমের মাধ্যমে। প্রতিটি এটম একটা আরেকটাকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণকে বলে **'এটোমিক বন্ড'**। দু'টি হাইড্রোজেন এটম একত্রিত হয়ে এই বন্ড তৈরী করে যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় **'মলিকিউল'** বলে। অনুরূপ অন্যান্য পদার্থের এটমও বন্ড তৈরী করে মলিকিউল হিসাবে অস্তিত্বশীল আছে। আরেকটি পদার্থের উপর কিছুটা ব্যাখ্যা তুলে ধরলেই বিষয়টি বুঝে আসবে।

হিলিয়াম নামক আরেকটি মৌলিক পদার্থ আছে। আমাদের নিকটতম তারা সূর্যের অভ্যন্তরে এই পদার্থ সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কিভাবে? প্রথমত: আগেই বলেছি প্রত্যেক তারার মধ্যে সর্বাধিক বেশী পদার্থ হলো হাইড্রোজেন। সূর্যের বাইরের তাপমাত্রা ৫,৫০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। অভ্যন্তরে বিরাজ করছে প্রচণ্ড চাপ [২.৪৭৭ x ১০^{১১} বার [পৃথিবীর সাগর-স্তরে চাপ মাত্র ১,০১৩ মিলিবার (০.০০১০১৩ বার), কেন্দ্রের ঘনাঙ্ক: ১.৬২২ x ১০৫ কিগ্র/মিস২ (কঠিন পদার্থ সীসার তুলনায় এই মাত্রা ১৩ গুণ বেশী)] ও তাপ [১৫.৬ মিলিয়ন (১.৫৬ কোটি) ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড]। সেখানে হাইড্রোজেন গ্যাস 'ফিউশন' [একত্রীকরণ ক্রিয়া] নামক আনবিক প্রতিক্রিয়ার শিকার। ফলে দু'টি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াই (কেন্দ্র) একত্রিত হচ্ছে। সৃষ্টি করছে হিলিয়াম পদার্থ। নতুন এ পদার্থ সৃষ্টির সময় রিলিজ বা বিকিরণ করছে বিরাট মাত্রার এনার্জি। এভাবে সূর্যটি 'জ্বলন্ত' আছে। ফিউশন প্রতিক্রিয়ার 'জ্বালানি' হিসাবে সূর্য 'সৃষ্টির' পর থেকে এ পর্যন্ত ৩৭ শতাংশ হাইড্রোজেন জ্বালিয়ে হিলিয়ামে পরিণত করেছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা আরো ৭ বিলিয়ন [৭০০ কোটি] বৎসর পর কেন্দ্রের হাইড্রোজেন শেষ হয়ে যাবে। ঘটবে সূর্যের মৃত্যু। নিম্নে আমরা হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম এটমের অতি সাধারণ চিত্র তুলে ধরেছি।

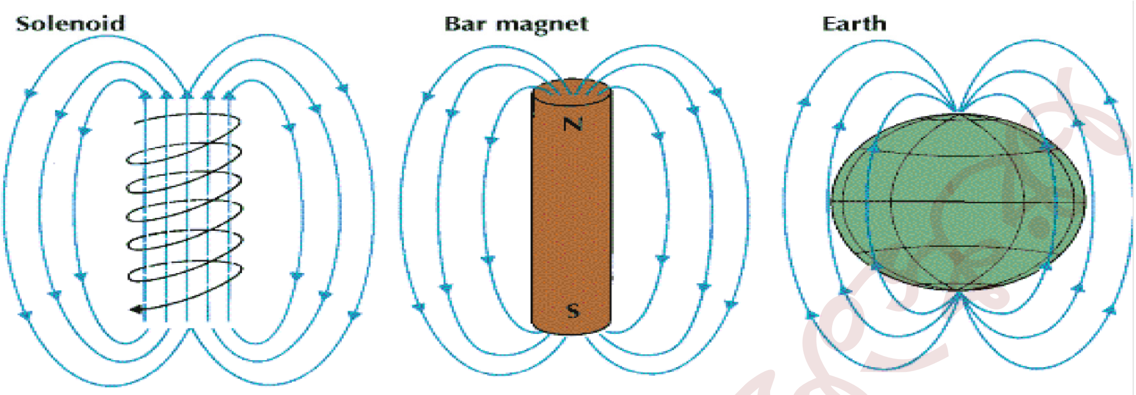


হাইড্রোজেন এটম হিলিয়াম এটম

উপরের চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। হাইড্রোজেন এটম যে একটিমাত্র প্রটন ও একটি ইলেকট্রনের তৈরী তা স্পষ্ট। অপরদিকে হাইড্রোজেন এটম ফিউশন প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে 'একত্রিত' হয়ে হিলিয়াম নামক যে নতুন পদার্থ সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে মোট ৬টি পরমাণু আছে: কেন্দ্রে দু'টি করে প্রটন ও নিউট্রন এবং বাইরে ঘূর্ণনরত দু'টি ইলেকট্রন। এ পর্যায়ে একটি তথ্য দেওয়া যায়। আদি যুগে সম্ভবত 'এ্যারিস্টটল' বলেছিলেন পুরো মহাবিশ্ব চারটি মাত্র মৌলিক পদার্থে সৃষ্ট। এগুলো হলো: পানি, আগুন, মাটি ও বাতাস। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে, এ্যারিস্টটলের এই 'ইলেমেন্ট' চতুষ্টয়ের মূল্যায়ন এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি বটে। তবে আজকের বিজ্ঞান বলছে স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত মৌলিক পদার্থের সংখ্যা ৯২টি। অবশ্য কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট এমন কিছু পদার্থের কথাও আমরা জানি যাদের সংখ্যা এ পর্যন্ত দশে দাঁড়িয়েছে।

আগামী ৫টি বক্তৃতার মাধ্যমে যা আমরা বুঝার চেষ্টা করবো তাহলো: ১. বস্তুর স্বরূপ, ২. বস্তুর মধ্যস্থ অণু-পরমাণুর গঠনপ্রণালী, ৩. কিভাবে একাধিক এটম থেকে 'মলিকিউল' নামক অপেক্ষাকৃত বড়ো আরেক মৌলিক বস্তু সৃষ্টি হয়, ৪. কিভাবে একাধিক মলিকিউল মিলে তৈরী হয় দৃশ্যমান সকল বস্তু, ৫. কিভাবে একাধিক ভিন্ন মৌলিক পদার্থ একত্রে মিলে তৈরী করে যুক্ত পদার্থ বা কম্পাউন্ড এবং কিভাবে বস্তুর মধ্যে এনার্জি বা শক্তি প্রয়োগের ফলে তার অবস্থা বা স্টেট পরিবর্তন হয়। এ বিষয়ের উপর যে ৫টি লেকচার থাকবে তার টপিকসমূহ নিম্নরূপ:

১. বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি: পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নীরিক্ষা; বৈজ্ঞানিক মাপজোখ যন্ত্রাদি।
২. ক্যুয়ার্ক থেকে মহাবিশ্ব: সাব-এটোমিক পরমাণু; ক্যুয়ার্ক; প্রটন ও নিউট্রন; অণু [এটম]।
৩. বন্ড ও মলিকিউল।
৪. মৌলিক পদার্থ [ইলেমেন্ট]; যুক্ত পদার্থ [কম্পাউন্ড]।
৫. বস্তুর ফিজিক্যাল অবস্থা: কঠিন; তরল; বাষ্প; প্লাজমা।



কারেন্ট বাহক 'সলেনোইড'-এ **ইলেকট্রমেগনাটিজম** | লৌহটুকরো-চুম্বকে **ফেরোমেগনেটিজম** | পৃথিবীতে **জিওমেগনেটিজম**

খ. পদার্থবিজ্ঞান: বস্তুজগতের মিথস্ক্রিয়া

হ্যাঁ, পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা জরুরী। তবে ভাবনার কারণ নেই- আমরা পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত উচ্চ-গণিতের জগতে পদার্পণ করবো না। এটা লেকচারের স্কোপ বা ব্যাপ্তির বাইরে। পদার্থবিজ্ঞানের মাধ্যমে বস্তু সম্পর্কে যা কিছু তথ্যাদি আবিস্কৃত হয়েছে, তা-ই হবে আমাদের আলোচ্য বিষয়াদি। এরপর, বস্তু যেভাবে আছে সেভাবে থাকার কারণ, একটি আরেকটির সাথে মিথস্ক্রিয়ার স্বরূপ, কোন্ কোন্ মৌলিক শক্তি বা বলের মাধ্যমে এই মিথস্ক্রিয়া ঘটছে ইত্যাদির উপরও আমরা বেশ কিছু মনোন্মচনী বক্তব্য তুলে ধরবো। খাস করে যে চারটি স্বাভাবিক শক্তির মাধ্যমে সমগ্র মহাবিশ্বের যাবতীয় বস্তু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তার উপর এই লেকচার ছ'টিতে বেশ কিছু কথা থাকবে। সন্ধানী ছাত্রবন্ধু! এসব বিষয় অনুধাবনই হলো বিজ্ঞান ও এর কাজ কী তা সঠিকভাবে বুঝার চাবি। সুতরাং ধৈর্যসহ এগুলোর প্রতি মনোযোগ সৃষ্টির প্রয়োজন। নীচের চিত্রে চারটে মৌলিক শক্তির ক্রিয়া কিভাবে বিভিন্ন বস্তুতে সক্রিয় আছে তার উদাহরণ তুলে ধরেছি।



প্রাকৃতিক চার শক্তি: সূর্য থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া এনার্জির মূলে আছে **'শক্তিশালী আনবিক শক্তি'**; পড়ন্ত আপেলে আছে **'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি'**; মেগনেটিক ফিল্ডে থাকে [উপরে ডানে] **'বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় শক্তি'**; এবং উজ্জ্বল ঘড়িতে আছে **'দুর্বল আনবিক শক্তি'**।

পদার্থবিজ্ঞানের উপর ছ'টি বক্তৃতা নিম্নে উল্লেখিত টপিকসমূহ অনুসরণে উপস্থাপন হবে।

১. পদার্থবিজ্ঞান: চার-শক্তির নিয়ন্ত্রণে সকল বস্তু।
২. আলোকবিজ্ঞান : ক. ভূমিকা, আলেকরশ্মির স্বরূপ: আলোকরশ্মি বিকিরণ, ইলেকট্রমেগনেটিক ওয়েভ।
৩. আলোকবিজ্ঞান : খ. ফটোন; আলোকসূত্র; আলোক সনাক্তকরণ।
৪. আলোকবিজ্ঞান : গ. আলোকের চরিত্র; বস্তুর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া; গতিমতি।
৫. আলোকবিজ্ঞান : ঘ. ফটোসিনথেসিস- ভূমিকা।
৬. আলোকবিজ্ঞান : ঙ. ফটোসিনথেসিস- বিশ্লেষণ।



তারা ও গ্যালাক্সিসর্বস্ব মহাবিশ্বের এক ক্ষুদ্রাংশ



আমাদের সৌরজগৎ

গ. মহাকাশবিজ্ঞান: গঠনপ্রণালী ও মৌলিক গতিবিধি

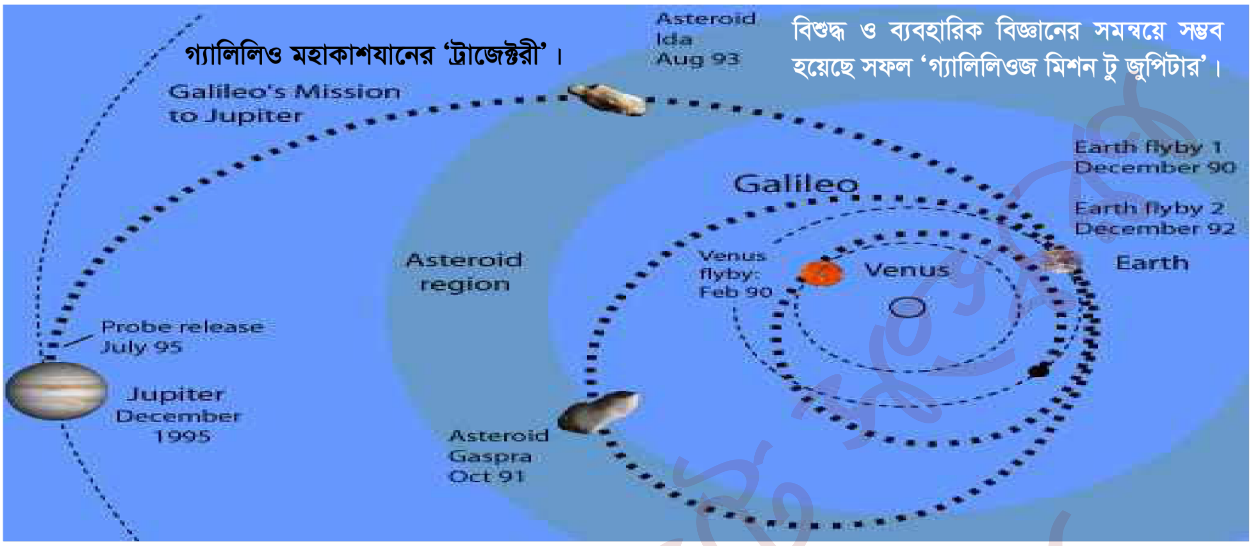
আমরা যে জগতে বাস করি তা বিরাট। এতে আছে এ পর্যন্ত জানা ৯২টি মৌলিক পদার্থ। অর্থাৎ মেটার বা বস্তু। আছে বিরাট বিরাট স্থান দখলকারী 'শূন্যস্থান' [Vacuum]। সর্বোপরি মহাবিশ্বব্যাপী বিরাজ করছে প্রায় গণনাতীত ছোট-বড় তারকা। এগুলো অস্তিত্বশীল আছে দলে দলে। দু'টি থেকে কোটি কোটি সদস্যসংখ্যা নিয়ে এসব গ্রুপ সৃষ্ট। এসব দলের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। যেমন: বাইনারি তারা সিস্টেম [দু'টি তারা নিয়ে একটি দল]; তারা ক্লাস্টার [শত শত বা হাজার হাজার তারাসম্বলিত দল]; সুপার তারা ক্লাস্টার [লক্ষ লক্ষ থেকে উর্ধ্বে কোটি কোটি পর্যন্ত তারাসম্বলিত দল]; এবং গ্যালাক্সি [কোটি কোটি তারা সম্বলিত বিরাট মহাশূন্য দখলকারী গ্রুপ]।

উপরোক্ত তারা-দলগুলো নিয়ে আলোচনা হবে এ বিষয়ের উপর প্রথম তিনটি লেকচারে। অর্থাৎ জড়-জগতের গঠনপ্রণালীর উপর মৌলিক তথ্যাদি উপস্থাপন করবো। এতে আশা করা যায় ছাত্রবন্ধুরা মহাবিশ্বের ব্যাপ্তি, বিরাটত্ব, কাঠামো ইত্যাদি সম্পর্কে স্বীয় মনে ধারণা পোষণে সমর্থ হবেন। এরপর মহাকাশবিজ্ঞানের উপর দ্বিতীয় দু'টি লেকচারের ফোকাস থাকবে জগতের মৌলিক গতিবিধির উপর। সমগ্র মহাবিশ্ব মূলত গতিশীল। বিজ্ঞান এ পর্যন্ত বিভিন্ন বস্তুর গতিমতি সম্পর্কে যা জানতে পেরেছে তা সরল ভাষায় উভয় বক্তৃতায় উপস্থাপন করবো। সন্ধানী বন্ধুরা! চিন্তার কারণ নেই- আমি আপনাদেরকে 'আস্ট্রফিজিক্স' বা মহাকাশ-পদার্থবিজ্ঞানের কাঠিন্যতার গবেষণায় নিমজ্জিত করে 'শাস্তি' দেবো না! আসলে বিজ্ঞানের উপর পুরো এ বক্তৃতামালাই মূলত বিজ্ঞানের স্বরূপ ও আবিষ্কার সম্পর্কে অতিরিক্ত জানার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। গাণিতিক কিংবা টেকনিক্যাল কাঠিন্যতা উপস্থাপন মোটেই উদ্দেশ্য নয়। বাস্তবে তার দরকারও নেই। আমরা শুধু বিজ্ঞানের জগতটাকে যেটুকু সম্ভব অনুধাবন করবো- এই যা।



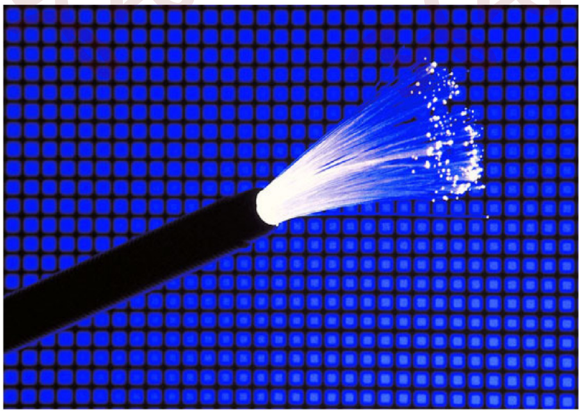
মহাকাশবিজ্ঞানের উপর আমাদের ছ'টি বক্তৃতার টপিক হবে নিম্নরূপঃ

১. মহাকাশবিজ্ঞানঃ ভূমিকা।
২. সৌরজগৎঃ সূর্য, অভ্যন্তরীণ চারটি পৃথিবীসদৃশ গ্রহ।
৩. সৌরজগৎঃ সূর্য, অভ্যন্তরীণ চারটি পৃথিবীসদৃশ গ্রহ।
৪. সৌরজগৎঃ এ্যাস্টারোইড বেল্ট ও বাইরের গ্রহ-উপগ্রহ।
৫. তারাজগৎঃ গ্যালাক্সি; ক্লাস্টার; সুপারক্লাস্টার; গ্যালাক্সির কেন্দ্র; ব্ল্যাক হোল।
৬. কজমোলজিঃ সৃষ্টিতত্ত্বের উপর কিঞ্চিৎ আলোচনা।



ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের দু'টি দিক আছে। এক. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান [পিওর বা থিওরীটিক্যাল সাইন্স] এবং দুই. ব্যবহারিক বিজ্ঞান [এপ্লাইড সাইন্স]। মোট তোরোটি বক্তৃতায় আমরা উভয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য প্রকৃতি ও এর কার্যকারিতা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানার্জন। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের অপর নাম প্রযুক্তি [টেকনোলজি]। বিজ্ঞানের উপর আমাদের মৌলিক জ্ঞানার্জন-ভিত্তিক এসব বক্তৃতামালায় আধুনিক প্রযুক্তির বিরাট ব্যাপ্তি উপেক্ষা করাই উদ্দেশ্য। বাস্তবে প্রযুক্তি এসব মৌলিক লেকচারে সম্পৃক্তকরণ আদৌ সম্ভব নয়। এরপরও বিজ্ঞানের নির্যাস হিসাবে চিহ্নিত 'ব্যবহারিক বিজ্ঞান' বা টেকনোলজির উপর কিঞ্চিৎ আলোচনা দ্বারা ছাত্রবন্ধুরা উপকৃত হবেন ভেবে লেকচারে তা সম্পৃক্ত করেছি। প্রথমেই যে বলেছিলাম, আপনার পকেটে হাত দিন- তা-তো সমূলে ভুলে গেলে চলবে না- কেমন? নিম্নে দু'টি চিত্র তুলে ধরেছি। থিওরীটিক্যাল সাইন্স বা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান এবং এ থেকে উদ্ভাবিত অত্যাধুনিক দু'টি টেকনোলজি চিত্রিত হয়েছে।



বিশুদ্ধ 'ডিজিট্যাল সিগনাল' বহনে ফাইবার-অপটিক্স কেব্‌ল'।



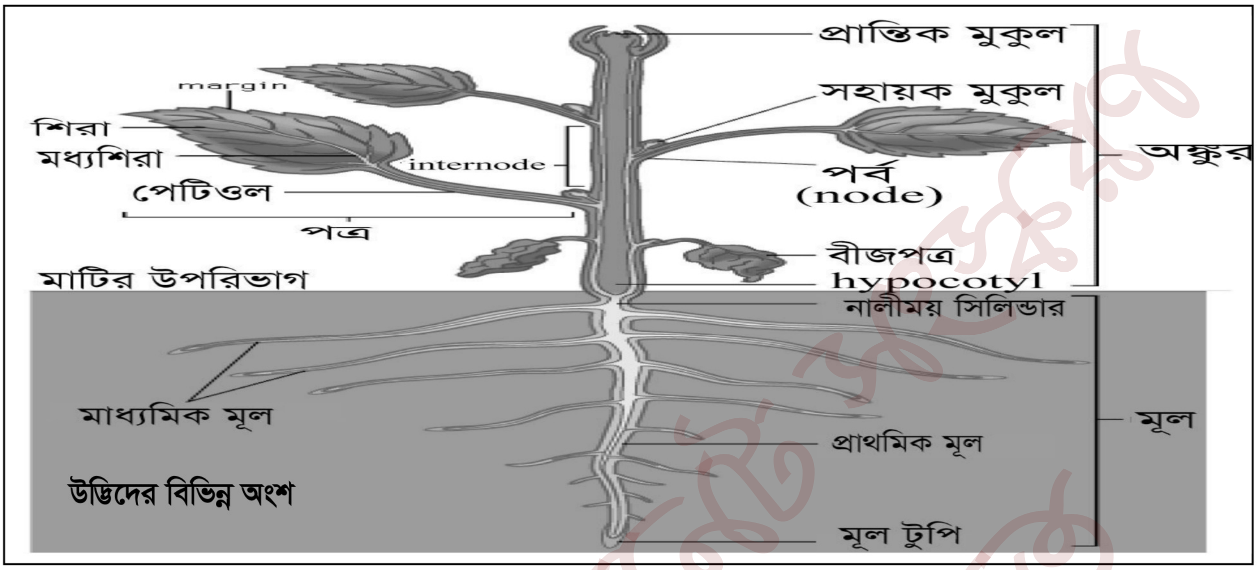
আকাশপথে দ্রুত ভ্রমণের অবলম্বন 'বিমান'।

যে আটটি বক্তৃতা নিয়ে এ বিষয় দু'টোর উপর আমাদের আয়োজন তা নিম্নরূপ:

১. আধুনিক প্রযুক্তি: **বিশুদ্ধ বিজ্ঞান: বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান; ব্যবহারিক বিজ্ঞান: প্রযুক্তি।**
২. আধুনিক প্রযুক্তি: **পকেট কালক্যুলেটার; যান্ত্রিক যানবাহন; উড়োজাহাজ।**
৩. আধুনিক প্রযুক্তি: **স্থির ও চলচিত্র ক্যামেরা; টেলিভিশন; এটম বোমা।**
৪. আধুনিক প্রযুক্তি: **ব্যক্তিগত কম্পিউটার [পিসি]; কিভাবে কম্পিউটার কাজ করে; কঠিন যন্ত্রাংশ [hardware]।**
৫. **ব্যবহারিক বিজ্ঞান;** পেরিফেরলস্; **ডিসপ্লে ইউনিট [প্রদর্শন যন্ত্র]; মাউস; কিবোর্ড; হার্ড ডিস্ক।**
৬. ব্যবহারিক বিজ্ঞান: **কঠিন যন্ত্রাংশ [যধৎফধিৎব] : পেরিফেরলস্; সিডি রম; মডেম; স্কানার; লাইট পেন।**
৭. ব্যবহারিক বিজ্ঞান: কম্পিউটারের তরল যন্ত্রাংশ: **সফ্‌টওয়্যার [software]; কম্পিউটারের ভাষা।**
৮. ব্যবহারিক বিজ্ঞান: ইন্টারনেট [internet]
৯. ব্যবহারিক বিজ্ঞান: **আধুনিক যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহ।**
১০. ব্যবহারিক বিজ্ঞান: **অপটিক্যাল ও রেডিও টেলিস্কোপ।**
১১. ব্যবহারিক বিজ্ঞান: **মাইক্রস্কোপ**
১২. ব্যবহারিক বিজ্ঞান: **মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি।**



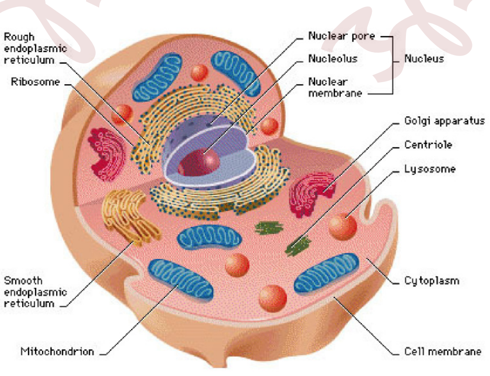
•'সৌর-বাতাস' গবেষণার জন্য কৃত্রিম উপগ্রহ: আধুনিক প্রযুক্তির বিস্ময়।



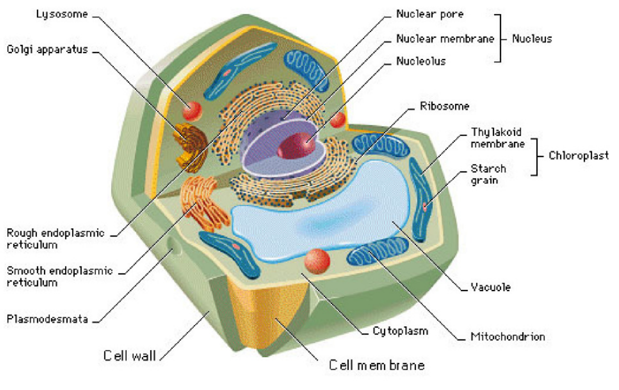
উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ

ঙ. প্রাণীজগৎ: পরিচিতি ও কার্যকারিতা

প্রাণ বলতে কি বুঝায়? জীবদেহ ও উদ্ভিদ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে? দেহের মৌলিক যন্ত্রাংশের পরিচিতি ও ফাংশন সম্পর্কে আলোচনা ইত্যাদি বিষয় থাকবে এ ছ'টি লেকচারের মধ্যে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমাদের দেহখানার মৌলিক বিল্ডিং ব্লকের নাম হলো কোষ বা সেল। আমাদের রক্ত, অস্থি, মজ্জা, ছোট-বড়ো দেহ-যন্ত্র, হাত-পা, চামড়া, লোম ইত্যাদি সবই কোষের তৈরী। একটি বিশেষ পদ্ধতিতে প্রতিটি কোষ 'ডিজাইন' করা হয়েছে। ফলে সবগুলো মিলে কাঙ্ক্ষিত কার্যাদি আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের পুরো দেহকে জ্যান্ত রাখছে। এখন, এই কোষগুলো সম্পর্কে যদি আমাদের মৌলিক ধারণা থাকে তাহলে পুরো দেহটি সম্পর্কে মোটামুটি বৈজ্ঞানিক একটি চিত্র আমাদের মনে রেখাপাত করবে। নীচের চিত্রে দু'টি কোষ দেখাচ্ছে: প্রথমটি প্রাণীদের ও দ্বিতীয়টি উদ্ভিদের।



প্রাণীদেহের বিল্ডিং ব্লক: **'মানব কোষ'**।



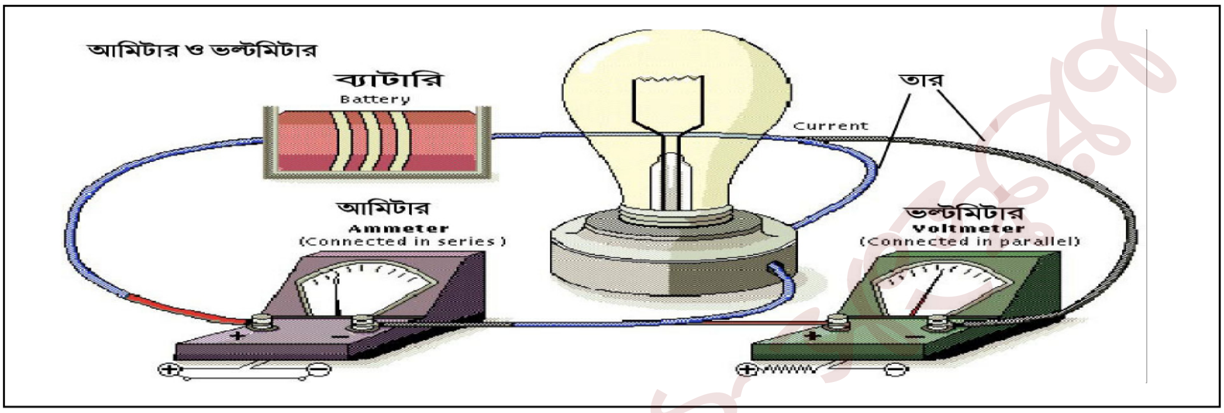
উদ্ভিদের বিল্ডিং ব্লক: **'উদ্ভিদ কোষ'**।

আমরা কেউ ডাক্তার হতে যাচ্ছি না! তবে ডাক্তারবাবুরা কী-সব জিনিস নিয়ে দিনরাত মাথা ঘামান ও চিকিৎসার নামে আমাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেন সে সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞানার্জন দোষের কিসের? সর্বোপরি স্বল্প পরিসরে হলেও কোষ বিজ্ঞানের উপর কিছুটা জানা থাকলে নিজের দেহকে সঠিকভাবে দেখাশোনার দায়িত্বোধ তো অন্তত অনেকটা প্রখর হবে। তাছাড়া প্রাণী-বিজ্ঞানের উপর ন্যুনতম কিছু আলোচনা ছাড়া বিজ্ঞানের উপর আমাদের তথ্যানুসন্ধান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এসব ব্যাপার চিন্তা করেই অত্র লেকচারে প্রাণী-বিজ্ঞান নিয়ে কিছুটা আলোচনার প্রয়াস। ছাত্রবন্ধুরা! আমি আশা করছি অপূর্ব কলা-কৌশলে সৃষ্ট নিজের দেহ সম্পর্কে অতিরিক্ত জ্ঞান উপকারী হবে। এ টপিকে প্রতিটি বক্তব্যের আলোচ্য বিষয় থাকবে নিম্নরূপ:

১. প্রাণীজগৎ: প্রাণের সংজ্ঞা; জীব-জন্তুর দেহকাঠামো।
২. উদ্ভিদ: কাঠামো; তাদের বেঁচে থাকার উপায়-পদ্ধতি; ফটোসিনথেসিস [সালোকসংশ্লেষণ]।
৩. কোষ বিজ্ঞান: জীব-জন্তুর কোষ ও উদ্ভিদের কোষ।
৪. কোষ থেকে সৃষ্ট মানবদেহ; কোষ থেকে সৃষ্ট উদ্ভিদ।
৫. মানবদেহের যন্ত্রাদি [অরগ্যান]: মস্তিষ্ক; হৃদযন্ত্র; যকৃৎ; বৃক্ক [কিডনি]।
৬. পঞ্চেন্দ্রিয়: চক্ষু; কর্ণ; নাসিকা; জিহ্বা; ত্বক।



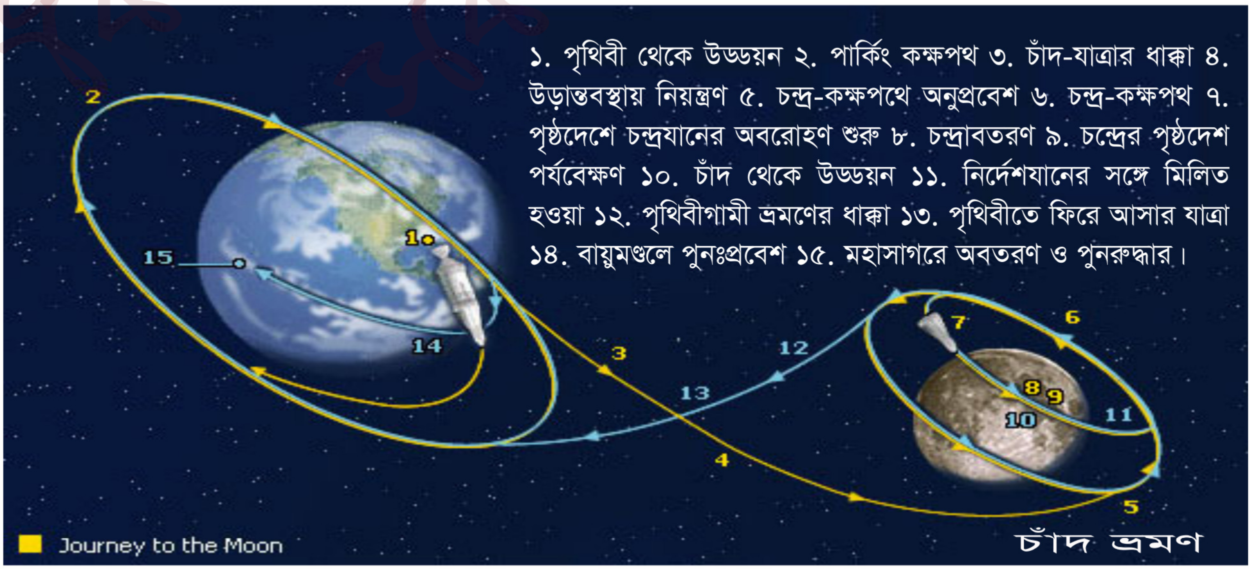
মহাকাশে ভাসমান **'প্রাণচঞ্চল'** গ্রহ আমাদের পৃথিবী।



চ. গণিত শাস্ত্রের গুরুত্ব

বলা হয় **'গণিত বিজ্ঞানের মা'**। সত্যিই তা-ই। কিন্তু গণিত খুব একটা সহজ বিষয় নয়। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন গাণিতিক ব্যাপার-স্যাপার শিক্ষার্থীর মনে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। গণিত শিক্ষায় আগ্রহে ভাটা পড়ে। 'জানার মধ্যস্থ উল্লাস' অনুভূত হয় না। কিন্তু এরপরও 'বিজ্ঞানী বনতে' গণিত শিক্ষার বিকল্প নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গণিত ছাড়া সম্পূর্ণ অচল। সুখের বিষয়, এ লেকচারে অংশগ্রহণকারী কারোর জন্য গণিত জানার প্রয়োজন নেই। তবে হ্যাঁ, অন্তত ভাসাভাসাভাবে গণিত সম্পর্কে ন্যূনতম কিছু ধারণা না থাকলে বিজ্ঞানকে বুঝা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এটা ভেবেই সর্বশেষ বক্তৃতায় গণিতের উপর আলোচনার প্রয়াস। সবাই স্বস্তিবোধ করুন! গাণিতিক সীমকরণ নিয়ে মাথা ঘামানো কিংবা মোটা মোটা জটিল অঙ্ক কষতে আমরা যাবো না। নিম্নে উল্লেখিত গণিতের বিভিন্ন বিষয়ের উপর শুধুমাত্র 'ভাষার মাধ্যমে যেটুকু সম্ভব' বুঝিয়ে বলাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এতে আশা করা যায়, শ্রোতাবন্ধুরা বিজ্ঞান গবেষণায় গণিতের বিরাট গুরুত্ব অনুধাবন করবেন।

বিজ্ঞানে গণিতের ব্যবহারের উপর একটি ছকবদ্ধ চিত্র নীচে তুলে ধরেছি। আশা, এ থেকে সন্ধানী বন্ধুরা বুঝতে সক্ষম হবেন গণিতের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা।



উপরের চিত্রে **'চন্দ্রে মানুষ প্রেরণ ও ফিরে নিয়ে আসা'র** ক্ষেত্রে ২৫টি পর্যায় দেখানো হয়েছে। এর প্রতিটি সফল করতে যেয়ে প্রয়োজন দাঁড়ায় গণিতের। ত্বরণ, দূরত্ব, মহাকার্ষিক টানক্রিয়া, গতি, মহাকাশে সময়ের সাথে পৃথিবী-চন্দ্রের অবস্থান, বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণগতি ইত্যাদি অনেক বিষয় সঠিকভাবে নির্ণয় করতে প্রয়োজন হয়েছে গণিতের। একখানা গড়ি চালনা ও নিয়ন্ত্রণে গণিতের সরাসরি ব্যবহার যানের **'গতিমিটারে'** আমরা দেখতে পাই। গাড়ির চাকা প্রতি মিনিটে ক'বার ঘুরছে সে হিসাব থেকে মিটারে গাড়ির গতি প্রদর্শিত হয়। মোটকথা গণিত ছাড়া পুরো বিজ্ঞানজগৎ অচল। সুতরাং গণিতের উপর আমাদের সর্বশেষ লেকচারটি এ বিষয়ের মূল ক'টি শাখা নিয়ে পরিচিতিমূলক তথ্যের উপর সীমাবদ্ধ থাকবে। এ বিয়ষগুলো হলো:

গণিত: মূল শাখা-প্রশাখা; পাটীগণিত, বীজগণিত; জ্যামিতি; ত্রিকোণমিতি।

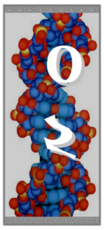
আজকের এই প্রথম লেকচারের এখানেই শেষ। উপরোক্ত বিষয়াদির উপর শীঘ্রই প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা ওয়াকিফহাল হবেন। জেনে নেবেন বিজ্ঞানের বিশাল জগতের স্বরূপ, চাকচিক্য, চমক ও কার্যকারিতা। এ আশা রেখে শেষ করছি।



মহাকাশে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত
'হাবল স্পেইস টেলিস্কোপ'।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ক. বস্তুজগৎ : মৌলিক গঠনপ্রণালী

বক্তৃতা ২ : বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি

প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! প্রথম বক্তৃতায় '**বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান**'-এর উপর পুরো এ কোর্সে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেছিলাম। আজ থেকে সত্যিকার অর্থে অত্র কোর্সের শুরু।

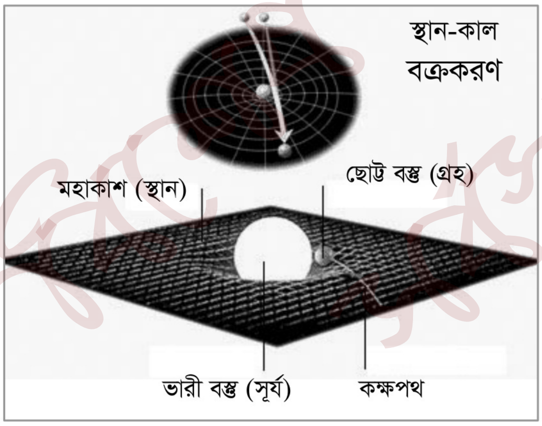
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মূলে কিছু বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। আমরা আজকের লেকচারে এর স্বরূপ উন্মোচন করার আশা রাখি। আমি অনুরোধ জানাচ্ছি, কোন ব্যাপার যদি পুরোদমে হৃদয়ঙ্গম না হয়, তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে কেউ দ্বিধা করবেন না। আপ্রাণ চেষ্টা চালাবো যাতে বিষয়টি আরো সহজ করে বুঝানো যায়। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কোন্ কারণে? এর জবাব হলো, বস্তুজগৎ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন। এই লক্ষ্যর্জনে বিজ্ঞান গবেষকরা মৌলিক একটি প্রিন্সিপাল বা পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। এই প্রিন্সিপালকে বলে '**সাইন্টিফিক মেথড**' বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে:

১. বস্তু জগৎ কিভাবে চলছে- তার অনুসন্ধান। তবে কেনো এরূপ চলে তা বিজ্ঞান-গবেষণার বাইরে। যেমন: কিভাবে মহাকর্ষ কাজ করে তার অনুসন্ধান চালানো। কেন মহাকর্ষ সৃষ্টি হলো সে ব্যাপারে আলোচনা-সমালোচনা অন্য কোন জ্ঞানান্বেষা যেমন দর্শনে থাকতে পারে, কিন্তু তা বিজ্ঞানে নেই।

২. বস্তুনিষ্ঠতার মানদণ্ডে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালানো ও যে ফলাফল পাওয়া যায় তা গ্রহণ করা। অর্থাৎ সবকিছুকে ঠিক ওভাবে দেখা, যেভাবে তা আছে। নিজের মধ্যে জন্মিত কোন ধারণা সঠিক বলে প্রমাণ করতে যেয়ে স্বেচ্ছায় বস্তুনিষ্ঠতার জলাঞ্জলি থেকে বিরত থাকা। মোটকথা, জগতটা যেভাবে আছে সেভাবে দেখা ও তার উপর তথ্যানুসন্ধান চালানো। কেন জগতটা এরূপ না হয়ে অন্যরূপ হলো না? কেন আলো সৃষ্টি হলো? ইত্যাদি প্রশ্ন বিজ্ঞান গবেষণার বাইরে। স্রষ্টায় যারা বিশ্বাসী তারা জানেন, যেভাবে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে ও চলছে সেভাবে করার ইচ্ছাপোষণ করেছিলেন মহান প্রভু- তা-ই এরূপ হয়েছে। এটা প্রভুর সৃষ্টি ও পরিচালনা পদ্ধতি। তিনি চাইলে অন্যভাবেও করতে পারতেন।

৩. যে কোন অনুসন্ধানের পেছনে থাকতে হবে উন্নত যন্ত্রাদি দ্বারা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নীরিক্ষা। আমরা বৈজ্ঞানিক মাপজোখ যন্ত্রাদির উপর আলোচনায় যাচ্ছি একটু পরই।

৪. আবিস্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্য সর্বদাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য আলোচনা-সমালোচনা, সত্যায়ন, পুনঃপরীক্ষণ ইত্যাদির জন্য উন্মুক্ত থাকবে। অর্থাৎ এটা বলতে নেই, **'আমি যে বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করেছি তা শতভাগ সঠিক'**। একটা দৃষ্টান্ত: বৃটিশ বিজ্ঞানী আইজাক নিউটন [১৬৪২-১৭২৭] মহাকর্ষ সম্পর্কে যেসব ব্যাপার আবিষ্কার করেছিলেন, পরবর্তী দীর্ঘ তিন শতাধিক বৎসর সবাই বিনাপ্রশ্নে মেনে নিয়েছে। এরপর বিংশ শতকের শুরুতে আলবার্ট আইনস্টাইন [১৮৭৯-১৯৫৫] এসে বললেন, আসল ব্যাপার হলো মহাকর্ষ মূলত স্থান-কালের একটি অবস্থার নাম। বস্তুর ওজন বা ম্যাস যতো বেশী হবে এর চতুর্পাশ্বস্থ স্থান-কাল ততো বেশী বক্র হয় [দেখুন নিম্নের 'স্থান-কাল বক্রকরণ' চিত্রটি]। এই বক্রপথে অন্য ছোট বস্তু চলার নামই মহাকর্ষ। এই নতুন থিওরীর নাম 'আপেক্ষিকতাবাদ'। উচ্চ গণিতের মাধ্যমে তিনি এ থিওরী বুঝিয়ে দিলেন এবং পরবর্তীতে তা পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে নিউটনের থিওরী সম্পূর্ণরূপে ভুলের ছিলো- তা কিন্তু নয়। বরং সাধারণভাবে নিউটনের থিওরী ও গণিত ব্যবহার করে মহাকাশে গ্রহ-উপগ্রহের গতিমতি প্রায় সঠিকভাবেই বের করা সম্ভব। বাস্তবে নিউটনের থিওরী থেকেও সূক্ষ্ম ও বেশী সঠিক হলো আইনস্টাইনের থিওরী। আর এটাও যে একদিন আরো সূক্ষ্মভাবে কারো দ্বারা উপস্থাপন হবে, তা অসম্ভব নয়। মোটকথা, কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই সমালোচনা ও সূক্ষ্মভাবে পুনঃঅনুসন্ধানের বাইরে নয়।



আপাতত উপরোক্ত চারটি বিষয় আমাদের পুরোদমে অনুধাবন করতে হবে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একটি দৃষ্টান্ত এখন তুলে ধরছি। এ থেকে সন্ধানী ছাত্রবন্ধুরা বিষয়টির উপর পূর্ণাঙ্গরূপে ওয়াকিফহাল হবেন এটাই আশা।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান : একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত

মনে করুন আপনার **'ফেরারি স্পর্টস্'** গাড়িটির সর্বোচ্চ গতি কী তা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বের করবেন। আপনি বলবেন, গাড়ির স্পিডোমিটারে এই গতি তো এমনিতেই দেখা যায়। হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে আমরা অন্য উপায়ে গতি নির্ণয়ের চেষ্টা চালাবো। এ থেকে বুঝতে সক্ষম হবো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে মানুষ হিসাবে আমাদের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা কতটুকু।

আপনার উদ্দেশ্য:

১. গাড়ির গ্যাস বা এক্সেলেরেটরে পা দ্বারা পরিপূর্ণরূপে চাপ দেওয়ার পর কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলেই গাড়িটি তার ক্ষমতানুযায়ী গতিশীল হবে।

২. এই গতি কী তা জানা।

গতি মাপার উপায়:

১. আপনার এক বন্ধু পেছনের সীটে বসে আছেন। হাতে একটি স্টপওয়াচ্।

২. গাড়িটি পূর্ণ গতিশীল হওয়ার পর রাস্তার পাশের একটি 'কিলোমিটার-ফলক' অতিক্রমের মুহূর্তে তিনি স্টপওয়াচ শুরু করলেন।

৩. পরবর্তী কিলোমিটার-ফলক অতিক্রমকালে স্টপওয়াচ্ স্টপ করা হলো।

৩. রেকর্ড করা হলো এক কিলোমিটার অতিক্রমের সময়-ডাটা বা তথ্য।

৪. আপনি অঙ্ক কষে বের করলেন, প্রতি ঘণ্টায় আপনার ফেরারি সুপার স্পর্টস্ গাড়িটির সর্বোচ্চ গতি কতো। আপনার অনুসন্ধান শেষ হলো। কিভাবে আপনি হিসাব করবেন তার দৃষ্টান্ত নীচে তুলে ধরছি।

মনে করুন, আপনার বন্ধুর স্টপওয়াচে রেকর্ড হয়েছে ১২.৬৭ সেকেন্ড। অর্থাৎ এক কিলোমিটার সরল সমতল রাস্তা পাড়ি দিতে এটুকু সময় লেগেছে। সুতরাং এক ঘণ্টায় গাড়িটি কতটুকু দূরে ভ্রমণ করতে পারবে? এ হিসাব অত্যন্ত সহজ।

ঘণ্টায় গাড়ির গতি = এক ঘণ্টায় যতো সেকেন্ড আছে / ১২.৬৭ সেকেন্ড।

ঘণ্টায় গাড়ির গতি = ৬০x৬০ / ১২.৬৭ সেকেন্ড = ৩৬০০ / ১২.৬৭ = ২৮৪.১৩৫৭৫৩৭৪৯০১৩ কিমি/ঘণ্টা = ২৮৪.১৩৬ কিমি/ঘণ্টা [১৭৬.৫৫ মাইল/ঘণ্টা]। আপনার ফেরারির গতি তো কম না!

আপনার এ হিসাবটা কতটুকু যথার্থ? এ প্রশ্নের জবাবে আপনি বলতে পারবেন না- তা ১০০ পার্সেন্ট সঠিক। এর একাধিক কারণ আছে। যেমন:

১. কিলোমিটার-ফলক থেকে যথার্থভাবে স্টপওয়াচ শুরু হয়েছে তা নিশ্চিত নয়।

২. স্টপওয়াচ বন্ধ করার সময় সঠিক স্থানে বন্ধ হয়েছে তা-ও নিশ্চিত নয়।

৩. গ্যাসে বা এক্সেলেরেটরে আপনি সর্বদা পুরোদমে চাপ দিয়েছিলেন- এটাও নিশ্চিত নয়।

৪. রাস্তা যথার্থ সমতল ও সোজা না-ও হতে পারে।

৫. রাস্তার মধ্যে পিচ্ছিলতা হেতু চাকাগুলো হয়তো সঠিকভাবে ঘুরতে পারে নি।

৬. বাইরের বাতাস হেতু গাড়ির মধ্যে বিপরীতমুখী বল বা ড্রাগ-ফোর্স অতিমাত্রায় সক্রিয় থাকতে পারে।

৭. সর্বোপরি আপনার বন্ধুর হাতের স্টপওয়াচটি ১০০ পার্সেন্ট সঠিকভাবে সময়-রেকর্ডে অসমর্থ হতে পারে।

আপনার গতিমিটারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারেন। বাস্তবে, গাড়ির গতিমিটারে যে গতি রেকর্ড হবে- তা-ই হবে সঠিক ফলাফলের অতি নিকটবর্তী। কারণ, ইঞ্জিনিয়াররা এটি ডিজাইন করতে যেয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছেন। ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা উন্নতমানের একটি যন্ত্র বানিয়েছেন। প্রতি মিনিটে গাড়ির চাকা ক'বার ঘুরছে আর একবার ঘুরতে কতটুকু দূর পর্যন্ত গাড়িটি এগিয়ে যায় তা নির্ণয় করেছেন সঠিকভাবে। চলন্ত অবস্থায় সর্বোচ্চ গতি কী হবে তা গতিমিটার থেকেই সর্বাপেক্ষা সঠিকভাবে জানা যেতে পারে।

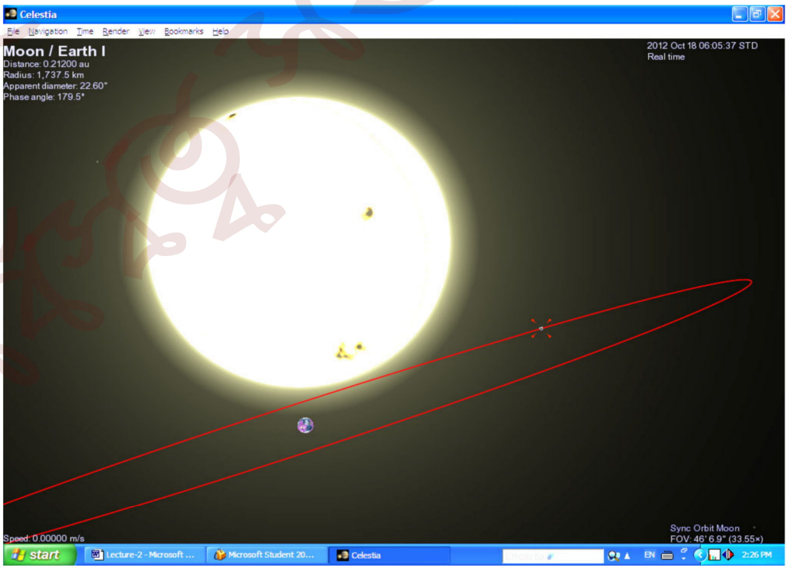
পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নীরিক্ষা

বিজ্ঞানীরা গবেষণা শুরু করেন কোন [দৃশ্যমান বা অদৃশ্য] ব্যাপার বা ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ থেকে। পর্যবেক্ষণ মূলত মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারাই হয়ে থাকে। কিন্তু তা সূক্ষ্মভাবে দেখতে যেয়ে বিজ্ঞানীরা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকেন। যেমন অণুবীক্ষণযন্ত্র [মাইক্রস্কোপ]। যেসব বস্তু মানব চোখে দেখা যায় না, এ যন্ত্রের সাহায্যে তা দেখা সম্ভব। অপরদিকে বেশী দূরবর্তী বস্তু যেমন মহাকাশের তারকা, কাছে থেকে দেখার উপায় হিসাবে বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেন দূরবীক্ষণযন্ত্র [টেলিস্কোপ]। বৈজ্ঞানিক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক যন্ত্রাদির উপর একটু পরই আলোচনা হবে।

পর্যবেক্ষণ দ্বারা সংরক্ষিত তথ্য বা ডাটা কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা কিছু পরীক্ষা-নীরিক্ষা করতে পারেন। এসব পরীক্ষা খুব সাধারণ থেকে বেশ জটিল হতে পারে। যেমন: কোন বস্তুর গলনাঙ্ক [মেল্টিং পয়েন্ট] কিংবা স্ফুটনাঙ্ক [বয়েলিং পয়েন্ট] বের করার জন্য তাতে তাপশক্তি [হিট এনার্জি] দেওয়া ও থার্মোমিটার দ্বারা মেপে নেওয়া; অথবা খুব জটিল-কঠিন পরীক্ষা যেমন, যে কোন মুহূর্তে দূরত্ব মাপার জন্য চন্দ্রের উপর পৃথিবী থেকে লেইজার আলোক-সিগনাল প্রেরণ ও ফিরিয়ে আনা।

সঠিক ফলাফল প্রাপ্তিতে সাধারণত একই পরীক্ষা বেশ কয়েক বার পরিচালনা করতে হয়। অদেখা, অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ব্যাপার পরীক্ষার সময় সক্রিয় থেকে ভুল ফলাফল রেকর্ড হতে পারে। এ সম্ভাবনা যাতে থাকে না, তা-ই বিজ্ঞানীরা কোন কোন সময় শত শত বার একই পরীক্ষা করে থাকেন। পানির গলনাঙ্ক ০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড [৩২ ডিগ্রী ফারেনহাইট]। এই সংখ্যাটি সঠিক হিসাবে সাব্যস্ত করতে যেয়ে বিজ্ঞানীরা গণণাতীত সংখ্যক পরীক্ষা করেছেন। অনুরূপ চন্দ্রের দূরত্ব মাপার পরীক্ষাটিও বার বার করা হয়ে থাকে।

অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নীরিক্ষা বাস্তব বস্তু নিয়েই হয়ে থাকে। যেমন: ইলেকট্রিক সার্কেট, রসায়নিক দ্রব্যাদি কিংবা প্রাণী। তবে এ যুগে কম্পিউটার বিজ্ঞানের চরম অগ্রগতির ফলে বিভিন্ন পরীক্ষা কম্পিউটার দ্বারাও করা হচ্ছে। একজন সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য তৈরী করতে পারেন একটি **'কম্পিউটার সিমুলেশন মডেল'**। অর্থাৎ বাস্তব অবস্থার সঠিক রূপায়ন কম্পিউটার প্রোগ্রাম দ্বারা উপস্থাপন। যেমন মহাকাশে সৌরজগতের গতিবিধি, সূর্য ও গ্রহ-উপগ্রহের তুলনামূলক আয়তন, সময়ের সঙ্গে কক্ষপথে ঘূর্ণন ও দৈনিক ঘূর্ণন গতির সম্পর্ক ইত্যাদি চিত্রিত করা যেতে পারে। এরপর একজন পরীক্ষক এই **'মডেল'** চালনা করে জেনে নিতে পারেন বিভিন্ন তথ্য। স্বচক্ষে অবলোকন করতে পারেন বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের তুলনামূলক আয়তন ও গতিশীলতা। বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে যা কিছু জেনেছেন গাণিতিকভাবে কম্পিউটার দ্রুত অঙ্ক কষে বস্তুগুলো পরিচালনা করে চিত্র-প্রদর্শন করতে পারে। ছাত্রবন্ধুদের যাদের ল্যাপটপ কিংবা টাওয়ার কম্পিউটার আছে তারা এরূপ একটি উন্নতমানের মডেল ইন্টারনেট থেকে **'ডাউনলোড করতে পারেন'**। আমার ল্যাপটপে এটি আছে। ডাউনলোড লিংক হলো: www.celestia.com



একটি বাস্তব পরীক্ষা

ছাত্রবন্ধুরা! আমার সামনে টেবিলের উপর কিছু বস্তু দেখতে পাচ্ছেন। আমি যে পরীক্ষাটা এখন প্রদর্শন করবো হয়তো আপনাদের অনেকেই এটা অতীতে দেখে থাকবেন। তবে এই পরীক্ষা দ্বারা কি কি প্রমাণ হয় তা হয়তো সবাই অবগত নন। আর এ জন্যেই অনেকের জানা এই **'যাদুসদৃশ'** পরীক্ষাটি তুলে ধরতে ইচ্ছা করছি।

উক্ত পরীক্ষা থেকে আমরা কী শিখলাম? যে ক'টি ব্যাপার এ থেকে স্পষ্ট হয়েছে তাহলো:

১. কাচের গ্লাসের ভেতর মোমবাতি জ্বলন্তাবস্থায় **'বাতাস ঢুকেছে'**। স্ট্র দ্বারা তা প্রমাণিত। এর কারণ কি?

২. গ্লাসটি পানির উপর কিছুক্ষণ উপুড় করে রাখার পর মোমবাতির আগুন এমনিতেই নিভে গেল। এর কারণ কি?

৩. বাতি নিভে যাবার উপর থালার কিছু পানি গ্লাসের ভেতর ঢুকে গেল। পানি তো আর এমনিতেই উপরের দিকে উঠে না। তাহলে এভাবে উঠার কারণ কি হতে পারে?

৪. ওঠার পর পানি নীচের দিকে নামছে না। কোন্ শক্তি একে আটকে রাখলো স্বস্থানে?

ছাত্র বন্ধুদের সবাইকে আমি এখন আবদার জানাচ্ছি, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ৫ মিনিটের ভেতর কাগজে লিখে আমার হাতে হস্তান্তর করুন। আপনি উপরোক্ত চার অবস্থার কারণ যেটাই মনে করেন- তা-ই লিখে দিন। ইতোমধ্যে আমি কয়েকটি শ্বাস নিচ্ছি! কেমন?

এই নোটে আমি উক্ত পরীক্ষার দৃশ্যত ফলাফল নিয়ে আর কিছু বলবো না। আগামী বক্তৃতার শুরুতেই চারটে প্রশ্নের জবাব তুলে ধরবো। এখন আসুন, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যবহৃত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রের উপর কিছু তথ্যাদি তুলে ধরি।

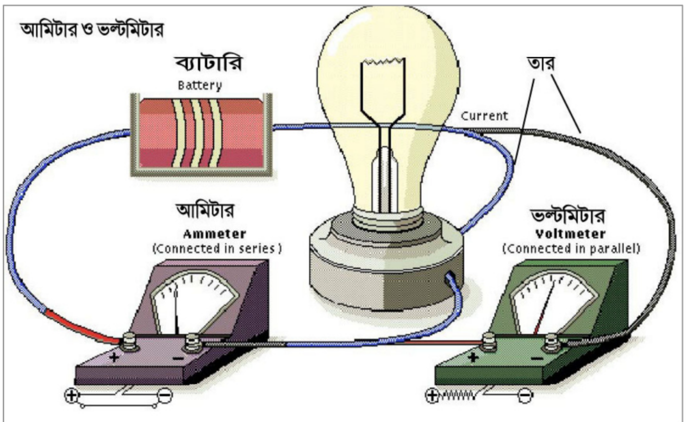
বৈজ্ঞানিক মাপজোখ যন্ত্রাদি

এ পর্যায়ে উচিৎ ছিলো মাপজোখে ব্যবহৃত **'আন্তর্জাতিক একক সিস্টেম'** এর উপর কিছু তথ্য তুলে ধরা। একে সাধারণত **এস.আই সিস্টেম** বলে। মাপজোখের একক যেমন, কিলোমিটার, মিটার, গ্রাম, কিউবিক মিটার ইত্যাদি হলো এই সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞানীরা মাপজোখ এই এস.আই সিস্টেম মুতাবিক করে থাকেন। পুরো এস.আই সিস্টেমের উপর আমরা আলোচনা করবো না এই লেকচারসমূহে। সুতরাং দরকার মতো ইউনিটের উপর তথ্য তুলে ধরবো মাত্র।

যাক, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে উপরে উল্লেখিত এস.আই সিস্টেমে গ্রহণযোগ্য ডাটা বা তথ্য সংগ্রহিত হয়। এই ডাটার উপর নির্ভর করেই পরবর্তীতে বৈজ্ঞানিক থিওরী আবিষ্কার ও প্রমাণ হয়। এ পর্যায়ে আমরা একে একে ৫টি আধুনিক যন্ত্রের পরিচিতি ও কার্যকারিতার উপর আলোচনা করবো। আর এরই মাধ্যমে আমাদের আজকের বক্তৃতার সমাপ্তি ঘটবে।

১. আমিটার (ammeter) ও ২. ভল্টমিটার (voltmeter)

যথাক্রমে ইলেকট্রিক কারেন্ট এবং ইলেকট্রিক ভলটেজের পরিমাণ মাপার জন্য আমিটার ও ভল্টমিটার ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রিক কারেন্টের ইউনিট হলো আম্পিয়ার (আম্পস্) এবং আপেক্ষিক পার্থক্য নির্ণয়ের ইউনিটের নাম ভল্ট। আমিটার ও ভল্টমিটার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান তখনই সম্ভব যখন আমরা বুঝতে সক্ষম হবো এই যন্ত্রদ্বয় বাস্তবে কি জিনিস পরিমাপ করে। সুতরাং আমরা এবার ইলেকট্রিক কারেন্ট, পটেনশিয়াল (আপেক্ষিক) পার্থক্য ও বৈদ্যুতিক রোধ (electrical resistance) বলতে কি বুঝায় সে ব্যাপারে কিঞ্চিৎ আলোচনা করবো।



ক. ইলেকট্রিক কারেন্ট (electric current): একটি বৈদ্যুতিক তারের ভেতর যেসব ইলেকট্রন চলে ওগুলোই হলো ইলেকট্রিক

কারেন্ট। এসব চলন্ত ইলেকট্রনকে বলে 'চার্জড্' (charged) ইলেকট্রন। তার বা কন্ডাকটারের (conductor) মাধ্যমে চার্জড ইলেকট্রন দু'টি পদ্ধতিতে চলন্ত হতে পারে: ১. সরাসরি একদিকে চলন্ত (direct current - DC) এবং ২. সামনে ও পেছনে এই উভয় দিকে চলন্ত (alternating current - AC)। কোনটা ডিসি আর কোনটি এসি কারেন্ট হবে তা নির্ভর করে কোন ধরনের জেনারেটর (generator) দ্বারা এই কারেন্ট তৈরি করা হয়েছে। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, জেনারেটরও **ডিসি** কিংবা **এসি** হতে পারে।

কন্ডাকটার বা তারের কোনো একটি পয়েন্ট দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে কি পরিমাণ চার্জড ইলেকট্রন অতিক্রম করে যাচ্ছে সেই হিসাবকেই আম্পিয়ার ইউনিট দ্বারা মাপা হয়। ১ আম্পিয়ার অর্থ প্রতি সেকেন্ডে $৬.২x১০^{১৮}$ (১০ এর সাথে ১৮টি শূন্য যোগ করলে যে বিরাট সংখ্যা হয়) সংখ্যক ইলেকট্রন ঐ তারের একটি পয়েন্ট দিয়ে গতিশীল আছে।

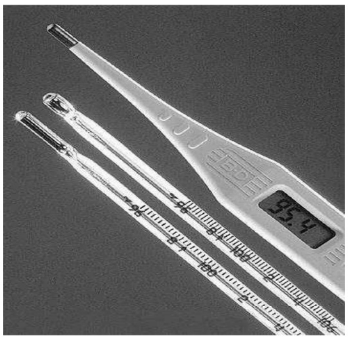
খ. আপেক্ষিক পার্থক্য (potential difference): যখন আমরা একটি ব্যাটারির উভয় টার্মিনাল কোন কন্ডাক্টিং তার দ্বারা সংযুক্ত করি তখন ইলেকট্রিক কারেন্ট ঐ তারের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। দু'টি টার্মিনালের একটি ইলেকট্রন সর্বদাই ছাড়তে থাকে আর অপর টার্মিনাল তা গ্রহণ করে নেয়। আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি কি পরিমাণ ইলেকট্রন (অণুর ক্ষুদ্রতম বস্তু) তারের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে চলমান আছে- তার হিসাব করা হয় আম্পিয়ার ইউনিট দ্বারা। তবে কোন্ শক্তিটি এসব ইলেকট্রনকে উভয় টার্মিনালের মধ্যে পরিচালনা করে? এই শক্তিটির নামই হচ্ছে ভলটেজ বা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স। ভলটেজ বেশি হওয়ার অর্থ হলো টার্মিনাল থেকে বেশী কারেন্ট চলন্ত হওয়া আর কম ভলটেজ হওয়ার অর্থ হলো এর বিপরীত তথা টার্মিনাল থেকে কম কারেন্ট চলন্ত থাকা।

গ. বৈদ্যুতিক রোধশক্তি (electrical resistance): এটাও একটি ইলেকট্রিকেল ইউনিট। কোন কন্ডাকটারই ইলেকট্রিকেল কারেন্টকে তার মধ্য দিয়ে চলতে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে না। কন্ডাকটারের নিজস্ব এটম ও চলন্ত ইলেকট্রনের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এর ফলে ইলেকট্রন চলার মধ্যে বাধার সৃষ্টি হয়। এই বাধাকেই বলে রেজিসটেন্ট। ওহ্‌ম (ohms) নামক ইউনিট দ্বারা এটা মাপা হয়- এবং এর সংকেত হলো গ্রীক অক্ষর Ω (ওমেগা)।

ভালো কন্ডাকটার সেটি, যার মধ্য দিয়ে অনায়াসে ইলেকট্রন চলতে পারে। অপরদিকে ভালো ইনস্যুলেটর (insulator) এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট ভালো চলে না। অর্থাৎ ভালো ইনস্যুলেটরে উচ্চ রেজিসটেন্ট বিদ্যমান।

৩. তাপমানযন্ত্র (thermometer)

থার্মোমিটার সবার জানা-চেনা একটি যন্ত্র। এর দ্বারা আমরা দেহের তাপ নির্ণয় করে থাকি। এরূপ যন্ত্রের মৌলিক অংশগুলো হলো গ্লাস টিউব ও তাতে রক্ষিত তরল ধাতু পারদ কিংবা সুরা (আলকাহল)। এই উভয় পদার্থ তাপের ফলে আয়তনে বাড়ে তাই এগুলোর ব্যবহার। গ্লাস টিউবে বা তার পার্শ্বে স্থাপিত অন্য কোন বস্তুর মধ্যে তাপের স্কেল লিখা থাকে। আমরা তাপের পরিমাণ এই স্কেল থেকে পড়ে নিতে পারি। নিম্নে তিনটি থার্মোমিটারের চিত্র দেওয়া হলো। লক্ষ্য করুন একটি থার্মোমিটারে তাপমাত্রা নাম্বারের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। এরূপ থার্মোমিটারকে বলে **'ডিজিটেল থার্মোমিটার'**।



আমরা সবাই জানি থার্মোমিটার দ্বারা তাপমাত্রা ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড কিংবা ডিগ্রী ফারেনহাইট ইউনিটে মাপা হয়। তবে তাপ মূলত কোন্ জিনিসকে বলে? বিজ্ঞান এই তাপকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে? এসব প্রশ্নের জবাব কি- তা একটু বুঝে নিতে হবে সবাইকে।

তাপের সংজ্ঞা: ‘কোন বস্তুর এক অংশ থেকে অন্য অংশে কিংবা এক দেহ থেকে অপর দেহে তাপমাত্রার (temperature) পার্থক্য দ্বারা এনার্জি (উদ্যম) স্থানান্তর হওয়াকে তাপ (heat) বলে’।

উপরোক্ত সংজ্ঞার আরো ব্যাখ্যা প্রয়োজন। তাপ হলো চলন্ত এনার্জির নাম। এটা সাধারণত উচ্চ তাপযুক্ত বস্ত থেকে নিম্ন তাপযুক্ত বস্তুতে স্থানান্তর হয়। এর উল্টোটা প্রায় হয়-ই না। ঠাণ্ডা বস্তু গরম বস্তুকে ঠাণ্ডা করে না বরং গরম বস্তুতে ঠাণ্ডা বস্তুর ছোঁয়া লাগলে তাপ ঐ ঠাণ্ডা বস্তুতে স্থানান্তরিত হয়। এতে ঠাণ্ডা বস্তুর তাপমাত্রা বাড়ে ও গরমটির তাপমাত্রা কমে। কথাটা বুঝে এসেছে, আশারাখি।

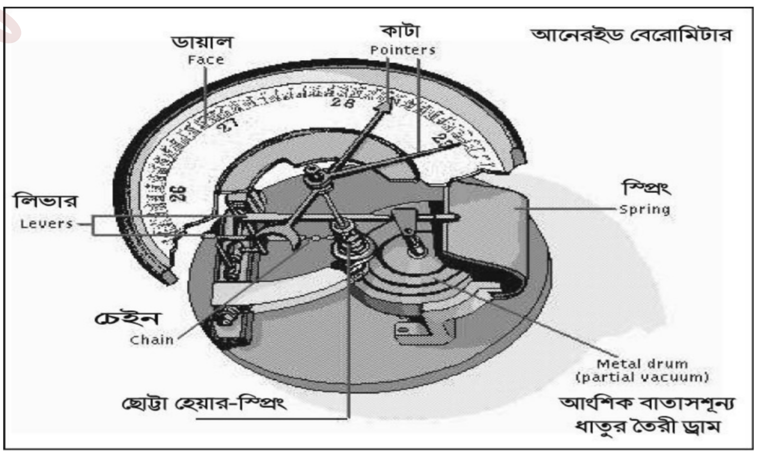
৪. আবহমানযন্ত্র (barometer) ও ৫. আলটিমিটার (altimeter)

আমাদের পৃথিবীর চতুর্দিকে একটি বায়ুমণ্ডল আছে। এই বায়ুমণ্ডলের ওজন থেকে একটি চাপ সৃষ্টি হয়। এই চাপকে বলে আবহমণ্ডলের চাপ (atmospheric pressure)। আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে যেয়ে এই চাপ কোন্ সময় কি পরিমাণ আছে তা মাপতে হয়। যে যন্ত্রের মাধ্যমে তা আঞ্জাম দেওয়া হয় তাকেই বলে আবহমানযন্ত্র (barometer)।

পারদ বেরোমিটার (mercury barometer) সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। এটা দেখতে অনেকটা থার্মোমিটারের মতো। অপর আরেক ধরনের বেরোমিটার আছে। এটাকে বলে আনেরইড বেরোমিটার (aneroid barometer)। সাগর লেবেলে আবহমণ্ডলের ওজন বিশেষভাবে ক্রমাঙ্কন নির্ণিত কাচের চোঙ্গা বা টিউবে রক্ষিত পারদকে ৭৬০ মিমি উপরে তুলে। তবে সাগর লেবেল থেকে উপরিস্থ কোন স্থানে পারদ উপরের দিকে কম ওঠবে। এর কারণ হলো, সেখানে বায়ুর মাত্রা কম। সুতরাং আবহমণ্ডলের চাপ উচ্চতা ও বায়ুর মাত্রার উপর নির্ভরশীল। পারদভর্তি টিউবের ব্যবহার হয়ে থাকে পারদ বেরোমিটারে (নীচের প্রথম চিত্রটি দেখুন)।

আনেরইড বেরোমিটার কিছুটা ভিন্ন। একটি ধাতুর তৈরী ড্রাম থেকে বাতাসের একাংশ বের করে নিয়ে এটাকে আংশিক বাতাসশূন্য করা হয়। এর ফলে বাতাসের মধ্যে চাপের তারতম্যের সঙ্গে ড্রামের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনকে কিছু গিয়ার সিস্টেম দ্বারা ঘড়ির ডায়ালের মতো একটি ডায়ালে কাটা বা পয়েন্টার দিয়ে তা দেখানো হয়। (নীচের দ্বিতীয় চিত্রটি দেখুন)। আনেরইড বেরোমিটারকে একটু পরিবর্তন করে বিমানে ব্যবহৃত উচ্চতা মাপার মিটার অলটিমিটার (altimeter) তৈরী করা হয়। যেহেতু উচ্চতার সঙ্গে চাপের সম্পর্ক বিদ্যমান তাই অলটিমিটার দ্বারা বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুচাপের মাত্রা নির্ণয় হলে অনায়াসেই আমরা সাগর লেবেল থেকে উচ্চতা অঙ্ক কষে বের করতে পারি। বাস্তবে এই অঙ্ক কষার কাজটি মিটারই করে থাকে। তাই পাইলট মিটার থেকে উচ্চতার মাত্রা সরাসরি অঙ্কে জেনে নিতে পারেন।





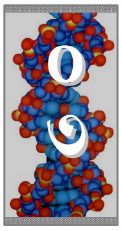
আরেক ধরনের অলটিমিটার আছে যার নাম রেডিও অলটিমিটার (radio altimeter)। বিমানের গায়ে একটি রেডিও যন্ত্র লাগানো থাকে। সেখান থেকে একটি ইলেকট্রমেগনেটিক রেডিও তরঙ্গ বা সিগনাল নীচের দিকে পাঠানো হয়। এই তরঙ্গ মাটিতে লেগে আবার ফিরে এসে বিমানের রাডার যন্ত্রে পৌঁছে। সিগনালটি যাওয়া-আসার মধ্যে যে সময় অতিবাহিত হয় তা থেকেই দূরত্ব মেপে বিমানের উচ্চতা নির্ণয় করা যায়। আলোকরশ্মি বা যে কোন ইলেকট্রমেগনেটিক সিগনাল একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলে। সুতরাং জানা এ গতি থেকে আমরা বিমানের উচ্চতা সহজেই নির্ণয় করতে পারি। তবে এ ক্ষেত্রেও অঙ্ক কষার কাজটি মিটারই করে থাকে। পাইলট যা দেখেন তা একটি সংখ্যা- মিটার, কিলোমিটার বা ফুট।

বিজ্ঞান গবেষণায় আরো অনেক ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। লেকচার প্রধান-কালে প্রয়োজন মুতাবিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির উপর তথ্যমূলক আলোচনা করবো।

সন্ধানী শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আজকের এ দ্বিতীয় বক্তৃতার এখানেই শেষ। আমি আশা করছি, আজকের বক্তব্য ও এসাথে লেকচার-নোট থেকে সকলে বিজ্ঞান সম্পর্কে আরো একটু বেশী জেনে নিয়েছেন! আগামী লেকচারে সবার সাথে আবার সাক্ষাৎ হবে এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

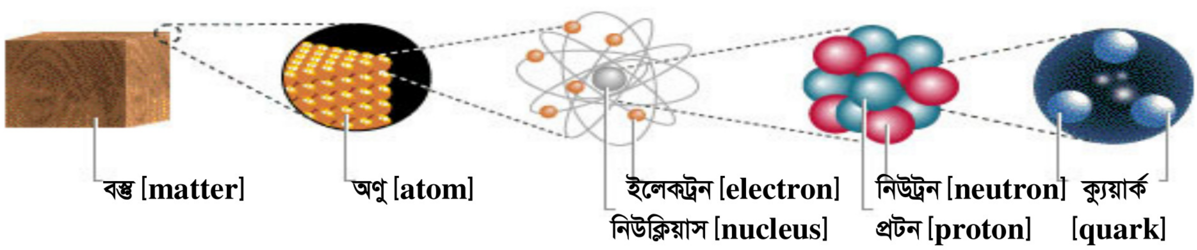
স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ক. বস্তুজগৎ : মৌলিক গঠনপ্রণালী

বক্তৃতা ৩ : ক্যুয়ার্ক থেকে মহাবিশ্ব

বস্তুজগতের [এ পর্যন্ত জানা] সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অংশের নাম **'ক্যুয়ার্ক'** [quark]। প্রিয় সন্ধানী বন্ধুরা! আজকের লেকচারে আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরের জগৎ নিয়ে আলোচনা করবো! শুধু তাই নয়, পরবর্তী লেকচারেও একাধিক অণুর সমন্বয়ে ঘটিত মলিকিউল [molecule] নামক বস্তুর উপর আলোচনা হবে। এটাও শক্তিশালী অণুবীক্ষণযন্ত্র ছাড়া চোখে দেখা যায় না। স্বভাবে বস্তুর অস্তিত্ব কিভাবে বিদ্যমান তা জানতে আমাদেরকে এসব ক্ষুদ্রতম বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে হচ্ছে। তবে কাঠিন্যতা বর্জন করে যাবো। এই লেকচারে বেশ ক'টি চিত্র ও সহজ বাংলা ভাষাকে মাধ্যম বানিয়ে সবাইকে অণু-পরমাণুর জগতে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক।

পৃথিবীব্যাপী একদল পদার্থবিজ্ঞানী আমাদের আজকের বিষয়ের উপর অক্লান্ত গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। পুরো এ বিষয়ের নাম **'পার্টিকেল ফিজিক্স'** [particle physics]। পার্টিকেল শব্দের অর্থ পরমাণু- অণুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। বড় বস্তু তৈরীর ইট-পাটকেল এগুলো। তবে ছাত্রবন্ধুদেরকে আগেই বলে রাখছি, এ লেকচার দ্বারা আপনি কোন বিষয়ের উপর 'বিশেষজ্ঞ' হবেন না! এটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আজকের বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও কার্যকারিতার স্বরূপ উন্মোচন আমাদের মূল লক্ষ্য। এ থেকে বিজ্ঞানের আলোকে সৃষ্ট মহাবিশ্বের স্বরূপ ও গতিমতি বুঝার আশারাখি সকলে।



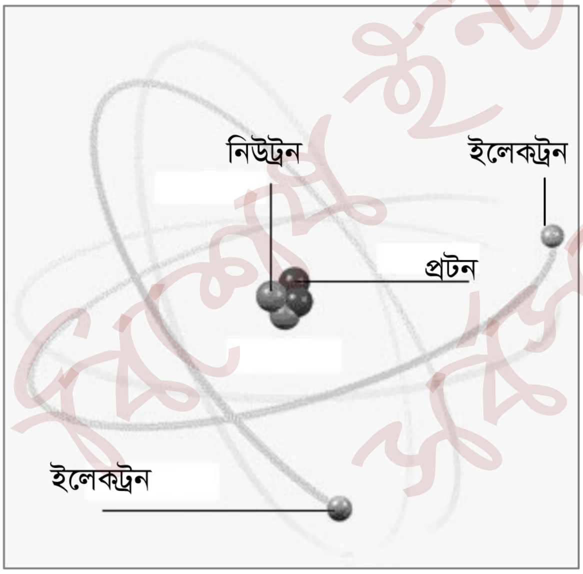
আপনার নিজের দেহসহ চতুর্পার্শ্বের যা-কিছু দৃশ্যমান কিংবা অদৃশ্যমান অবস্থায় বিরাজ করছে তা সবই ক্যুয়ার্ক দ্বারা সৃষ্ট। বিজ্ঞানীরা ক্যুয়ার্ককে আলাদাভাবে অস্তিত্বশীল পান নি কিন্তু। সে এমন এক বস্তু, কখনো একাকী থাকতে ভালোবাসে না। একাধিক ক্যুয়ার্ক মিলে পরবর্তী ভারী দু'টি পরমাণু তৈরী হয়। এগুলো হলো 'প্রটন' [proton] ও 'নিউট্রন' [neutron]। আর এই উভয় পরমাণু দ্বারাই সৃষ্ট 'এটম' [atom] বা অণু নামক বস্তুর কেন্দ্র [nucleus]। আসুন এবার এ পর্যন্ত জানা অণুর ক্ষুদ্রতম এই বস্তুটির স্বরূপ ও কার্যকারিতা সম্পর্কে আরো কিছু জেনে নিই, কেমন?

ক. সাব-এটোমিক পরমাণু

ইতোমধ্যে আমরা অণুর এ পর্যন্ত জানা ক্ষুদ্রতম অংশ **'ক্যুয়ার্ক'** সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। একটু পরই অণুর কেন্দ্রস্থ দু'টি পরমাণু তথা, প্রটন ও নিউট্রন তৈরীতে ক্যুয়ার্কের ভূমিকা তুলে ধরবো। এর পূর্বে **'সাব-এটোমিক পরমাণু'** সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

ক. ১. ইলেকট্রন

প্রথমেই আমরা ইলেকট্রন নামক কণার সঙ্গে পরিচিত হবো। অণুর মধ্যে এটি সক্রিয়। ইলেকট্রন **'নেগিটিভ চার্জ'** [ঋণাত্মক আকর্ষণ] বহন করে। এর অর্থ অন্য বিপরীত চার্জসম্পন্ন কণা যেমন **'প্রটন'**-কে এটি আকর্ষণ করে। আমরা একটু পরই প্রটন সম্পর্কে জানবো। নিম্নের চিত্রে এটমের মধ্যে ইলেকট্রন, প্রটন ও নিউট্রনের অবস্থান অতি সিম্পুলভাবে তুলে ধরেছি।



লক্ষ্য করুন, ইলেকট্রন এটমের বাইরের দিকে অবস্থান করছে। সুতরাং একটি অণুর বাইরের সীমানা এই ইলেকট্রনের অবস্থান দ্বারা নির্ণিত হয়। অপর ব্যাপার হলো ইলেকট্রন কখনো থেমে নেই- সে সর্বদা কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে। ইলেকট্রনের ঋণাত্মক চার্জের মাত্রা বিজ্ঞানীরা জানেন। এর ওজনও আছে। আমরা এসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংখ্যা নিয়ে মাথা ঘামাবো না। ইলেকট্রন বস্তুর বেশ ক'টি গুণ বিকাশের জন্য দায়ী। যেমন বিদ্যুৎ ও আলো। এছাড়া বস্তুর রসায়নিক গুণাগুণেও ইলেকট্রনের বিরাট ভূমিকা বিদ্যমান। ইলেকট্রন উপযুক্ত মাধ্যমে চলতে জানে। এই মাধ্যমকে বলে ইলেকট্রিকেল কন্ডাকটার। আমরা ইলেকট্রিকেল তার বলতে পারি। যাবতীয় ইলেকট্রিকেল ও ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাদি ইলেকট্রনের এই **'চলন্ত'** থাকার গুণাগুণের উপর নির্ভরশীল। ফ্লাসলাইট থেকে কম্পিউটার- যাকিছুই ইলেকট্রিকেল সবই ঋণাত্মক চার্জ বহনকারী ইলেকট্রনের নিকট ঋণী। ইলেকট্রন স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল হতে পারে বলেই তাকে কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে। অপরদিকে অধিকাংশ **'সাব-এটোমিক পার্টিকেল'** [পরমাণু] অস্তিত্ব বজায় রাখে অন্যদের সঙ্গে থেকে। একককভাবে থাকতে পারে না।

কন্ডাকটারে গতিশীল হওয়া ছাড়াও ইলেকট্রন নিজে নিজে ঘুরতেও জানে। একে স্পিন বা ঘুর্ণন বলে। সে ডানে ও বামে ঘুরতে পারে। জগতের মধ্যে চারটি মৌলিক ফোর্স বা শক্তি বিদ্যমান। এ চারটি শক্তি দ্বারা সমগ্র মহাবিশ্ব ও তার মধ্যস্থ সকল বস্তু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আমরা পরবর্তী কোন এক বক্তৃতায় এই শক্তি-চতুষ্টয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করবো। এখানে শুধু এটুকু বলে রাখছি, ইলেকট্রনে এই চার-শক্তির তিনটি সক্রিয় আছে। এ

তিনটি হলো মহাকর্ষ, বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় শক্তি ও দুর্বল আনবিক শক্তি। এ শক্তি তিনটি কি, এ ব্যাপারে আপাতত কেউ ভাববেন না। পরে আমরা এগুলোর উপর পুরো ওয়াকিফহাল হবো ইনশাআল্লাহ!

ক. ২. প্রটন

অণুর কেন্দ্রে দু'টি পরমাণু আছে। এর একটির নাম প্রটন। এটাও একটি মৌলিক পরমাণু। এই পরমাণু বহন করে ধনাত্মক বা পজিটিভ ইলেকট্রিক চার্জ। এবার বুঝে নিন, কোন্ কারণে স্বাধীনভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেকট্রন এটমের চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে। মূল কারণটি হলো এই প্রটন। ঋণাত্মক ও ধনাত্মক চার্জসম্পন্ন বস্তু সর্বদাই একে অন্যের দিকে আকর্ষিত হয়। সুতরাং ইলেকট্রনে ঋণাত্মক বা নেগিটিভ চার্জ ও প্রটনে ধনাত্মক বা পজিটিভ চার্জ থাকায় একে অন্যকে আকর্ষণ করে। কিন্তু ইলেকট্রন কেন্দ্রস্থ এই প্রটনের উপরে যেয়ে পড়ে না- এর কারণ কি হতে পারে? আমরা একটু পরই এর কারণ বর্ণনা করবো। প্রথমে প্রটন নামক কেন্দ্রীয় কণাটি সম্পর্কে যা জানা গেছে তা তলিয়ে দেখা যাক। যে ক'টি বিষয় আমাদের জানা দরকার তাহলো:

১. প্রটন নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল হতে পারে। অর্থাৎ নিজেকে রক্ষার্থে অন্য কোন বস্তুর সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

২. প্রটন ও অপর পার্টিকেল নিউট্রন মিলে অণুর কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস গঠিত। অর্থাৎ প্রটন কেন্দ্রীয় বস্তু।

৩. ইলেকট্রনের মতো প্রটনে চার্জের মাত্রা বিজ্ঞানীরা জানেন। তার ওজন বা ম্যাস সম্পর্কেও সকলে অবগত।

৪. প্রটন ও নিউট্রন মিলে সৃষ্ট কেন্দ্রের মধ্যেই এটমের মূল ওজন বিদ্যমান। অর্থাৎ নিউক্লিয়াসই এটমের সর্বাপেক্ষা ভারী অংশ।

৫. সাধারণ সকল বস্তুর এটমে স্থিতিশীলতা অর্জনে সমান সংখ্যক ইলেকট্রন ও প্রটন আছে। অর্থাৎ স্থিতিশীল এটমের মোট চার্জ ০ হতে হবে। এ সংখ্যায় পার্থক্য থাকলে পুরো এটমকে [ঋণাত্মক বা ধণাত্মক] চার্জসম্পন্ন এটম বলা হয়। সাধারণত ইলেকট্রন সংখ্যায় তারতম্যের ফলেই অণু চার্জসম্পন্ন হয়।

৬. এটমের কেন্দ্রে ক'টি প্রটন আছে তা-ই নির্ধারণ করে বস্তুটি কোন্ ধরনের রসায়নিক পদার্থ। যেমন: হাইড্রোজেনে আছে একটি মাত্র প্রটন এবং এ পর্যন্ত জানা সর্বাপেক্ষা ভারী মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়ামে আছে ৯২টি প্রটন।

৭. এটমের কেন্দ্রে ক'টি প্রটন আছে সে হিসাবকে বলে এটোমিক নাম্বার। অর্থাৎ এটমিক নাম্বার দ্বারা বস্তু সনাক্ত করা যায়।

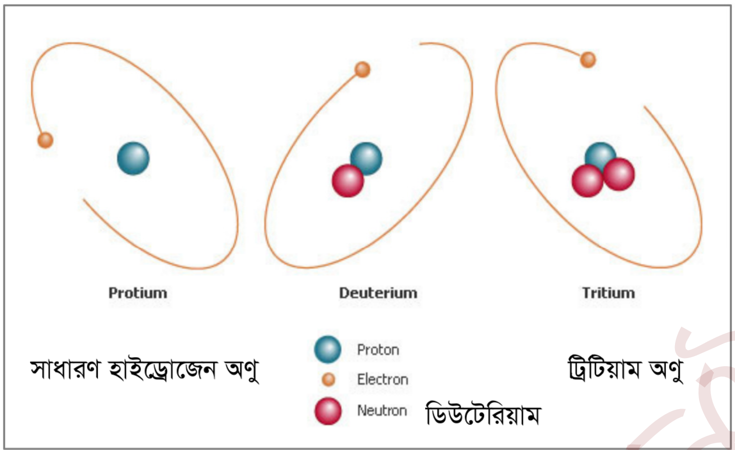
৮. মৌলিক চারটি ফোর্স দ্বারাই প্রটন নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ প্রটনে মহাকর্ষ, সবল ও দুর্বল আনবিক শক্তি ও বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় শক্তি ক্রিয়া করে।

ক. ৩. নিউট্রন

অণুর কেন্দ্রে অপর যে পরমাণু বাস করে তার নাম '**নিউট্রন**'। এর অর্থ চার্জহীন কেন্দ্রীয় কণা। প্রটনের সঙ্গে নিউট্রন যুক্ত অবস্থায় থেকে এটমের নিউক্লিয়াস তৈরী করে। নিউট্রনের কার্যকারিতা সম্পর্কে আমাদের যা জানার তা নিম্নরূপ।

১. সাধারণত এটমের কেন্দ্রে সমান সংখ্যক নিউট্রন ও প্রটন থাকে। তবে একই পদার্থের বিভিন্ন এটমে অতিরিক্ত বা কম নিউট্রন থাকতে পারে। [দেখুন নীচের চিত্রটি]। এরূপ ক্ষেত্রে এটমটিকে '**অস্থিতিশীল এটম**' [unstable atom] বলে।

২. যেসব এটমের কেন্দ্রে শুধুমাত্র নিউট্রনের সংখ্যায় পার্থক্য থাকে একে বলে **'আইসোটোপ'** [isotope]। একটা দৃষ্টান্ত: জগতের সর্বাপেক্ষা সাদামাটা পদার্থ হলো হাইড্রোজেন। এর অধিকাংশ এটমের কেন্দ্রে একটি মাত্র প্রটন আছে। এই প্রটনকে প্রদক্ষিণ করে একটিমাত্র ইলেকট্রন। নীচের চিত্রটি দেখুন।



তবে, স্বভাবে প্রাপ্ত কিছু সংখ্যক [আনুমানিক ০.০১৫%] হাইড্রোজেন পাওয়া যায় যার এটমের কেন্দ্রে প্রটন ছাড়াও একটি বা দু'টি নিউট্রন বিদ্যমান। এরূপ হাইড্রোজেন আইসোটোপকে **'ভারী হাইড্রোজেন'** বা **'ডিউটেরিয়াম'** কিংবা [দুটি প্রটন থাকলে] **'ট্রিটিয়াম'** বলে। এগুলোর বৈশিষ্ট্য কি? বাস্তবে আইসোটোপ ও আইসোটোপহীন এটমের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। এখন বিজ্ঞানীরা জানেন প্রায় সকল মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ আছে। অন্য কথায় একই পদার্থের এটমের নিউক্লিয়াসে ভিন্ন সংখ্যক নিউট্রন অবস্থান করে থাকে। তবে চারটে মৌলিক পদার্থে এখনো কোন আইসোটোপ পাওয়া যায় নি। এগুলো হলো: বেরিলিয়াম, এলোমিনিয়ান, ফসফোরাস ও সোডিয়াম। আইসোটোপ আলাদা করে কাজে লাগানো যায়। আপাতত আইসোটোপের উপর আমাদের তথ্যানুসন্ধান এ পর্যন্তই- আর অতিরিক্ত জানার প্রয়োজন নেই।

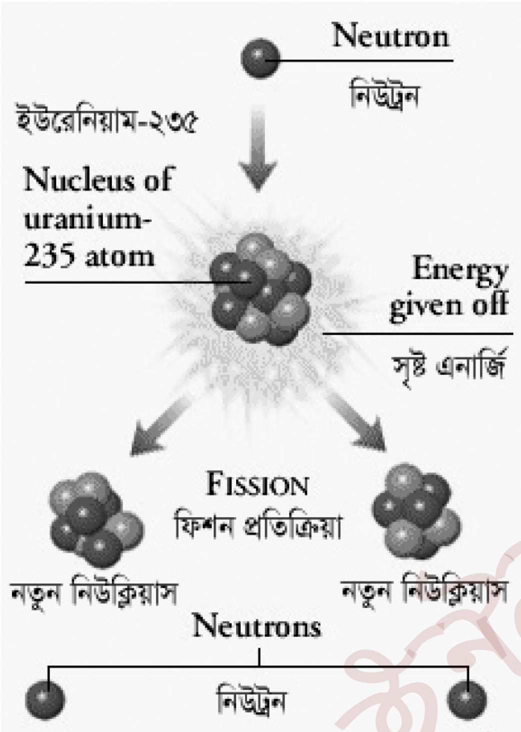
৩. নিউট্রন তার নিকটস্থ পড়শী প্রটন থেকে সামান্য একটু ভারী। কিন্তু ইলেকট্রন থেকে সে প্রায় ১৮৩৮ গুণ বেশী ওজনসম্পন্ন। আগে বলেছিলাম, ইলেকট্রনকে স্বভাবের তিনটি মৌলিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে। নিউট্রন কিন্তু প্রটনের মতো চারটি শক্তি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ সবল ও দুর্বল আনবিক শক্তি, ইলেকট্রমেগনেটিক ও মহাকর্ষ- এ চার শক্তিই নিউট্রনে সক্রিয়।

৪. নিউট্রনকে তার এটম থেকে আলাদা করা যায়। তবে মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে নিজেকে দু'টি পরমাণুতে রূপান্তর করে। এভাবে বদলে যে অন্য এক বা একাধিক পরমাণুতে রূপান্তর হয়- এ ক্রিয়াকে বলে **'ডিকে'** [decay]। এককভাবে অস্তিত্বশীল **'ডিকে'** [ক্ষয়] ক্রিয়ার মাধ্যমে নিউট্রন চার্জসম্পন্ন একটি প্রটন ও একটি ইলেকট্রনে পরিণত হয়। এই প্রসেসেই 'নিউক্লিয়ার এনার্জি' সৃষ্টিতে সক্রিয়। এই ডিকে ক্রিয়ার সময় রিলিজ হয় মোটা অঙ্কের এনার্জি।

৫. সাধারণত বস্তুর এটমের কেন্দ্রে থাকা নিউট্রন ডিকে ক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তন হয় না। তবে কোন কোন বস্তুর নিউক্লিয়াসে অতিরিক্ত নিউট্রন পাওয়া যায়। এসব বস্তুর নিউক্লিয়াস অস্থিতিশীল। বিজ্ঞানীরা এরূপ অস্থিতিশীল বস্তুকে **'রেডিওএক্টিভ'** [তেজস্ক্রিয়] বলেন। অর্থাৎ এগুলোর নিউক্লিয়াসে পড়ে থাকা অতিরিক্ত নিউট্রন নির্দিষ্ট সময়ে ডিকে হয়ে যায়। কোন কোন বস্তু অকৃত্রিমভাবে এরূপ ডিকে হওয়া থেকে আমরা উপকৃত হতে পারি। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো, কার্বন-১৪ পদার্থ। এটি নির্দিষ্ট সময়ে ডিকে হয়ে নাইট্রোজেন পদার্থে রূপান্তর হয়। বিজ্ঞানীরা মৃত প্রাণীদের মধ্যে রক্ষিত কার্বন-১৪ বস্তুর ডিকে থেকে হিসাব করতে পারেন জন্তুটি কতদিন পূর্বে মারা গেছে। এই প্রসেসকে বলে **'কার্বন-১৪ তারিখ নির্ধারণ'** [carbon-14 dating]।

৬. পরমাণু বিজ্ঞানীরা ইউরেনিয়ামের মতো ভারী এটমকে কৃত্রিম উপায়ে নিউট্রন দ্বারা হিট করে থাকেন। এটমটির নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রে অনেক প্রটন ও নিউট্রন থাকায় দ্রুত চলন্ত একটি নিউট্রনকে তা [অর্থাৎ নিউক্লিয়াস] গ্রেফতার করতে পারে। ফলে নিউক্লিয়াসটি অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। এরূপ প্রতিটি অস্থিতিশীল নিউক্লিয়াস বিভক্ত হয়ে সৃষ্টি করে ছোট্ট দু'টি নিউক্লিয়াস। এই প্রসেসের সময় সৃষ্টি হয় আরো মুক্ত নিউট্রন। ওগুলো অন্যান্য নিউক্লিয়াসে যুক্ত হয়ে একই প্রসেস অব্যাহত রাখে। এভাবে সৃষ্টি হয় একটি **'চেইন রিয়েকশন'**। এই রিয়েকশন যদি অনিয়ন্ত্রিত থাকে

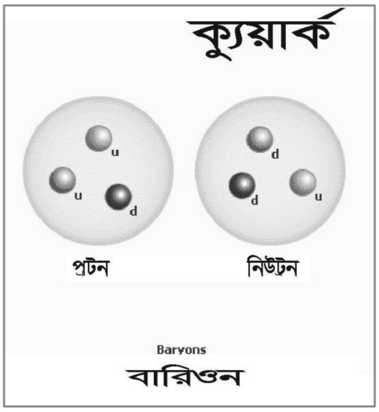
তাহলে বিরাট বিস্ফোরণ ঘটবে। আর এরূপ বিস্ফোরণই 'এটম বোমা' থেকে হয়ে থাকে। প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! দেখলেন, মাত্র ক'টি কথায় '**এটম বোমা**'র পেছনের বিজ্ঞান কিভাবে বুঝিয়ে দিলাম! যাক, নীচের চিত্রটি থেকে চেইন রিয়েকশন কী তা আরোও একটু বুঝতে পারবেন- এটাই আশা।



অণুর তিনটি মৌলিক পরমাণু ইলেকট্রন, প্রটন ও নিউট্রনের উপর সংক্ষিপ্ত তথ্যানুসন্ধান এখানেই শেষ। এ লেকচারে আর অতিরিক্ত বলার স্কোপ নেই। তবে নিম্নে আমরা অণুর কেন্দ্রীয় বস্তুর গঠনপ্রণালীর উপর কিঞ্চিৎ আলোচনা করবো। আপনাদের মনে প্রশ্ন থেকে যেতে পারে- 'নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রটন ও নিউট্রন কী কোনো ক্ষুদ্রতম বস্তুর তৈরী হতে পারে?' সুতরাং আসুন, আধুনিক বিজ্ঞান এ প্রশ্নের জবাবে কি বলে তা একটু তলিয়ে দেখি।

খ. ক্যুয়ার্ক

সমগ্র জগৎব্যাপী যতো বস্তু [matter] আছে তা অতি ক্ষুদ্রকায় ইলেকট্রন ও ক্যুয়ার্ক দ্বারা সৃষ্ট। আমরা ইতোমধ্যে অবগত হয়েছি অণুর মধ্যে তিনটি মৌলিক পরমাণু আছে। এগুলো হলো ইলেকট্রন, প্রটন ও নিউট্রন। প্রথমটি অণুর কেন্দ্রের চতুর্দিকে ঘুর্ণনরত, আর শেষোক্ত দু'টি দ্বারা কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস গঠিত। নিউক্লিয়াসের উভয় পরমাণু মূলত ক্যুয়ার্ক দ্বারা নির্মিত।



ক্যুয়ার্ক ছাড়া এটম হতো না আর এটম ছাড়া বস্তু হতো না। আসুন তাহলে, জেনে নিই এই ক্যুয়ার্ক নামক বস্তুটি আসলে কী? এটা জানা হয়ে গেছে ক্যুয়ার্ক একা একা অস্তিত্বশীল হতে পারে না। অন্য কথায় ক্যুয়ার্ককে আলাদা করা যায় না। বাস্তবে সে হলো প্রটন ও নিউট্রনের 'কাঁচামাল'। কিন্তু সাধারণ কাঁচামাল ও ক্যুয়ার্ক কাঁচামালের মধ্যে মৌলিক একটি পার্থক্য আছে। ক্যুয়ার্ক কাঁচামাল একত্রে থেকে যে বস্তু তৈরী করেছে তা-ই একটি মৌলিক বস্তু যাকে ভেঙ্গে ছোট্ট করা যায় না- মানে তাঁর যুক্ত অংশগুলো আলাদা হয় না।

মোট ছয় ধরনের ক্যুয়ার্কের সন্ধান মিলেছে। এগুলোর চিত্তাকর্ষক নামকরণ করা হয়েছে: **১. আপ [up], ২. ডাউন [down]. ৩. চার্ম [charm], ৪. স্ট্রেইঞ্জ [strange], টপ [top] এবং বটোম [bottom]**। কী অদ্ভুত হাস্যকর নামকরণ! যাক আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শুধুমাত্র প্রথম দু'টি ক্যুয়ার্ক: আপ ও ডাউন। কারণ, এ দু'টোই সাধারণ বস্তুর এটমের প্রটন ও নিউট্রনের কাঁচামাল। অন্য চারটির প্রথম দু'টি, অর্থাৎ চার্ম ও স্ট্রেইঞ্জ ক্যুয়ার্ক শুধুমাত্র বাইর-জগৎ থেকে আগত '**কজমিক রেডিয়েশন**' নামক রশ্মির মধ্যে পাওয়া যায়। আর বাকী দু'টো, আপ ও বটোম ক্যুয়ার্ক বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে ক্ষণকালের জন্য ফিজিক্স পরীক্ষাগারে বানাতে সক্ষম হয়েছেন মাত্র।

আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো ক্যুয়ার্ক দ্বারা কিভাবে প্রটন ও নিউট্রন তৈরী হয়। প্রটনে থাকে দু'টি 'আপ' ও একটি 'ডাউন' ক্যুয়ার্ক। তিনটি ক্যুয়ার্কের মোট ইলেকট্রিক চার্জ সমান ১। সুতরাং প্রটনে +১ চার্জ এই তিনটি

ক্যুয়ার্ক থেকেই এসেছে। প্রতিটি ক্যুয়ার্ক চার্জসম্পন্ন। কিন্তু তা একের অংশ মাত্র। আস্ত নয়। অর্থাৎ আপ ক্যুয়ার্কে আছে +২/৩ চার্জ, অপরদিকে ডাউন ক্যুয়ার্কে বিদ্যমান -১/৩ চার্জ। লক্ষ্য করুন প্লাস ও মাইনাস সাইনের দিকে। সুতরাং তিনটি ক্যুয়ার্ক মিলে মোট চার্জ দাঁড়ায়: ২/৩+২/৩ + (-১/৩)=(৪-১)/৩ = ৩/৩ = ১।

নিউট্রনে আছে একটি 'আপ' ক্যুয়ার্ক ও দু'টি 'ডাউন' ক্যুয়ার্ক। আমরা জানি নিউট্রন চার্জশূন্য। এখন জেনে নেবো- কেন। নিউট্রনের চার্জ = ২/৩+ (-১/৩) + (-১/৩) = ((২-১)-১)/৩ = ০/৩ = ০।

গ্লুওন [gluon] নামক একটি শক্তি [এনার্জি] তিনটি ক্যুয়ার্ককে একত্রিত রাখে। কিভাবে গ্লুওন কাজ করে তা বুঝিয়ে বলা এ লেকচারের স্কোপের বাইরে। তবে এটুকু বলতে পারি, **'রঙ্গিণ চার্জ'** [color charge] নামক একটি বৈশিষ্ট্য গ্লুওনে আছে। খুব দ্রুত গ্লুওন এই রঙ্গিন চার্জ রদবদল করতে থাকে। এর ফলাফল হলো স্থিতিশীল ক্যুয়ার্ক তথা প্রটন ও নিউট্রন। যাক, আজকের বক্তৃতার সমাপ্তি কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটবে। তবে এর পূর্বে আজকের মূল টপিক এটম সম্পর্কে আমরা যাকিছু আলোচনা করলাম তার সার-সংক্ষেপ তুলে ধরা জরুরী মনে করছি।

ঘ. সংক্ষেপে এটমের মডেল

বস্তুজগৎ সঠিকভাবে বুঝার চাবিকাঠি হলো এটমকে যেটুকু সম্ভব জানা। আজকের পুরো লেকচারটি এই এটমের উপর উৎসর্গ করার কারণও এটি। কিন্তু এটমকে বুঝা তেমন সহজ নয়। তাই আসুন, যেটুকু আলোচনা হয়েছে তার সার-সংক্ষেপ উল্লেখ করি।

১. জগতে যতো মেটার বা বস্তু আছে তা সবই এটমের তৈরী।

২. মোট তিনটি পরমাণু দ্বারা প্রতিটি এটম সৃষ্ট। এগুলো হলো: ক. কেন্দ্রে অবস্থানরত প্রটন, খ. কেন্দ্রে অবস্থানরত নিউট্রন ও ঘ. কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণরত ইলেকট্রন।

২. প্রটনে আছে একটি (পজিটিভ +) চার্জ। নিউট্রন চার্জশূন্য। ইলেকট্রনে আছে (নেগিটিভ -) চার্জ।

৪. ইলেকট্রন এটম থেকে মুক্ত হয়ে চলতে পারে। এরই নাম ইলেকট্রিসিটি বা কারেন্ট।

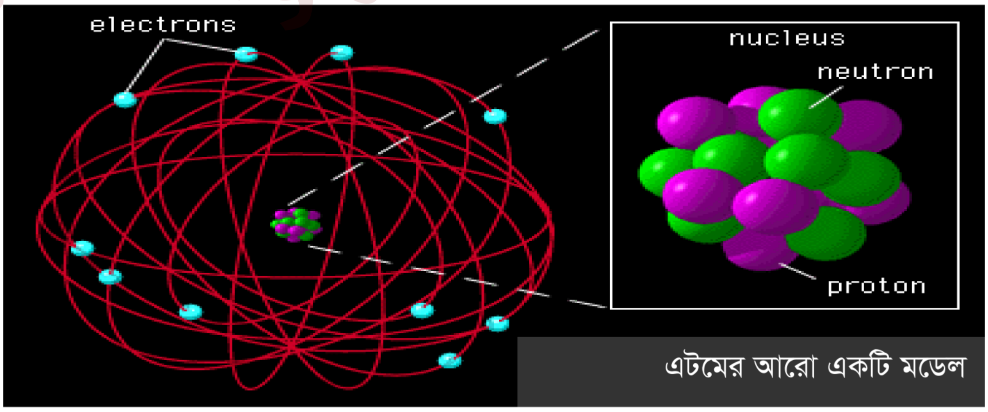
৫. প্রতিটি এটমের কেন্দ্রীয় উভয় পরমাণু আরো ক্ষুদ্রতম একটি পরমাণুর তৈরী। এই পরমাণুর নাম ক্যুয়ার্ক।

৬. প্রটনে ও নিউট্রনে তিনটে করে ক্যুয়ার্ক থাকে।

৭. প্রতিটি ক্যুয়ার্কের মধ্যে একের কম চার্জ বিদ্যমান। প্রটনে তিনটি ক্যুয়ার্কের মোট চার্জ হলো +১।

৮. নিউট্রনের তিনটি ক্যুয়ার্কের মোট চার্জ ০।

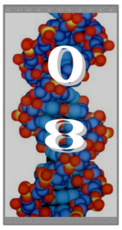
প্রিয় সন্ধানী শ্রোতাবন্ধুগণ! আগামী বক্তৃতায় আমি কেমিকেল বন্ড ও মলিকিউল নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ! এ পর্যায়ে এই উভয় বস্তু সম্পর্কে আর কিছু বলে আপনাদেরকে চিন্তাযুক্ত করতে ইচ্ছে করছি না। আগামী লেকচারে সব উন্মোচন হবে। এটুকু বলেই আজকে লেকচার শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।



এটমের আরো একটি মডেল

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তাঃ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থানঃ খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ক. বস্তুজগৎ : মৌলিক গঠনপ্রণালী

বক্তৃতা ৪ : বণ্ড ও মলিকিউল

প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! **'বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান'**-এর চতুর্থ লেকচারে সকলে ওয়েলকাম। গত তিনটি বক্তৃতায় যথাক্রমে ভূমিকা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি ও ক্যুয়ার্ক থেকে মহাবিশ্ব - এ তিনটি বিষয়ের উপর আলোচনা হয়েছে। ভূমিকা বাদে বাকী দু'টো লেকচার মূলত বস্তুজগতের গঠনপ্রণালীর উপর ছিলো। এ বিষয়ের উপর আলোচনার ইতি আমরা এখনো টানি নি। বাস্তবে আজকের বক্তৃতাসহ মোট চারটি লেকচার এখনো বাকী। বস্তুজগৎ বৈজ্ঞানিক আলোকে বুঝার গুরুত্ব অপরিসীম। এ কারণেই প্রথম ৬টি মূল বক্তৃতা এ বিষয়টির উপর ফোকাস রেখেছি।

আমরা ইতোমধ্যে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে, সমগ্র বিশ্বজগতের যাবতীয় বস্তু মূলত ক্যুয়ার্ক ও ইলেকট্রনের তৈরী। ক্যুয়ার্ক এ পর্যন্ত জানা ক্ষুদ্রতম পরমাণু। তিনটি করে ক্যুয়ার্ক মিলে তৈরী হয় অণুর কেন্দ্রীয় দু'টি কণা: প্রটন ও নিউট্রন। আর অণুর অপর কণা ইলেকট্রন এই কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে দূরে থেকে। অর্থাৎ অণু বা এটম ক্যুয়ার্কের তৈরী কেন্দ্রে অবস্থিত প্রটন ও নিউট্রন এবং বাইরে প্রদক্ষিণরত ইলেকট্রন দ্বারা সৃষ্ট। আর সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় বস্তু এই এটম দ্বারা তৈরী হয়েছে। লক্ষ্য করুন, আমরা প্রটন ও নিউট্রন তৈরীর ক্রিয়া প্রথমে বর্ণনা করেছি। দ্বিতীয় পর্যায়ে পুরো এটমের সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেছি। এ লেকচারে তৃতীয় স্টেজের উপর বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরার আশা রাখি। আর এ স্তরের নাম বন্ড ও মলিকিউল।

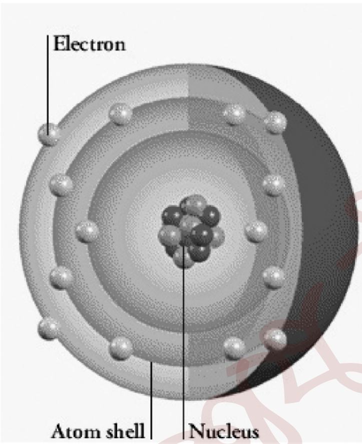
বিজ্ঞানীরা বেশ আগে থেকেই জানতেন 'মলিকিউল' বস্তুর মধ্যে একাধিক অণু একত্রে জড়িত থেকে অস্তিত্বশীল থাকে। এই একত্র হওয়ার নাম কেমিক্যাল বন্ডিং [chemical bonding]। আর বন্ডেড বা যুক্ত এটমগুলোকে বলে 'মলিকিউল' [molecule]। মলিকিউল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা একটু পরই হবে। প্রথমে আমরা কেমিক্যাল বন্ড সম্পর্কে আরো কিছু বক্তব্য তুলে ধরবো।

১. কেমিক্যাল বন্ড

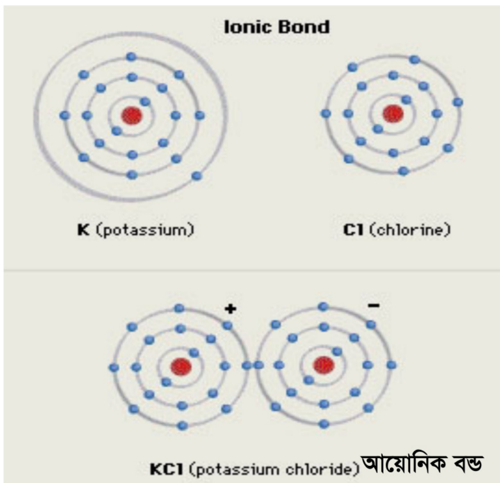
বস্তুর মধ্যে তিন ধরনের বন্ড পাওয়া যায়: ১. আয়োনিক [ionic], ২. কোভেলেন্ট [covalent] ও ৩. মেটালিক [metallic] বন্ড। এই তিনটির উপর এখন বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

১. আয়োনিক বন্ড

এই বন্ডটির উপর বিস্তারিত বলার আগে প্রথমে জানতে হবে, ভেলেন্স শেল [vallence shell] ও আয়োন [ion] বলতে কি বুঝায়। প্রতিটি এটমের মধ্যে ইলেকট্রিকেল ব্যালান্স থাকে। এটমের কেন্দ্রে [+ প্লাস] চার্জসম্পন্ন প্রটনের সংখ্যা বাইরে [- মাইনাস] চার্জসম্পন্ন ইলেকট্রনের সংখ্যার মান সমান থাকলেই পুরো এটমে এই ব্যালান্স সৃষ্টি হবে। এরূপ অবস্থায় বিদ্যমান এটম হলো 'ইলেকট্রিক্যালী নিউট্রেল'। অর্থাৎ পুরো এটমের চার্জ শূন্য। এছাড়া প্রতিটি এটমের এক বা ততোধিক ইলেকট্রন নির্দিষ্ট কিছু দূরত্বে থেকে কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে। যে অবস্থানে থেকে তারা ঘুরে তার একেকটির নাম এনার্জি শেল। আর বাইরের সর্বশেষ শেলটির নাম হলো ভেলেন্স শেল। নীচের চিত্রটি দেখুন।



অধিকাংশ এটমের ভেলেন্স শেল [সর্বশেষ শেল বা বহিরাবরণ] পরিপূর্ণ নয়। অর্থাৎ এই শেলে আরো ইলেকট্রন যুক্ত হতে পারে। আর নিজেদের ভেলেন্স শেলকে পূর্ণ করতে যেয়েই এটম অন্য এটম থেকে ইলেকট্রন ছিনিয়ে আনতে যায় কিংবা অন্যের সঙ্গে ইলেকট্রন শেয়ার করে। কিন্তু কয়েকটি গ্যাসীয় পদার্থ আছে যাদের বাইরের শেল পরিপূর্ণ। ফলে এসব পদার্থ অন্যদের সাথে মিশে না। এগুলোকে বলে 'নোবল গ্যাস' [অভিজাত বাষ্প!]। কেমিস্টরা এরূপ ৬টি নোবল গ্যাসের সন্ধান পেয়েছেন: হিলিয়াম [helium], নিওন [neon], আরগন [argon], ক্রিপটন [krypton], জেনন [xenon] এবং রেডন [radon]।



আয়োনিক বন্ড

যে কোন নিউট্রেল এটম বা একদল এটম [মলিকিউল] এক বা ততোধিক ইলেকট্রন কোন কারণে হারাতে পারে। অর্থাৎ এটম থেকে অন্য কোন এটমের সঙ্গে সংযুক্ত কিংবা মুক্ত হয়ে চলে যেতে পারে। এটমের নিউক্লিয়াসে থাকা প্রটন ধনাত্মক চার্জ সম্পন্ন। সুতরাং ঋণাত্মক চার্জসম্পন্ন একটি ইলেকট্রন খোয়া গেলে পুরো এটমটি আর নিউট্রেল থাকতে পারে না- সে হয়ে যায় ধনাত্মক (+) চার্জসম্পন্ন এটম। এই এটমের নামই আয়োন। অপরদিকে কোন এটমে যদি অতিরিক্ত একটি ইলেকট্রন লেগে যায় তাহলে পুরো এটমটি নেগিটিভ আয়োনে রূপান্তর হবে। সুতরাং আয়োন অর্থ পজিটিভ কিংবা নেগিটিভ চার্জসম্পন্ন এটম বা মলিকিউল। এটা তখনই সম্ভব যখন এটমের ইলেকট্রন অন্যত্র চলে যায়। সাধারণত এটমকে এক্স-রে কিংবা উচ্চ এনার্জিসম্পন্ন আলোকরশ্মি দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে 'আয়োনাইজ' [ionize] করা হয়। কেমিক্যাল রিয়েকশনেও বস্তু আয়োনাইজ হয়ে থাকে। যেমন: মৌলিক পদার্থ সোডিয়াম ও ক্লোরিনের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সাধারণ লবণ। লবণের রসায়নিক নাম হলো সোডিয়াম-ক্লোরাইড। এই রিয়েকশনের সময় প্রতিটি সোডিয়াম

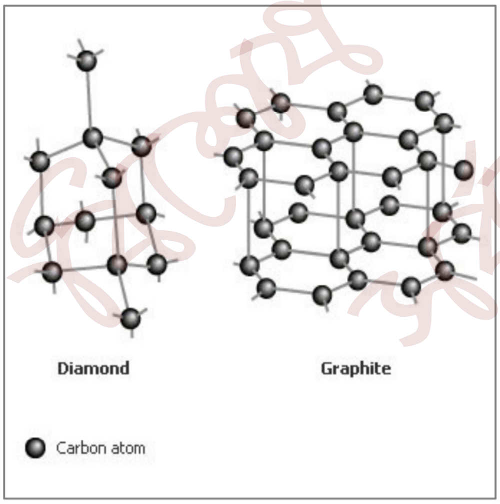
এটম একটি করে ইলেকট্রন ক্লোরিন এটমে স্থানান্তর করে। এর ফলে সৃষ্টি হয় + চার্জসম্পন্ন সোডিয়াম আয়োন ও - চার্জসম্পন্ন ক্লোরিন আয়োন।

আয়োন ও ভেলেন্স শেল সম্পর্কে ধারণা লাভের পর এবার আমরা আয়োনিক বন্ড নিয়ে আলোচনায় যেতে পারি। চার্জ এটম বা আয়োন অপর চার্জ হওয়া এটমকে আকর্ষণ করে। যেমন একটি - [মাইনাস] চার্জসম্পন্ন এটম অপর আরেকটি + প্লাস চার্জসম্পন্ন এটমকে আকর্ষণ করবে। কিন্তু উভয় এটম একটা আরেকটার সঙ্গে একেবারে যুক্ত হয় না। এটমের ‘ইলেকট্রন ক্লাউড’ [ঘুর্ণনরত ইলেকট্রনসমূহ] একটি বিপরীতমুখী বিকর্ষণ সৃষ্টি করে। ফলে আয়োনিক বন্ডকৃত এটম নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখেও একে অন্যের প্রতি আকর্ষিত থাকে। সুতরাং আমার বলতে পারি, **‘আয়োনিক বন্ড হলো + প্লাস ও - মাইনাস চার্জসম্পন্ন এটমের [আয়োনের] মধ্যে স্বাভাবিক আকর্ষণ’**।

২. কোভেলেন্ট বন্ড

দু’টি এটম একটিমাত্র ইলেকট্রন শেয়ার করতে পারে। এই অবস্থাকেই বলে কোভেলেন্ট বন্ড। কোভেলেন্ট বন্ড থেকেই সৃষ্টি হয় ‘মলিকিউল’। আমরা একটু পরই মলিকিউল সম্পর্কে আরো আলোচনা করবো। তবে এখানে এটুকু বলা যায়, মলিকিউল দুই বা ততোধিক এটমে সৃষ্ট। এর প্রতিটি এটমই একটা আরেকটাকে কোভেলেন্ট বন্ডের মাধ্যমে যুক্ত রাখে। কোন কোন মলিকিউলে হাজার হাজার কোভেলেন্ট বন্ডসম্পন্ন এটম থাকতে পারে।

‘কার্বন’ হলো অ-ধাতু মৌলিক পদার্থের একটি। বিজ্ঞানীরা জেনেছেন, পৃথিবীর সব প্রাণীদেহ মূলত ‘কার্বন’ পদার্থের উপর নির্ভরশীল। এ পর্যন্ত জানা সর্বাপেক্ষা শক্ত ও মূল্যবান বস্তু হলো হীরা। এটা কার্বন এটমের তৈরী। অপরদিকে অতি নরম, কালো আরেক বস্তু হলো গ্রাফাইট [graphite]। এটা দেখতে অসুন্দর ও কম দামী। ব্যবহৃত হয় পিচ্ছিল তৈল হিসাবে যন্ত্রাদিতে। কিন্তু এটাও কার্বন এটমে তৈরী! কিভাবে কার্বন এটম যুক্ত আছে সেটাই নির্ধারণ করে সৃষ্ট বস্তুটি মহামূল্যবান হীরা না নগণ্য গ্রাফাইট। নীচে সংক্ষিপ্তভাবে উভয় ‘মলিকিউল’ চিত্রিত হয়েছে।

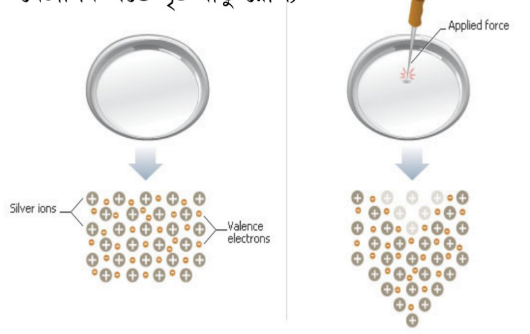


৩. মেটালিক বন্ড

আমরা ইতোমধ্যে বলেছি, যে কোন এটমের বাইরের শেলকে বলে ভেলেন্স শেল। অর্থাৎ বাইরের যে অবস্থানে ইলেকট্রন ঘুর্ণনরত আছে, তা-ই হলো ভেলেন্স শেল। এই শেলের সঙ্গেই অন্য এটমের মিথস্ক্রিয়া ঘটে। কিন্তু এই শেল ইলেকট্রন দ্বারা অপরিপূর্ণ থাকতে পারে। বাস্তবে ৯২টি নেচারেল পদার্থের মধ্যে মাত্র কয়েকটি ব্যতীত বাকীগুলোর ভেলেন্স শেল ইলেকট্রন দ্বারা অপরিপূর্ণ। এ অবস্থা থাকা জরুরীও। অন্যথায় সবাই হয়ে যেতো ‘অস্পৃশ্য’! যেমন উপরে বর্ণিত ৬টি ‘অভিজাত বাস্প’। ভেলেন্স শেল অপরিপূর্ণ থাকায় এটমগুলো অন্যান্য এটমের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছে। তৈরী করেছে বড় বড় বস্তু। সৃষ্টি হয়েছে পুরো মহাবিশ্ব।

ভেলেন্স শেল পরিপূর্ণ হওয়ার দু’টি পদ্ধতি ইতোমধ্যে আমরা বর্ণনা করেছি। এর প্রথমটি হলো **‘আয়োনিক বন্ড’** [চার্জসম্পন্ন অণুর বন্ড] এবং দ্বিতীয়টি **‘কোভেলেন্ট বন্ড’**

মেটালিক বন্ডে সৃষ্ট ধাতু রৌপ্য



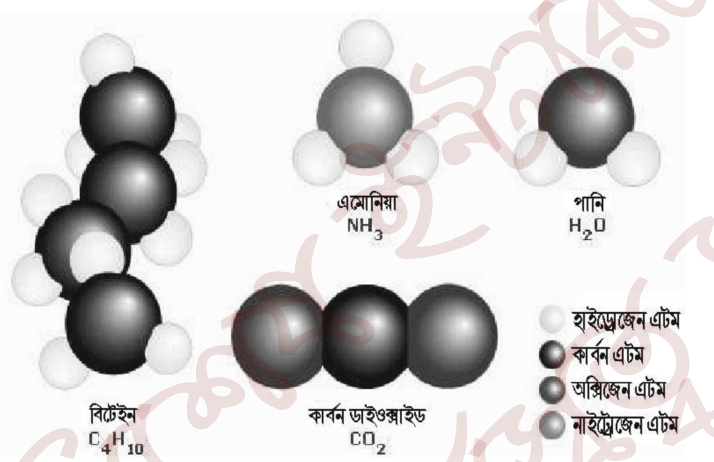
[ইলেকট্রন শেয়ার করার বন্ড]। তৃতীয় আরেক উপায় আছে। এটাই হলো **‘মেটালিক বন্ড’** [ধাতুর মধ্যে বন্ড]।

এই বন্ডের বৈশিষ্ট্য হলো সকল এটম তাদের বাইরের শেলের ইলেকট্রন পড়শী এটমের সঙ্গে শেয়ার করা। এই পদ্ধতিটি মূলত ‘ধাতু জাতীয়’ পদার্থ বা যুক্ত পদার্থের জন্য খাস। এজন্যই একে বলে, মেটালিক বন্ড। অর্থাৎ যতো ধাতু আছে তাদের এটম একটা আরেকটার সঙ্গে এরূপ বন্ডের মাধ্যমে যুক্ত থাকে।

ধাতু সৃষ্ট হয় উপরোক্ত উপায়ে এটমের মধ্যে বন্ড তৈরী করে। কিন্তু এখানে একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য দু’টি বন্ডের মধ্যে পাওয়া যায় না। প্রতিটি এটমের বাইরের শেলে যেসব ইলেকট্রন আছে ওগুলোর মালিক কোন বিশেষ এটম নয়- তারা মুক্ত! সুতরাং ইলেকট্রিক্যাল ধাক্কা পেলেই এগুলো চলন্ত হয় অনায়াসে। অন্যকথায় এরূপ ধাতু ভালো বৈদ্যুতিক কন্ডাকটার হিসাবে ব্যবহারযোগ্য। বলেছি, ইলেকট্রিক্যাল ধাক্কা! এর অপর নাম ভল্টেজ বা ইলেকট্রমোটিভ ফোর্স। জেনারেটরে এই ভল্টেজ সৃষ্টি হয়।

২. মলিকিউল

প্রিয় সন্ধানী বন্ধুরা! একটি মলিকিউল তৈরীর পূর্ব-প্রস্তুতি হিসাবে যে তিন ধরনের যুক্ততা বা বন্ড বস্তুর সঙ্গে জড়িত তার উপর আমরা ইতোমধ্যে বেশ কিছু আলোচনা করলাম। এবার মূল আলোচনার দিকে মনোনিবেশ করতে পারি। আর সেটা হলো **‘মলিকিউল’** তৈরীর কৌশল।



বিভিন্ন মলিকিউল

উপরে বর্ণিত **‘কোভেলেন্ট’** বন্ডের মাধ্যমে মলিকিউল তৈরী হয়। একই পদার্থের মলিকিউল একেকটি অংশে [একক মলিকিউলে] বিভক্ত করা যায় মাত্র- এর বেশী নয়। মনে করুন একটি তরকারী তৈরীর মূল মসলা হলো এটম। ক’টি এটম যুক্ত আছে তার উপর নির্ভর করে মিশ্রিত তরকারীর স্বাদ-গন্ধ-রং ও নাম। যদি মূল মসলা [এটম] বেশকম হয় তাহলে তরকারীও স্বাদে-গন্ধে-রঙে-নামে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হয়ে যাবে।

কেমিস্টরা প্রতিটি মলিকিউলের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন একেকটি কেমিক্যাল ফর্মুলা। এই ফর্মুলার মধ্যে বেশকম করা যায় না- আর করলেও তা আর ঐ বস্তু থাকবে না- অপরটিতে রূপান্তর হবে। দেখুন উপরের চিত্রটি। মলিকিউল সম্পর্কে যাকিছু জানা আমাদের জন্য জরুরী তা নিম্নরূপ:

১. প্রত্যেক মলিকিউলের বিশিষ্ট আয়তন আছে। এটা ভেঙ্গে গেলে মূল মলিকিউলের চরিত্র অবশিষ্ট থাকবে না।

২. মলিকিউলের মধ্যে একই পদার্থের কিংবা বিভিন্ন পদার্থের এটম থাকতে পারে। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের তৈরী মলিকিউলকে বলে **‘মলিকিউলার কম্পাউন্ড’** [যুক্ত পদার্থের মলিকিউল]। একটি দৃষ্টান্ত হলো পানি। উপরের চিত্রটি দেখুন।

৩. পৃথিবীর বহু-বহু বস্তু মলিকিউলের তৈরী। মানবদেহের কোটি কোটি বিল্ডিং ব্লক হলো কোষ বা সেল। এগুলো সবই মলিকিউলের তৈরী। কয়েক মিলিয়ন মলিকিউল যুক্ত হয়ে তৈরী করেছে একেকটি প্রাণী ও উদ্ভিদ কোষ।

৪. আমাদের খাবার, শ্বাস-নিঃশ্বাসের বায়ু, পরিধেয়, কাঠের তৈরী বাড়িস্থ সবকিছু, পেইন্ট, ফ্লোরের গালিচা এ সবই মলিকিউলের তৈরী। স্বভাবে এমনিতেই কোটি কোটি ভিন্ন মলিকিউল বিদ্যমান। কেমিস্টরা কৃত্রিম উপায়েও অনেক মলিকিউল তৈরী করে থাকেন।

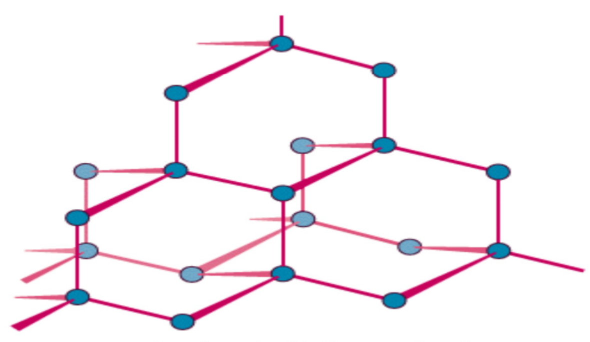
৫. দু'টি কারণে যে কোন মলিকিউলের বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়: ক. তার মধ্যস্থ অণু এবং গ. কিভাবে তারা একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত আছে। দৃষ্টান্ত হলো: আমরা যে অক্সিজেন শ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করি তার মলিকিউলে আছে সংযুক্ত দু'টি অক্সিজেন এটম। কিন্তু যদি একটি অক্সিজেন এটম অপর একটি কার্বন এটমের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে এটা হয়ে যায় মারাত্মক বিষ **'কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাস'** মলিকিউল।

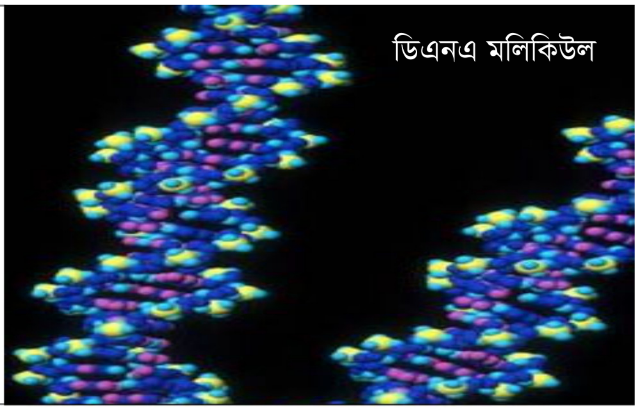
৬. বিজ্ঞানীরা মলিকিউল গবেষণা করে জানতে পারেন বিভিন্ন বস্তুর ভিন্ন গুণাবলীর কারণ। দৃষ্টান্ত: পানি কেন উচ্চ তাপে ফুটতে থাকে তা তার মলিকিউলার গবেষণা দ্বারা জানা গেছে। বিজ্ঞানীরা মলিকিউলার গঠনপ্রণালী জেনে কৃত্রিম উপায়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বস্তু তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন: প্লাস্টিক-পলিস্টাইরিন, পলিস্টার, নাইলন ও পলিভাইনিল। কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট বস্তুকে বলে **'সিনথেটিক পলিমারর্স'** [Synthetic polymers]।

৭. ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্টরা মলিকিউলার জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সৃষ্টি করেন নতুন নতুন ঔষধ। ডিএনএ [deoxyribonucleic acid -DNA] নামক মলিকিউল আবিস্কৃত হওয়ার পর থেকে মেডিসিন ও শিল্পে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এই মলিকিউল হলো সকল প্রাণীর **'জেনেটিক ব্লুপ্রিন্ট'**। কোর্সের এক পর্যায়ে আমরা প্রাণীজগৎ নিয়ে আলোচনা করবো। ডিএনএ মলিকিউল সম্পর্কে তখন বেশ কিছু জানতে সক্ষম হবো, আশারাখি।

৮. আমরা বলেছি, বিশ্বের অধিকাংশ বস্তু মলিকিউলের তৈরী। যেসব বস্তু মলিকিউলের তৈরী নয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'টি হলো: ধাতু ও লবণ। এগুলোর বন্ড উপরে আলোচিত **'মেটালিক'** না হয় **'আয়োনিক'**। একমাত্র কোভেলেন্ট বন্ডযুক্ত বস্তু মলিকিউলের তৈরী।

৯. বিজ্ঞানীরা মলিকিউল নিয়ে গবেষণায় 'মলিকিউলার ফর্মুলা' আবিষ্কার করেছেন। এটা মলিকিউলের এটম ও তাদের গঠনপ্রণালী সংক্ষিপ্তভাবে লিখার একটি উত্তম পদ্ধতি মাত্র। একটি দৃষ্টান্ত হলো: H_2O। এই ফর্মুলা দ্বারা পানির মলিকিউল বুঝাচ্ছে। এখানে H হলো হাইড্রোজেন পদার্থের সংকেত, ২ [সাবস্ক্রিপ্ট] অর্থ হলো দু'টি হাইড্রোজেন এটম এবং O হলো অক্সিজেন পদার্থের সংকেত। সুতরাং পানির মলিকিউলের ফর্মুলা দ্বারা যা বুঝা গেল তাহলো: দু'টি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন এটম মিলে পানির মলিকিউল সৃষ্ট। লক্ষ্য করুন O এর সঙ্গে ১ [সাবস্ক্রিপ্ট] হিসাবে দেখানো হয় নি। সাধারণত একের অধিক এটম থাকলে সাবস্ক্রিপ্ট যুক্ত হয়। না থাকলে বুঝতে হবে একটি এটম। এসব ফর্মুলা বুঝা হলো **'রসায়ন শাস্ত্রের ভাষা বুঝার'** প্রথম পদক্ষেপ। আমরা এই প্রথম পদক্ষেপেই থেমে যাবো! এ শাস্ত্রের উপর গভীর জ্ঞানার্জন ডাক্তার, কেমিস্ট ও ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের সঙ্গে জড়িতদের জন্য খাস। ঠিক কি না? **সবার জন্য দু'টি প্রশ্ন:** ক. মলিকিউলার ফর্মুলা: C_2H_6 এবং খ. C_4H_{10}- এর অর্থ কি? এটুকু বলে দিচ্ছি প্রথমটি 'ইথেইন' ও দ্বিতীয়টি 'বিউটেন' নামক রসায়নিক বস্তুর ফর্মুলা। এছাড়া ইংরেজী অক্ষর C হলো কার্বন পদার্থের সংকেত।


কার্বন এটমে তৈরী হীরার মলিকিউল


ডিএনএ মলিকিউল

১০. মলিকিউলের আয়তন ও গঠনপ্রণালী অনেক ধরনের হতে পারে। হীরার মলিকিউল খুব ছোট্ট। অপরদিকে কোন কোন মলিকিউল হাজার হাজার এটম নিয়ে সৃষ্ট। বিষয়টি বুঝার জন্য নীচের চিত্রে হীরা ও ডিএনএ মলিকিউল অঙ্কন করেছি। আয়তন ও গঠনপ্রণালী খুব গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর উপর নির্ভর করে মলিকিউলের গুণাবলী। যেমন, ছোট্ট আয়তনেরটি ভেঙ্গে যায় সহজে। বড় লম্বাগুলো অনেকটা শক্ত। ছোট্টগুলো কম তাপে ভেঙ্গে গ্যাসে পরিণত হতে পারে। যেমন বাতাস একটি গ্যাস। এতে আছে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের ছোট্ট আয়তনের মলিকিউল। এ মলিকিউলগুলো খুব অল্প তাপে ফুটন্ত হয়।

১১. মলিকিউলের আকার বা আকৃতিও গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষকরে প্রাণীদের মধ্যে কোনো মলিকিউল কোন্ আকার ধারণ করে আছে তার উপর নির্ভর করে সে কিভাবে কার্য সমাধা করবে। একটি দৃষ্টান্ত হলো রক্তের হিমোগ্লোবিন-সৃষ্ট [আয়রোনযুক্ত প্রটিন] **ইরিথ্রোসাইট** [erythrocyte] বা লাল রক্তকোষ। এটার আকার এমনভাবে ডিজাইন করা যে, সে সহজেই অক্সিজেন মলিকিউল বহন করতে পারে। অর্থাৎ তার মধ্যে অক্সিজেন মলিকিউল সঠিকভাবে 'ফিট' হয়। এখন এই আকারে যদি তারতম্য সৃষ্টি হয় তাহলে সে অক্সিজেন নিয়ে শিরা-উপশিরায় ঢুকতে সমর্থ হবে না। এই অবস্থাকে বলে 'সিকল সেল আমেনিয়া'। এর অর্থ হলো রক্তের লাল সেল আকার-বিকৃতির শিকার। দেখুন নীচের চিত্র দু'টি।



সুস্থ লাল রক্তকোষ



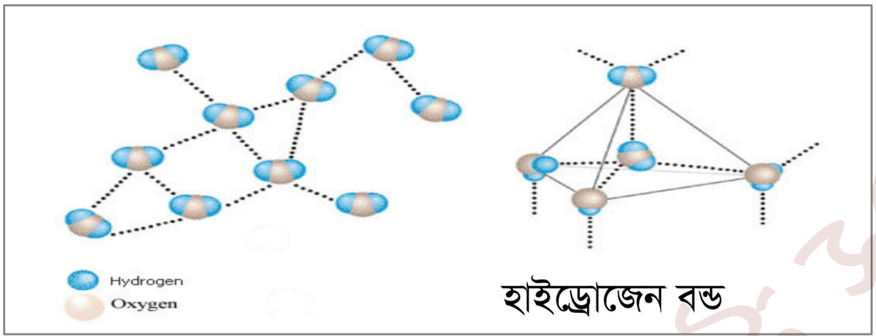
অসুস্থ লাল রক্তকোষ

১২. মলিকিউলের আয়তন মাপতে যেয়ে বিজ্ঞানীরা একটি ইউনিট (মাপার একক) ব্যবহার করেন। এর নাম **আংস্ট্রম** [angstrom - Å]। ১ Å = ১/১০০০০০০০০০০ মিটার [বা ১০$^{-১০}$ মিটার]। এটা খুব ছোট্ট একটি সংখ্যা। হাইড্রোজেন মলিকিউলের আয়তন মাত্র ১.৫ Å। অপরদিকে মানব ডিএনএ মলিকিউল যখন লম্বা করা হয়- তার দৈর্ঘ্য ৯ সে.মি [৪ ইঞ্চি] পর্যন্ত হতে পারে। তবে বাস্তবে এগুলো বক্র ও মুড়ানো অবস্থায় থাকে। ফলে একটি মানব-কোষের কেন্দ্রে ৪৬টি ডিএনএ মলিকিউল জায়গা করে নেয়।

১৩. একাধিক মলিকিউল মিলে যুক্ত পদার্থ হতে পারে। এসব যুক্ত বা **কম্পাউন্ড** [compound] পদার্থ বস্তুর তিনটি মৌলিক অবস্থার যে কোনোটি হতে পারে। এ তিন অবস্থা হলো বাষ্প [gas], তরল [liquid] ও কঠিন [solid] অবস্থা। গ্যাসে মলিকিউল অনবরত গতিশীল ও একটা আরেকটা থেকে দূরে থাকে। তরল অবস্থায় মলিকিউলগুলো অনেকটা কাছে থাকে কিন্তু ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর কঠিন অবস্থায় মলিকিউলগুলো একে অন্যের সঙ্গে শক্তভাবে সংযুক্ত থাকে। বস্তুর অবস্থা নির্ভর করে তাপমাত্রা ও চাপের [প্রেশার] উপর। মলিকিউল থেকে মলিকিউলে যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি সক্রিয় আছে- তার নাম 'ইন্টারমলিকিউলার ফোর্স'। বাংলায় বলতে পারি আন্তঃমলিকিউল বল।

১৪. হাইড্রোজেন মলিকিউলের আন্তঃমলিকিউল বলের দরুন এই পৃথিবীর বুকে আমরা বেঁচে আছি। কিভাবে? পানির মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ড বিদ্যমান থাকার ফলে এর স্ফুটনাঙ্ক ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হয়েছে। এই বন্ডিং না

থাকলে তা হতো মাত্র -৮০ ডিগ্রী! লক্ষ্য করুন মাইনাস (-) সাইনটি। এর অর্থ শূন্য থেকে ৮০ ডিগ্রী কম। এ অবস্থায় পৃথিবীর বুকে পানির কোন অস্তিত্বই থাকতো না। আর পানি ছাড়া জীবন কল্পনাতীত। নীচের চিত্রটি দেখুন।

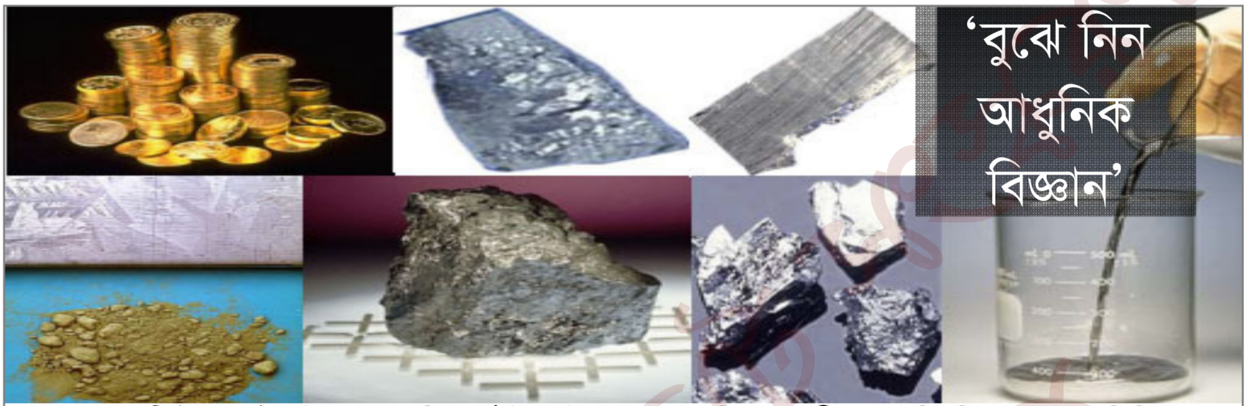


হাইড্রোজেন বন্ড

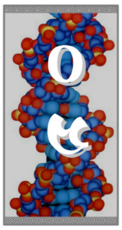
১৫. বড় মলিকিউল [মেক্রোমলিকিউল] বেশ ভারী। এর প্রায় সবটির মূলে থাকে কার্বন এটম। কার্বন নিজে নিজে ও অন্যদের নিয়ে অতি সহজে বন্ড তৈরী করতে জানে। কার্বনের এই সহজে যুক্ত হওয়ার গুণাগুণের ফলেই প্রাণীদেহ **'কার্বন-মূল'** [carbon based] হিসাবে স্বীকৃত। কেমিস্টরা কৃত্রিম উপায়ে বড় মলিকিউল তৈরী করতে পারেন। এগুলোকে বলে পলিমার- অর্থাৎ একই ধরনের একাধিক অংশে তৈরী মলিকিউল। প্রাণীরা এই পলিমার মলিকিউল ও অন্যান্য জটিল মলিকিউল তৈরী করতে পারে। প্রাণীরা এরূপ তিনটি মৌলিক বায়োলজিক্যাল পলিমার তৈরী করে: ১. পলিসাকারাইড; ২. প্রটিন; ও ৩. নিউক্লিয়েক এসিড। প্রথমটি চিনি মলিকিউল দ্বারা তৈরী। যেমন, ফ্রকটোজ [মধু ও ফলের চিনি] ও গ্লুকোজ [চিনিজাতীয় এনার্জিসূত্র, যেমন ডেক্সট্রোজ]। উদ্ভিদ চিনি মলিকিউল দ্বারা তৈরী করে স্ট্রাচ [প্রাণীদের এনার্জিসূত্র] ও সেল্যুলুজ [বৃক্ষরাজির কোষের দেওয়াল]। দ্বিতীয়টি আমিনো এসিডের তৈরী। প্রটিন মলিকিউল প্রাণীদের জন্য একান্ত জরুরী বস্তু। প্রটিনের কারণেই দেহের মধ্যে এনজাইম নামক কাটালিস্ট [নিজের মধ্যে রদবদল ছাড়াই রসায়নিক প্রতিক্রিয়া দ্রুত ঘটানোর ক্ষমতাসম্পন্ন কেমিকেল] সৃষ্টি হয়। এছাড়া প্রটিনের আরো অনেক ফাংশন আছে। তৃতীয় মলিকিউলটি সাধারণত কোষের কেন্দ্র ও সাইটোপ্লাজম [কোষের একটি বিশেষ অংশ] নামক বস্তুতে পাওয়া যায়। ডিএনএ [deoxyribonucleic acic - DNA] এবং আরএনএ [ribonucleic acid -RNA] এই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। আমরা পরবর্তী কোন লেকচারে প্রাণীবিদ্যার উপর আলোচনাকালে এ ব্যাপারে আরো বলবো।

প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! বস্তুর গঠনপ্রণালীর অংশ হিসাবে একাধিক এটমের তৈরী মলিকিউলের উপর আমাদের সংক্ষিপ্ত তথ্যানুসন্ধানের এখানেই শেষ। বাস্তবে এ লেকচারে এর অতিরিক্ত কিছু আলোচনা আদৌ যথাযথ হবে না। তবে আমি আশা করি, বস্তু কিভাবে বন্ড ও মলিকিউল হিসাবে অস্তিত্বশীল আছে সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এই আলোচনা থেকে কিছুটা হলেও বর্ধিত হয়েছে। বস্তুজগতের গঠনপ্রণালীর উপর আমাদের প্রাথমিক ক'টি বক্তৃতার অংশ হিসাবে পরবর্তীতে মৌলিক পদার্থ [ইলেমেন্ট] ও যুক্ত পদার্থ [কম্পাউন্ড] নিয়ে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। সবাইকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের লেকচারের ইতি টানছি। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম



কয়েকটি ইলেমেন্ট: [উপরের সারি] স্বর্ণ, টাংস্টেন ও মেগনেশিয়াম। [নীচের সারি] জিন্‌ক [দস্তা], সিলিকন ক্রোমিয়াম ও পারদ।



বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ক. বস্তুজগৎ : মৌলিক গঠনপ্রণালী

বক্তৃতা ৫ : মৌলিক পদার্থ [ইলেমেন্ট] ও যুক্ত পদার্থ [কম্পাউন্ড]

'বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান' বক্তৃতাসর্বস্ব এ কোর্সের সকল শিক্ষার্থীদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। পঞ্চম এ বক্তৃতায় আমরা বস্তুজগতের গঠনপ্রণালী সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো বলে আশারাখি। এ বিষয় দু'টো হলো: ১. মৌলিক পদার্থ [element] ও ২. যুক্ত পদার্থ [compound]। আমাদের জানা পুরো মহাবিশ্বের যাবতীয় বস্তু হয় **'ইলেমেন্ট'** না হয় **'কম্পাউন্ড'**।

বস্তু বা মেটার

ইলেমেন্ট ও কম্পাউন্ডের উপর তথ্যানুসন্ধানের পূর্বে প্রথমে **'বস্তু'** [matter] বলতে কি বুঝায় তার একটি সংজ্ঞা উপস্থাপন জরুরী মনে করছি। বিজ্ঞানীরা বলেন, মেটার হিসাবে স্বীকৃত বস্তুর মধ্যে তিনটি গুণ থাকতে হবে: **১. স্থান দখল করার ক্ষমতা, ২. মহাকর্ষ ও ৩. ইনার্শা [inertia] বা জড়তা।**

আধুনিক বিজ্ঞানে বস্তুর আরেকটি গুণ সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। এটি হলো **এনার্জি** বা **উদ্যম**। আগের যুগে মনে করা হতো এনার্জি ও মেটার দু'টি আলাদা জিনিস। এখন এটা স্পষ্ট হয়েছে যে বাস্তবে উভয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মেটার ও এনার্জি রূপান্তরযোগ্য। বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত **'রিলেটিভিটি থিওরী'** দ্বারা এটা প্রমাণ করেছেন। এ মুহূর্তে রিলেটিভিটি কী তার উপর আমাদের চিন্তাভাবনার প্রয়োজন নেই। সময়মতো এ বিষয়টি সম্পর্কে যেটুকু প্রয়োজন বলবো।

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি, কিছু মৌলিক পরমাণু দ্বারা সকল বস্তু সৃষ্ট। এ পর্যন্ত জানা সর্বাপেক্ষা মৌলিক পরমাণুর নাম ক্যুয়ার্ক। তিনটি ক্যুয়ার্ক থেকে সৃষ্টি হয় একেকটি প্রটন ও নিউট্রন নামক কণা। তৃতীয় আরেক ক্ষুদ্রকায় কণা আছে। এর নাম ইলেকট্রন। সুতরাং ক্যুয়ার্কের তৈরী প্রটন ও নিউট্রন এবং সেসাথে ইলেকট্রন মিলে সৃষ্টি হয়েছে একেকটি এটম। এরপর আমরা তা-ও জেনেছি যে, একাধিক এটম তিন ধরনের বন্ডের [যুক্ততার] মাধ্যমে তৈরী করে আরো বড় বস্তু। এই বন্ড তিনটি হলো: **১. আয়োনিক [এটমের মধ্যে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক চার্জ থাকা] বন্ড, ২. মেটালিক [ধাতুগত] বন্ড ও ৩. কোভেলেন্ট [বাইরের শেলের ইলেকট্রন শেয়ার করার] বন্ড**। শেষোক্ত বন্ড থেকেই সৃষ্টি হয়েছে যাবতীয় **'মলিকিউল'**। আশারাখি সকল ছাত্রবন্ধুর কাছে এ পর্যন্ত যা বলেছি তা সুস্পষ্ট। মেটার সম্পর্কে এটুকু বলার পর আমরা আজকের মূল আলোচনায় যেতে পারি।

১. মৌলিক পদার্থ [elements]

এখানে মৌলিক পদার্থ বলতে আমরা **কেমিক্যাল ইলেমেন্ট** বুঝাচ্ছি। এর সংজ্ঞা হলো, **'যে কোন বস্তু যা সাধারণ কেমিক্যাল প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে একাধিক অন্য বস্তুতে রূপান্তর সম্ভব নয়'**। ইলেমেন্ট বা মৌলিক পদার্থ দ্বারাই **'সকল'** বস্তু সৃষ্ট। এ লেকচারে আমরা মৌলিক পদার্থের সূত্র ও বিশ্বব্যাপী এর ব্যাপ্তির উপর আলোচনা করবো। আমরা কোন অঙ্ক কষবো না। এটা তো বিজ্ঞানীদের কাজ!

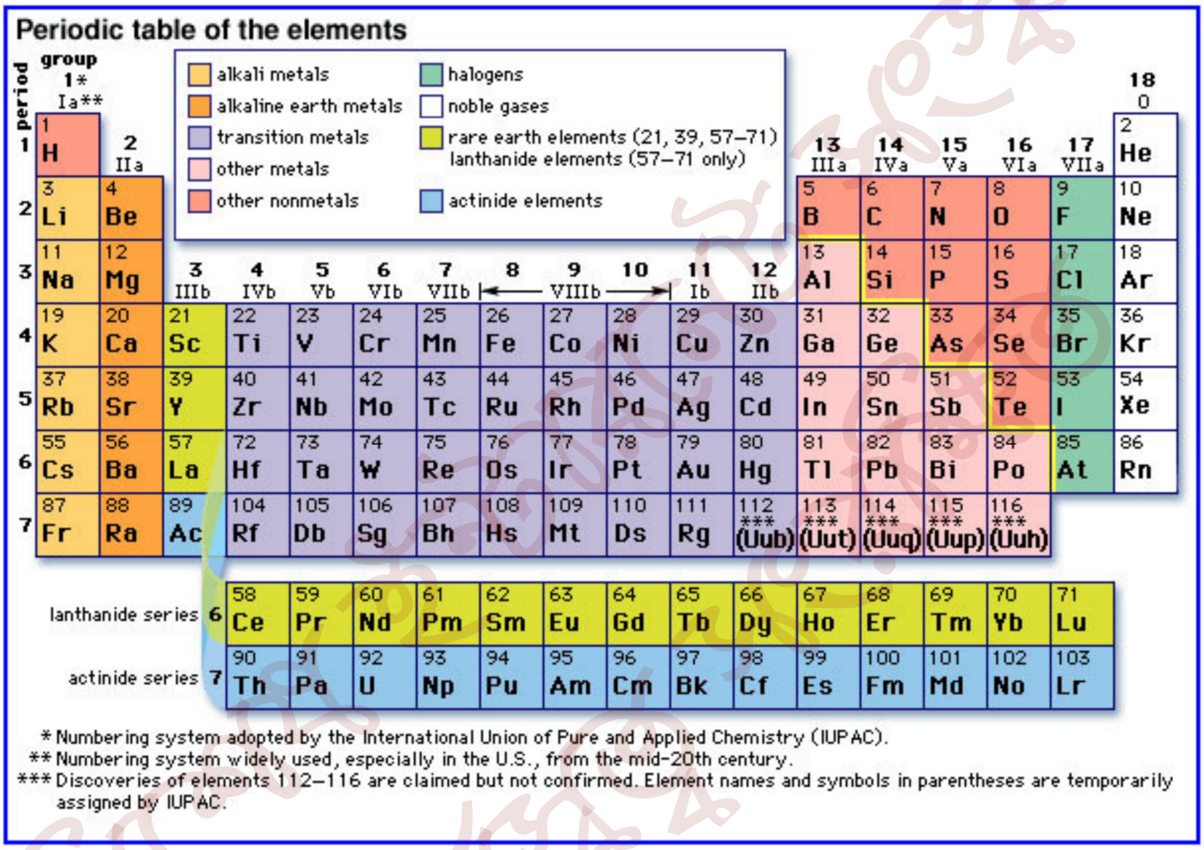
যাক, এ পর্যন্ত ৯২টি মৌলিক পদার্থ পাওয়া গেছে। এগুলো স্বাভাবিকভাবে অস্তিত্বশীল। বাকী আরো উনিশটির মতো পদার্থ বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। স্বভাবে মাত্র ৯২টি মৌলিক পদার্থ থাকলেও একাধিক ইলেমেন্টে সৃষ্ট যুক্ত পদার্থের অভাব নেই। এ পর্যন্ত ১ কোটি ১০ লক্ষাধিক যুক্ত পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। আমরা একটু পরই যুক্ত পদার্থের উপর আলোচনা করবো। এখানে এটুকু জানা দরকার, যখন একাধিক ভিন্ন মৌলিক পদার্থ মিলে কম্পাউন্ড বা যুক্ত পদার্থ সৃষ্টি করে তখন প্রতিটি মৌলিক পদার্থ তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। তাদের চরিত্র আর অবশিষ্ট থাকে না। যেমন: মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন একত্রিত হয়ে তৈরী করে যুক্ত পদার্থ- পানি। এই পানির গুণাবলী সম্পূর্ণ ভিন্ন। এতে না আছে হাইড্রোজেন কিংবা অক্সিজেনের কোন গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য।

যে কোন যুক্ত বস্তুকে রসায়নিক উপায়ে ভেঙ্গে তার একক মৌলিক পদার্থে রূপান্তর করা যায়। কিন্তু এ পর্যন্তই। সাধারণ কেমিক্যাল প্রক্রিয়ায় মৌলিক পদার্থকে ভাঙ্গা যায় না। যেমন: উপরে বর্ণিত পানির মলিকিউলকে ভেঙ্গে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে রূপান্তর সম্ভব। আর এই রূপান্তর শেষে প্রাপ্ত উভয় পদার্থই মৌলিক- এদেরকে আর ভাঙ্গা যাবে না সাধারণ প্রক্রিয়ায়। আশারাখি কথাটি ছাত্রবন্ধুদের বোধে এসে গেছে।

মৌলিক পদার্থের পিরিওডিক টেবিল

স্বভাবে প্রাপ্ত এ পর্যন্ত জানা ও ল্যাবে সৃষ্ট ইলেমেন্টের একটি টেবিল বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করে থাকেন। খুব চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে সৃষ্ট এ টেবিল থেকে প্রতিটি মৌলিক পদার্থের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়। আমরা

'পিরিওডিক টেবিল'র উপর এ লেকচারে খুব একটা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবো না। শুধুমাত্র পুরো টেবিলের একটি ছবি ও দু'চারটে ইলেমেন্ট নিয়ে আলোচনা করবো। আশা করা যায় এ থেকেই সকলে টেবিলের গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হবেন। প্রথমে আমরা টেবিলটি নিম্নে চিত্রিত করছি। এরপর টেবিল থেকে কোন্ কোন্ বিষয় সহজে জানা যায় তার একটি তালিকা ব্যাখ্যাসহ লিপিবদ্ধ করবো।



বৈশিষ্ট্যাবলী

ক. এটোমিক সংখ্যা নির্ধারণ: বাম থেকে ডানদিকে এটোমিক সংখ্যা [atomic number] মুতাবিক টেবিলটি সাজানো হয়েছে। ইলেমেন্টের এটমের কেন্দ্রে ক'টি প্রটন আছে সে হিসাবকে বলে এটোমিক নাম্বার।

খ. মৌলিক পদার্থের জাত নির্ধারণ: উপর থেকে নীচের দিকে ইলেমেন্টগুলোর জাত মুতাবিক সাজানো আছে। পিরিওডিক টেবিলে মোট ৯ জাত মৌলিক পদার্থ আছে। এগুলো হলো:

১. অধাতু [nonmetals]: এ গ্রুপে আছে মোট ১১টি ইলেমেন্টে। এদের এটোমিক নাম্বার হলো: ১, ৫ থেকে ৮, ১৪ থেকে ১৬, ৩৩ ও ৩৪ এবং ৫২। এ গ্রুপের একে অন্যের মধ্যে ভিন্ন গুণাবলী পরিলক্ষিত হয়। কয়েকটি কক্ষ-তাপমাত্রায় [২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড] গ্যাস হিসাবে অস্তিত্বশীল; অন্যরা কঠিন পদার্থ। এদের কয়েকটি প্রাণী জীবনের মৌলিক মাল-মসলা- যেমন: **কার্বন [C], অক্সিজেন [N], নাইট্রোজেন [O]** ইত্যাদি।

২. ক্ষারযুক্ত মাটির ধাতু [alkaline earth metals]: এ গ্রুপে এটোমিক নাম্বার ৪, ১২, ২০, ৩৮, ৫৬ ও ৮৮- এই মোট ৬টি ইলেমেন্ট আছে। টেবিলের দ্বিতীয় কলামে এগুলো পাওয়া যায়। এ গ্রুপের সদস্যরা শুধুমাত্র ক্ষারযুক্ত [alkali] ধাতু থেকে কম প্রতিক্রিয়াশীল। তবে অপর্যাপ্ত নয়। এগুলো স্বাভাবিকভাবে অন্য কোন ইলেমেন্টের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় বিদ্যমান। এরা খুব ভালো ইলেকট্রিক কন্ডাকটার। এছাড়া সহজেই বাতাসের মধ্যে পুড়ে যায়। এ গ্রুপের মধ্যে ক'টি উল্লেখযোগ্য ইলেমেন্ট হলো, **ক্যালসিয়াম - খটিক [Ca], রেডিয়াম [Ra]** ও **ম্যাগনেশিয়াম - [Mg]**।

৩. অন্যান্য ধাতু [other metals]: এ গ্রুপে ১৪টি ইলেমেন্ট আছে। এদের এটোমিক নাম্বার হলো, ১৩, ৩১ ও ৩২, ৪৯ থেকে ৫১, ৮১ থেকে ৮৪ এবং [কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট] ১১৩ থেকে ১১৬। এ গ্রুপে ধাতু ও অধাতু উভয়টি আছে। ধাতুর গুণাবলীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান, যেমন: **গ্যালিয়াম [Ga]**। এটি আপনার হাতে গলে যাবে। অপরদিকে ইলেমেন্ট **এ্যান্টিমোনি [Sb]** এর গলনাঙ্ক ৬১৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড! এই গ্রুপের আরো ক'টি পরিচিত ধাতু হলো **টিন [Sn], এলুমিনিয়াম [Al]** ও **লেড - সীসা [Pb]**।

৪. তেজস্ক্রিয়সম্পন্ন সিরিজ [actinide series]: এ গ্রুপে আছে মোট ১৪টি ইলেমেন্ট। এগুলোর এটোমিক সংখ্যা ৮৯ থেকে ৯২ এবং [কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট] ৯৩ থেকে ১০৩। এই গ্রুপের সব ইলেমেন্ট তেজস্ক্রিয়সম্পন্ন। তবে মাত্র চারটি [৮৯ থেকে ৯১] স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায়। বাকীগুলো বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করে থাকেন। এই গ্রুপেই আনবিক বোমা তৈরীর পদার্থ **ইউরেনিয়াম [U]** ও [কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট] **প্লুটোনিয়াম [Pu]** অন্তর্ভুক্ত।

৫. অভিজাত বাষ্প [noble gas]: এ গ্রুপে মোট ৬টি ইলেমেন্ট আছে। টেবিলের ১৮তম কলামে এগুলো পাওয়া যায়। এদের এটোমিক সংখ্যা হলো ২, ১০, ১৮, ৩৬, ৫৪ এবং ৮৬। এই গ্রুপের গ্যাসগুলো সত্যিই একক এক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তারা অন্য কোন পদার্থের সঙ্গে মিশে থাকতে ভালোবাসে না। এদেরকে **'নিষ্ক্রিয় গ্যাস'** [inert gas] হিসাবেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই দলেরই অন্তর্ভুক্ত **হিলিয়াম [He]** ও **নিওন [Ne] গ্যাস**।

৬. ক্ষারযুক্ত ধাতু [alkali metals]: টেবিলের প্রথম কলামে এজাতীয় মোট ৬টি ইলেমেন্ট আছে। এদের এটোমিক সংখ্যা হলো ৩, ১১, ১৯, ৩৭, ৫৫ ও ৮৭।

৭. পরিবর্তনশীল ধাতু [transition metals]: টেবিলের ৪ থেকে ১২ নাম্বার কলামে চিত্রিত এই সর্ববৃহৎ গ্রুপে মোট ৪০টি ইলেমেন্ট আছে। এদের এটোমিক নাম্বার হলো ২২ থেকে ৩০, ৪০ থেকে ৪৮, ৭২ থেকে ৮০ এবং [মানবসৃষ্ট] ১০৪ থেকে ১১২। এই ধাতুগুলো খুব বেশী প্রতিক্রিয়াশীল। তারা কখনো একা থাকে না- অন্য কোন ইলেমেন্টের সঙ্গে মিশে যুক্ত পদার্থ হিসাবে অস্তিত্বশীল থাকে। অন্যান্য ধাতুর তুলনায় এরা অনেকটা নরম। তাদের গলনাঙ্কের মাত্রাও কম। লবণ তৈরীর মসলা **সোডিয়াম [Na]** এই গ্রুপেরই অন্তর্ভুক্ত। সোডিয়াম ও **ক্লোরিন [Cl]** মিলে অতি গুরুত্বপূর্ণ যুক্ত পদার্থ লবণ সৃষ্টি হয়। এই গ্রুপেই আছে মূল্যবান ধাতু স্বর্ণ **[Au], রৌপ্য [Ag], প্লাটিনাম [Pt]** ও **টাংস্টেন [W]**। এছাড়া **লৌহ [Fe], নিকেল [Ni], তামা [Cu], জিংক - দস্তা [Zn], ম্যাঙ্গানিজ [Mn], পারদ [Hg]** ইত্যাদি ধাতুও এই দলের সদস্য।

৮. উচ্চ প্রতিক্রিয়াশীল ইলেমেন্ট [halogens]: টেবিলের ১৭ নাম্বার কলামে এ গ্রুপটির অবস্থান। এতে মোট ৫টি ইলেমেন্ট আছে। এদের এটোমিক নাম্বার হলো ৯, ১৭, ৩৫, ৫৩ ও ৮৫। উপরে উল্লেখিত লবণের মসলা ক্লোরিন [chlorine] এই দলের অন্তর্ভুক্ত। তবে বাকী চারটি ইলেমেন্টও সোডিয়ামের সঙ্গে মিশে লবণ-জাতীয় যুক্ত পদার্থ তৈরী করতে পারে। এই গ্রুপের প্রতিটি ইলেমেন্ট রসায়নিকভাবে খুব বেশী প্রতিক্রিয়াশীল।

৯. বিরল মাটির ধাতু [lanthanide series / rare earth elements]: এ গ্রুপের এটোমিক সংখ্যা ২১, ৩৯, ৫৭ থেকে ৭১ পর্যন্ত বিস্তৃত। এতে আছে মোট ১৭টি ইলেমেন্ট। স্বভাবে এই দলের সদস্যদের খুব বেশী পাওয়া যায় না। এদের বৈশিষ্ট্য প্রায় একই ধরনের। এটকা আরেকটা থেকে আলাদাকরণ খুব কঠিন।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! ইলেমেন্টের পিরিওডিক টেবিল সম্পর্কে আর বেশী আলোচনা এ কোর্সের স্কোপের বাইরে। এ পর্যন্ত উক্ত টেবিলে সন্নিবেশিত মৌলিক পদার্থ সম্পর্কে যাকিছু বলা হয়েছে, তা থেকেই আশারাখি সকলে বিষয়টি সম্পর্কে অনেকটা বেশী ওয়াকিফহাল হয়েছেন। বস্তুজগৎ কিভাবে সৃষ্ট তার অংশ হিসাবে আমরা মৌলিক পদার্থের উপর আলোচনা করলাম। এখন একাধিক মৌলিক পদার্থের তৈরী 'যুক্ত পদার্থ' নিয়ে আলোচনা করা যাক-কেমন?

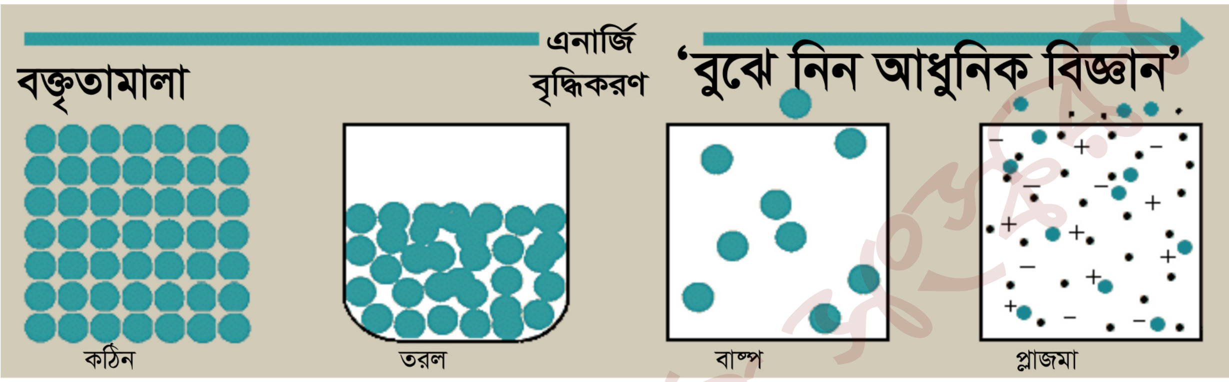
২. যুক্ত পদার্থ [compound]

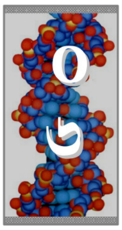
যুক্ত পদার্থের উপর বাস্তবে খুব একটা বলার প্রয়োজন নেই। পৃথিবী ও বাইর বিশ্বে জানা ৯২টি স্বাভাবিক মৌলিক পদার্থের যে কোন দুই বা ততোধিক সংমিশ্রিত হয়ে যাবতীয় যুক্ত পদার্থ সৃষ্ট। আমরা ইতোমধ্যে লবণ ও পানি সম্পর্কে বলেছি। উভয় বস্তু যুক্ত পদার্থ। কোন্ কোন্ মৌলিক পদার্থের এটম থেকে যুক্ত পদার্থ তৈরী হয়েছে, তা কিন্তু বুঝা কঠিন ব্যাপার। পানির উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস তা অবিশ্বাস্য মনে হয়- কিন্তু আসলে তো তা-ই। লৌহ জং কি জিনিস আমরা জানি। কিন্তু এটা যে অক্সিজেন ও লৌহ ধাতুর সমন্বয়ে গঠিত তা বুঝা যায় না। কম্পাউন্ড সম্পর্কে একটি গুরুত্ব ব্যাপার হলো সর্বক্ষেত্রেই বস্তুর বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের ওজন একই। অর্থাৎ পানি যেখান থেকেই আসুক না কেন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের ওজনের আনুপাতিক মাত্রা একই- এ ক্ষেত্রে ১ ভাগ হাইড্রোজেন ও ৮ ভাগ অক্সিজেন। এই অনুপাতে বেশকম হলে বস্তুর বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হয়ে যায়। যেমন হাইড্রোজেন পারোক্সাইড। এটাও হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এটমের তৈরী। তবে একটি ভিন্ন বস্তু। কারণ এর অনুপাত ২ অংশ হাইড্রোজেন ও ১৬ অংশ অক্সিজেন।

সন্ধানী বন্ধুরা! আমাদের চতুর্পাশ্বস্থ অধিকাংশ বস্তু কেমিক্যাল কম্পাউন্ড বা যুক্ত পদার্থ। আমরা মৌলিক পদার্থ তথা ইলেমেন্ট সচরাচর খুব অল্পই দেখি। সোনা ও রূপা মাঝে মধ্যে দেখা যায় বটে। বিয়ের অনুষ্ঠান তো আজকাল কম না! বাতাসে অবশ্য বিভিন্ন মৌলিক গ্যাস আছে। যেমন অক্সিজেন, কার্বন ডাইওক্সাইড, নাইট্রোজেন ইত্যাদি। তবে এগুলো আমরা দেখি না।

যুক্ত পদার্থকে এখন থেকে আমরা শুধু বস্তু বা মেটার হিসাবে উল্লেখ করবো। কারণ, তারার মূল জ্বালানি হাইড্রোজেন হলেও পৃথিবীসহ শক্ত গ্রহ-উপগ্রহ মূলত অসংখ্য যুক্ত পদার্থের তৈরী। যাক আজকের লেকচারের এখানেই ইতি টানবো। আগামী লেকচারে আমরা বস্তুজগতের গঠনপ্রণালীর অংশ হিসাবে স্বভাবে প্রাপ্ত সকল বস্তুর মোট চারটে অবস্থার উপর বিস্তারিত আলোচনা করবো। এখানে শুধু এ চার অবস্থার নামগুলো বলে রাখছিঃ **১. কঠিন, ২. তরল, ৩. বাষ্প ও ৪. প্লাজমা**। আগামী ক্লাসে সবার সঙ্গে আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ক. বস্তুজগৎ : মৌলিক গঠনপ্রণালী

বক্তৃতা ৬ : বস্তুর ফিজিক্যাল অবস্থা

প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! **'বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান'** লেকচারে সবাইকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি। বস্তুজগৎ সম্পর্কে আলোচনার ষষ্ঠ এ বক্তৃতায় আমরা বস্তুর অবস্থা [states of matter] সম্পর্কে অবগত হবো। পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে সকল বস্তু তিনটি অবস্থার যে কোন একটিতে অস্তিত্বশীল আছে। এ তিনটি হলো: **১. কঠিন [solid], ২. তরল [liquid]** ও **৩. বাষ্প [gas]**। তবে আরো একটি অবস্থার কথা বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন। চতুর্থ এই অবস্থার নমা **প্লাজমা [plasma]**। এই অবস্থায় কোন বস্তু পৃথিবীতে স্থায়ীভাবে অস্তিত্বশীল নেই। **'বজ্রপাত'** ও কেউ কেউ **'ধাতুর মুক্ত ইলেকট্রনকে'** প্লাজমা বলেছেন। তবে মহাবিশ্বের সর্বাধিক বস্তু কিন্তু প্লাজমা অবস্থায় বিরাজমান। কারণ উচ্চ তাপমাত্রায় অস্তিত্বশীল তারাগুলোর হাইড্রোজেন গ্যাস প্লাজমা অবস্থা ধারণ করে আছে। তবে প্রথমে আমরা পৃথিবীতে অস্তিত্বশীল বস্তুর মৌলিক তিনটি অবস্থার বর্ণনা দেবো। এরপর প্লাজমা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

১. কঠিন বস্তু [solid]

বস্তুর একটি অবস্থার নাম কঠিন। এ অবস্থায় বস্তু তার কাঠিন্যতা ও আকার বজায় রাখে। সাধারণত কঠিন অবস্থায় বস্তুর মধ্যে বিরাজ করে সম-বিন্যস্ত এটমিক, আয়োনিক কিংবা মলিকিউলার কণা। কঠিন বস্তুর গঠনপ্রণালী মূলত ক্রিস্টেলাইন [স্ফটিক-সদৃশ]। এর অর্থ তাদের এটম নির্দিষ্ট কোন জ্যামিতিকভাবে বিন্যস্ত নকশায় যুক্ত থাকে। সুতরাং সহজে ভাঙ্গা যায় না। অপরদিকে তরল বস্তুর মধ্যে ক্রিস্টেলাইন গঠনপ্রণালী পাওয়া যায় না। তাদের এটম, আয়োন বা মলিকিউল সাধারণত ইরেগুলার বা অসমভাবে বিন্যস্ত।

কঠিন পদার্থের এটম থেকে এটমের মধ্যে বন্ড [যুক্ততা] খুব শক্ত। একটা আরেকটার মধ্যে আকর্ষণ বেশী। ফলে সহজে নিজেদের আকার বদলে না। অপরদিকে তরল অবস্থায় অস্তিত্বশীল পদার্থ খুব সহজে তাদের আকার বদলে ফেলে। অধিকাংশ তরল পদার্থ পাত্রের আকার ধারণ করে। যেমন পানি।

অধিকাংশ কঠিন বস্তু নিম্ন তাপমাত্রায়ই বিরাজমান। যে তাপমাত্রায় কঠিন পদার্থ গলে যায় তা-ই হলো সে বস্তুর '**গলনাঙ্ক**'। অর্থাৎ বস্তুটি গলে তরল পদার্থে পরিণত হয়। যেমন পানির গলনাঙ্ক ০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। শূন্য থেকে নীচের তাপমাত্রায় এটি কঠিন পদার্থ- তথা বরফ।

১. ক. কঠিন বস্তুর বন্ড

ক্রিস্টেলাইন কঠিন পদার্থ বা বস্তুর মধ্যে চার ধরনের '**এটোমিক বন্ড**' [অণু থেকে অণুর মধ্যে যুক্ততা] পাওয়া যায়। যথা: **১. মেটালিক [এটম থেকে এটমে], ২. আয়োনিক [চার্জসম্বলিত বন্ড], ৩. কোভেলেন্ট [সর্বশেষ ইলেকট্রন শেলে এটম শেয়ার করে যে বন্ড হয়] ও ৪. মলিকিউলার [এক মলিকিউল থেকে অন্য মলিকিউলে আকর্ষণ]।** আমরা আগের লেকচারে এসব বন্ডের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে ব্যাখ্যা হিসাবে আরো কিছু বলা যায়।

মেটালিক ক্রিস্টেল: মেটালিক বন্ড থেকে সৃষ্ট ধাতু ও যুক্ত ধাতুর মধ্যে কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন: এদের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ সহজে হয়ে থাকে। এছাড়া তাপও সহজে প্রবহমান হয়। এর মূল কারণ হলো, ধাতুর মধ্যে বিরাজ করে অনেক মুক্ত ইলেকট্রন। সামান্য এনার্জি পেলেই এগুলো চলমান হয়। এনার্জি আসতে পারে তাপ কিংবা বৈদ্যুতিক ভল্টেজ থেকে।

আয়োনিক ক্রিস্টেল: চার্জ-হওয়া এটম থেকে এ বন্ড তৈরী হয়। লবণ-জাতীয় বস্তু এই দলের অন্তর্ভুক্ত কঠিন পদার্থ। তাপমাত্রা বাড়লে এসব পদার্থের মধ্যে ইলেকট্রন চলতে পারে।

কোভেলেন্ট ক্রিস্টেল: এ বন্ড থেকে সৃষ্ট বস্তু খুব শক্ত। তবে সহজে ফেটে যেতে পারে। এ দলের অন্তর্ভুক্ত আছে হীরা, সিলিকন [বালু], সিলিকন-কার্বাইড [কার্বনযুক্ত বালু] ইত্যাদি।

মলিকিউলার ক্রিস্টেল: আসলে এই বন্ডটি মূলত কোভেলেন্ট বন্ডেরই অনুরূপ। এভাবে যুক্ত পদার্থে মলিকিউল থেকে মলিকিউলে দুর্বল বন্ড বিদ্যমান। যেমন শুষ্ক বরফ- যা মূলত কঠিন অবস্থায় কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস। এছাড়া এ দলে আছে কঠিন অবস্থায় বিরল গ্যাস [আর্গন, ক্রিপটন, জিনোন ইত্যাদি]। অনেক অরগ্যানিক [প্রাণীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত] বস্তুর ক্রিস্টেল অবস্থাও এই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত।

সেমিকন্ডাক্টার

এ পর্যায়ে আমরা ইলেকট্রনিক্স শিল্পে খুব বেশী ব্যবহৃত একদল কঠিন বস্তুর কথা উল্লেখ করতে পারি। এদের নাম সেমিকন্ডাক্টার। প্রতিটি কঠিন অবস্থায় প্রাপ্ত মেটেরিয়েল ইলেকট্রিক্যাল দিক থেকে তিন ধরনের যে কোন একটি হতে পারে। **যথা: ক. ইনস্যুলেটর [ইলেকট্রন চলতে বাধাদানকারী বস্তু], খ. কন্ডাক্টার [সহজে ইলেকট্রন চলতে দেয় এমন বস্তু] এবং খ. সেমিকন্ডাক্টার [বিশেষ অবস্থায় কিছু ইলেকট্রন চলতে দেয় এমন বস্তু]।**

ক. ইনস্যুলেটর: স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত কিংবা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট অনেক বস্তু আছে যাদের মধ্যদিয়ে ইলেকট্রন খুব অল্প চলে। এসব বস্তু ইলেকট্রিসিটি চলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়- অর্থাৎ ইলেকট্রন চলতে দারুণ বাধাদান করে। ইলেকট্রিক্যাল সার্কেটে এসব বস্তুর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এগুলোর উপরই কন্ডাক্টার স্থাপন করতে হবে। অন্যথায় সবকিছুতে কারেন্ট চলতে থাকবে। মানবসৃষ্ট রাবার ও প্লাস্টিক সর্বত্র ইলেকট্রিক্যাল ইনস্যুলেটর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাইরের পাওয়ার লাইনে ইনস্যুলেটর হিসাবে থাকে চীনামাটির তৈরী বস্তু। আর বড় বড় জেনারেটর ও মোটরে ইনস্যুলেশন নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয় খনিজ ধাতু অভ্র [mica]। এই বস্তুটি ইলেকট্রিক্যাল ও তাপ ইনস্যুলেটর হিসাবে খুব দক্ষ।

খ. কন্ডাক্টার: কিছু বস্তু আছে যাদের ভেতর দিয়ে মুক্ত ইলেকট্রন সহজে চলতে পারে। অবশ্য এর জন্য প্রয়োজন কোন ধাক্কা-শক্তির। এই শক্তি আসে জেনারেটর বা ব্যাটারি থেকে। তবে ইলেকট্রন চলার সময় মাঝে-মধ্যে কোনো **পজিটিভ আয়োন** [যে এটমের কেন্দ্রের প্রটন-সংখ্যা তার ইলেকট্রন সংখ্যা থেকে বেশী - তা-ই পজিটিভ আয়োন] এর উপর পড়ে গ্রেফতার হতে পারে। গ্রেফতারের সময় একটি সংঘর্ষ বাধে। ফলে সৃষ্টি হয় তাপ। এভাবে ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টার সময়ে গরম হয়ে ওঠে। আর কন্ডাক্টার যতো গরম হবে তার মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্টেন্ট [বৈপরীত্য] ততো বাড়বে। যে বস্তুর মধ্যে খুব বেশী রেজিস্টেন্ট তা অতি সহজে গরম হয়ে যায়। এরূপ একটি বস্তু হলো **টাংস্টেন**। এটা খুব শক্ত। এ কারণেই টাংস্টেন তার দিয়ে তৈরী হয় বৈদ্যুতিক বাল্ব। ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্টেন্ট হেতু তারটি উচ্চ তাপমাত্রার কারণে জ্বলে ওঠে। কিন্তু শক্ত হওয়ার কারণে পুড়ে ছাই হয় না।

গ. সেমিকন্ডাক্টার: ছাত্রবন্ধুরা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, এটি কোন্ জিনিস। কন্ডাক্টার নয় কিন্তু বিশেষ অবস্থায় কারেন্ট এই বস্তুটির ভেতর দিয়ে চলতে পারে- এ জন্য এই নামকরণ, যার অর্থ **'কিছু-কন্ডাক্টার'**। আমরা এ বস্তুর উপর বিস্তারিত আলোচনা করতে চাচ্ছি এ কারণে যে, আধুনিক কম্পিউটারসহ যাবতীয় ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রে এটির ব্যবহার খুব বেশী।

স্বভাবে বেশ কিছু বস্তু পাওয়া যায় যারা সেমিকন্ডাক্টার হিসাবে স্বীকৃত। যেমন: সিলিকন, জার্মানিয়াম, সেলেনিয়াম, গ্যালিয়াম আর্সেনাইড, জিন্ক আর্সেনাইড এবং লেড টেলোরাইড। ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়াররা এসব বস্তুর মৌলিক এই গুণটিকে কাজে লাগিয়েছেন। বাস্তবে কক্ষ-তাপমাত্রায় সিলিকন একটি ইনস্যুলেটর। তার মধ্যদিয়ে খুব বেশী ইলেকট্রন চলন্ত হয় না। কিন্তু তাপমাত্রা বৃদ্ধি কিংবা আলোকরশ্মির মাধ্যমে একে কন্ডাক্টারে পরিণত করা যায়। সে তখন নিজের বন্ডের ভেলেন্স [বাইরের শেলের] ইলেকট্রন অতিরিক্ত এনার্জির চাপে মুক্ত করে দেয়। এখন সে একটি কন্ডাক্টার। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে সেমিকন্ডাক্টার মূলত একই সঙ্গে **'ইনস্যুলেটর ও কন্ডাক্টার'**। যে কোন মুহূর্তে সে কোন্ চরিত্রের অধিকারী তা নির্ভর করে তাপমাত্রা কিংবা আলোকরশ্মির উপর। সুতরাং ইলেকট্রিক্যাল সার্কেটে এই বস্তুটি ব্যবহার করা যায় **'সুইচ'** হিসাবে।

অপর আরেক উপায়ে সেমিকন্ডাক্টার বস্তুকে ইলেকট্রন বহনকারী কন্ডাক্টারে রূপান্তর করা যায়। এই প্রসেসকে বলে 'ডোপিং' [doping]। আসলে এর অর্থ কৃত্রিম উপায়ে কিছু বস্তু মূল সেমিকন্ডাক্টার বস্তুতে মিশানো। ফলে এটা পজিটিভ বা নেগেটিভ ইলেকট্রিসিটি বহনকারীতে রূপান্তর হয়। সাধারণত সিলিকন ক্রিস্টেলকে এভাবে ধনাত্মক (+) কিংবা ঋণাত্মক (-) ইলেকট্রিসিটি বহনকারী হিসাবে তৈরী করা হয়ে থাকে। এই উভয় ধরনের সেমিকন্ডাক্টার দ্বারা কৌশলে বিভিন্ন বস্তু তৈরী করা যায়। যেমন ডায়োড, ট্রানজিস্টার, পি-এন [+ এবং -] জাংশন লেইজার, রেক্টিফাইয়ার্স ইত্যাদি ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশ। আধুনিক যুগে কম্পিউটার হার্ডওয়ার তৈরীতে মাইক্রচীপ ব্যবহার হচ্ছে। মাইক্রচীপ মূলত কোটি কোটি ট্রানজিস্টার সম্বলিত সুইচিং যন্ত্র।

যাক, সাধারণ বিজ্ঞানের উপর এই বক্তৃতামালা। আমরা উচ্চ-প্রযুক্তির উপর বিচরণ করতে যাবো না। তবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশারাখি এটুকু বুঝতে সক্ষম হয়েছেন, কম্পিউটারসহ ইলেকট্রনিক্স সিস্টেমে সেমিকন্ডাক্টার বস্তুর গুরুত্ব কতো অপরিসীম।

২. তরল বস্তু [liquid]

আমরা ইতোমধ্যে পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে অস্তিত্বশীল **'কঠিন'** বস্তুর উপর বেশ কিছু আলোচনা করেছি। কক্ষ-তাপমাত্রায় অনেক বস্তু আছে যা তরল অবস্থায় বিরাজমান। প্রাণীদের বেঁচে থাকার মৌলিক উপাদান পানি। এটি সাধারণত তরল অবস্থায় থাকে। পৃথিবীর উপর তিন-তৃতীয়াংশব্যাপী শুধু পানি আর পানি। তবে একই সময়

পানি আরো দু'টি অবস্থায়ও বিদ্যমান। এই অবস্থা দু'টো হলো বরফ ও বাষ্প। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে পানি বরফ অবস্থায় আছে। মেঘমালায় বাষ্পাকারে পানির সার্বক্ষণিক বিচরণ হচ্ছে পুরো পৃথিবী-গোলকের বায়ুমণ্ডলে।

তরল পদার্থের মলিকিউলগুলো অনেকটা ঢিলেঢালা। কিন্তু গ্যাসের মতো একেবারে ফ্রি নয়। সঠিক তাপমাত্রা ও চাপে অধিকাংশ বস্তু তরল অবস্থা ধারণ করতে পারে। আমরা ইতোমধ্যে পানির কথা বলেছি। হিলিয়াম সাধারণ তাপ ও চাপমাত্রায় একটি গ্যাস। তাপমাত্রা খুব অল্পে নামানো হলে কিংবা চাপ বিরাট অঙ্কে বৃদ্ধি করলে এটা তরল হিলিয়ামে রূপান্তর হবে। সবার পরিচিত লোহা কক্ষ-তাপে একটি কঠিন পদার্থ। কিন্তু তার মধ্যে ১৫৩৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপ দিলে সে হয়ে যাবে তরল লৌহ। আমরা আগের লেকচারে পিরিওডিক টেবিলের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। স্বভাবে প্রাপ্ত মোট ৯২টি মৌলিক পদার্থের মধ্যে মাত্র তিনটি স্বাভাবিকভাবে তরল অবস্থায় থাকে। এ তিনটি হলো **ব্রোমাইড** [bromide], **গ্যালিয়াম** [gallium] ও **পারদ** [mercury]। বাকী সব মৌলিক পদার্থ হয় কঠিন না হয় বাষ্প হিসাবে অস্তিত্বশীল আছে।



অনেক কম্পাউন্ড [যুক্ত পদার্থ] তরল হিসাবে অস্তিত্বশীল। এ্যালকাহল, পেট্রোল, তৈল, পানি ইত্যাদি সবই তরল পদার্থ। আমরা এখন বস্তুর তিনটি অবস্থার এটোমিক ব্যাখ্যা তুলে ধরছি। ছাত্রবন্ধুদের প্রতি অনুরোধ, উপরের চিত্রটির দিকে খিয়াল করুন। এতে বস্তুর তিনটি অবস্থার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তরল বস্তু সকল বস্তুর মতো এটম কিংবা বন্ড-হওয়া এটম তথা মলিকিউলের তৈরী। বস্তুর মধ্যে এগুলো কিভাবে সাজানো আছে তা-ই নির্দিষ্ট করে কোন্ ফিজিক্যাল অবস্থায় তা বিদ্যমান। তরল বস্তুর মলিকিউল বাষ্পের তুলনায় অনেকটা এঁটেসেঁটে ও সুন্দরভাবে সাজানো। তবে কঠিন পদার্থের মলিকিউলের মতো এতো বেশী টাইট-ফিট বা সুন্দরভাবে সাজানো নয়।

২. ক. আন্তঃমলিকিউল ফোর্স

তরল পদার্থের ফিজিক্যাল বৈশিষ্ট্য অনেকটা নির্ভর করে 'ইন্টারমলিকিউলার ফোর্স'র উপর। একে বাংলায় আন্তঃমলিকিউল ফোর্স বলা চলো। মলিকিউল থেকে মলিকিউলে যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ বিদ্যমান তা-ই আন্তঃমলিকিউল ফোর্স। তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক, হিমাঙ্ক ও সারফেস টেনশন ইত্যাদি এই ফোর্সের উপর নির্ভরশীল। যে তাপমাত্রায়

বস্তু ফুটন্ত হয় তা-ই এ বস্তুর স্ফুটনাঙ্ক। যে তাপমাত্রায় হিমায়িত তথা বরফে পরিণত হয় তা-ই হলো বস্তুর হিমাঙ্ক। আর সারফেস টেনশন অর্থ তরল বস্তুর বহির্ভাগে সৃষ্ট শক্তি। নীচের চিত্রটি দেখুন। সারফেস টেনশনের ফলেই পানি বা অন্য কোন তরল পদার্থে 'ফোটা' ধরে। একই কারণে পানির উপর দিয়ে ছোট্ট পোকা-মাকড় দৌড়াতে সক্ষম হয়।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করতে হবে। মলিকিউল থেকে মলিকিউলে শুধু আকর্ষণ নয়। বিকর্ষণও আছে। আর এ কারণেই তরল ও কঠিন পদার্থের ভলিওম বা ঘনত্ব বলপূর্বক কমানো খুব কঠিন। তবে একই কথা গ্যাসের বেলা প্রযোজ্য নয়।

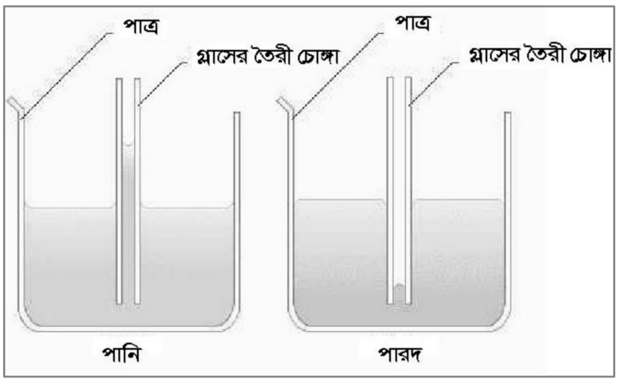
বস্তু স্ফুটনাঙ্ক বায়ুমণ্ডলের চাপের তারতম্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। চাপ কমলে স্ফুটনাঙ্কও কমবে। ধরুন পানির কথা। সাগর লেবেলে পানির স্ফুটনাঙ্ক [যে তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হয়] ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। একই লেবেলে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ এক **আথমোস্ফিয়ার** [atm]। তবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত হিমালয়ের উপর পানির স্ফুটনাঙ্ক ৩০ ডিগ্রী কম; ৭০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এর কারণ হলো সাগর লেবেল থেকে ২৯,০৩৫ ফুট উঁচু এই পর্বতের চূড়ায় বায়ুমণ্ডলের চাম মাত্র এক তৃতীয়াংশ।

বস্তুর **গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক** মূলত একই তাপমাত্রার দু'টি নাম। বরফ বা কঠিন অবস্থা থেকে তাপমাত্রা বাড়ানোর সময় ঠিক তরল হওয়ার মুহূর্তে যে তাপ বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান, তা-ই সাধারণত গলনাঙ্ক হিসাবে ধরা হয়। অপরদিকে তরল থেকে কঠিন তথা বরফে পরিণত করার সময় এই একই তাপমাত্রায় পৌঁছতে হবে। তখন এটাকে আমরা হিমাঙ্ক বলতে পারি। তরল থেকে বরফ হতে বস্তুর মলিকিউল আয়তনে ১০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পায়। তবে এই আইন পানি, তরল গ্যালিয়াম ও বিজমাথের বেলায় প্রযোজ্য নয়। বাস্তবে এসব বস্তু বরফ অবস্থায় তরল থেকে কম ঘন। আর এ কারণেই পানিতে বরফ ভাসে।

অন্যান্য গবেষণা

বিজ্ঞানীরা বস্তুর বিভিন্ন অবস্থার উপর আরো অনেক ধরনের গবেষণা করে থাকেন। আমরা এখানে কয়েকটির নাম বলবো মাত্র। অবশ্য খুব সংক্ষেপে ব্যাখ্যাও থাকবে।

ভিসকোসিটি: তরল অবস্থায় বস্তু ফ্লো বা গতিশীলতার কতটুকু বিরোধী তার হিসাবকে বলে ভিসকোসিটি। এই গতিশীলতার ফলেই তরল বস্তু তার পাত্রের আকার ধারণ করে থাকে। উচ্চ ভিসকাস-সম্পন্ন বস্তুর মলিকিউল খুব জটিলভাবে বিন্যস্ত থাকে। একটা আরেকটার সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে একে অন্যকে চলতে দিতে বাধার সৃষ্টি করে। পানির ভিসকোসিটি ভারী তেলের তুলনায় কম। তাই পানি তৈল থেকে বেশী গড়িয়ে চলে। ভিসকোসিটি তাপ বৃদ্ধির সাথে কমে আসে। এ সময় মলিকিউলগুলো অনেকটা মুক্তভাবে চলে।



ক্যাপিলারি একশন [পরীক্ষা]: আমার সামনে যে পানির পাত্রটি আছে এটির মাধ্যমে একটি সাধারণ পরীক্ষা করবো। আশা করছি এই ছোট্ট কাচের টিউবটি পাত্রের মধ্যে ঢুকালে কিছুটা পানি উপরের দিকে উঠে আসবে। তাহলে দেখে নিই ...। হ্যাঁ, এই দেখুন। পাত্রের পানির লেবেল থেকেও উপরে উঠে এসেছে কিছু পানি টিউবের ভেতর দিয়ে। একই পাত্রে এবার এই টিস্যু পেপার সামান্য ঢুকাবো। লক্ষ্য করুন, এবারও কিছু পানি কাগজ বেয়ে উপরে উঠেছে। এই ক্রিয়ার নামই

ক্যাপিলারি একশন। বায়ের চিত্রটি দেখুন।

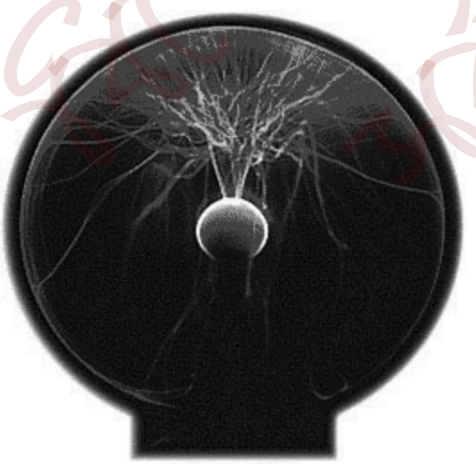
প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে কেন হয়? পানির মধ্যে কোন্ শক্তি সক্রিয় আছে? তরল পদার্থের নিজস্ব মলিকিউলের মধ্যে একটি আকর্ষণ শক্তি আছে। অপরদিকে কঠিন পদার্থের মলিকিউলগুলোর মধ্যে আকর্ষণ শক্তি থাকলেও তার মাত্রা ভিন্ন। এই পার্থক্যের ফলেই ক্যাপিলারি একশন ক্রিয়া সংঘটিত হয়। অন্যকথায় তরল পদার্থের মলিকিউল কঠিন পদার্থের মলিকিউলকে অধিক আকর্ষণ করে। তাই মলিকিউলগুলো একটু এগিয়ে যেয়ে মিশে। অর্থাৎ একটু এগিয়ে যেয়ে আলিঙ্গন- এই যা!

আমাদের নিকট বিষাক্ত পারদ নেই। উপরের ছবিতে [ডানে] ক্যাপিলারি একশনের উল্টো ক্রিয়া চিত্রিত হয়েছে। পারদের মধ্যে যখন কাচের টিউব ঢুকানো হয় তখন টিউবের ভেতরের পারদ উপরের দিকে না ওঠে নীচের দিকে নামবে! এ ক্ষেত্রে পারদের মলিকিউলের মধ্যে নিজেদের আকর্ষণ কাচের টিউবের মলিকিউলের আকর্ষণের তুলনায় বেশী। উল্টো এই ক্যাপিলারি একশনের জন্য এটাই দায়ী।

মিস্‌সিবিলিটি [মিশে যাওয়ার ক্ষমতা]: বন্ধুরা! পানির উপর তৈল ভাসতে সবাই দেখেছেন। বলতে পারবেন কেন? এক্ষুণি জবাবটি জেনে নেবো। বিভিন্ন তরল পদার্থ একত্রিত হলে কতটুকু মিশবে তার মাপকে বলে মিস্‌সিবিলিটি। অর্থাৎ মিশে যাওয়ার ক্ষমতা। মলিকিউল থেকে মলিকিউলে আকর্ষণ দু' ধরনের: ১. মেরুভিত্তিক ও ২. অমেরুভিত্তিক। প্রথম ধরনের বন্ডে মলিকিউলের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দিক আকর্ষিত হয়। এটা শক্ত বন্ড। দ্বিতীয় ধরনের বন্ড অনেকটা দুর্বল। কারণ এই বন্ডের মূলে ইলেকট্রনিক্স আকর্ষণ নেই।

ভিন্ন তরল পদার্থ সহজে মিশে যাবে যদি তাদের মলিকিউলার বন্ড একই ধরনের হয়। সুতরাং পনি ও এ্যালকাহলে মিশ্রণ ঘটে এ কারণে যে, উভয়টির মলিকিউলে পোলার [মেরুভিত্তিক] বন্ড বিদ্যমান। কিন্তু পানির সঙ্গে তৈল মিশবে না। বরং তৈল পানির উপর ভাসতে থাকে। এর কারণ হলো তৈল একটি নন-পোলার তরল পদার্থ। ভাসমান হওয়ার কারণ হলো, পানির পোলার মলিকিউলগুলো তৈলের তুলনায় একে অন্যের সঙ্গে অনেক বেশী আকর্ষিত। মিশ্রণের আইন হলো, **"জাতে জাতে মিশ্রণ"**। উভয়টি পোলার হলে মিশবে এবং উভয়টি নন-পোলার হলেও মিশবে। ভিন্ন হলে মিশবে না।

প্রিয় সন্ধানী বন্ধুরা! স্বভাবে প্রাপ্ত বস্তুর তিনটি সাধারণ অবস্থার উপর আমরা এতোক্ষণ আলোচনা করলাম। বস্তুর কঠিন, তরল কিংবা বাষ্প অবস্থায় বিরাজমান। তবে শুরুতে বলেছি বস্তুর আরেকটি স্টেট বা অবস্থা আছে। এটার নাম প্লাজমা। নীচে খুব সংক্ষেপে এই স্টেটের উপর আলোচনা করে আজকের লেকচারের ইতি টানবো।



প্লাজমা বল: শক্তিশালী ইলেকট্রিক কারেন্ট এ গ্যাস বলের কেন্দ্রে সৃষ্টি করেছে প্লাজমা।

৪. প্লাজমা অবস্থা [plasma]

অনেকের মতে এটা বাষ্পীয় অবস্থার একটি উপ-অবস্থা। অর্থাৎ প্লাজমা মূলত গ্যাস- তবে এতে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। প্লাজমা গ্যাসের এটম কিংবা মলিকিউল আয়োনাইজ্‌ড [ionized] অবস্থায় থাকে। ছাত্রবন্ধুরা, নিশ্চয়ই আয়োনাইজ অর্থ বুঝতে পারছেন। এরপরও আবার বলে দিচ্ছি। সব বস্তুর এটম কিংবা মলিকিউল হয় নিউট্রেল না হয় চার্জসম্পন্ন থাকে। চার্জসম্পন্ন অবস্থার নামই আয়োন।

প্লাজমার মধ্যে আছে চার্জহীন নিউট্রেল কণা, + আয়োন ও − আয়োন। প্লাজমা ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টার। পৃথিবীর বুকে স্বাভাবিকভাবে প্লাজমা বিরাজ করে না। তবে সূর্যসহ যাবতীয় তারার ভেতরে প্লাজমা অবস্থায় বস্তু বিদ্যমান। এর কারণ হলো উচ্চ

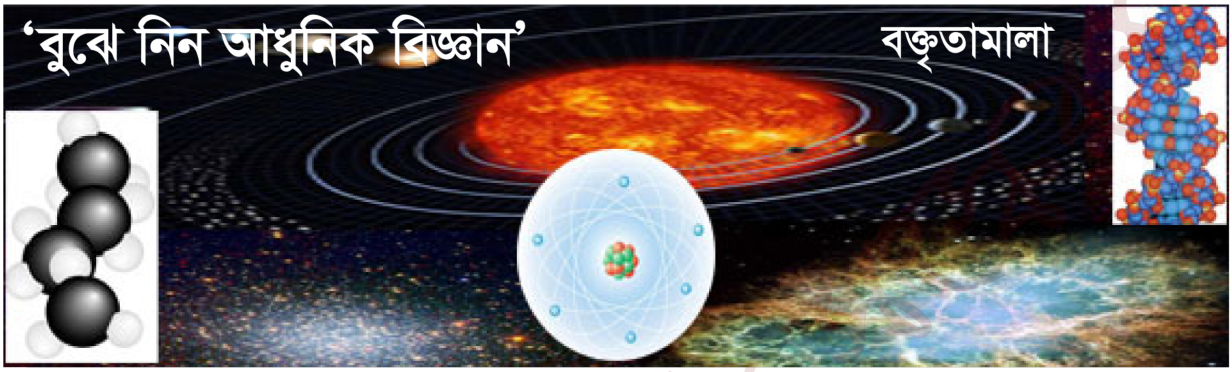
তাপমাত্রা। প্লাজমা অবস্থা ধারণের আরেক কারণ হলো তেজস্ক্রিয়া। পৃথিবীর ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে **আয়োনোস্ফিয়ার** [ionosphere] নামক একটি স্তর আছে। বুঝতেই পারছেন, এই স্তরের গ্যাস মূলত আয়োন অবস্থায় বিদ্যমান। অর্থাৎ চার্জ-হওয়া গ্যাস। এই স্তরকেও প্লাজমা বলা চলে। কৃত্রিম উপায়ে আমরা সর্বদা প্লাজমা তৈরী করে থাকি। যেমন, নিওন বাতি ও ফ্লোরেসেন্ট টিউব বাল্ব। অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রায় প্লাজমার কণায় সৃষ্টি হয় যথেষ্ট পরিমাণ এনার্জি। ফলে এরা উচ্চ গতিতে ছুটোছুটি করতে থাকে। একে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় শুরু হয় নিউক্লিয়ার রিয়েকশন। এরূপ **'ফিউশন'** রিয়েকশনই সূর্য ও সকল তারার কেন্দ্রে সংঘটিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে।

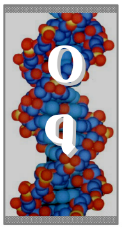
ফিউশন রিয়েকশন থেকে বিরাট মাত্রার এনার্জি বেরিয়ে আসে। উজ্জ্বল জ্বলন্ত সূর্য এর প্রমাণ। কিন্তু ফিউশন রিয়েকশন পৃথিবীতে কৃত্রিম উপায়ে ঘটানো খুব কঠিন। বিজ্ঞানীরা বহুদিন যাবৎ এই ফিল্ডে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। অনেকে মনে করেন বর্তমান শতকের কোন এক সময় নিয়ন্ত্রিত ফিউশন রিয়েকশনের মাধ্যমে ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন হবে। আমরা অপেক্ষায় রইলাম। সেসাথে আগামী লেকচারে সবাইকে আবারো স্বাগত জানাতে অপেক্ষায় থাকবো আমি। আমরা তখন বিজ্ঞানের মূল একটি শাখা 'পদার্থবিজ্ঞান'-এ পদার্পণ করবো। তলিয়ে দেখবো আধুনিক বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারসমূহ। আল্লাহ হাফিজ।



বস্তুর সৃষ্ট মহাবিশ্বঃ পেঁচানো গ্যালাক্সি এম-৩১। পৃথিবী থেকে ২২ লক্ষ আলোক-বৎসর দূরে অবস্থিত বিরাট তারামণ্ডল এম-৩১ [অপর নাম আন্ড্রমেডা গ্যালাক্সি]। এর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব ২ লক্ষ আলোক-বৎসর। আমাদের 'ছায়াপথ' মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি ও এম-৩১ প্রায় একই ধরনের। তুলনামূলক কাছে থাকায় মহাকাশ বিজ্ঞানীরা একে নিয়ে গবেষণা করেন খুব বেশী। সকল গ্যালাক্সির আসল সদস্যরা হলো তারা। এম-৩১ গ্যালাক্সিতে অন্তত ৩ থেকে ৪ হাজার কোটি তারা আছে। গ্যালাক্সির মধ্যে তারারাও বিভিন্ন দলে বিভক্ত। যেমন: **গ্লোবুলার ক্লাস্টার ও অপেন ক্লাস্টার**। এছাড়া গ্যালাক্সিতে আছে **নিউট্রন তারা, বামন তারা, লাল জায়ান্ট, সুপারজায়ান্ট, ব্ল্যাক হোল** ইত্যাদি। সন্ধানী বন্ধুদের নিকট এসব শব্দ অদ্ভুত, অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য লাগা স্বাভাবিক। ভাবনার কারণ নেই। এই কোর্সের এক পর্যায়ে সবই উন্মোচন হবে। ধৈর্য ধরুন। ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত হন। মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচনই আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

খ. পদার্থবিজ্ঞান : বস্তুজগতের মিথস্ক্রিয়া

বক্তৃতা ৭ : চার-শক্তির নিয়ন্ত্রণে সকল বস্তু

প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! আস্‌সালামু আলাইকুম। 'বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান' শীর্ষ বক্তৃতামালায় সবাইকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি। এটা সপ্তম বক্তৃতা। ইতোমধ্যে আমরা বস্তুর মৌলিক গঠনপ্রণালী সম্পর্কে বেশ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছি। আমরা জেনেছি কিভাবে এ পর্যন্ত জানা ক্ষুদ্রতম কণা 'ক্যুয়ার্ক' থেকে অণুর কেন্দ্রীয় পরমাণু প্রটন ও নিউট্রন তৈরী হয়েছে। এরপর একাধিক অণুর সমন্বয়ে বিভিন্ন ধরনের বন্ড ও মলিকিউলের গঠনপ্রণালী নিয়ে আলোচনা করেছি। স্বভাবে প্রাপ্ত মৌলিক পদার্থ তথা ইলেমেন্ট ও যুক্ত পদার্থ তথা কম্পাউন্ড নিয়েও বিস্তর বর্ণনা এসেছে। বস্তুর চারটি অবস্থা যেমন: কঠিন, তরল, বাষ্প ও প্লাজমা নিয়েও তথ্যমূলক আলোচনা হয়েছে। আমি অত্যন্ত আশাবাদী, অতি সহজে ব্যাখ্যায়িত এসব ব্যাপার আপনারা বুঝে নিয়েছেন। আর যদি এখনো সন্দেহে থাকেন, চিন্তা করবেন না- অচিরেই সকল সন্দেহ থেকে মুক্ত হবেন।

যাক, অতীতে আলোচিত বিভিন্ন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত এই উক্তি শেষে এবার পদার্পণ করবো বিজ্ঞানের এক মৌলিক বিষয়ের উপর- পদার্থবিজ্ঞান। শ্রোতা বন্ধুরা! কোন চিন্তার কারণ নেই। পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত কঠিন গণিত শাস্ত্র আমরা যদ্দূর সম্ভব এড়িয়ে যাবো। আমি বলেছি, যদ্দূর সম্ভব, এর কারণ হলো- কিছু ব্যাপার আছে বুঝার জন্যও এক দু'টো সাধারণ অঙ্কের রেফারেন্স এড়ানো অসম্ভব। তবে সত্যিই সাধারণ পর্যায়ে থাকবে গণিতের উপর আমাদের বিচরণ- উচ্চ পর্যায়ের কিছু নয়।

বাস্তবে ইতোমধ্যে যে ৫টি লেকচার হয়েছে তা-ও পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত এই শাখাকে বলে পরমাণু বিজ্ঞান। আমি এসব অত্যাধুনিক নামকরণ এড়িয়ে গিয়েছি। এসব শোনলে হয়তো আমাদের মতো সাধারণ বিজ্ঞানান্বেষীদের আগ্রহে ভাটা পড়ে যাবে! ঠিক কি না? যাক, এবার আজকের বক্তৃতার মূল বিষয়ে আসা যাক।

১. চার-শক্তি : নামকরণ ও সংজ্ঞা

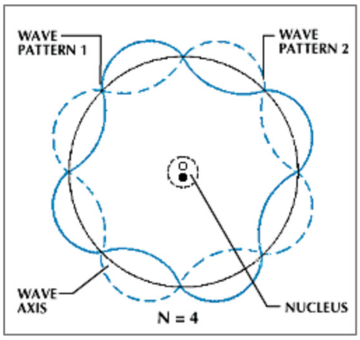
জগৎ-সৃষ্টির পর পুরো মহাবিশ্ব কিছু মৌলিক ফিজিক্যাল আইন-কানুন মেনে চলছে। নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে যেভাবে সবকিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করছে সেভাবে করার ইচ্ছা বলতে হবে, সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **'বস্তুতে বস্তুতে মিথস্ক্রিয়া'** [interaction of matter] ছাড়া জগৎ পরিচালনা অসম্ভব। কিন্তু এই মিথস্ক্রিয়া নির্দিষ্ট কিছু আইনের আওতাভুক্ত রেখে নিয়ন্ত্রণাধীন না থাকলে বিরাট সমস্যা দাঁড়াবে। তা-ই মৌলিক কিছু শক্তি বা বল তৈরী করা হয়েছে যার আওতাভুক্ত থেকে বস্তুর মধ্যস্থ যাবতীয় ইন্টারেকশন সংঘটিত হবে। বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা শেষে মোট চারটি এরূপ মৌলিক শক্তির সন্ধান পেয়েছেন। এগুলো কিভাবে বস্তুর মধ্যে ক্রিয়া করে তা জানা গেলেও কেনো এগুলো তৈরী হয়েছে, তা বিজ্ঞান জানে না। আসলে জানার কোন উপায়ও নেই। শুধু এটুকু বলা চলে, এই শক্তি চতুষ্টয় সৃষ্টি হয়েছে মহাবিশ্বকে অস্তিত্বশীল, পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও নিয়ন্ত্রণ রাখতে। আমরা এখন এই শক্তি চতুষ্টয়ের বাংলা এবং ইংরেজী নামকরণ, সংজ্ঞা ও কার্যকারিতা অতি সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

১. ক. বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় শক্তি [electromagnetic force]

এই শক্তির কারণেই ইলেকট্রিক্যাল চার্জ [ধনাত্মক ও ঋণাত্মক] এর মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ সৃষ্টি হয়। আলোকরশ্মি ও বস্তুর রসায়নিক চরিত্রও এই শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে। বস্তুর এটম থেকে সৃষ্ট এই ফোর্সের কারণেই আমরা রেডিও, এক্স-রে, মাইক্রওয়েভ ইত্যাদি সম্পর্কে জেনেছি ও কাজে লাগাচ্ছি। আধুনিক টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেটসহ যাবতীয় সিগনাল-সর্বস্ব তথ্য বিপ্লবের মূলে যে শক্তিটি কাজ করছে তা-ই হলো ইলেকট্রমেগনেটিক ফোর্স। নামকরণ থেকেই বুঝা যায়, শক্তিটির সঙ্গে ইলেকট্রিসিটি ও চুম্বকীয়তা জড়িত।

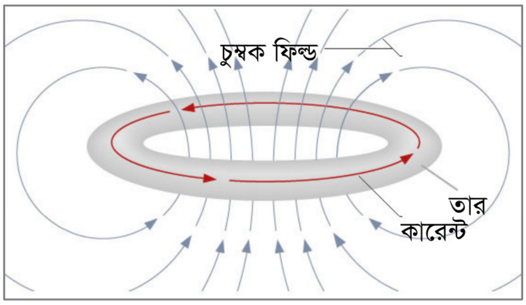
আমরা এখন একটা পরীক্ষা করবো। সবাই প্লাস্টিকের চিরুনি দ্বারা মাথা আঁচড়ান। এরপর টেবিলে রাখা কাগজের টুকরোগুলোর নিকটে চিরুনিটি নিন। দেখুন তো, কিভাবে কাগজের টুকরোগুলো লাফ মেরে চিরুনিকে ধরছে বা ধরার চেষ্টা করছে। পরীক্ষার এখানেই সমাপ্তি। আমরা কী দেখলাম? চিরুনি চুলের সাথে ঘর্ষণের ফলে চার্জসম্পন্ন হয়েছে। তাই কাগজকে আকর্ষণ করেছে। এই ক্রিয়ার কারণ হলো বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় শক্তি। এই ফোর্সের কারণে অণুর পজিটিভ চার্জসম্পন্ন নিউক্লিয়াস নেগিটিভ চার্জসম্পন্ন ইলেকট্রনকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে।

চার্জসম্পন্ন বস্তু যতো কাছে আসবে ইলেকট্রমেগনেটিক শক্তিও ততো বৃদ্ধি পাবে। আমরা বলেছি ইলেকট্রনকে কেন্দ্র আকর্ষণ করে। বিজ্ঞানীরা বহুদিন যাবৎ প্রশ্ন করে আসছিলেন, কোন্ কারণে ইলেকট্রন কেন্দ্রে যেয়ে পতিত হয় না? অবশেষে জানা গেল, ইলেকট্রন শুধু কণা নয়, তরঙ্গ হিসাবে সক্রিয়। আর এই চরিত্র থাকার ফলেই ইলেকট্রন নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখে। নীচের চিত্রটি দেখুন।



বস্তুর মধ্যে চারটি শক্তি একত্রে ক্রিয়া করে। সুতরাং যে কোন একটি শক্তির পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা একককভাবে দেওয়া যায় না। অন্যান্য শক্তি মিলেই বস্তুর মধ্যে ব্যালান্স ও সামঞ্জস্যতা সৃষ্টি করে। আমরা বলেছি, ইলেকট্রমেগনেটিক শক্তি এটমের নিউক্লিয়াসের দিকে ইলেকট্রনগুলোকে আকর্ষিত করে। এই শক্তিটি মূলত চার্জসম্পন্ন কণার মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ ক্রিয়ার সূত্র। অর্থাৎ দু'টি ঋণাত্মক কিংবা ধনাত্মক কণার মধ্যে সৃষ্টি হয় বিকর্ষণ, অপরদিকে দু'টি বিপরীত চার্জসম্পন্ন কণার মধ্যে থাকে আকর্ষণ। এখন, নিউক্লিয়াসে একাধিক প্রটনে পজিটিভ চার্জ বিদ্যমান। সুতরাং প্রটন একটা আরেকটাকে দূরে ঠেলে দেওয়ার কথা। কিন্তু নিম্নে

আলোচিত সবল আনবিক শক্তি এসে এ অবস্থার অবসান ঘটায়। সৃষ্টি করে এটমের নিউক্লিয়াসে ব্যালান্স।



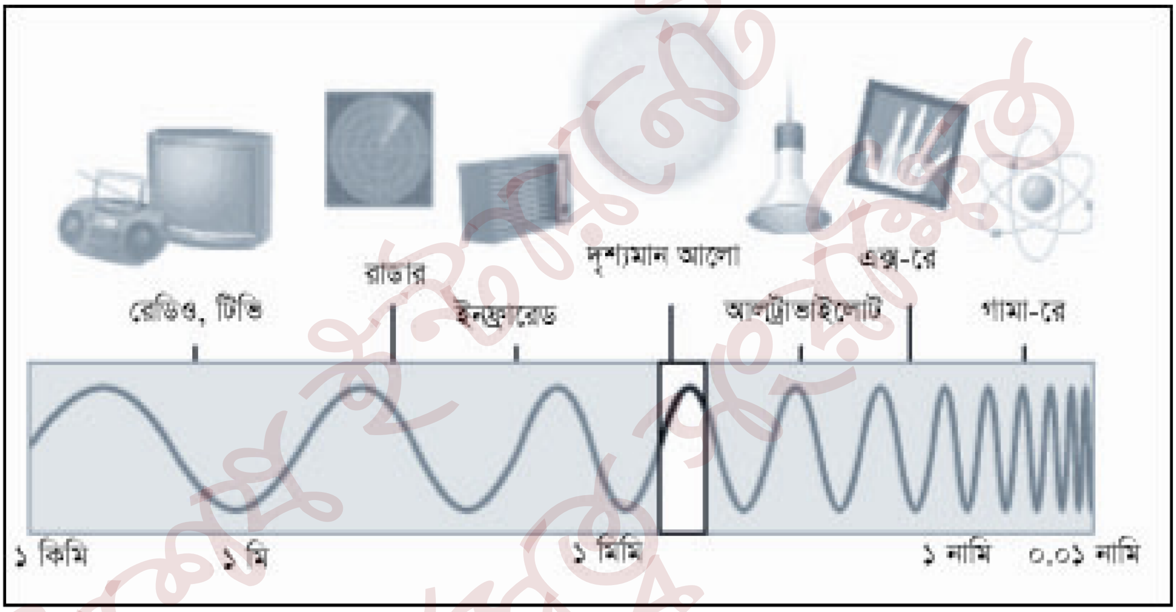
ইলেকট্রমেগনেটিক শক্তির ব্যবহার

আধুনিক প্রযুক্তিতে এই শক্তিটি সর্বাধিক কাজে লাগানো হচ্ছে। এনার্জি প্রতিস্থাপন প্রকৌশল বিজ্ঞানের একটি মৌলিক দিক। আর এনার্জি সম্পর্কে একটি আইন সর্বত্র কার্যকর: এনার্জি সৃষ্টি করা যায় না, ধ্বংসও হয় না- শুধুমাত্র এক অবস্থা থেকে অপরটিতে রূপান্তর সম্ভব। আর এই রূপান্তর 'প্রযুক্তি'র মাধ্যমে ঘটিয়ে মানবকল্যাণে এনার্জি ব্যবহৃত হয়। একটা দৃষ্টান্ত হলো ইলেকট্রিসিটি। আপনি ইলেকট্রিসিটি প্রডাকশনের চীফ ইঞ্জিনিয়ার। রসায়নিক বস্তু যেমন কয়লা, পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল, ইত্যাদি একটি জেনারেটরে জ্বালানি হিসাবে আপনি কাজে লাগিয়ে রসায়নিক এনার্জি বের করলেন। এখন রসায়নিক দ্রব্যের এই এনার্জিকে প্রযুক্তির মাধ্যমে জেনারেটর ঘুরানোর জন্য কাজে লাগালেন। এখানে জ্বালানির মধ্যে মওজুদ রসায়নিক এনার্জিকে জেনারেটর ঘুরানো তথা মেকানিক্যাল [কিনেটিক] এনার্জিতে রূপান্তর করলেন। তবে জেনারেটর ঘুরিয়ে তো কোন লাভ নেই। এবার এই মেকানিক্যাল এনার্জিকে ইলেকট্রিকেল এনার্জিতে রূপান্তর প্রয়োজন। এভাবে আপনি কয়লা বা তৈলে মওজুদ এনার্জিকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে 'রূপান্তর' করলেন মাত্র। আপনি কোন এনার্জি সৃষ্টি করেন নি। আশারাখি বিষয়টি আপনাদের বুঝে এসে গেছে। আমরা পরবর্তী কোন লেকচারে এনার্জির উপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ। ও হ্যাঁ, বর্ণিত পদ্ধতিতে এনার্জি রূপান্তর মূলত ইলেকট্রমেগনেটিক শক্তির আওতাভুক্ত একটি ক্রিয়া।

আগেই বলেছি রেডিও, এক্স-রে, তেজস্ক্রিয়া, আলো ইত্যাদি সবই ইলেকট্রমেগনেটিক শক্তির কারণে সৃষ্টি হয়। উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট, আমরা প্রযুক্তির মাধ্যমে এনার্জি রূপান্তর করি। এই রূপান্তর ছাড়া এনার্জি কাজে লাগানো যায় না। সাধারণত এনার্জি রূপান্তর তিনটি পদ্ধতিতে সম্ভব: **১. বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তেজস্ক্রিয়া [ইলেকট্রমেগনেটিক রেডিয়েশন], ২. পরিচলন [কন্ডাকশন] ও ৩. সঞ্চলন [কনভেকশন]**। শেষোক্ত দু'টির জন্য **'মিডিয়াম'** [মাধ্যম] হিসাবে প্রয়োজন বস্তুর। নীচের চিত্রটি দেখুন।



ইলেকট্রিসিটি পরিচলনের জন্য তামার তার [অর্থাৎ কন্ডাক্টার] এবং তাপ প্রতিস্থাপনে প্রয়োজন লৌহদণ্ড ইত্যাদি। কিন্তু ইলেকট্রমেগনেটিক তেজস্ক্রিয়ার জন্য কোন মিডিয়াম বা মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। এটা শূন্যস্থানের উপর চলতে পারে। বরং শূন্যস্থানের উপর এর চলার গতি সর্বোচ্চ। এই গতি হলো ১,৮৬, ২৭২ মাইল প্রতি সেকেন্ড। একে আলোকের গতি বলে। এই গতি স্বাধীন। অর্থাৎ এনার্জি-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য, সেকেন্ডে ক'টি তরঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে কিংবা কোন উপায়ে তরঙ্গ তৈরী করা হয়েছে [wavelength, frequency, propagation method] এসব ব্যাপার আসে যায় না- সে সর্বদাই আলোকের গতিতে চলে। ইলেকট্রমেগনেটিক সিগন্যালের এই মৌলিক গুণকে কাজে লাগিয়ে আমরা পৃথিবীব্যাপী একই সঙ্গে **'সরাসরি'** টিভি সম্প্রচার অবলোকন করতে পারি। অপরদিকে দূর-দূরান্তে অবস্থিত তারা থেকে পৃথিবীতে আলোকরশ্মি আসে। ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রাম বা রেডিয়েশনের একটি চিত্র নীচে অঙ্কন করেছি। দেখুন, কিভাবে এনার্জি চলন্ত হয় এবং মানুষ তা কাজে লাগাচ্ছে।

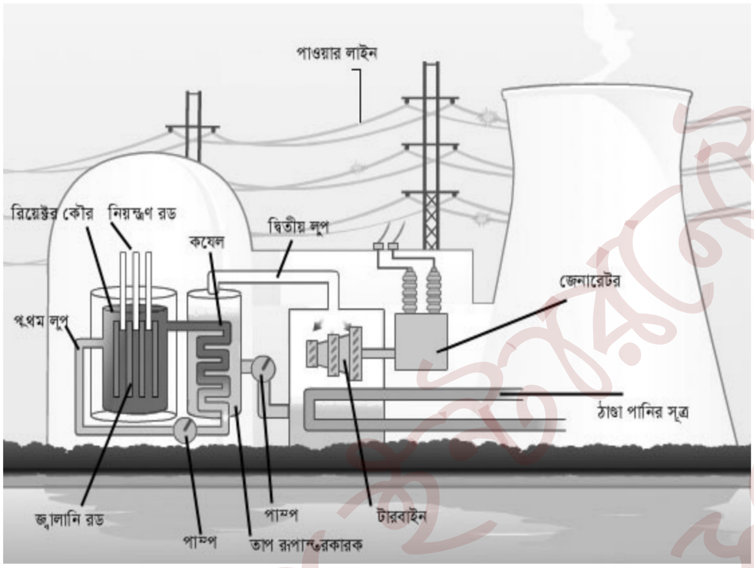


১. খ. সবল আনবিক শক্তি [strong nuclear force]

মৌলিক কণার মধ্যে এই শক্তিটি ক্রিয়াশীল। প্রটন ও ইলেকট্রন নামক পরমাণু দ্বারা এটমের কেন্দ্র গঠিত। সবল আনবিক শক্তিই উভয়টিকে যুক্ত রাখে। এই শক্তিটি বিরাট। যখন কোন উচ্চ এনার্জিসম্পন্ন কণা নিউক্লিয়াসে হানা দেয় তখন এই শক্তির কারণেই সৃষ্টি হয় নতুন আনবিক কণা। সবল হলেও এ ফোর্সের প্রভাব খুব সীমিত। অণুর কেন্দ্রে যদি খুব বেশী প্রটন থাকে তাহলে দূরতম প্রটন ও নিউট্রনে এই শক্তির প্রভাব অত্যল্প পড়ে। মোটকথা সবল শক্তি খুব বেশী ক্ষমতাশীল এটমের নিউক্লিয়াসে। এই শক্তিই আনবিক প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী। তারার কেন্দ্রে ফিউশন ও কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট ফিশন প্রতিক্রিয়ার কারণ এই শক্তি।

ইতোমধ্যে বলেছি, এই শক্তিটিই ইলেকট্রমেগনেটিক শক্তি থেকে সৃষ্ট বিকর্ষণকে বাধাদান করে। কিন্তু এ শক্তি প্রটনকে স্বস্থানে ধরে রাখতে যথেষ্ট নয়। অন্য কোন কণা থেকে অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন। যে কণাটি এ শক্তি যোগান দেয় সেটি হলো নিউক্লিয়াসের অপর চার্জহীন নিউট্রন পরমাণু। নিউট্রনে চার্জ না থাকায়ই সে ইলেকট্রমেগনেটিক ফোর্সের প্রভাব থেকে মুক্ত- যা নিউক্লিয়াসকে স্থিতিশীল রাখতে জরুরীও বটে।

অণুর কেন্দ্রে পদার্থবিজ্ঞানীদের বিচরণ খুব বেশিদিনের নয়। এর উপর গবেষণা অব্যাহত আছে। ভবিষ্যতেও থাকবে। সবল আনবিক শক্তি সম্পর্কে এ পর্যন্ত জানা তথ্যের উপর নির্ভর করেই মানুষ সৃষ্টি করেছে প্রলয়ঙ্করী এটম, হাইড্রোজেন ও নিউট্রন বোমা। 'পরমাণু এনার্জি' সৃষ্টির পরমাণু চুল্লী থেকে তৈরী হচ্ছে মোটা অঙ্কের ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। নীচের চিত্রটি দেখুন। অণুর কেন্দ্রের সবল আনবিক শক্তিকে মানুষ নিয়ন্ত্রিত উপায়ে আরো বেশী কাজে লাগানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখবে- এতে সন্দেহ নেই।



১. গ. দুর্বল আনবিক শক্তি [weak nuclear force]

নামকরণ থেকেই এর অর্থ অনেকটা বোধগম্য। এই শক্তি আনবিক স্কেলে সক্রিয়। এটা উপরে আলোচিত ইলেকট্রমেগনেটিক ও সবল শক্তি থেকে অনেকটা দুর্বল। তবে দুর্বল হলেও পুরো এটমে তার প্রভাব বিদ্যমান। অর্থাৎ কেন্দ্রের প্রটন ও নিউট্রন এবং বাইরের ইলেকট্রনেও সে সক্রিয়। অপরদিকে ইলেকট্রমেগনেটিক শক্তি সক্রিয় শুধুমাত্র ইলেকট্রন ও প্রটনে আর সবল শক্তি শুধুমাত্র কেন্দ্রের নিউট্রন ও প্রটনে ক্রিয়া করে। যখন কোন নিউক্লিয়াসে অতিরিক্ত প্রটন এসে হানা দেয় কিংবা প্রয়োজনের বেশী প্রটন অবস্থান করে তখন সবল শক্তি সক্রিয় হয়ে পুরো নিউক্লিয়াসকে আরো এঁটে দিতে চায়। অর্থাৎ ছোট্ট করার চেষ্টা চালায়। এ সময় এই দুর্বল শক্তি উদ্ধারকারী হিসাবে কাজে লেগে যায়। সে এক ধরনের কণা অন্যটিতে রূপান্তর করে দেয়।

সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে এই শক্তিটিও অন্যদের মতো গুরুত্বহ। এটমকে স্থিতিশীল রাখতে সে কাজ করে। দুর্বল শক্তির প্রতিক্রিয়া বুঝানো এ লেকচারে আদৌ সম্ভব নয়। বাস্তবে বুঝানোর চেষ্টাও সফল হবার নয়। তবে আমরা এটুকু বলতে পারি, স্বভাবের চার শক্তির একটি হলো এই ফোর্সটি। এটা অণু-পরমাণুর ক্ষেত্রে সক্রিয়। পুরো এটম-অতএব, বস্তুকে স্থিতিশীল রাখতে এ শক্তিটিও অপর তিনটির সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় জড়িত। এখন আমরা যে শক্তিটির উপর আলোচনা করবো তার প্রভাব থেকে কেউ মুক্ত নন। চতুর্থ এই শক্তির নাম মহাকর্ষ।

১. ঘ. মহাকর্ষ শক্তিঃ [gravitational force]

জগতে সবচেয়ে সক্রিয়, প্রভাবিত, সচরাচর অনুভূত, গ্রহ-উপগ্রহ, তারা, গ্যালাক্সি ইত্যাদি মহাবিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে যে শক্তিটি নিয়ন্ত্রণ করে তার নাম মহাকর্ষ [gravity]। এই শক্তির মূল বৈশিষ্ট্য হলো সকল বস্তুতে একে অন্যের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি। আপনি, আমি এ আকর্ষণ শক্তির কবলে থাকায়ই পৃথিবীর জমিনে চলতে ফিরতে পারছি। অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে সর্বদা একটি টান–শক্তি বিদ্যমান। ফলে আমরা পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে 'উপরের দিকে পড়ে যাচ্ছি না!' পৃথিবী গোলাকার। বাস্তবে বলের মতে গোলক। এটি সবকিছুর মতো মহাকাশে ভাসমান। মহাকর্ষের কারণে সে সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরে আর এই একই কারণে তার মধ্যস্থ সকল বস্তুর মধ্যে কেন্দ্রের

দিকে একটি টানশক্তি কাজ করছে। আমরা মহাকর্ষের উপর এই লেকচারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো মাত্র। তবে আশাকরি এ থেকেই শ্রোতারা স্বভাবের চতুর্থ এই শক্তিটির স্বরূপ বুঝতে সক্ষম হবেন।

মহাকর্ষ [gravitation] ও **মধ্যাকর্ষণ** [gravity] শব্দ দু'টো সামর্থবোধক। এদের অর্থে সামান্য ব্যবধান আছে। প্রথমটি সাধারণ অর্থে ও দ্বিতীয়টি পৃথিবীর উপর এ শক্তির প্রভাব বুঝায়। তবে আমরা উভয়টি উভয় অর্থেই ব্যবহার করবো। বুঝে এসেছে? যাক, এবার জেনে নিই শক্তিটি আসলে কী?

দু'টি থিওরীর মাধ্যমে এটি বুঝানো যায়। প্রথমটি ক্লাসিক্যাল ও দ্বিতীয়টি আধুনিক। কোনটির প্রতি আপনাদের আগ্রহ? বলবেন, আধুনিক নিশ্চয়ই। বাস্তবে সূক্ষ্মতার দিক থেকে আধুনিকটা বেশী যথার্থ। আর সাধারণভাবে বুঝার জন্য ক্লাসিকটাই যথেষ্ট। আমরা সংক্ষেপে উভয়টি নিয়েই আলোচনা করবো।

ক্লাসিক্যাল থিওরী

আইজাক নিউটন [১৬৪২-১৭২৭] নামক এক ব্যক্তি আজ থেকে সোয়া তিন শতাধিক বৎসর পূর্বে ইংল্যান্ডের কোন এক গ্রামের একটি আপেল গাছের নীচে বসা ছিলেন। হঠাৎ গাছ থেকে একটি পাকা আপেল তার মাথায় পতিত হলো! উহ্! বেশ ব্যথা লাগলো। নিউটন মাথায় নিজেই হাত বুলালেন এবং ভাবতে লাগলেন কেন, এভাবে ব্যথা লাগার কারণ কি? কোন্ কারণে আপেলে এতো শক্তি আসলো? ইত্যাদি প্রশ্ন করতে করতে তিনি **'মহাকর্ষ'** কি জিনিষ তার উপর গবেষণা চালালেন। তার এই গবেষণা থেকেই জন্ম নিলো, মহাকর্ষের ক্লাসিক থিওরী।

এই থিওরী বলে: **'জগতের প্রত্যেক বস্তু অপর প্রত্যেক বস্তুকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ শক্তি নির্ভরশীল উভয় বস্তুর মোট জড়মাত্রা [ম্যাস], ও দূরত্বের উপর।'** একটি গাণিতিক সমীকরণ দ্বারা এই শক্তির মাত্রা বের করা যায়, যথা: $\mathbf{F= GMm/d^2}$। অক্ষরগুলো ইংরেজীই রেখে দিলাম। প্রতিটি অক্ষরের অর্থা এই: F = মহাকার্ষিক শক্তি; G = একটি অপরিবর্তনশীল সংখ্যা যাকে **'ইউনিভার্সাল কন্সস্টেন্ট অব গ্রাভিটেশনেল ফোর্স'** বলে; M ও m হলো যথাক্রমে উভয় বস্তুর ম্যাস [জড়মাত্রা]; এবং d = উভয় বস্তুর মধ্যে দূরত্ব। এখন ইউনিভার্সাল কন্সস্টেন্ট অব গ্রাভিটেশন কি হতে পারে? অনেক পরীক্ষা-নীরিক্ষা শেষে বর্তমানে গ্রহণযোগ্য মান হলে **৬.৬৭০ x ১০^-১১ N-m²/kg²**। লক্ষ্য করুণ এই সংখ্যাটি খুব ছোট্ট। বাস্তবে তা ০.০০০০০০০০০০০৬৬৭০। এ কারণেই খুব বড়ো বস্তু যেমন গ্রহ-উপগ্রহ ছাড়া ছোট্ট ওজনবিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে মহাকার্ষিক শক্তি অত্যল্প মাত্র। যেমন এক হাজার কেজি ওজনের দু'টি বস্তু যদি একে অন্য থেকে ১ মিটার দূরে থাকে তাহলে তাদের মধ্যে মহাকর্ষের মাত্রা হবে এক নিউটনের ৬ কোটি ৭০ লক্ষের এক ভাগ মাত্র। ও হ্যাঁ, নিউটন হলো একটি মাপের একক। **১ নিউটন = ১ কেজি ওজনের বস্তুকে ১ মিটার প্রতি সেকেন্ড-সেকেন্ড ত্বরণ সৃষ্টি করতে যে ফোর্সের প্রয়োজন হয়।**

ক্লাসিক গ্রাভিটেশন থিওরী এখনও ব্যবহারযোগ্য। এর কারণ হলো, উক্ত সমীকরণ দ্বারা সূর্য-গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি সৌরজগতের সকল বস্তুর পর্যবেক্ষিত গতিবিধি নির্ণয় করা যায়। তবে এই থিওরী সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়।

আধুনিক মহাকার্ষিক থিওরী

নিউটনের ইউনিভার্সাল গ্রাভিটেশন আইন দীর্ঘদিন গ্রহণযোগ্য ছিলো এবং আজো একেবারে অকেজো নয়। কিন্তু এই থিওরীর মধ্যে কিছু সমস্যা আছে। যেমন: বুধ গ্রহের প্রদক্ষিণের মধ্যে 'অব্যাখ্যাত' তারতম্য। এ পর্যায়ে গ্রহের প্রদক্ষিণ কী তা বুঝে না আসলে চিন্তা করবেন না। আগামীতে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করবো। এখানে নিউটনের ব্যাখ্যায় সমস্যা বুঝাতে বুধের প্রদক্ষিণ সম্পর্কে উল্লেখ করছি মাত্র। যাক, অপর আরেক সমস্যা হলো, নিউটনের থিওরীতে পর্যবেক্ষকের নিজের গতিমতি বা ফ্রেম অব রেফারেন্স একটা মৌলিক ফাটল আছে। সন্ধানী বন্ধুদেরকে এবারও বলছি, বিষয়টি যদি আঁচ করতে না পারেন তাহলে কোন সমস্যা নেই। এসব ব্যাপার পরবর্তী

এক বা একাধিক লেকচারে আলোচিত হবে। নিউটন বলেছিলেন, সকল গতিই আপেক্ষিক। তিনি জানতেন না, কোন একটি গতি থাকতে পারে যা অপরিবর্তনীয় ও মৌলিক।

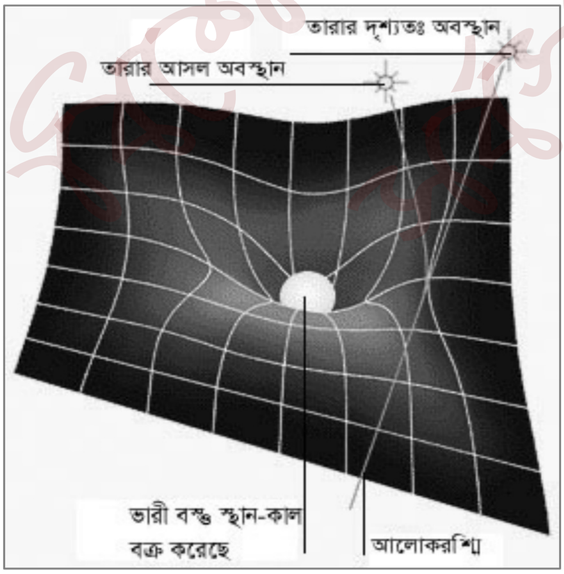
এরূপ একটি গতি উনিশ শতকের শেষের দিকে আবিস্কৃত হলো- এই গতির নাম আলোকের গতি। দেখা গেলো, কোন বস্তুই এই গতির ঊর্ধ্বে চলতে পারে না। বাস্তবে [আলোক-রশ্মিসহ] একমাত্র ইলেকট্রমেগনেটিক সিগন্যাল শূন্যস্থানের উপর সব সময় এই গতিতে চলে। এখন, নিউটনের মতে দু'জন পর্যবেক্ষক একে অন্যের দিকে যে গতিতে অগ্রসর হবে তারা উভয়ে মেপে দেখবে অপরের গতি উভয়ের গতির যোগফল। অর্থাৎ ছাত্রবন্ধু ক ছুটে চলেছেন ছাত্রবন্ধু গ এর দিকে ঘণ্টায় ১০ মাইল বেগে। কিন্তু ছাত্রবন্ধু গ নিজেও চলছেন ছাত্রবন্ধু ক এর দিকে ঘণ্টায় ১৫ মাইল বেগে। এখন উভয়ে যখন একে অন্যকে অতিক্রম করবেন তখন দেখবেন উভয়ের গতি ঘণ্টায় ২৫ মাইল [১০+১৫]। এই থিওরী ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য যতক্ষণ পর্যন্ত উভয় ছাত্রবন্ধুর গতি আলোকের অর্ধেক গতি থেকেও নীচে। যখন বেশী হবে তখন নিউটনের আইনে উভয়ের মধ্যে গতি হবে আলোকের গতি থেকেও বেশী! অথচ এটা নিশ্চিতভাবে জানা গেছে, আলোকের গতিই সর্বোচ্চ গতি। এ থেকেও উচ্চগতিতে কিছুই চলতে পারে না। সুতরাং বিরাট সমস্যা।

সমস্যার সমাধান

বিংশ শতকের শুরুতে [১৯০৫] **আলবার্ট আইনস্টাইন** [১৮৭৯-১৯৫৫] এই সমস্যার সমাধান দেন। তিনি দেখালেন, কোন কণাই- এমনকি তথ্যও আলোকের গতি থেকে ঊর্ধ্ব গতিতে চলতে পারবে না। অপরদিকে নিউটনের থিওরী মুতাবিক তথ্য অসীম গতিতে চলতে পারে। আইনস্টাইনের নতুন থিওরীর নাম **'বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ'** [relativity]। অমরা অন্য কোন লেকচারে এই থিওরীর উপর আরো কিছু তথ্য তুলে ধরবো। এ পর্যায়ে এটুকু বলাই উদ্দেশ্য যে, বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ বর্তমানে বিজ্ঞানমহলে সর্বাধিক সঠিক ও গ্রহণযোগ্য থিওরী। এটা বার বার পরীক্ষা দ্বারা সত্যায়িত করা হয়েছে।

আইনস্টাইনের মহাকার্ষিক থিওরী

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ১৯১৫ সালে **'জেনারেল আপেক্ষিকতাবাদ'** নামক আরেক থিওরী প্রকাশ করেন। উপরে উল্লেখিত বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের ফলাফল এই নতুন থিওরী দ্বারা বুঝানো যায়। নিউটনের ক্লাসিক থিওরী যেখানে ফেল করে সেখানেও নতুন এই থিওরী কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

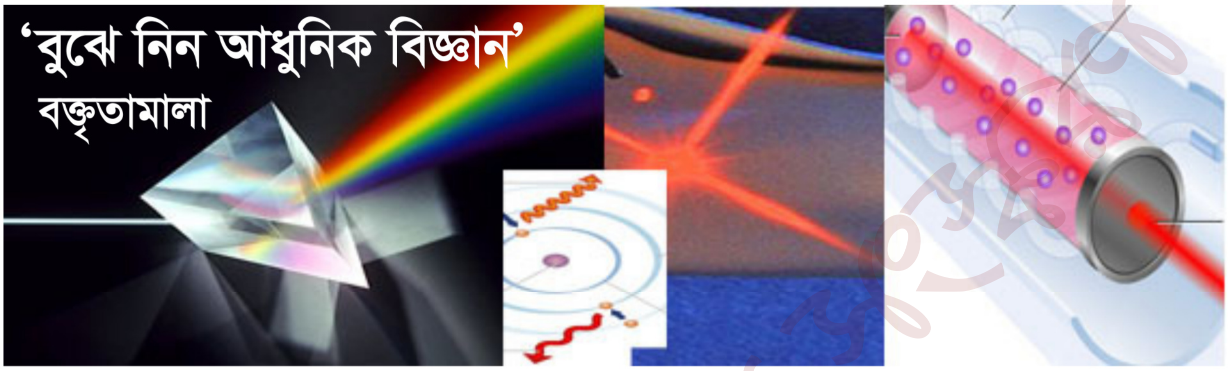


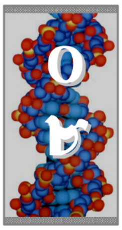
নতুন এ থিওরী মুতাবিক পুরো মহাবিশ্ব আসলে চতুর্থ-মাত্রিক- ত্রিমাত্রিক নয়। তিনি সময়কে চতুর্থ মাত্রা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং আমরা যে বিশ্বে বাস করি তা মূলত চার-মাত্রিক স্পেইস-টাইম [দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতাসম্পন্ন স্থান ও সময়] কন্টিনিউয়াম [ধারাবাহিকতা]। অর্থাৎ সময়কে বাদ দেওয়া যাবে না। এই থিওরী বলে, মহাকর্ষ আসলে এই স্পেইস-টাইমের একটি অবস্থা মাত্র। কোন ভারী বস্তু যেমন সূর্য তার চতুর্পাশ্বস্থ স্থান-কালকে বক্র বা গোমরা করে দেয়। লক্ষ্য করুন, শুধু স্থান বক্র হয় না- বলা হচ্ছে স্থান-কাল। ফলে আলোকরশ্মিও বক্র হয়ে পড়ে। পাশের চিত্রটি দেখুন।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদকে সত্যায়িত করা সহজ ব্যাপার নয়। মোটকথা পরীক্ষার মাধ্যমে গণিতভিত্তিক এ থিওরী প্রমাণ করা কঠিন। তবে দু'টি ক্ষেত্রে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হয়। ইতোমধ্যে বলেছি, সূর্যের নিকটস্থ গ্রহ বুধের কক্ষপথে তারতম্য বিদ্যমান। এর কারণ সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ দ্বারা সঠিকভাবে জানা গেছে। আর অপর ব্যাপারটি হলো, আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী সূর্যের নিকট-দিয়ে চলন্ত আলোকরশ্মি বক্রপথে চলবে। এটাও বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন [আগের পৃষ্ঠার চিত্র দ্র:]

প্রিয় সন্ধানী বন্ধুরা! আজকের লেকচারের ইতি এক্ষুণি টানবো। এ লেকচারে আমরা ভাসাভাসাভাবে হলেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করেছি। তাহলো, সমগ্র মহাবিশ্ব মৌলিক কিছু আইনের আওতাভুক্ত আছে। চারটে ফোর্স বা শক্তির মাধ্যমে প্রতিটি বস্তু- এমনকি মহাশূন্যও নিয়ন্ত্রিত। আমরা এ চারটি ফোর্সের উপর সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করেছি মাত্র। এ থেকে এটুকু আশা করা যায়, গুরুত্বপূর্ণ এ শক্তি চতুষ্টয় ছাড়া জগৎ যেভাবে চলছে সেভাবে যে চলতো না তা আমরা অনুধাবন করেছি। এসব বিষয়ের উপর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এ লেকচারের স্কোপের বাইরে। সুতরাং পরবর্তী লেকচারে পদার্থবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় **'আলোকবিজ্ঞান'**র উপর তথ্যমূলক আলোচনা করবো। আগামী লেকচারে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তাঃ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থানঃ খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

খ. পদার্থবিজ্ঞান : বস্তুজগতের মিথস্ক্রিয়া

বক্তৃতা ৮ : আলোকবিজ্ঞান : ক. ভূমিকা

প্রিয় জ্ঞানান্বেষী শিক্ষার্থীরা! আধুনিক বিজ্ঞানের উপর আলোচনাসর্বস্ব লেকচারের অষ্টম এ সেশনে সবাই ওয়েলকাম। ইতোমধ্যে আমরা বিজ্ঞান জগতের অনেক বিষয়ের উপর বিচরণ করেছি। আজকের মূল বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশের পূর্বে এ পর্যন্ত যাকিছু আলোচনা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ আবারো ব্যক্ত করে নিই- কেমন? নিম্নে এর একটি তালিকা প্রদত্ত হলো।

১. প্রথম লেকচার ছিলো **‘বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান’** এর একটি **‘ভূমিকা’**। এতে আলোচিত হয়েছে:
ক. বিজ্ঞান শাস্ত্রের সংজ্ঞা ও ব্যাপ্তি;
খ. আলোচনার সুবিধার্থে ৬টি মূল বিষয়ে বিন্যস্তকরণের স্বরূপ;
গ. প্রতিটি বিষয়ের উপর কিভাবে লেকচার হবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

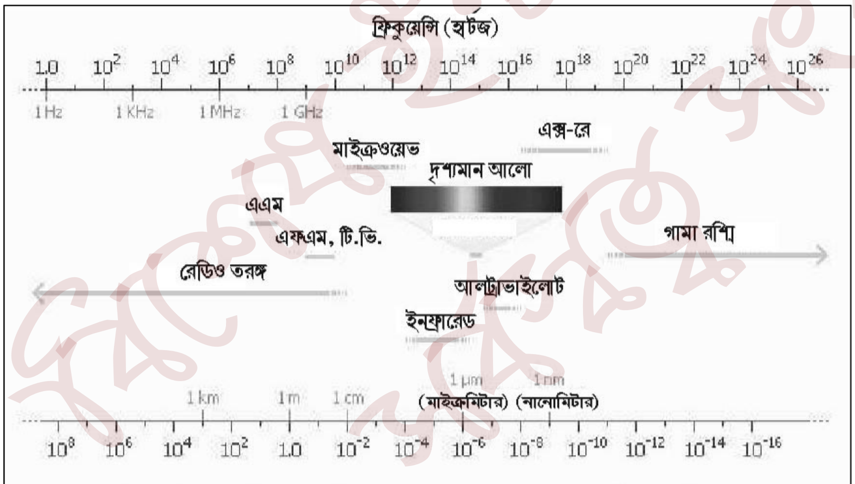
২. দ্বিতীয় লেকচারে আমরা যা কাভার করেছি তাহলো:
ক. বস্তুজগতের মৌলিক গঠনপ্রণালী;
খ. পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নীরিক্ষা;
গ. বৈজ্ঞানিক মাপজোখ যন্ত্রাদি।

৩. তৃতীয় বক্তৃতায় এসেছে:
ক. ক্যুয়ার্ক থেকে মহাবিশ্ব;
খ. সংক্ষেপে এটমের মডেল।

৪. চতুর্থ বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিলো: বন্ড ও মলিকিউল।

৫. পঞ্চম লেকচারে আমরা আলোচনা করেছি:
ক. মৌলিক পদার্থ [ইলেমেন্ট] ও যুক্ত পদার্থ [কম্পাউন্ড] এবং
খ. পিরিওডিক টেবিল অব ইলেমেন্ট নিয়ে।
৬. ষষ্ট বক্তৃতায় ছিলো: বস্তুর ফিজিক্যাল অবস্থা।
৭. সপ্তম লেকচারে আমরা আলোচনা করেছি:
ক. পদার্থ বিজ্ঞান : বস্তুজগতের মিথস্ক্রিয়া;
খ. মৌলিক চার শক্তি ইত্যাদির উপর।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আজকের এ অষ্টম লেকচার ও পরবর্তী ক'টিতে পদার্থ বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা সীমিত রাখবো। বিষয়টি হলো **'আলোকবিজ্ঞান'** [light]। আলো স্বভাবের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যেখানে আলো নেই সেখানে আঁধার। যেখানে আঁধার নেই সেখানে আলো। কিন্তু আলোকরশ্মি মূলত এক ধরনের এনার্জি বৈ কিছু নয়। আমাদের চোখ এই রশ্মিকে দেখার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু জগতে আলোকরশ্মি ছাড়াও বিকিরণ হচ্ছে আরো অনেক এনার্জি যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। আগের লেকচারে আমরা **'ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রাম'** [electromagnetic spectrum] নামক একটি ব্যাপার নিয়ে সামান্য আলোচনা করেছি। এই স্পেকট্রাম মূলত দৃশ্যমান আলোসহ বিভিন্ন সূত্র যেমন সূর্য থেকে নির্গত তরঙ্গ আকারে বিকিরণ হওয়া এনার্জির ব্যাপ্তির চিত্র। নীচের ছবিতে এরূপ একটি স্পেকট্রাম তুলে ধরেছি।



ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রামে দৃশ্যমান আলো ও অন্যান্য রশ্মির ব্যাপ্তি

আগেই বলেছি 'আলোক'র গুরুত্ব বিরাট। সূর্য আমাদের মূল আলোকসূত্র। পুরো সৌরজগতের এনার্জি সাপ্লাই দেয় এই সূর্য। পৃথিবীর জমিনে পতিত আলোকরশ্মির কারণে বৃক্ষরাজি জীবিত। সবুজ পত্র সূর্যের আলো থেকে তৈরী করে উদ্ভিদের জন্য রসায়নিক খাদ্য। **সালোকসংশ্লেষণ** [photosynthesis] নামক এই প্রসেসের সময় বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয় আমাদের জীবনরক্ষার্থে গুরুত্বপূর্ণ বাষ্পীয় উপাদান অক্সিজেন। আধুনিক যুগে মানুষের এনার্জির প্রয়োজন মেটাচ্ছে কয়লা, নেচারেল গ্যাস, পেট্রোল ইত্যাদি। সুদূর অতীতে মৃত অসংখ্য উদ্ভিদ ও জীব-জন্তুর দেহাবশেষ হলো এসব খনিজ সম্পদের সূত্র।

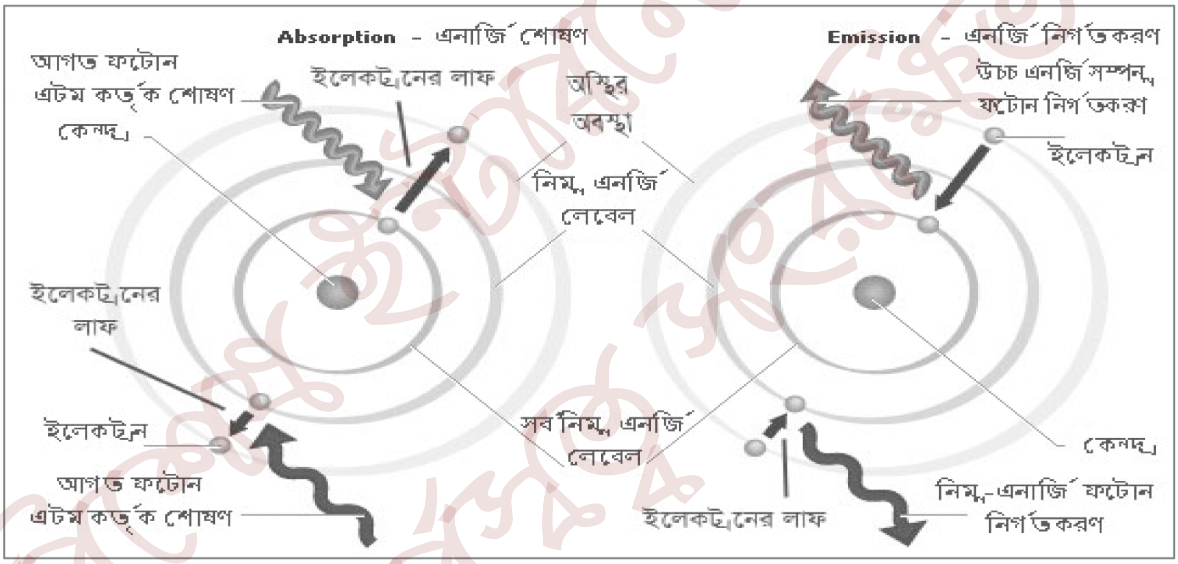
খ. আলোকরশ্মির স্বরূপ

আলোকের স্বরূপ বুঝতে হলে আমাদেরকে বস্তুর এটোমিক লেবেলে যেতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অণুর ইলেকট্রন হলো আলোকরশ্মির মূল সূত্র। আমরা ইতোমধ্যে এটমের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা জানি

এটম হলো বস্তুর মৌলিক বিল্ডিং ব্লক। এতে প্রটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন এ তিনটি কণা আছে। কেন্দ্রে থাকে প্রটন ও নিউট্রন। কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে তারঙ্গিক পথে ইলেকট্রন। এবার জেনে নেবো এই ইলেকট্রন থেকে কিভাবে আলোকরশ্মির জন্ম হয়ে বেরিয়ে আসে বাইর জগতে।

খ. ১. আলোকরশ্মি বিকিরণ

আলো বিকিরণ বা নির্গত হতে পারে অণুর চতুর্দিকে ঘুর্ণনরত ইলেকট্রন থেকে। এখন যা বলবো তা সঠিকভাবে বুঝার জন্য নিম্নের চিত্রটির প্রতি খিয়াল রাখতে হবে। ইলেকট্রন অণুর চতুর্দিকে কিছু বিশেষ পথে চলতে পারে যাকে বিজ্ঞানীরা **'অরবিট্যাল'** [প্রদক্ষিণপথ] বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রতিটি অরবিট্যালের জন্য যে পরিমাণ এনার্জির প্রয়োজন তাকে বলে **'অণুর এনার্জি লেবেল'**। কেন্দ্রের নিকটস্থ অরবিট্যালে চলন্ত ইলেকট্রনের এনার্জির মাত্রা দূরে চলন্ত ইলেকট্রনের তুলনায় অল্প। নিম্ন এনার্জি লেবেলে চলন্ত ইলেকট্রন থেকে কোন বিকিরণ হবে না- যদিও সে দ্রুত ঘুর্ণনরত। কিন্তু এই নিম্ন লেবেলের এটমে যদি কিছু অতিরিক্ত এনার্জি যোগ হয় তখন ইলেকট্রন স্বস্থান থেকে লাফ মেরে উচ্চ এনার্জি লেবেলে চলে যায়। এ পর্যায়ে পুরো অণুর অবস্থা **'অস্থির'** [excited] বলে আখ্যায়িত করা হয়।



লাফ দেওয়ার সময় ইলেকট্রন থেকে কিছু এনার্জি ক্ষয় হয়। সে এবার পুনরায় আগের নিম্ন লেবেলে লাফ মারে। এখন সে কিছু এনার্জি বিরিকরণ করবে। এই বিকিরণ হতে পারে **'প্যাকেট'** বা **'ক্যুয়ান্টাম এনার্জি'**। এই এনার্জিকে বলে **ফোটন**। আর ফোটনই হলো আলোকরশ্মিসহ ইলেকট্রমেগনেটিক বিকিরণের মূল।

স্বভাবে প্রাপ্ত প্রতিটি ভিন্ন এটমে বিরাজ করে একক এনার্জি লেবেল সেট। এসব লেবেলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ফোটনে বিকিরণশীল এনার্জি হলো এই এটমের **'স্পেকট্রাম'** [বর্ণচ্ছটা]। সুতরাং এটমের নিজস্ব এই স্পেকট্রাম **'অঙ্গুলি-ছাপ'** [fingerprint] এর মতো। স্পেকট্রাম গবেষণা করে এটমের স্বরূপ বা জাত সনাক্ত করা যায়। আর এই সনাক্তকরণ ক্রিয়ার নামই হলো **'স্পেকট্রোস্কপি'** [spectroscopy]।

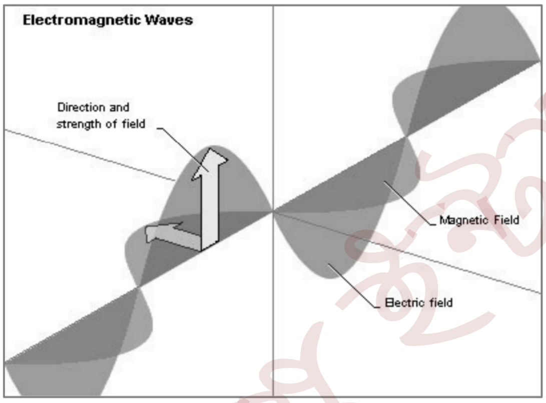
আশাকরি শ্রোতা বন্ধুরা এ পর্যন্ত আলোচিত বিষয়গুলো বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। যদি কোন সন্দেহ থাকে তাহলে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করবেন না কিন্তু। অণুর স্পেকট্রাম কি তা বুঝার মধ্যেই আলোকবিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন নিহিত। সুতরাং স্পেকট্রাম, যার বাংলা **'বর্ণচ্ছটা'**, কি জিনিষ তা আমাদেরকে খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে।

এবার আমরা আরো একটু এগিয়ে যাচ্ছি। বিজ্ঞানীরা একটি থিওরী তৈরী করেছেন। এটার নাম **‘ক্যুয়ান্টাম থিওরী’**। আমরা এর গভীরে যাওয়ার সাহস করবো না! তবে এটুকু জানা দরকার, ক্যুয়ান্টাম থিওরী দ্বারাই এটমের **অরবিট্যাল ও এনার্জি লেবেল** [শক্তি-স্তর] গাণিতিকভাবে বুঝানো হয়।

খ. ইলেকট্রমেগনেটিক তরঙ্গ [electromagnetic wave]

এই তরঙ্গটির মাধ্যমে অণুর মধ্য থেকে বিকিরণকৃত এনার্জি চতুর্দিকে [শূন্যস্থানে] আলোকের গতিতে [**১,৮৬,০০০ মাইল প্রতি সেকেন্ড**] চলন্ত হয়। আলোকরশ্মিসহ স্পেকট্রামের যাবতীয় তরঙ্গ এই গতিতেই চলে। উপরে বর্ণিত এটমের ফিঙ্গারপ্রিন্ট পুরোটাই ইলেকট্রমেগনেটিক তরঙ্গে চলন্ত হয়। আর বিজ্ঞানীরা এই তরঙ্গের স্পেকট্রাম গবেষণা করে মূল সূত্র এটম সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারেন।

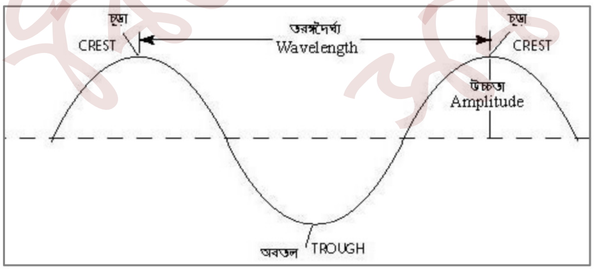
এই তরঙ্গটি কি? আসলে নাম থেকেই বুঝা যায়, এতে আছে ইলেকট্রিক ও মেগনেটিক তরঙ্গ। উভয়টি যৌথভাবে এনার্জি বহনকারী হিসাবে কাজ করে। একটা আরেকটা থেকে ৯০ ডিগ্রী তফাৎ বজায় রাখে। নিম্নের চিত্রটি দেখুন।

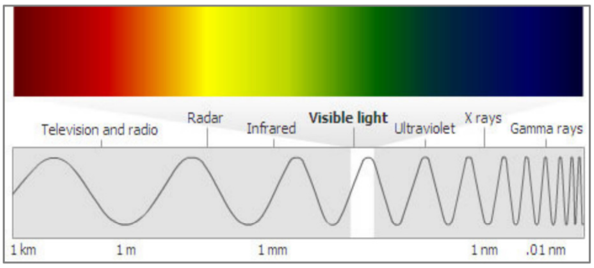


খ. ১. তরঙ্গদৈর্ঘ্য [wavelength], তরঙ্গসংখ্যা [frequency] ও তরঙ্গ-উচ্চতা [amplitude]

ইলেকট্রমেগনেটিক তরঙ্গ সম্পর্কে এই চারটি বিষয় আমাদের জানতে হবে। আগে বলেছি এটমের ফিঙ্গারপ্রিন্ট হলো ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রাম। এটম থেকে এটমে, বিকিরণের জাত থেকে জাতে পার্থক্য নির্ণয় করে এই চারটি পরিমাপ। আমরা একে একে এগুলোর ব্যাখ্যা তুলে ধরবো।

১. তরঙ্গদৈর্ঘ্য: তরঙ্গের দু'টি সর্বোচ্চ পয়েন্ট কতটুকু দূরে তার মাপকে বলে **ওয়েভলেন্থ** বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য। নীচের চিত্রটি দেখুন। দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব অল্প। এ কারণে নানো মিটার [nm - এক মিটারের এক হাজার মিলিয়নের এক অংশ] ব্যবহৃত হয়।





২. তরঙ্গসংখ্যা: ইলেকট্রমেগনেটিক তরঙ্গ বিশেষ গতিতে চলে। প্রতি সেকেন্ডে ক'টি তরঙ্গ চলমান আছে তার মাপকেই বলে তরঙ্গসংখ্যা বা **ফ্রিকুয়েন্সি**। **হার্টজ্** নামক ইউনিটে এটা মাপা হয়। আমরা বলেছি সকল ইলেকট্রমেগনেটিক তরঙ্গ একই গতিতে চলে- অর্থাৎ আলোকের গতিতে। সুতরাং তরঙ্গসংখ্যা বেশী হবে যদি তরঙ্গদৈর্ঘ্য অল্প হয়- আর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশী হলে তরঙ্গসংখ্যা কম হবে। সুতরাং আমরা একটি সমীকরণ তৈরী করতে

পারি যাতে থাকবে, **আলোকের গতি** [c মিটার প্রতি সেকেন্ড], **তরঙ্গদৈর্ঘ্য** [l মিটার] এবং **তরঙ্গসংখ্যা** [f হার্টজ]। এই সমীকরণ নিম্নরূপঃ

$$c = lf$$

এখানে **আলোকের গতি c হলো ৩x১০^{৮} মি/সে**। l কিংবা f এর মান জানতে পারলে আমরা তৃতীয়টির মান নির্ণয় করতে পারবো এই সমীকরণ থেকে।

৩. তরঙ্গ-উচ্চতাঃ ইলেকট্রমেগনেটিক তরঙ্গের উচ্চতা কি তা উপরের চিত্র থেকে স্পষ্ট। উচ্চতার মাত্রা জানলে আমরা ইলেকট্রিক ও মেগনেটিক ফিল্ডের ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারি। এছাড়া আলোকরশ্মিতে ক'টি ফোটন আছে তা-ও নির্ণয় করা যায়।

গ. স্পেকট্রাম গবেষণা

আমরা এখন স্পেকট্রাম সম্পর্কে আরো কিছু তথ্যাদি তুলে ধরতে পারি। ইতোমধ্যে এটির সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ব্যাপার জেনে নিয়েছি। যেমনঃ **তরঙ্গগতি, তরঙ্গদৈর্ঘ্য, তরঙ্গসংখ্যা ও তরঙ্গ-উচ্চতা**। আমরা এ লেকচারে দৃশ্যমান আলোকরশ্মি সম্পর্কে আলোচনা করছি। তবে স্পেকট্রাম হলো এটম থেকে বেরিয়ে আসা ইলেকট্রমেগনেটিক তরঙ্গে পূর্ণাঙ্গ এনার্জি বহনকারী মাধ্যম। মানব-দৃষ্টির ভেতরেই আলোকরশ্মির ফ্রিকুয়েন্সি বিদ্যমান। দৃশ্যমান এই রেঞ্জের তরঙ্গসংখ্যা [ফ্রিকুয়েন্সি] খুব উচ্চে। বাস্তবে তা ৫x১০^{৪} থেকে ৭.৫x১০^{৪} হার্টজ। অপরদিকে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ব্যাপ্তি হলো ৪০০ থেকে ৭০০ নানো মিটার। অদৃশ্য তরঙ্গের মধ্যে একটি হলো এক্স-রে। এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কয়েক হাজার নানো মিটার থেকে কয়েক নানো মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। আর অদৃশ্য রেডিও-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের ব্যাপ্তি কয়েক মিটার থেকে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত।

আমাদের দৃশ্যমান রেঞ্জের সামান্য কম তরঙ্গসংখ্যা [সুতরাং দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্য] থেকে যেসব তরঙ্গ বেরিয়ে আসে এগুলোকে বলে **'ইনফ্রারেড ওয়েভ'** [infrared wave -লাল-তরঙ্গ]। এর বিপরীতে যেসব তরঙ্গের সংখ্যা একটু বেশী ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম তাদের নাম **'আলট্রাভাইলোট ওয়েভ'** [ltraviolet wave -বেগুনি-তরঙ্গ]। সূর্য থেকে এনার্জির অর্ধেকটা দৃশ্যমান ইলেকট্রমেগনেটিক তরঙ্গ। ৩ শতাংশ বেগুনি-তরঙ্গ। বাকী সবই লাল-তরঙ্গ। এ পর্যায়ে স্পেকট্রামের উপর আরো কিছু আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি।

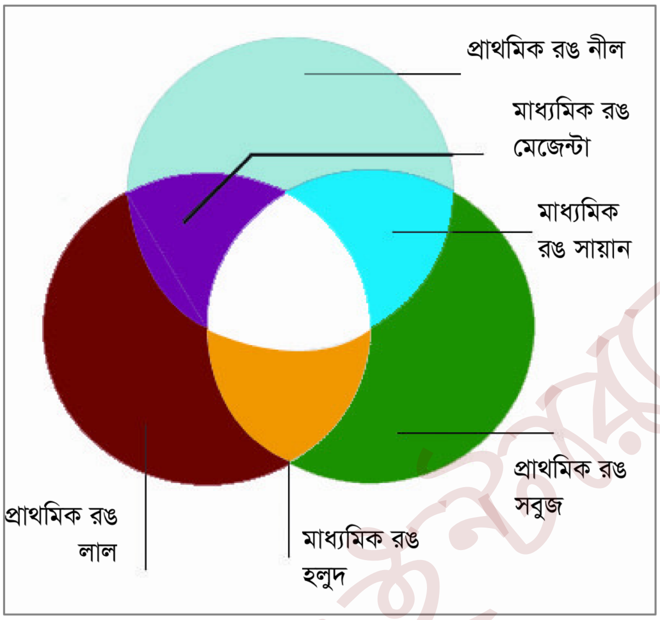
গ. ১. স্পেকট্রাম কি জিনিষ?

সাধারণ **'সাদা'** আলোকরশ্মি সর্বত্র আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু তা কি সাদা? আসলে তা নয়। **তিনফলা কাচ** [prism] সূর্য থেকে আগত সাদা আলোকরশ্মির সামনে রাখা হলো। কাচের অপরদিকে কোন্ রঙের আলো বেরিয়ে আসবে বলে মনে করেন? যা আসবে তা নীচে চিত্রিত হয়েছে। সাদাকালো প্রিন্ট থাকলে সঠিকভাবে ধরতে পারবেন না রঙগুলো। তবে বিশ্বাস করুন রংধনুর মতো ৬টি রঙ বেরিয়ে এসেছে এবং 'সাদা' আলো বলতে কিছুই নেই! আসলে সাদা আলো মূলত ৬টি ভিন্ন রঙের আলোকরশ্মি দ্বারা সৃষ্ট।



বিজ্ঞানীরা বেশ আগে থেকেই ব্যাপারটি জানতেন। তবে আধুনিক যুগে এসে স্পেকট্রামের ৬টি রঙের গোপন রহস্য অবগত হয়েছেন। স্পেকট্রামে যে ৬টি রঙ দেখা যায় তাহলোঃ **বেগুনি, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল**। প্রতিটি রঙের সঙ্গে যুক্ত একেকটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও তরঙ্গসংখ্যা। **স্পেকট্রোস্কোপ** নামক একটি যন্ত্র আছে। সাদা আলোকরশ্মিকে এই যন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন রঙে বিভক্ত করা যায়। **স্পেকট্রোগ্রাফ** নামক আরেক যন্ত্র আছে। এটি স্পেকট্রামের রঙিন ছবি তুলে। আরেক যন্ত্রের

মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা স্পেকট্রামের বিভিন্ন অংশের ঔজ্জ্বল্য পরীক্ষা করেন। এ যন্ত্রের নাম **স্পেকট্রোফটোমিটার**। এ তিনটি যন্ত্রের ব্যবহার করে যে গবেষণা করা হয় তার নাম **'স্পেকট্রোস্কপি'**। কথাটা বুঝে এসেছে? বেশী ভাববেন না। শুধু এটুকু জানা থাকাই যথেষ্ট, আলোকরশ্মি মূলত রঙের খেলা। সাদা বলতে কোন আলোকরশ্মি নেই। হ্যাঁ, একাধিক রঙিন আলোকরশ্মি মিলে সাদা দেখায় মাত্র। যেমন মৌলিক [প্রাইমারী] তিনটি রঙ একত্রিত হলে তা সাদা দেখাবে। নীচের চিত্রটি দেখুন।



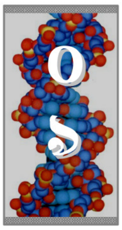
আলোকরশ্মির সূক্ষ্ম গবেষণাও সময় সময় দরকার। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা ইন্টারফেরোমিটার নামক আরেক যন্ত্র কাজে লাগান। বিজ্ঞানীরা গত শতকের শুরুর দিকে আবিষ্কার করলেন **'আলট্রাভাইলোট রশ্মি'** [ultraviolet radiation]। অদৃশ্য এ রশ্মিটি স্পেকট্রামের বেগুনি রঙের দিকে। এরপর আবিস্কৃত হলো আরো একটি রশ্মি যার নাম **'ইনফ্রারেড রশ্মি'** [infrared radiation]। এটিও মানব চোখে অদৃশ্য। এটার স্থান স্পেকট্রামের লাল দিকে। এখানেই শেষ নয়। পরবর্তীতে ইনফ্রারেড পরেও আবিস্কৃত হয় রেডিও ওয়েভ। এরপর এক্স-রে ও গামা-রে আলট্রাভাইলোট পরে দেখা দেয়। সুতরাং পুরো স্পেকট্রামে দৃশ্যমান আলো ছাড়াও যুক্ত হলো অদৃশ্য অনেক রশ্মি।

আমরা যখন বলি **'ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রাম'** [electromagnetic spectrum], বুঝতে হবে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গে বিকিরণকৃত স্পেকট্রামের পুরোটা। অর্থাৎ দৃশ্যমান রেঞ্জ ও উভয়দিকের অদৃশ্য রেঞ্জ। দৃশ্যমান রেঞ্জটি আমাদের চোখে ধরা দেয়। আর এটাই আলোকরশ্মি। এখন, প্রশ্ন জাগে আমরা কেনো ভিন্ন রঙ দেখি। দৃশ্যমান আলো'র মধ্যে আছে আলাদা তরঙ্গদৈর্ঘ্য কিংবা তরঙ্গসংখ্যা। এই তারতম্যের ফলেই আমরা বিভিন্ন রঙ দেখি। দীর্ঘতম তরঙ্গদৈর্ঘ্য যা আমাদের চোখে ধরা দেয় তাহলো খুব গাঢ় লাল। এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৭০০ নানো মিটার। সর্বাধিক কম তরঙ্গদৈর্ঘ্য যা আমরা দেখতে পারি তাহলো গাঢ় নীল বা বেগুনি। এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৪০০ নানো মিটার।

আলোকবিজ্ঞানের উপর **'ভূমিকাসর্বস্ব'** আজকের লেকচারের ইতি টানবো শীঘ্রই। একটা ব্যাপার অতিরিক্ত বলেতে চাচ্ছি। বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, যে আলোকরশ্মি মানবচোখে সর্বাধিক সুন্দর ও নিষ্কলুষভাবে ধরা দেয় তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৫৫০ নানো মিটার। এর রঙ সবুজ। সুতরাং সবুজ রঙের দিকে দৃষ্টিপাত করুন- এতে চোখের উপকার হবে। এই রঙটিই সূর্য থেকে আগত সর্বাধিক উজ্জ্বল রঙ। আগামী লেকচারে আলোকবিজ্ঞানের উপর আরো গভীর আলোচনার আশা রাখি। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





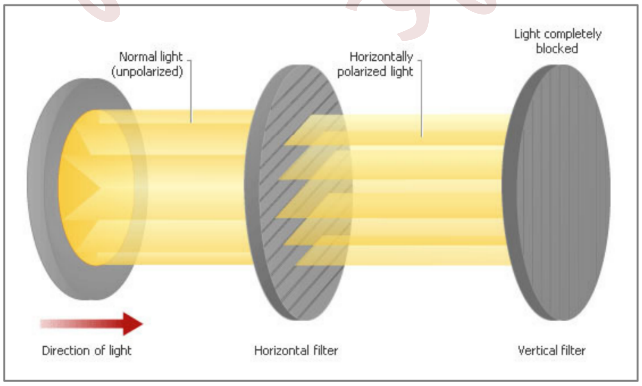
বক্তাঃ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থানঃ খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

খ. পদার্থবিজ্ঞান : বস্তুজগতের মিথস্ক্রিয়া

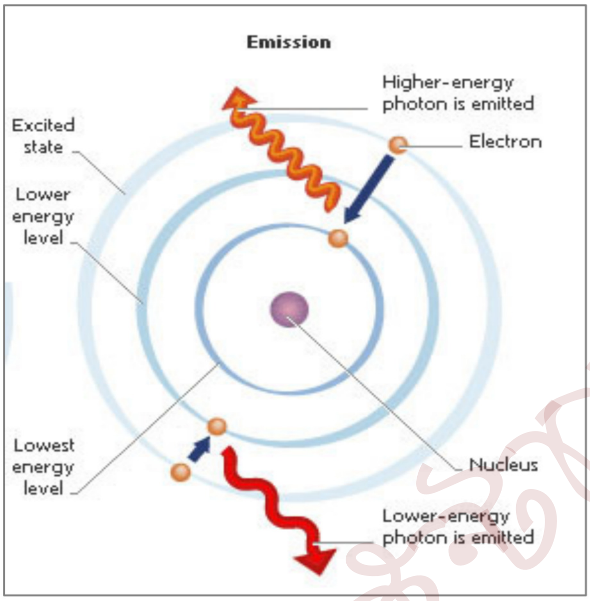
বক্তৃতা ৯ : খ. পোলারাইজেশন ও ফটোন

সবাইকে আবারো স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের এই নবম বক্তৃতা। আমরা গত লেকচারে আলোকবিজ্ঞানের উপর আলোচনা করেছি। এ লেকচারেও তা-ই করবো। বাস্তবে আলো সম্পর্কে অনেক-কিছু এখনো জানার বাকী আছে। গত লেকচারের শেষে আলোচনা করেছি ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রাম নিয়ে। বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের গতি কোন্ দিকে তা আমাদের জানা দরকার। আমরা বলেছি, পুরো তরঙ্গ মূলত ইলেকট্রিক ও মেগনেটিক ফিল্ডের সমন্বয়ে গঠিত। যেদিকে এই তরঙ্গ চলে তার একটা নাম আছে। এই নামটি হলো **'পোলারাইজেশন'** [polarization]। বাংলা শব্দটি হলো **'মেরুকরণ'**। তবে এখানে শব্দটির অর্থ ঠিক তা-ই নয়।



যখন কোন তরঙ্গের ইলেকট্রিক ফিল্ড উপর থেকে নীচের দিকে ওঠানামা করে তখন একে বলা হয় **'উপর-নীচের দিকে পোলারাইজ'** তরঙ্গ। ঠিক এর বিপরীত দিকে, অর্থাৎ ডানে-বামে ওঠানামা করলে তরঙ্গটিকে বলে **'ডানে-বামের দিকে পোলারাইজ'**। এই উভয় তরঙ্গের আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম তরঙ্গের **'ফটোন'** [আলোক-প্যাকেট] অন্য বস্তুর সঙ্গে দ্বিতীয়টির তুলনায় ভিন্নভাবে ক্রিয়া করে। তবে সূর্য থেকে পতিত আলোক-তরঙ্গের ইলেকট্রিক ফিল্ড কিন্তু সবদিকে ওঠানামা করে। একে বলে **'আনপোলারাইজ'**

[unpolarized]। অর্থাৎ দিগ্‌ভ্রান্ত! সূর্যালোক যদি কোন বস্তুর পৃষ্ঠদেশে পড়ে প্রতিবিম্ব হয় তাহলে তা আংশিক পোলারাইজ হবে। এক ধরনের সান-গ্লাস আছে। এই গ্লাস ডানে-বামে পোলারাইজ আলোকরশ্মি চোখে আসতে দেয় না। এরূপ সান-গ্লাসের নাম **'পোলারোইড'** [polaroid] সূর্যচশমা। যাক, আমরা আলোকবিজ্ঞানের **'পোলারাইজেশন'** শব্দের অর্থ কি জানলাম। কৃত্রিম উপায়ে আলোকরশ্মি পোলারাইজ করেই তৈরী হয় লেইজার। এ সম্পর্কে একটু পরই আরো বলবো।



'ফটোন' [photon] হলো আলোক-এনার্জির প্যাকেট। এগুলো সর্বদাই ইলেকট্রমেগনেটিক তরঙ্গের এক বিশেষ তরঙ্গসংখ্যার [ফ্রিকুয়েন্সির] সঙ্গে সম্পৃক্ত। উনিশ শতকে আবিস্কৃত হয় এই ফটোন। আলোক-এনার্জি বহনকারী এই ফটোন কি তা আমাদেরকে বুঝতে হবে। পাশের চিত্রটি দেখুন।

আমরা বলেছি, এটমের ইলেকট্রন যখন তার নিজের এনার্জি-লেবেল থেকে লাফ মেরে অন্য লেবেলে যায় তখন **'বাই-প্রোডাক্ত'** হিসাবে ফটোন [এনার্জি-প্যাকেট] বাইরের দিকে বিকিরণ বা রিলিজ করে। এই ফটোনই আলোকরশ্মির মূল সূত্র। ফটোনে কি পরিমাণ এনার্জি আছে তা মাপা যায়। বিজ্ঞানীরা একটি সমীকরণ ব্যবহার করেন। যেমন:

Ep = fh

এখানে Ep অর্থ ফটোনের এনার্জি। f হলো ফটোনের ইলেকট্রমেগনেটিক তরঙ্গের তরঙ্গসংখ্যা [ফ্রিকুয়েন্সি] এবং h হলো অপরিবর্তনশীল সংখ্যা ৬.৬২৬x১০$^{-৩৪}$। এর অপর নাম **প্লাংক কন্সস্টেন্ট**। একটি ১ ওয়াট লাইট বাল্ব প্রতি সেকেন্ডে আড়াই মিলিয়ন ট্রিলিয়ন সবুজ আলোর ফটোন এনার্জি ব্যবহার করে। বাংলায় এই বিরাট সংখ্যাটি কিভাবে বুঝিয়ে বলা যায়? এক মিলিয়ন সমান ১০ লক্ষ। এক হাজার মিলিয়ন সমান ১০০ কোটি। আর এক ট্রিলিয়ন সমান এক হাজার মিলিয়ন। তাই এক ট্রিলিয়ন হলো ১০০ x ১০০০ = ১০০০০০ = এ লক্ষ কোটি। সুতরাং আড়াই মিলিয়ন ট্রিলিয়ন মানে ২৫০ x ১০০০০০ = ২,৫০,০০,০০০ লক্ষ কোটি। মোটকথা, মোটা অঙ্কের ফটোন। মেপে দেখা গেছে ঠিক দুপুরের সময় পৃথিবীর বিষুবরেখা বরাবর বায়ুমণ্ডলের উপরে এক বর্গমিটারের মধ্যে সূর্য থেকে আসে ১৪টি ১০০ ওয়াট লাইট বাল্ব পরিমাণ আলোক-এনার্জি। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে, সূর্য থেকে আগত আলোক তরঙ্গ বিরাট সংখ্যক ফটোন তৈরী করে।

খ. ১. আলোকসূত্র

আলোকের সূত্র অনেক কিছু হতে পারে। অগ্নি, মোমবাতি, টর্চ, ইলেকট্রিক বাল্ব এবং সূর্য ক'টি দৃষ্টান্ত মাত্র। আমরা জানি বা ইতোমধ্যে জেনেছি, ইলেকট্রনের লাফ মারা থেকে আলো সৃষ্টি হয়। যে এনার্জির মাধ্যমে ইলেকট্রন এই লাফ মারে তার সূত্র আসতে পারে তাপ থেকে। এ ক্ষেত্রে সূত্রের নাম **'ইনকান্ডেসেন্ট'** [incandescent]। শব্দটির অর্থ বাংলা একাডেমী অভিধানে **'ভাস্বর'** বলা হয়েছে। যে বস্তু উত্তপ্ত অবস্থায় আলো সৃষ্টি করে তা-ই ইনকান্ডেসেন্ট আলোকসূত্র।

এরূপ আলোকসূত্রে উত্তপ্ত অণু একটা আরেকটার সঙ্গে জড়িত হয় সংঘর্ষে। ফলে কিছু এনার্জি এটমের ইলেকট্রনে স্থানান্তরিত হয়। তারা এই এনার্জি পেয়ে উচ্চ এনার্জি লেবেলে লাফ মারে। সৃষ্টি করে ফটোন। অর্থাৎ

আলো। মোমবাতির আলো ইনকান্ডেসেন্ট। অনুরূপ ইনকান্ডেসেন্ট আলোক-বাল্ব থেকে যে ফটোন [আলো] বেরিয়ে আসে তা বাল্বের **ফিলামেন্ট** [ক্ষুদ্র তার] থেকে সৃষ্ট। এই তারটিকে চলন্ত ইলেকট্রিক কারেন্ট উত্তপ্ত করে।

আমাদের সূর্যও একটি ইনকান্ডেসেন্ট আলোক-সূত্র। যে তাপ থেকে ইলেকট্রন উচ্চ এনার্জি লেবেলে লাফ মেরে ফটোন তৈরী করে তা আসে নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়েকশন থেকে। এই রিয়েকশন প্রতিনিয়ত সংঘটিত হচ্ছে সূর্যের কেন্দ্রে। সংক্ষেপে এই ফিউশন রিয়েকশন মানে, প্রচণ্ড চাপ ও তাপে হাইড্রোজেন গ্যাস হিলিয়াম গ্যাসে রূপান্তর। সূর্যের কেন্দ্রে তাপমাত্রা **১৫.৬ মিলিয়ন [১ কোটি ৫৬ লক্ষ] ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড** পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই রিয়েকশন সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা ইতোমধ্যে হয়েছে। সূর্যের গভীরে এই প্রতিক্রিয়া চললেও বাইরের দিকে এটম থেকে এটমে বিরাট অঙ্কের এনার্জি স্থানান্তরিত হয়। সূর্যের পৃষ্ঠদেশে এসে এই তাপমাত্রা **৬,০০০ ডিগ্রী ফারেনহাইটে** নেমে আসে। কিন্তু এরপরও এই মাত্রা এতো বেশী যে প্রতিটি এটমে ইলেকট্রনগুলো নিজেদের এনার্জি লেবেল থেকে লাফ মারতে থাকে। ফলে সৃষ্টি হয় বিরাট মাত্রার ফটোন যা আলো ও অন্যান্য এনার্জি হিসাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে ইলেকট্রমেগনেটিক তরঙ্গের মাধ্যমে।

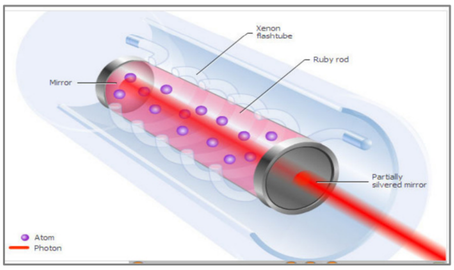
সকল তাপসূত্রের স্পেকট্রাম [মনে আছে? বর্ণচ্ছটা] চওড়া। এর অর্থ তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে বিভিন্ন মাত্রার এনার্জিসম্পন্ন ফটোন [দৃশ্যমান আলো ও অদৃশ্য অন্যান্য তরঙ্গ]। যে কোন ইনকান্ডেসেন্ট সূত্রের রঙ [আলোকরশ্মির রঙ যা আমরা দেখি] তা নির্ভর করে তাপমাত্রার উপর। যতো বেশী উত্তপ্ত, রঙ ততো বেশী নীল। আর যতো বেশী ঠাণ্ডা, রঙ ততো বেশী লাল। লাল-উত্তপ্ত থেকে নীল-উত্তপ্ত বেশী তাপমাত্রাসম্পন্ন।

দ্বিতীয় প্রকার আলোক-সূত্রকে বলে **'লুমিনেসেন্স'** [luminescence]। এর অর্থ, তাপহীন আলো বিকিরণ। তাপ ছাড়া আলো, তা কি সম্ভব? অবশ্যই। এই যে টিউব লাইট, এটা তো মূলত এরূপ আলোকসূত্র। **ফসফার** [phosphor] একটি কেমিক্যাল যুক্ত পদার্থ। এর একটি বিশেষ গুণ আছে। যখন কোন সূত্র থেকে এনার্জি পতিত হয় তখন তার এটম নির্গত করে অল্প তরঙ্গসংখ্যার [ফ্রিকুয়েন্সিসম্পন্ন] দৃশ্যমান আলো। সাধারণত টিউবের ভেতর থাকে পারদ কণা। টিউবের কাচের অভ্যন্তর লেপা থাকে ঐ ফসফার দ্রব্য দ্বারা। যখন ইলেকট্রিসিটি টিউবের মধ্যদিয়ে অতিক্রম করে, তখন পারদের এটম অস্থির হয়ে ওঠে। ফলে এটমগুলো থেকে নির্গত হয় চার ধরনের আলো: **নীল, সবুজ, বেগুনি ও আলট্রাভাইলোট**। টিউবের ভেতর ফসফার এটম আলট্রাভাইলোট তরঙ্গকে চুষে নেয়। এসময় তারা রিলিজ করে কিছু এনার্জি তাপ হিসাবে। কিন্তু এর পূর্বে নির্গত করে দৃশ্যমান আলো যার ফ্রিকুয়েন্সি অল্প।

অনুরূপ এই যুক্ত পদার্থ ফসফার ব্যবহৃত হয় টিভির ছবি-টিউবে। টিউব থেকে আগত **ইলেকট্রন বীম** [আলোকধারা] স্ক্রীনের ছোট্ট ছোট্ট ফসফার পয়েন্টে পতিত হয়। এটমগুলো অস্থির হয়ে ওঠে। তাদের ইলেকট্রন উচ্চ এনার্জি লেবেলে লাফ মারে। এরপর যখন এটমগুলোর ইলেকট্রন পুনরায় স্বীয় এনার্জি লেবেলে ফিরে আসে তখন তারা নির্গত করে কিছু তাপ ও দৃশ্যমান আলো। সকল ফসফার থেকে নির্গত আলো দ্বারা তৈরী হয় টিভি-চলচিত্র।

অপর আরেক আলোকসূত্র আছে। এটা এটম থেকে আসে না। এই আলোকসূত্রকে বলে **'সিন্‌ক্রোটন রেডিয়েশন'** [synchrotron radiation]। এরূপ সিস্টেমে বড়ো একটি চুম্বক দ্বারা মাইক্রওয়েভ রেডিয়েশনের মাধ্যমে ইলেকট্রনকে দ্রুত গতিতে ঘুরানো হয়। বলাই বাহুল্য এই মেশিনের নাম **'সিন্‌ক্রোটন'**। একে দেখতে অনেকটা **'কৃত্রিম বড়ো এটম'** মনে হয়। ঘুর্ণমান ইলেকট্রন থেকে ইচ্ছে হলে বিভিন্ন তরঙ্গসংখ্যায় [ফ্রিকুয়েন্সিতে] আলো তৈরী সম্ভব।

ইতোমধ্যে লেইজার নামক কৃত্রিম আলোর কথা বলেছি। এখন এ সম্পর্কে আরো কিছু বলবো। ইংরেজী [LASER] শব্দের অর্থ হলো [**L**ight **A**mplification by **S**timulated **E**mission of **R**adiation]। এ কথাগুলোর অর্থ কি তা এ মুহূর্তে বলছি না। আমরা লেইজার শব্দ দ্বারাই চালিয়ে যাবো। আসলে এটা একটি পদ্ধতির নাম। এ পদ্ধতিতে সাধারণ আলোকরশ্মিকে খুব টাইট-ফিট করে ফোকাস করা হয়। দেখুন নীচের চিত্র।



পাশের চিত্র থেকে বুঝা যাচ্ছে সৃষ্ট আলোকরশ্মি পোলারাইজ ও শক্তিশালী। এটা দূর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারে। মেডিসিন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, মিলিটারী প্রযুক্তি এবং যোগাযোগে আজকাল উন্নতমানের লেইজার ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটারের **কমপেক্ট ডিক্স** [সিডি] থেকে তথ্য লেইজার দ্বারা **'পড়া'** ও **'লেখা'** হয়। মোটকথা আজকের হাই-টেক দুনিয়ায় লেইজার আলোর ব্যবহার সর্বক্ষেত্রে হচ্ছে।

খ. ২. আলোক সনাক্তকরণ

প্রিয় ছাত্র বন্ধুরা! আজকের লেকচারের শেষাংশে এসে গেছি। তবে সমাপ্তির পূর্বে আলোকবিজ্ঞানের আরেকটি দিক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। এ পর্যন্ত আমরা আলো সৃষ্টির উপর আলোচনা করেছি। কিন্তু যেরূপ আলো সৃষ্টির বিভিন্ন পথ আছে ঠিক তদ্রূপ আলো সনাক্তকরণেরও বিভিন্ন উপায়-অবলম্বন আছে। সনাক্তকরণ সম্পর্কে আলোচনায় আমরা দু'টি বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবো। এগুলো হলো: **১. ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট** [photoelectric effect] ও **২. ফটোকেমিক্যাল ডিটেকশন** [photochemical detection]। শব্দগুলো ইংরেজী। এদের সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ নেই। সুতরাং নিম্নে এদের পূর্ণাঙ্গ [বাংলা] ব্যাখ্যার উপরই আমরা নির্ভর করবো।

খ. ২. ক. ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট [photoelectric effect]

সংজ্ঞা: প্রথমে আমরা এই ক্রিয়ার একটি সংজ্ঞা তুলে ধরবো। এ থেকে বিষয়টির মূলে কি আছে তা ধরা পড়বে। শব্দ দু'টির **অর্থ:** আলোকরশ্মি দ্বারা ইলেকট্রন নির্গত হওয়া। **ব্যাখ্যা: 'যখন কোন বস্তু ইলেকট্রমেগনেটিক বিকিরণের শিকার হয় তখন সে বস্তু থেকে বেরিয়ে আসে মুক্ত কিছু ইলেকট্রন। এই ক্রিয়ার নামই ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট।'**

উপরের সংজ্ঞাটি সাধারণ। এর মানে যে কোন ধরনের **'ইলেকট্রমেগনেটিক বিকিরণ'** থেকে ইলেকট্রন মুক্ত হতে পারে। আমরা যেহেতু আলোকবিজ্ঞানের উপর আলোচনা করছি তাই আমাদের ফোকাস সেদিকেই থাকা উচিৎ। কোন ধাতুজাতীয় কন্ডাক্টারের উপর যখন সূর্যের আলো পতিত হয় তখন এই ক্রিয়ার মাধ্যমে ইলেকট্রন **'মুক্ত'** হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানীরা প্রযুক্তির মাধ্যমে সূর্যের এই **'বিনামূল্যের'** এনার্জিকে কাজে লাগিয়েছেন। এই প্রযুক্তির নাম **ফটোইলেকট্রিক সেল** [photoelectric cell]। আমাদের দেশে **'গ্রামীণ শক্তি'** নামক একটি কোম্পানীর কথা আপনারা শুনেছেন। গ্রামবাংলার অনেক অঞ্চল এখনো জাতীয় গ্রিড থেকে ইলেকট্রিসিটি পাচ্ছেন না। গ্রামীণ শক্তি এসব অঞ্চলে যেয়ে **'সৌরবিদ্যুৎ'** সরবরাহ করছে। অবশ্য টাকার বিনিময়ে! যে প্রযুক্তিতে তা হচ্ছে তা-ই হলো **'ফটোইলেকট্রিক সেল প্রযুক্তি'**। সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ তৈরীর প্রযুক্তির মূল অংশকে বলে **'সোলার সেল'** [সৌরসেল]। সূর্যের আলোকরশ্মি এসব সেলে পতিত হয়। মুক্ত করে অনেক ইলেকট্রন। এগুলো **ঋণাত্মক চার্জসম্পন্ন** [নেগিটিভ]। তাদের প্রাথমিক অবস্থান **'ফটোকেথোড'** নামক প্যানেলে। এদেরকে একটি **ধনাত্মক চার্জসম্পন্ন** [পজিটিভ] **'এ্যানোড'**-এ নিয়ে যাওয়া হয়। মাঝখানে রাখলেন, ব্যাটারি। চলন্ত ইলেকট্রন ব্যাটারি চার্জ করে দেয়। এই ক্রিয়া দৈনিক সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলতে থাকে। খুব সংক্ষেপে সৌরবিদ্যুৎ এটাই।

নিম্নে একটি **'সোলার বাড়ি'**র ছবি তুলে ধরেছি। সোলার সেল **'হাতঘড়ি'** ও **'কালক্যুলেটার'** থেকে মহাকাশে প্রেরিত **'কৃত্রিম উপগ্রহে'** কারেন্ট যোগানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। সূর্যের এনার্জি ফ্রি। তবে প্রযুক্তির মাধ্যমে তা কাজে লাগানো মূল্যসাপেক্ষ। আশাকরা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে নতুন টেকনোলজির মাধ্যমে মূল্য কমানো সম্ভব হবে।

খ. ২. খ. ফটোকেমিক্যাল ডিটেকশন [photochemical detection]



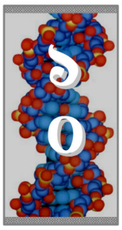
সংজ্ঞা: শব্দ দু'টোর অর্থ হলো, **'রসায়নিক দ্রব্যে আলোকরশ্মি যে রদবদল সৃষ্টি করে তা সনাক্তকরণ'**। পুরো ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলতে হয়, **'ফটোইলেকট্রিক ইফেক্টের কারণে রসায়নিক দ্রব্যে রদবদল সৃষ্টি হয়। ফটোগ্রাফিক ফিল্ম সেরূপ একটি দ্রব্য। এটার উপর আলোকরশ্মি পতিত হলে ছবি অঙ্কিত হয়। যে প্রযুক্তির মাধ্যমে এ কাজটি আঞ্জাম দেওয়া হয় তা-ই ফটোকেমিক্যাল ডিটেকশন'**। অন্যকথায় ফাটোগ্রাফ করার ফিল্মে কিভাবে ছবি সংরক্ষিত হয় সেই প্রযুক্তি হলো এটি। আমরা এ ব্যাপারে খুব বেশী গভীরে যাবো না।

আমরা জানি আলোকরশ্মি মূলত **'ফটোন'** নামক প্যাকেট-এনার্জি। ফটোফিল্মে থাকে ফটোন-এনার্জির প্রতি দুর্বল রসায়নিক বস্তু। আলো এতে সৃষ্টি করে রসায়নিক রদবদল। আলোকরশ্মির তথা ফটোনের এনার্জির মাত্রার তারতম্য অনুযায়ী ফিল্মে বিভিন্ন **'সাদাকালো'** কিংবা **'রঙিন'** ছাপ পড়ে তা সংরক্ষিত হয়। পরে বিশেষ রসায়নিক দ্রব্যের দ্বারা তা **'প্রসেস'** করে ছবিতে রূপান্তর করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মানুষের দৃষ্টিশক্তি অনুরূপ উপায়ে কার্য করে। চোখের পেছনে **রেটিনা** নামক স্থান হলো **'ফটোসেনসিটিভ'** এলাকা। এতে আছে **'রড'** ও **'কৌন'** [মোচাকার] ছোট্ট ছোট্ট বস্তু। চোখের সামনের লেন্স থেকে আলো-আধার এসে পতিত হলে রসায়নিক রদবদল ঘটে রেটিনায়। এরপর **'অপটিক নার্ভ'** [আলোক-স্নায়ু] এর মাধ্যমে এই তথ্য চলে যায় মস্তিষ্কে। মগজ এই সিগনালকে **'এ্যানালাইজ'** [গবেষণা] করে আমাদেরকে **'জ্যান্ত চলচিত্র'** দেখায়। অতি সংক্ষেপে চোখের দৃষ্টিশক্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শোনলাম। এ ব্যাপারে পরবর্তী কোন লেকচারে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

যাক, আজকের জন্য এটুকুই। আপনাদের সবাইকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের লেকচার শেষ করছি। আগামী বক্তৃতায় আমরা আলোকবিজ্ঞানের অন্যান্য দিকে নিয়ে আলোচনার আশা রাখি। খাস করে আলোকরশ্মির **'চারিত্রিক'** বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। আমরা তখন সেদিকেই মনোযোগ দেবো। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

খ. পদার্থবিজ্ঞান : বস্তুজগতের মিথস্ক্রিয়া

বক্তৃতা ১০ : ঘ. আলোকের চরিত্র

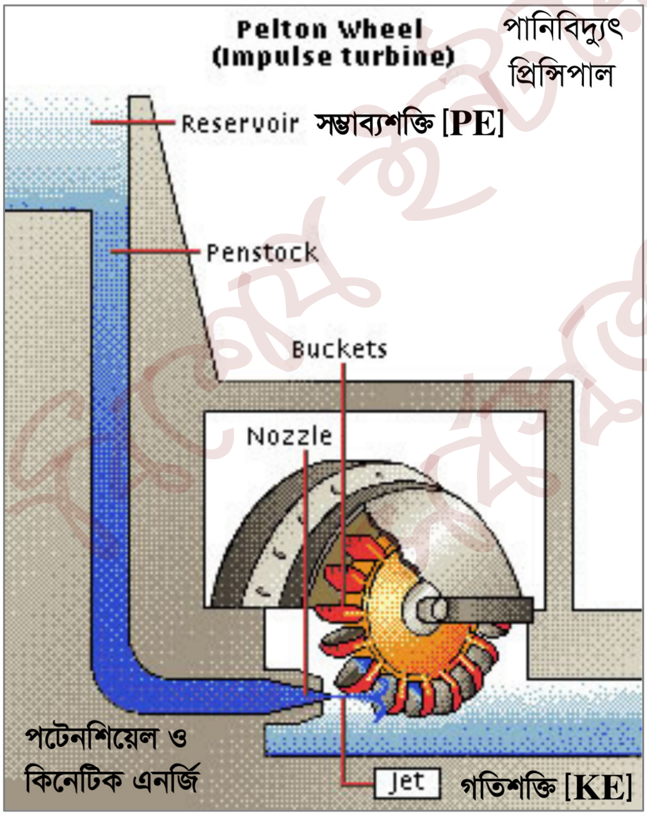
আস্‌সালামু আলাইকুম। আমার প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! **'বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান'** শীর্ষক লেকচারে আবারো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। এটা দশম বক্তৃতা। গত নয়টি লেকচারে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের বেশ কিছু বিষয় কাভার করেছি। আমি আশাবাদী, আপনারা এ থেকে উপকৃত হয়েছেন। এ বক্তৃতামালার উদ্দেশ্য **'বিজ্ঞান কিভাবে জগতটাকে বুঝে'** তা জানা।

যাক, আজকের বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করি, কেমন? গত দু'টি বক্তৃতার বিষয় ছিলো **'আলোকবিজ্ঞান'**। আজকেও আমরা এ বিষয়ের উপরই থাকবো। প্রথমত বুঝে নিই আলোক নামক এনার্জির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী। ও হ্যাঁ, আমি অহরহ **'এনার্জি'** শব্দটির প্রয়োগ করছি। ইন-কেইস আপনাদের কেউ এ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল না থাকলে- এটি কি, তা বুঝে নিন।

ঘ. ক. এনার্জি [energy]

এনার্জির বাংলা ক'টি প্রতিশব্দ হলো, **'বল'**, **'ক্ষমতা'**, **'শৌর্যবীর্য'**, **'শক্তি'** [সূত্রঃ Bangla Academy English-Bengali Dictionary]। সবগুলোই সুন্দর শব্দ। তবে এনার্জি শব্দটির প্রয়োগই হবে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বাধিক শুদ্ধ। অভিধানে দেওয়া কোনো শব্দই ইংরেজী **'এনার্জি'** শব্দের পূর্ণাঙ্গ অর্থবোধক নয়। সুতরাং আমরা এনার্জি শব্দটিই ব্যবহার করবো। এবার আসি এর ব্যাখ্যায়।

বলা হয়েছে, **'বস্তুর [সর্ব লেবেলে] গতি কিংবা নিজের অবস্থানের তুলনায় তার উপর সক্রিয় ফোর্স থেকে যে কর্মক্ষমতার সৃষ্টি হয় তাকেই বলে এনার্জি'**। গতির সঙ্গে সম্পর্কিত এনার্জির নাম **'কিনেটিক এনার্জি'** [kinetic energy - KE]। অবস্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত এনার্জির নাম **'পটেনশিয়েল এনার্জি'** [potential energy - PE]। প্রথমটিকে বাংলায় **'গতিশক্তি'** ও দ্বিতীয়টিকে **'সম্ভাব্যশক্তি'** বলা যায়। এ দু'টো এনার্জি অনেক ধরনের চরিত্রে বিদ্যমান আছে স্বভাবে। যেমনঃ **মেকানিক্যাল** [যান্ত্রিক], **থারমল** [তাপশক্তি], **কেমিক্যাল** [রসায়নিক], **বৈদ্যুতিক, রেডিয়েন্ট** [তেজস্ক্রিয়], **এটোমিক** [আনবিক], **বিদ্যুৎ-চুম্বকীয়** ইত্যাদি। আসলে পুরো বস্তুজগতেই এনার্জির খেলা চলছে। এনার্জি যেখানে নেই- বস্তু সেখানে নেই। এনার্জি থাকার নাম বস্তু থাকা। অন্যকথায় এনার্জির কারণেই বস্তু অস্তিত্বশীল। এনার্জি সম্পর্কে আরেক ব্যাপার জেনে নিতে হবে। **'সকল এনার্জি এক অবস্থা থেকে অপর একাধিক অবস্থায় রূপান্তর সম্ভব। এতে কিছু এনার্জি ক্ষয় হতে পারে। কিন্তু মোট এনার্জি বাড়েও না কমেও না- সর্বদাই সমান থাকে।'** অন্যকথায়, এনার্জি বানানো যায় না এবং ধ্বংসও করা যায় না। শুধুমাত্র এক অবস্থা থেকে অপর এক বা একাধিক অবস্থায় রূপান্তর সম্ভব প্রযুক্তির মাধ্যমে। এই রূপান্তরকালে এনার্জি দ্বারা কর্ম সম্পাদিত হতে পারে। বিজ্ঞানের নির্যাস হিসাবে খ্যাত **'টেকনোলজির'** কাজ এটাই। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে **'এনার্জি'** ও **'ম্যাস'** [বস্তু] একই জিনিষ। অর্থাৎ বস্তুকে এনার্জিতে রূপান্তর ও এনার্জিকে বস্তুতে রূপান্তর সম্ভব। নিউক্লিয়ার রিয়েকশনে এটাই সংঘটিত হয়। যাক এনার্জি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভের পর আমরা এবার ফিরে যাবো মূল আলোচনায়।



ঘ. খ. বস্তুর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া

আলোকরশ্মি কোনো বস্তুতে পতিত হলে এটমের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে। এর কারণ হলো এনার্জি। কোন্ **তরঙ্গসংখ্যা** [ফ্রিকুয়েন্সি] আলোর মধ্যে আছে এবং বস্তুর এটোমিক কাঠামো কি, তা-ই নির্ধারণ করে কিভাবে এই ইন্টারেকশন হবে। পতনের জিনিষ ট্রান্সপেরেন্ট বা আলোকভেদ্য হলে বস্তুর এটমের ইলেকট্রনে সৃষ্টি হয় কম্পন। ফলে আলোকরশ্মির গতি কিছুটা কমে আসে তবে এনার্জি ক্ষয় হয় না। ঘন বস্তুতে পতিত হলে আলোকরশ্মির গতি অনেক বেশী কমে আসে- কিন্তু এ ক্ষেত্রেও মাত্রা নির্ভর করে ফ্রিকুয়েন্সি ও বস্তুর এটোমিক কাঠামোর উপর। তবে আলোকরশ্মি সম্পূর্ণরূপে গতিহীন করা কঠিন। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে অবশ্য কৃত্রিম উপায়ে আলোকরশ্মিকে সম্পূর্ণরূপে **'অনড়'** রাখতে সক্ষম হয়েছেন। গত ২০০১ সালে সর্বপ্রথম এ কাজটি সম্পন্ন হয়। অতিমাত্রায় ঠাণ্ডা সোডিয়াম এটমের **'মেঘে'** একগুচ্ছ আলোকরশ্মি ক্ষণকালের জন্য অনড় রাখতে সক্ষম হন একদল বিজ্ঞানী।

আলোকরশ্মি স্বাভাবিকভাবে সদাচলমান। সম্পূর্ণ অ-আলোকভেদ্য বস্তুর উপর পতিত হলে আলোক-এনার্জি হয় বস্তুর এটম কর্তৃক শোষণ না হয় প্রতিবিম্ব হবে। বস্তু যতো কালে রঙের হবে আলোকরশ্মি তাতে ততো বেশী

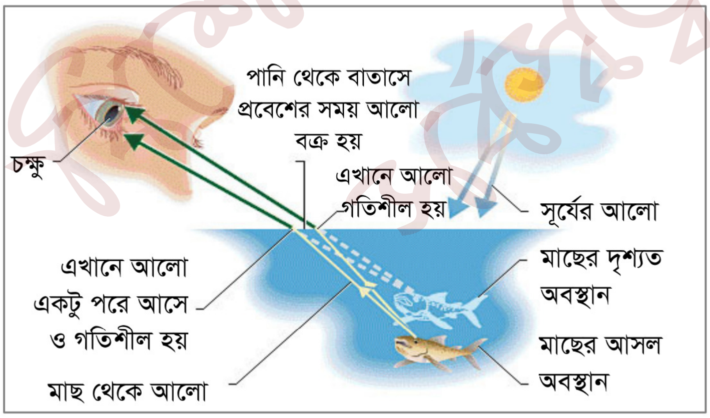
শোষণের শিকার হবে। ফলে বস্তুর এটমে এনার্জি থেকে যাবে ও শুরু করবে কম্পন। এ থেকে সৃষ্টি হবে তাপশক্তি। এ কারণেই, কালো বস্তু সূর্যের আলোতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অপরদিকে শ্বেত কাপড় যেমন **'টেস্ট'** ক্রিকেটারদের ইউনিফর্ম, অনেকটা ঠাণ্ডা থাকে। আলোকরশ্মি পতনের পর তার এনার্জিসহ প্রতিবিম্ব হয়। সকল বস্তুই আলোকরশ্মি অল্প-বিস্তর শোষণ, প্রতিসরণ ও প্রতিবিম্ব করে। একটু পরই এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করবো। যে বিজ্ঞান-গবেষণা বস্তুর সঙ্গে আলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে জড়িত তার নাম **'অপটিক্স'** [optics]।

আলোকের চরিত্রকে দু'টি আলাদা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ১. বস্তুর সঙ্গে আলোকের মিথস্ক্রিয়া ও ২. কিভাবে আলোকরশ্মি ভ্রমণ করে। আমরা প্রথমটির উপর এবার বিস্তারিত আলোচনা করবো।

বস্তুর ধরন ও পৃষ্ঠদেশ কিরূপ তার উপর নির্ভর করে পতিত আলো কিভাবে মিথস্ক্রিয়া করবে। বিজ্ঞানীরা তিনটি বিশেষ ব্যাপার সনাক্ত করেছেন। এ তিনটি হলো: **১. প্রতিসরণ [refraction], ২. প্রতিবিম্ব [reflection] ও ৩. ছড়ানো [scattering]**। এ তিনটির উপর ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

ঘ. খ. ১. প্রতিসরণ [refraction]

আলোকরশ্মি বক্র হয় যখন তা এক মাধ্যম অতিক্রম করে অন্য মাধ্যমে যায়। এভাবে বক্র হওয়াকেই বলে **'প্রতিসরণ'** [refraction]। বিভিন্ন বস্তু বা মাধ্যমে আলোকরশ্মি ভিন্ন গতিতে চলে। এটা তার স্বভাব। সুতরাং এক মাধ্যমের সীমানায় পৌঁছে অপর মাধ্যমে প্রবেশের মুহূর্তে গতি পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে। যদি আলোকরশ্মি এই সীমান্ত এলাকায় কোনো কোণে পতিত হয় তাহলে রশ্মির যে দিকটি আগে নতুন মাধ্যমের সীমান্তে পৌঁছবে সেদিকের আলোর গতি বেশী বা কম হওয়া অনিবার্য হবে। গতি কম না বেশী হবে তা নির্ভর করে মাধ্যমের উপর। এর ফলে আলোকরশ্মি ঐ নতুন মাধ্যমের সীমান্তে বাধ্য হয়ে বক্র হয়। অর্থাৎ প্রতিসরণ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পানির নীচের কোন বস্তুতে আলোকরশ্মি পতিত হয়ে ফিরে আসার কথা বলা যেতে পারে। একজন পর্যবেক্ষকের চোখে পৌঁছার পূর্বে আলোকরশ্মি বস্তুতে লেগে প্রথমে পানির নীচ দিয়ে চলবে। এরপর তা বাতাসের মধ্যে চলে চোখে যেয়ে লাগবে। পর্যবেক্ষক যদি কোনো কোণ থেকে দৃষ্টিপাত করে তাহলে প্রতিসরণের কারণে সে দেখবে পানির নীচের বস্তুটি আসল স্থান থেকে একটু উপরে। নীচের চিত্র দ্বারা ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। দেখুন।



বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মাধ্যমে আলোকের গতির তারতম্য নির্ধারণের জন্য একটি হিসাব আবিষ্কার করেছেন। একে বলে **'রিফ্রেক্টিভ ইন্‌ডেক্স'** [refractive index]। বাংলায় আমরা বলতে পারি **'প্রতিসরণ সূচক'**। এটা হিসাব করার সমীকরণ হলো:

$$\mathbf{ri = c_v / c_m}$$

এখানে ri এর অর্থ হলো রিফ্রেক্টিভ ইন্‌ডেক্স [প্রতিসরণ সূচক]। c_v মানে শূন্যস্থানে আলোকের গতি [অর্থাৎ সর্বোচ্চ গতি]। c_m হলো আলোকের গতি বস্তুর অভ্যন্তরে। একটা দৃষ্টান্ত দেখতে পারি। বরফের রিফ্রেক্টিভ ইন্‌ডেক্স হলো ১.৩০৯। এ সংখ্যা থেকে কিভাবে বের করা যায় বরফের মধ্যে আলোকের গতি? উপরের সমীকরণ থেকে: [বরফের ইন্‌ডেক্স] ১.৩০৯ = [শূন্যস্থানে আলোকের গতি] ২৯,৯৭,৯২,৪৫৮ / বরফের মধ্যে আলোকের গতি। সমীকরণটি একটু ঘুরিয়ে লেখা যায়: বরফের মধ্যে আলোকের গতি = ২৯,৯৭,৯২,৪৫৮ / ১.৩০৯ = ২২,৯০,২৪,০৩২.০৮৫৫৬ মিটার / সেকেন্ড। প্রায় ৭,০৭,৬৮,৪২৬ মিটার / সেকেন্ড কম। আমরা

এখানে কিছু বস্তুর রিফ্রেক্টিভ ইন্‌ডেক্স লিপিবদ্ধ করছি। এই টেবিলে দেওয়া ইন্‌ডেক্স ৫৯০ x ১০$^{-৯}$ মিটার [৫৯০ নানো মিটার] তরঙ্গদৈর্ঘ্য-সম্পন্ন আলোকরশ্মির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমরা জানি আলোকরশ্মির গতি এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও বস্তুর গঠনপ্রণালীর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং অন্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যে চলন্ত আলোকরশ্মি নিম্নের বস্তুগুলোতে ভিন্ন গতিতে চলবে- ফলে এদের প্রতিসরণ সূচকও হবে ভিন্ন।

মাধ্যম	প্রতিসরণ সূচক
শূন্যস্থান	১.০০০০
বাতাস	১.০০০৩
বরফ	১.৩০৯০
পানি	১.৩৩০০
এ্যথল মদ (alcohol)	১.৩৬০০
কাচ	১.৫২০০
লবণ	১.৫৪০০
হীরা	২.৪২০০

লক্ষ্য করুণ, হীরার মধ্যে আলোকের গতি কতটুকু কমে আসে। উপরের সমীকরণ থেকে হিসাব করলে দেখা যায় হীরার মধ্যে আলোকরশ্মির গতি হবে **১২,৩৮,৮১,১৮১** মিটার / সেকেন্ড - যা সর্বোচ্চ গতির অর্ধেকের চেয়েও কম। অপর আরেক ব্যাপার হলো তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে জানা যায় আলোকরশ্মির রঙ। সুতরাং বিভিন্ন রঙের আলো বিভিন্ন ধরনের কাচ ভিন্ন **'কোণে'** আলোকরশ্মিকে বাঁকা করে এক মাধ্যম থেকে অপর মাধ্যমে চলার সময়। আর এটাই কাচের তৈরী প্রিজমে রঙিন **স্পেকট্রাম** [বর্ণচ্ছটা] প্রদর্শনের মূল কারণ। রিফ্রেক্টিভ ইন্‌ডেক্ট জানলে কোন্ কোণে আলোকরশ্মি আলোকভেদ্য বস্তুতে মাধ্যম অতিক্রমকালে চলবে তা-ও জানা যায়। এটাকে বলে **'স্নেল্‌স আইন'** [Snell's Law]। বাস্তবে এটি একটি গাণিতিক সমীকরণ। এর মাধ্যমে অপটিশিয়ানরা চশমার **'লেন্স'** ডিজাইন ও অন্যান্য অপটিক্যাল বস্তু দ্বারা আলোক রশ্মিকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

ঘ. খ. ২. প্রতিবিম্ব [reflection]

কে না দেখেছেন নিজের প্রতিচ্ছবি আরশিতে। এটার নামই আলোকরশ্মির প্রতিবিম্বতা। এটার কারণও কিন্তু দু'টি মাধ্যমে আলোকরশ্মি চলন্ত হওয়া। অর্থাৎ যখন রশ্মি উভয় মাধ্যমের সীমানা অতিক্রম করে, ঠিক সে মুহূর্তে প্রতিবিম্ব হয়। কিছুটা আলো প্রতিবিম্ব হয়ে প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে। যে কোণে পতন সংঘটিত হয়, ঠিক সমপরিমাণ কোণে তা প্রতিবিম্ব হবে। যেভাবে একটি বল ফ্লোরে পড়ে লাফ মারে। আশাকরি প্রতিবিম্ব সম্পর্কে সকলেই ওয়াকিফহাল। এরপরও ব্যাপারটি বুঝতে নীচের চিত্র দু'টি গবেষণা করা যায়। উভয় ধরনের দূরবীক্ষণযন্ত্রের মৌলিক প্রযুক্তি সম্পর্কেও কিছুটা জানা যাবে। উল্লেখ্য, আলোকবিজ্ঞানের উপর গভীর গবেষণার সুফল চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিসহ মহাকাশে স্থাপিত দূরবীক্ষণযন্ত্র এবং অন্যান্য বহু প্রযুক্তিতে দেখা যায়।





ঘ. খ. ৩. ছড়ানো [scattering]

আলোকরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য আছে। আমরা এ কথাটি বার বার বলে আসছি। তরঙ্গদৈর্ঘ্য মানে তরঙ্গের এক অংশ থেকে অপর একই ধরনের অংশের দূরত্ব। এখন কোন ট্রান্সপেরেন্ট [আলোকভেদ্য] বস্তুর এটম যদি অমসৃণ থাকে এবং একে অন্যের মধ্যে দূরত্ব আলোকরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে বেশী হয় তাহলে কি হবে? বস্তুর এরূপ

অবস্থাকে আমরা বলতে পারি, তার মলিকিউলগুলো অমসৃণভাবে জড়িত আছে। তাহলে প্রশ্নের উত্তর হবে, আলোকরশ্মি ছড়ানো। আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল একটি দৃষ্টান্ত। বায়ুমণ্ডলের মলিকিউলগুলো ঠিক এভাবেই অমসৃণ। সূর্যের আলো এতে পতিত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পাড়ে। উজ্জ্বল করে তুলে সমগ্র আবহমণ্ডলকে। যে আলোর ফ্রিকুয়েন্সি বা তরঙ্গসংখ্যা বেশী ও কম তরঙ্গদৈর্ঘ্য তা ছড়িয়ে পড়বে অতিমাত্রায়। এর বিপরীত হলে ছড়িয়ে পড়ার মাত্রা হবে কম। আমাদের বায়ুমণ্ডল সর্বাপেক্ষা বেশী ছড়ায় **'ভাইলোট'** আলো। মানবচোখে এ আলো খুব একটা দৃশ্যমান নয়। কিন্তু নীলের প্রতি চোখের প্রতিক্রিয়া অধিক। এটা চোখ দেখে খুব ভালো করে। আর সূর্যের তরঙ্গের পরবর্তী যে রঙ বেশী ছড়িয়ে পড়ে তা-ই হলো নীল। সূর্যাস্ত দেখতে লাল। কারণ কি? জবাব: যখন সূর্য পশ্চিম দিগন্তে থাকে তখন সূর্যালোক গাঢ় বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে আমাদের চোখে পৌঁছে। এসময় ঘন বাতাস, ধূলো এবং পাতলা কুয়াশা ইত্যাদি সূর্যের নীল আলোকে খুব বেশী ছড়িয়ে দেয়।

আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়ার অপর কারণ হলো বস্তুর মধ্যস্থ **'ভেজাল'**। আমরা অবশ্য খাদ্যে ভেজাল থাকার কথা বলছি না! এখানে শব্দটির প্রয়োগ ইংরেজী **'ইমপিউরিটি'** [impurity] শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে এসেছে। কিভাবে বিভিন্ন গ্রহের বায়ুমণ্ডলে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ে তা থেকে বিজ্ঞানীরা সে আবহমণ্ডলের বিভিন্ন বস্তুর উপস্থিতি নির্ণয় করতে পারেন। যা হোক, ছড়িয়ে পড়ার উপর বেশ কিছু তথ্য আলোচিত হলো। এবার আসুন অন্য প্রসঙ্গে যাই।

ঘ. ২. আলোকের গতিমতি

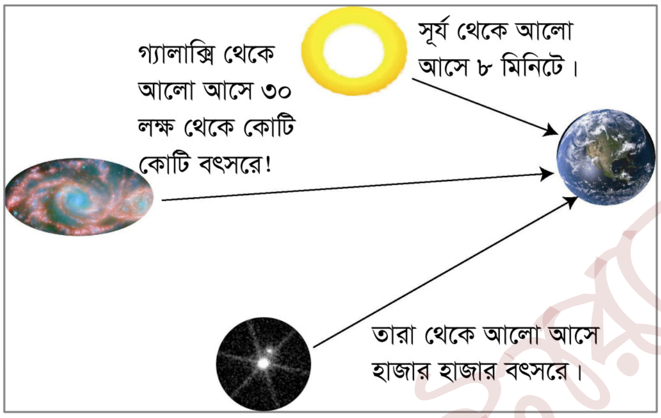
আলোকরশ্মি সর্বোচ্চ গতিতে চলে। আমরা ইতোমধ্যে বলেছি, শূন্যস্থানে এর গতি ২৯,৯৭,৯২,৪৫৮ মিটার প্রতি সেকেন্ড [২,৯৯,৭৯২.৪৫৮ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড, মাইলের হিসাবে ১,৮৬,২৮২.৪০ মাইল প্রতি সেকেন্ড]। শুধু আলোকরশ্মি কেনো, যাবতীয় ইলেকট্রমেগনেটিক রশ্মি এই একই গতিতে চলে। অর্থাৎ বর্ণচ্ছটার [স্পেকট্রামের] দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল তরঙ্গের গতি এটি। আমরা কিভাবে এই উচ্চ গতিকে মাপতে পারি? বা এ প্রশ্ন করা যায়, বিজ্ঞানীরা কিভাবে মাপলেন?

একক রঙের আলোকরশ্মির অপর নাম **মনোক্রমেটিক আলো** [monochromatic light]। এর কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে যা মাপা যায়। আমরা ইলেকট্রমেগনেটিক ওয়েভ [বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ] নিয়ে আলোচনাকালে বলেছি, আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য **মিটার** এককে মাপা হয়। তার ফ্রিকুয়েন্সি বা তরঙ্গসংখ্যা মাপা হয় **হার্টজ্** এককে। আমরা এটাও বলেছি, **ওয়েভলেন্থ** [তরঙ্গদৈর্ঘ্য] মাপার একটি যন্ত্র আছে। এটার নাম **'ইন্টারফেরোমিটার'** [interferometer]। আর ফ্রিকুয়েন্সি মাপতে দরকার পড়ে এই ওয়েভলেন্থ ও আলোকের গতি যার একক হলো মিটার প্রতি সেকেন্ড। অর্থাৎ আলোকের গতি = তরঙ্গদৈর্ঘ্য x তরঙ্গসংখ্যা। অনেকবার মাপার পর **১৯৮৩** সনে বিজ্ঞানীরা ঘোষণা দিয়েছেন শূন্যস্থানে আলোকের যথার্থ গতি, $c = 299{,}792{,}458$ m/s (exact)। এটাই স্বভাবে সর্বোচ্চ গতিতে চলন্ত এনার্জি। এর চেয়ে উচ্চ গতিতে কিছুই চলতে পারে না।

ছাত্রবন্ধুরা! আজকের বক্তৃতার শেষে এসে গেছি। দু'একটা কথা বাকী আছে। আলোকবিজ্ঞানের উপর আমাদের তথ্যানুসন্ধান বেশ কিছু হয়েছে। কিন্তু শেষ হয় নি মোটেই। এটা পদার্থবিজ্ঞানের একটি মৌলিক শাখা। আমরা অবশ্য আর গভীরে যাচ্ছি না। তবে আলোকবিজ্ঞানের ব্যাপ্তি আরো কিছু আঁচ করে নিতে তিনটি বিষয় খুব সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করলে ভালো হয়।

১. আলোকের গতি ও সময় বিলম্বিত হওয়া: আমরা একটু আগে আলোকের গতি সম্পর্কে বলেছি। আর গতি যতো বড়োই হোক এর সঙ্গে সময়ের সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ কোন আলোকসূত্র থেকে পর্যবেক্ষকের নিকট রশ্মিটি পৌঁছতে যতো কম বা বেশীই হোক, **সময়** অতিবাহিত হবেই। ব্যাপারটি বুঝার জন্য সূর্যের আলোর কথা বলা যায়।

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব কম না- প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। সূর্যের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের হয়ে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে ছুটে চলেও আলোকরশ্মি পৃথিবীর উপর পৌঁছাতে সময় লাগে ৮ মিনিটেরও বেশী। আর এটা সবাই জানেন, আলোকরশ্মি বস্তু থেকে এসে চোখে পতিত হলেই সেটা আমরা **'দেখতে'** পাই। তাহলে বুঝা গেল সূর্য পূর্বাকাশে উদিত হওয়ার ৮ মিনিট পর তাকে আমরা দেখি। অর্থাৎ সূর্য আকাশের যে স্থানে বাস্তবে অবস্থান করে সেখানে আমরা তাকে কখনো দেখি না! বেশ নীচে দেখি। এ থেকে স্পষ্ট হলো আলোকের গতি সীমিত থাকায় কোন বস্তুই তার সঠিক স্থানে দেখার উপায় নেই। দূরত্ব মেপে নির্ধারণ করতে হবে বস্তুটি যে কোনো মুহূর্তে আসলে কোথায় আছে! ভাবার ব্যাপার নয় কি? এ সম্পর্কে নীচের চিত্র থেকে আরো কিছু জানা যাবে।



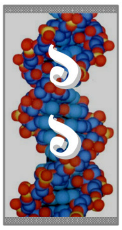
২. ডিফ্রেকশন এন্ড ইন্টারফেরেন্স অব লাইট [diffraction and interference of light] - আলোকের অপবর্তন ও ব্যতিচার: মনে করুন আলোকরশ্মিকে আপনি খুব ছোট্ট একটি প্রবেশপথে চলতে দিলেন। পথের আয়তন যদি রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কাছাকাছি হয় তাহলে আলোকরশ্মি ডিফ্রেক্ট বা তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে। যখন আলোকরশ্মি অনুরূপ দু'টি প্রবেশপথে চলবে তখন দু'টি তরঙ্গ বেরিয়ে এসে একে অন্যের সঙ্গে ইন্টারফিয়ার বা ব্যতিচার করবে। সুতরাং এ কথাগুলো থেকে ডিফ্রেকশন ও ইন্টারফেরেন্স এর অর্থ পরিষ্কার হলো। বিজ্ঞানীরা আলোকের এই চারিত্র কাজে লাগিয়ে আবিষ্কার করেছেন, হলোগ্রাফি [holography]। সংক্ষেপে এর অর্থ হলো লেইজার আলোকরশ্মি দ্বারা ৩-মাত্রিক সদৃশ ছবি সৃষ্টি। নীচের চিত্রটি দেখুন।



৩. ঔজ্জ্বল্য [brightness]: মানবচোখে আলোকরশ্মির ঔজ্জ্বল্য কতটুকু তা জানার প্রয়োজন পড়ে অনেক ক্ষেত্রে। বিজ্ঞানীরা লুউমেন [lumen] নামক একটি একক ব্যবহার করেন ঔজ্জ্বল্যতা মাপতে। মহাকাশবিজ্ঞানে তারা, তারা ক্লাস্টার, গ্যালাক্সি ইত্যাদির ঔজ্জ্বল্য জানা জরুরী। আমরা মহাকাশবিজ্ঞানের উপর আলোচনাকালে এ সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য উপস্থাপন করবো।

আজ এ পর্যন্তই। পদার্থবিজ্ঞানের একটি মৌলিক শাখা **'আলোকবিজ্ঞানে'**র উপর তিনটি লেকচারের এখানেই সমাপ্তি। আরো দু'টি লেকচার বাকী। আমি ইতোমধ্যে **সালোকসংশ্লেষণ** বা **ফটোসিনথেসিস** নামক প্রসেসের কথা বলেছি। আগামী লেকচারে এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা শুরু হবে। আপনারা বুঝতে সক্ষম হবেন ইনশাআল্লাহ, কিভাবে সবুজ পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষরাজি আমাদের বেঁচে থাকার মৌলিক উপাদান অক্সিজেন গ্যাস তৈরী করে। সুতরাং সামনের দু'টি বক্তৃতা কেউ মিস করবেন না- আশাকরি। আল্লাহ হাফিজ।





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

খ. পদার্থবিজ্ঞান : বস্তুজগতের মিথস্ক্রিয়া

বক্তৃতা ১১ : সালোকসংশ্লেষণ [photosynthesis]

সবাইকে উষ্ণ স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই ১১তম লেকচারে। বিজ্ঞানকে জানার সীমায় পৌঁছা আদৌ কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এক যুগ ছিলো, বিজ্ঞানের ব্যাপ্তি তেমন চওড়া হয় নি। তখনো সবাই সকল বিষয়ের উপর পারদর্শী হয়েছেন, এমন দাবী কেউ করেন নি। আর আমাদের এই আধুনিক যুগ তো বিজ্ঞানেরই। লক্ষ লক্ষ বিজ্ঞানী সমগ্র পৃথিবীব্যাপী বিজ্ঞানের শত শত মূল, শাখা, উপশাখা ও উপ-উপশাখায় গবেষণা চালাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। আবিষ্কার করছেন নতুন নতুন তথ্য। তুলে ধরছেন বস্তুজগৎ ও এর অসংখ্য দৃশ্যমান ও অদৃশ্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যাস্বরূপ নব নব থিওরী। এসব কথা থেকে কিন্তু নিরাশ হওয়ার অবকাশ নেই। ভাসাভাসাভাবে ব্যাখ্যা দ্বারাও আমরা বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সম্পর্কে অন্তত প্রাথমিক **'ধারণা'** অর্জনের আশা করতে পারি। আর তা-ই হলো এই লেকচার সিরিজের উদ্দেশ্য। যাক, প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! এ পর্যন্ত দশটি বক্তৃতা উপস্থাপন করেছি। গেল বক্তৃতার শেষে বলেছিলাম **'সালোকসংশ্লেষণ'** [photosynthesis] নামক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের উপর আলোচনা শুরু করবো আজকের বক্তৃতায়। আসুন, আমরা এখন সেদিকে মনোনিবেশ করি।

ক. সালোকসংশ্লেষণ [photosynthesis] : ভূমিকা

বিষয়টি জটিল। তবে এটা জানা দরকার। পৃথিবীর সমগ্র প্রাণীদের বেঁচে থাকা সম্ভব হচ্ছে এই প্রতিক্রিয়া সবুজ পত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদের মধ্যে সংঘটিত হওয়ার কারণে। এই **'নেচারেল'** প্রতিক্রিয়ার নাম **'ফটোসিনথেসিস'** [সালোকসংশ্লেষণ]। সূর্য থেকে আগত দৃশ্যমান এনার্জির নাম আলো। আলোকরশ্মির এনার্জির কিছুটা ক্ষমতা আমরা টের পাই যখন গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে মাথার উপর সূর্যটি থাকে। কিন্তু এই **'গরম'** তাপ ফটোসিনথেসিস প্রতিক্রিয়া ঘটায়

না। সবুজ পত্রে যখন আলোকরশ্মি পতিত হয় তখন আলোকরশ্মির **ফটোন** [এনার্জি প্যাকেট] প্রতিক্রিয়া ঘটায়। এই প্রতিক্রিয়া উদ্ভিদের **'শ্বাস-নিঃশ্বাসের'** মতো। প্রতিক্রিয়ার ফলাফল- **কার্বন ডাইওক্সাইড** নামক গ্যাস ও পানিকে সাধারণ **চিনি গ্লুকোজে** পরিণত করা। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়ার একটি বাই-প্রোডাক্ট আছে যা উদ্ভিদ নিজে কাজে লাগায় না বা তার জন্য এটা ব্যবহারযোগ্য নয়। এই বাই-প্রোডাক্টের নাম **অক্সিজেন**। আর এই গ্যাসটি হলো **'সকল প্রাণীদের'** বেঁচে থাকার মৌলিক এনার্জি-সূত্র।

ভূমিকা শেষ। এবার খুব সতর্কতার সঙ্গে অতি সরল ভাষায় আমরা প্রসেসটির উপর আলোচনা করবো। আজকের লেকচার যথেষ্ট নয়- আমরা আগামী লেকচারও একই বিষয়ের উপর নিবদ্ধ রাখবো।

খ. ফটোসিনথেসিসের ক্ষেত্র ও উদ্দিষ্ট উৎপাদনবস্তু

এই প্রসেসের ক্ষেত্র সকল **'সবুজ'** পত্রবিশিষ্ট **উদ্ভিদ**, **সমুদ্রশৈবাল**, **শেওলা** এবং বিশেষ ধরনের **জীবাণু** [bacteria]। সবে মিলে প্রতি সেকেন্ডে তৈরী করে যাচ্ছে কোটি কোটি নতুন গ্লুকোজ মলিকিউল। উদ্ভিদ এসব **'কার্বহাইড্রেট'** [খাবারের এনার্জি অংশ] গ্লুকোজ কাজে লাগায় নিজেদের পত্র, পুষ্প, ফল ও বীচিতে। তারা গ্লুকোজের একাংশ **সেল্যুলুজ** [উদ্ভিদ কোষের দেওয়ালের মূল বস্তু] তৈরীতেও কাজে লাগায়। অধিকাংশ উদ্ভিদ প্রয়োজনের বেশী গ্লুকোজ তৈরী করে সালোকসংশ্লেষণ প্রতিক্রিয়ায়। এর কারণ কি? সংরক্ষণ। বৃক্ষের মূল, কাণ্ড ও পত্রে এসব কার্বহাইড্রেট সংরক্ষিত থাকে। প্রতি বৎসর ফটোসিনথেসিস থেকে বিরাট পরিমাণ **'অতিরিক্ত'** কার্বহাইড্রেট উৎপাদন হয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা অন্তত ১৭০ বিলিয়ন [১ হাজার মিলিয়নে ১ বিলিয়ন] মেট্রিক টন [এক হাজার কিলোগ্রাম হলো এক মেট্রিক টন] কার্বহাইড্রেট উৎপাদন হয় যা সংরক্ষণ থাকে উৎপাদনকারী বস্তুর মধ্যে। এসব এনার্জি-সূত্র যদি পৃথিবীর সকলের মধ্যে বণ্টন করার সুযোগ থাকতো, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগ্যে জুটতো ৩০ মেট্রিন টন প্রতি বৎসর!

সমগ্র প্রাণীজগতের জন্য ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ার উপকার কিন্তু বিরাট। ঠিক উদ্ভিদের মতো মানবগোষ্ঠি ও অন্যান্য প্রাণী গ্লুকোজ এনার্জির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কেউই নিজে তা উৎপাদনের ক্ষমতা রাখে না। ঘুরেফিরে অবশেষে উদ্ভিদ কর্তৃক গ্লুকোজ উৎপাদনের উপরই নির্ভর করতে হয় সকলে। তাছাড়া অক্সিজেনের কথা তো বলেছি। এটা উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু প্রসেসের সময় বাই-প্রোডাক্ট হিসাবে এটা তৈরী হবেই। অন্যথায় পুরো প্রতিক্রিয়া অকেজো। সুতরাং উদ্ভিদ এই অনাকাঙ্ক্ষিত গ্যাসটিকে বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়। আর আমরা তা লুফে নিই বেঁচে থাকতে- প্রতিটি শ্বাসে ফুসফুসে নিয়ে অক্সিজেনমুক্ত লাল রক্তকোষকে অক্সিজেনযুক্ত করি। হৃদযন্ত্র তা পাম্প করে পাঠিয়ে দেয় দেহের প্রতিটি কোষে। রক্তকোষ সাপ্লাই দিয়ে ফিরে আসে কোষের বাই-প্রোডাক্ট কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস নিয়ে। ফুসফুসে ফিরে এসে তা মুক্ত করে। নিঃশ্বাসের মাধ্যমে তা বাইরে এনে ফেলে দিই আমরা। আর এভাবেই প্রতি মিনিটে ৫০-৬০ বার অক্সিজেন ভেতরে নেওয়া ও কার্বন ডাইওক্সাইড বাইরে এনে বায়ুমণ্ডলে ছাড়ার ক্রিয়া চলে জন্ম থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। মজার কথা হলো, আমরা কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস কোষের বাই-প্রোডাক্ট হিসাবে তৈরী করি আর উদ্ভিদরা তা ব্যবহার করে। অপরদিকে তারা অক্সিজেন তৈরী করে বাই-প্রোডাক্ট হিসাবে আর ব্যবহার করি আমরা। **তাদের বর্জ্য আমাদের মূল্যবান পণ্য। আমাদের বর্জ্য তাদের মূল্যবান পণ্য।** কী সুন্দর আদান-প্রদান! জীবনকে বাঁচানোর কী সুন্দর কৌশল! সুবহানাল্লাহ!

ফটোসিনথেসিসের উপকার এখানেই শেষ নয়। আমাদের জীবনচলার ক্ষেত্রে **'টেকনোলজি'** [প্রযুক্তি] এক বিরাট ফেক্টর। প্রযৌক্তিক উপায়ে আমরা উত্তোলন ও কাজে লাগাচ্ছি **খনিজ সম্পদ**। **নেচারেল গ্যাস, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম** মানবগোষ্ঠি কী পরিমাণ ব্যবহার করছে আধুনিক অর্থনীতিতে তার সঠিক হিসাব এ মুহূর্তে বলা যাবে

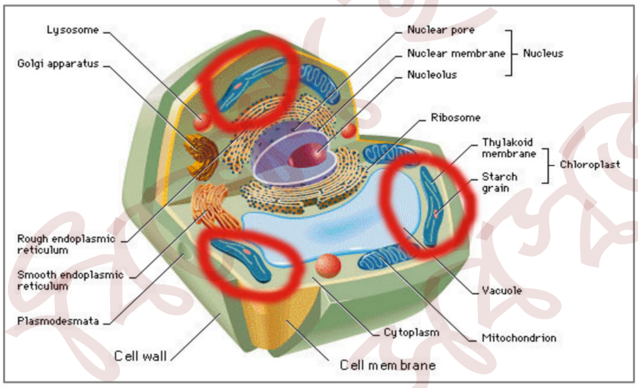
না। আমাদের পুরো ইন্ডাস্ট্রি এসব এনার্জিসূত্রের উপর নির্ভরশীল। এসব বস্তুতে আছে **হাইড্রোকার্বন**, সুদূর অতীতে মৃত প্রাণীদের দেহাবশেষ এবং মাটির গর্ভে লুকিয়ে থাকা মৃত উদ্ভিদ। সবই বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়েছিল সে যুগে এই ফটোসিনথেসিসের কারণে। সুতরাং এভাবে বলা অতিরঞ্জিত হবে না, **‘সকল প্রাণীজীবন সরাসরি ও ঘুরেফিরে এনার্জি, খাদ্য, অক্সিজেন ইত্যাদি বেঁচে থাকার উপাদান লাভ করে ফটোসিনথেসিস প্রতিক্রিয়া থেকে’**। এ কারণে, এই প্রতিক্রিয়াটি জানা সকল **বায়োরসায়নিক** [biochemical] প্রসেসের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিজ্ঞানমহলে বিবেচিত।

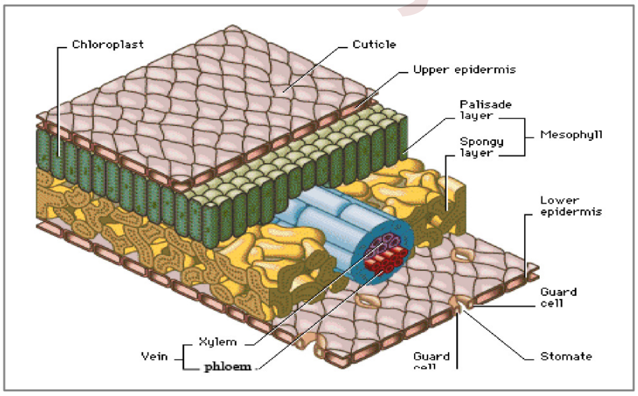
গ. কোথায় এ প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়

সবই জটিল ডিজাইনের উপর নির্ভরশীল। সবুজ পত্র দেখতে খুব সাধারণ মনে হয়। কিন্তু উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অণুবীক্ষণযন্ত্রের নীচে এনে একটি সবুজ পাতা রাখুন। আপনার চোখের সামনে ভেসে ওঠবে এক বিরাট জটিল-কঠিন সৃষ্টি-কাঠামো। নীচের চিত্রটি দেখুন। তবে ঠিক কোথায় ফটোসিনথেসিস প্রতিক্রিয়াটি সংঘটিত হয়? বিজ্ঞানীরা পত্রের একটি বিশেষ অংশ সনাক্ত করেছেন। এখানেই সালোকসংশ্লেষণ প্রসেস হয় প্রতিনিয়ত। এ অংশের নাম **‘ক্লরোপ্লাস্ট’** [chloroplast]। এটা পত্রকোষের একটি অংশ। ক্লরোপ্লাস্ট সম্পর্কে এবার আরো কিছু জানতে হবে।

গ. ১. ক্লরোপ্লাস্ট [chloroplast]

প্রাণীদেহের বিল্ডিং-ব্লক হলো কোষ [cell]। উদ্ভিদের প্রাণ আছে। সুতরাং তারাও কোষের তৈরী। সকল পল্লব হাজার হাজার কোষ দ্বারা সৃষ্ট। এককেটি কোষে আছে ৫০-৬০ টি ক্লরোপ্লাস্ট। আমরা প্রাণীবিজ্ঞানের উপর আলোচনা করবো সামনের কোন এক বা একাধিক লেকচারে। এ মুহূর্তে এটুকু জানাই যথেষ্ট, **‘প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহ, কোষের তৈরী’**। বৃক্ষরাজির পাতা ও সবুজ শাখায় বিশেষ ধরনের কোষ আছে। এখানেই ক্লরোপ্লাস্ট ইউনিটটি বিদ্যমান। নীচের চিত্রটি দেখুন।



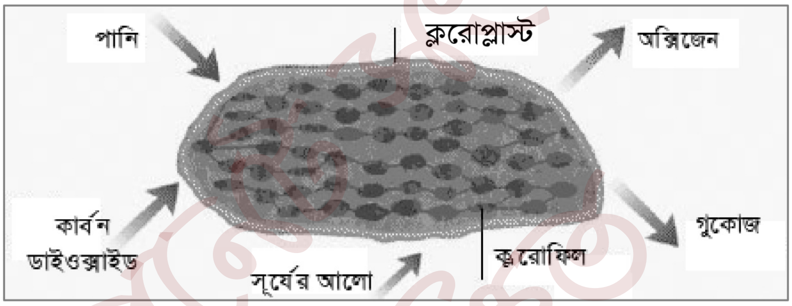


পাশের চিত্রে উদ্ভিদ কোষের অভ্যন্তরে তিনটি **ক্লরোপ্লাস্ট** [বৃত্তের ভেতর অঙ্কিত] ইউনিট দেখানো হয়েছে। আসল কোষে অবশ্য আরো অনেক বেশী ক্লরোপ্লাস্ট আছে। ডিম্বাকৃতির এ ইউনিটের দায়িত্ব হলো **‘ফটোসিনথেসিস’** প্রতিক্রিয়া আঞ্জাম দেওয়া। নীচের চিত্রে একটি পত্রের পুরো কোষ এ্যানাটমি অঙ্কিত হয়েছে। আসুন, এটি আরো একটু গবেষণা করি।

আমি ইন্টারনেট থেকে চিত্রটি এনেছি। বিভিন্ন অংশের ইংরেজী নামগুলো রেখে দিয়েছি। ইংরেজী-বাংলা অভিধানে প্রাপ্ত বাংলা প্রতিশব্দসহ এবার পত্রের প্রতিটি অংশের ব্যাখ্যা তুলে ধরবো। বুঝে নিন, একটি সাধারণ সবুজ পাতার ডিজাইনে কিরূপ কৌশল ও প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। সুবহানাল্লাহ!

ক্লরোপ্লাস্ট [chloroplast] - পত্রহরিৎ : শব্দটি গ্রীক ভাষার। অর্থ, **‘সবুজ পাতা’**। আসলে এই

ইউনিটই পাতা সবুজ হওয়ার জন্য দায়ী। পতিত দৃশ্যমান আলোকরশ্মির প্রায় সব রঙ ক্লরোপ্লাস্ট চুষে নেয়- কিন্তু সবুজ রঙ প্রতিবিম্ব করে। আর যে কোন বস্তু, যে রঙ বেশী প্রতিবিম্ব করে সে রঙেই আমরা তাকে দেখি। অর্থাৎ যে রঙটির প্রতি বস্তুর বৈরিতা- অপছন্দনীয়, সে রঙেই আমাদের চোখে ধরা দেয়! ব্যাপারটি ভাবার নয় কি? যাক, ক্লরোপ্লাস্টে ফটোসিনথেসিস ক্রিয়াটি সংঘটিত হয়, বিধায় এর উপর বর্তমান লেকচারে আমাদের ফোকাস নিবদ্ধ থাকবে। নীচের অনেকটা সহজ চিত্রটি দেখুন। এ চিত্রের শব্দগুলো বাংলা। লক্ষ্য করুণ ক্লরোপ্লাস্টের অভ্যন্তরে **‘ক্লরোফিল’** [chlorophyll] নামক আরেক ইউনিট আছে। এগুলো মূলত মলিকিউল। এদের কাজ আলোকরশ্মিকে **‘আটক’** করা। আর এই আটক হওয়া রশ্মিই শুরু করে ফটোসিনথেসিস প্রতিক্রিয়া।



ডানের চিত্রে দেখানো হয় নি- এমন আরো কিছু বস্তু ক্লরোপ্লাস্টে আছে। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো **এনজাইম** [enzyme]। শব্দটির প্রতিশব্দ অভিধানে নেই। সুতরাং একটি বানাতে হবে! প্রথমে বুঝে নিই তার কাজ। এনজাইম হলো রসায়নিক বস্তু। যে কোন রসায়নিক প্রতিক্রিয়া গতিশীল করাই হলো তার কাজ। শব্দটি গ্রীক ভাষার- অর্থ [in yeast] **‘এককোষী ছত্রাকে’**। রুটি তৈরীতে ঈস্ট ব্যবহৃত হয়। পারিভাষিক অর্থে আমরা বাংলায় বলতে পারি এনজাইম মানে **‘ক্রিয়াগতিকারক’**।

কিউটিকল [cuticle] - বাইরচর্মের মোমদ্রব্য : এটা মূলত পত্রের বাইরের একটি পাতলা মোমদ্রব্য। এটার কাজ হলো পাতার ভেতর অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রবেশ আটকানো। পত্রের অভ্যন্তর থেকে পানি ক্ষয়কেও রক্ষা করে এই বস্তুটি।

এপিডার্মিস [epidermis] - বাইরচর্মের স্তর : উদ্ভিদ কোষের বাইরের স্তর এটি। পত্রের উভয় দিকে এই স্তরটি বিদ্যমান।

মেজোফিল [mesophyll] - [অভিধানে নেই] নরম পত্রটিস্যু : এই নরম টিস্যু উভয় এপিডার্মিস স্তরের মাঝখানে অবস্থিত।

পালেসেইড লেয়ার [palisade layer] - নরম দীর্ঘ পত্রটিস্যু : এই স্তরেই ফটোসিনথেসিসের জন্য জরুরী সকল ক্লরোফিল থাকে। এটা মেজোফিলের অংশ।

স্পন্‌জি লেয়ার [spongy layer] - স্পন্‌জ স্তর : এটাও মেজোফিলের একটি অংশ। এতে সংরক্ষিত থাকে বিভিন্ন রসায়নিক বস্তু।

গার্ড সেল [guard cell] - ছিদ্রযুক্ত পাহারাদার কোষ : সবকিছু সংরক্ষণ করতে হবে। উভয় এপিডার্মিস তথা বাইর স্তরে এসব রক্ষক কোষ বিদ্যমান।

স্টমাটা [stomata] - [অভিধানে নেই] স্টমা শব্দের বহুবচন - পত্রচর্মের ক্ষুদ্র ছিদ্র : বাইরের রক্ষক বা পাহারাদার কোষও সম্পূর্ণ বন্ধ নয়। তার মধ্যে আছে অতি ক্ষুদ্রকায় ছিদ্র। এসব ছিদ্র দিয়েই ফটোসিনথেসিসের মৌলিক উপাদান- পানি, অক্সিজেন ও কার্বন ডাইওক্সাইড আসা-যাওয়া করে।

ভেইন [vein] - শিরা : এগুলো খালি চোখে দেখা যায়। এসব শিরা দিয়ে চলাচল করে পানি ও খাদ্যদ্রব্য যা উদ্ভিদ বেঁচে থাকার জন্য একান্ত জরুরী।

জাইলাম [xylem] - [অভিধানে নেই] শিরার সমর্থক টিস্যু : শিরার দু'টি মূল অংশের একটি। এই টিস্যু দিয়ে উদ্ভিদ তার পত্রের মধ্যে পানি নিয়ে আসে।

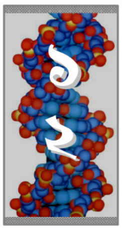
ফ্লয়েম [phloem] - [অভিধানে নেই] শিরার সমর্থক টিস্যু : শিরার অপর মূল অংশ। ফ্লয়েমের কাজ পত্র থেকে খাদ্যদ্রব্য উদ্ভিদের অন্যান্য অংশে নিয়ে যাওয়া।

প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! ফটোসিনথেসিসের উপর প্রথম বক্তৃতার ইতি ঘটতে শীঘ্রই। আমরা এ পর্যন্ত যা বলেছি তাতে আশারাখি সবাই এটুকু জেনে নিয়েছেন, প্রতিক্রিয়াটি গুরুত্ববহ ও এর ক্ষেত্র উদ্ভিদের সবুজ পাতায়। আমরা পাতার বিভিন্ন অংশের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনাও তুলে ধরেছি উপযুক্ত চিত্রসহ। ফটোসিনথেসিস একটি জটিল রসায়নিক ক্রিয়া। আলোকবিজ্ঞানের উপর আলোচনার অংশ হিসাবে এটার উপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা বর্ণনা করছি এ কারণে যে, প্রতিক্রিয়াটির মূল কারণ হলো সূর্যের আলোকরশ্মি। ইনশাআল্লাহ, আগামী লেকচারে ঠিক কিভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াটি সংঘটিত হয় সবুজ পত্রের ক্লরোপ্লাস্টে তা বুঝিয়ে বলবো। নীচে একটি কেমিক্যাল ফর্মুলা তুলে ধরেছি। এটার উপরই আলোচনা হবে পরবর্তী বক্তৃতায়। আজকের মতো এটুকুই। আল্লাহ আমাদের চিরসাথী।

ফটোসিনথেসিস ঃ পানি [H_2O] + কার্বন ডাইঅক্সাইড [$2H_2O$] + সূর্যালোক = অক্সিজেন [O_2] + গ্লুকোস-কার্বহাইড্রেট [CH_2O] + পানি [H_2O] (**অক্সিজেন** বায়ুমণ্ডলে চলে যায়। **গ্লুকোস-কার্বহাইড্রেট** ও **পানি** উদ্ভিদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়)।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

খ. পদার্থবিজ্ঞান : বস্তুজগতের মিথস্ক্রিয়া

বক্তৃতা ১২ : ফটোসিনথেসিস

প্রিয় শ্রোতাবন্ধুরা! **'বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান'** বক্তৃতামালার ১২তম আলোচনায় সকলে ওয়েলকাম। বস্তুর মিথস্ক্রিয়ার অংশ হিসাবে আলোকবিজ্ঞানের উপর আমরা আলোচনা করছি। গত লেকচারে পৃথিবীর বুকে সকল প্রাণীজীবনের জন্য জরুরী একটি নেচারেল প্রতিক্রিয়ার উপর আলোচনা শুরু হয়েছিল। সূর্যের আলোকরশ্মি বৃক্ষরাজির সবুজ পত্রে পাতিত হলে এই প্রসেসের সূত্রপাত ঘটে। উদ্ভিদ এই প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লুকোজ জাতীয় খাদ্য নিজের জন্য তৈরী করে। একই সময় প্রতিক্রিয়ার বাই-প্রোডাক্ট [বর্জ্য] হিসাবে তৈরী হয় অক্সিজেন গ্যাস। এই গ্যাস প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসে বায়ুমণ্ডলে- যা আমরা প্রাণীদের শ্বাস গ্রহণের মূল উপাদান।

আমরা গত লেকচারে ফটোসিনথেসিসের গুরুত্ব, ক্ষেত্র ইত্যাদির উপর আলোচনা করেছি। আজকের লেকচারে প্রসেসটির উপর আরো যেটুকু জানার বাকী আছে তা-ই আলোচিত হবে।

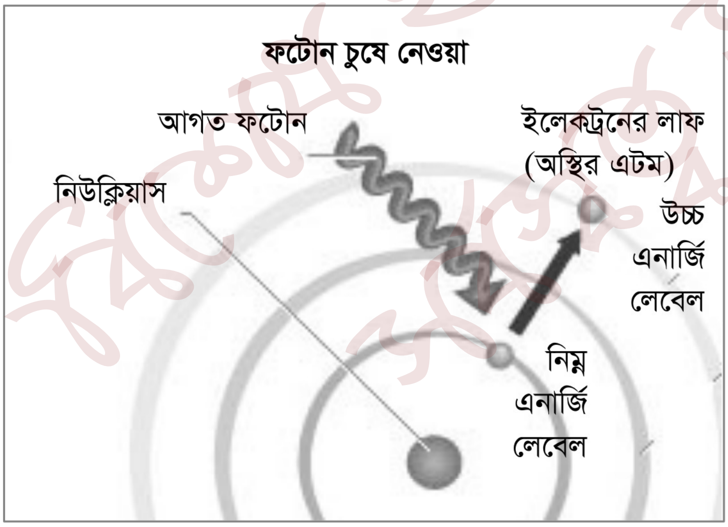
ক. সালোকসংশ্লেষণ প্রতিক্রিয়া

আমরা ইতোমধ্যে একাধিকবার বলেছি, এই প্রতিক্রিয়াটি খুব জটিল একটি প্রসেস। বিজ্ঞানীরা সহজে বুঝা ও গবেষণার স্বার্থে পুরো প্রতিক্রিয়াকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথমত, একটি স্টেজ আছে যখন সূর্যের আলো সবুজ ক্লুরোপ্লাস্টে এসে পতিত হয়। আলোকরশ্মির শক্তিকে **'আটক'** করার কাজ এই স্টেজে সম্পাদিত হতে হবে। ক্লুরোপ্লাস্টের কাজ এটাই। এনার্জি গ্রেফতারের পর একে কাজে লাগানো দরকার। ক্লুরোপ্লাস্ট তা-ও আঞ্জাম দেয়। আলোকরশ্মির এনার্জিকে সে রসায়নিক এনার্জিতে রূপান্তর করে। প্রথম স্টেজের কাজ এ পর্যন্তই। বিজ্ঞানীরা এই স্টেজকে **'আলোক-নির্ভর প্রতিক্রিয়া'** [light-dependant reaction] নামে অভিহিত করেছেন।

আলোক-নির্ভর প্রতিক্রিয়ায় রূপান্তরিত এনার্জি দু'টি মলিকিউলে সংরক্ষিত হয়- ১. nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) ও ২. adenosine triphosphate (ATP)। এ পর্যায়ে এ মলিকিউলগুলো কি তা বুঝা আমাদের জন্য জরুরী নয়। এখানে তাদের নাম উল্লেখ করলাম মাত্র। তবে এটুকু বুঝতে হবে, দ্বিতীয় স্টেজে এই উভয় মলিকিউলই কাজে লাগানো হয় কাঙ্ক্ষিত খাদ্যবস্তু তৈরীতে। প্রথম মলিকিউল [NADPH] থেকে আসে হাইড্রোজেন এটম- যা গ্লুকোজ তৈরীতে সাহায্য করে। দ্বিতীয় মলিকিউল [ATP] সাপ্লাই দেয় এনার্জি- যা ব্যবহার করে গ্লুকোজ **'সংশ্লেষণ'** বা সিনথেসাইজ করতে হয়। মোটকথা কাঙ্ক্ষিত বস্তু [চিনি জাতীয় খাদ্য] তৈরীতে এই উভয় মলিকিউল **'কাঁচামাল'** হিসাবে কাজ করে। আর এই কাঁচামাল তৈরী হয় প্রথম প্রতিক্রিয়ায় [আলোক-নির্ভর প্রতিক্রিয়ায়]। দ্বিতীয় স্টেজে আলোকরশ্মির প্রয়োজন আর থাকে না- তাই বিজ্ঞানীরা এই স্টেজের নামকরণ করেছেন, **'আলোক-স্বাধীন প্রতিক্রিয়া'** [light-independant reaction]। অতীতে প্রথম স্টেজকে **'আলোক প্রতিক্রিয়া'** ও দ্বিতীয় স্টেজকে **'কালো প্রতিক্রিয়া'** বলা হতো। আশাকরি উভয় স্টেজের মৌলিক কাজ সম্পর্কে এখন সকলেই অবগত। এবার এই উভয় স্টেজে ঠিক কিভাবে প্রতিক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় সেদিকে খিয়াল করা যাক।

খ. আলোক-নির্ভর প্রতিক্রিয়া

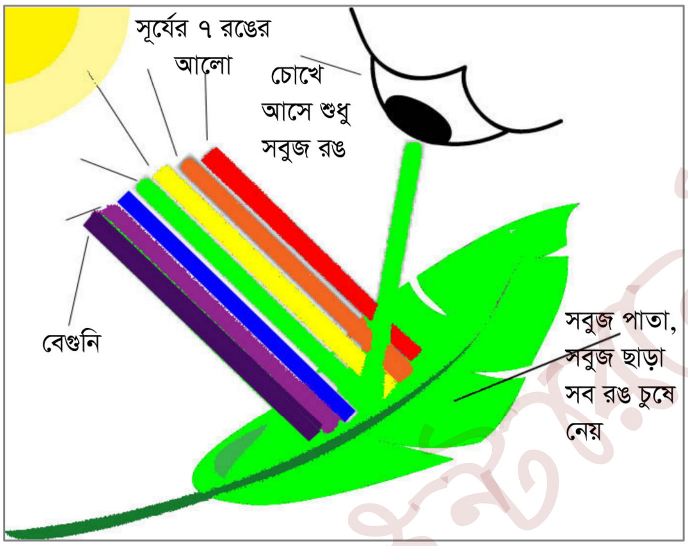
এই গুরুত্বপূর্ণ স্টেজের উপর আলোচনার পূর্বে প্রথমে অণু সম্পর্কে ইতোমধ্যে আলোচিত একটি বিষয় পুনরায় স্মরণ করে নিতে হবে। মনে আছে, এনার্জি লেবেলের কথা? আমরা বলেছি, প্রত্যেক এটমে আছে ইলেকট্রন। এরা বিভিন্ন লেবেলে প্রটন ও নিউট্রন পরমাণু সম্বলিত কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে। এসব লেবেলকে বলে **'এনার্জি লেবেল'**। আলোকরশ্মিতে আছে **'ফটোন'** নামক এনার্জি-প্যাকেট। ফটোনের এনার্জির কারণে ইলেকট্রন তাদের স্ব-স্ব এনার্জি লেবেল থেকে লাফ মারে। এরপর খুব তাড়াতাড়ি স্বস্থানে ফিরে আসে। এই আশা-যাওয়ার ফলেই এটমে একটি কম্পন শুরু হয়। অর্থাৎ ফটোনের এনার্জি **'রেজনেন্স এনার্জি'**-তে [কম্পন-এনার্জি] রূপান্তর হয়। আশারাখি এ পর্যন্ত যা বলেছি তা সবার বুঝে এসে গেছে। বায়ের চিত্র থেকে তা আরো স্পষ্ট হবে।



সবুজ পাতার মধ্যে ক্লরোপ্লাস্ট নামক স্তরে ক্লরোফিল মলিকিউল আছে। এগুলো মূলত রঞ্জন পদার্থ। আলোক-রশ্মিকে **'আটক'** করার উপাদান। ফটোন এতে পতিত হলেই তাদের ইলেকট্রন লাফালাফি করে [এনার্জি লেবেল থেকে নামে ও ওঠে]। শুরু হয় কম্পন। ক্লরোফিলের মলিকিউল একটা থেকে আরেকটা অতি নিকটে স্থাপিত। সুতরাং পুরো ক্লরোপ্লাস্ট স্তরে এই কম্পন দ্রুত বিস্তার লাভ করে। মোটকথা ফটোনের এনার্জি এখন রেজনেন্স এনার্জিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রামের **'দৃশ্যমান'** অংশ হলো আলোক। কিন্তু আলোকরশ্মি মূলত ৬টি [অতীতে ৭টি - ইন্ডিগো বা গাঢ় বেগুনিকে আলাদা মনে করা হতো] রঙের সমন্বয়ে গঠিত। প্রত্যেক রঙের আছে আলাদা **তরঙ্গদৈর্ঘ্য** [wavelength]। সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোকরশ্মি কিন্তু ফটোসিনথেসিসের জন্য সুবিধাজনক নয়। বিশেষ কিছু **'নীল'** ও **'লাল'** তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি এই প্রতিক্রিয়ায় কার্যকরী। কারণ যে পরিমাণ এনার্জির দরকার- ঠিক তা-

ই এ দু'টো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যে বিদ্যমান। অর্থাৎ ক্লরোফিলের এটমের ইলেকট্রনগুলোকে অস্থির করা ও স্ব-স্ব এনার্জি লেবেল থেকে উচ্চ এনার্জি লেবেলে লাফ মারতে বাধ্য করতে যেটুকু এনার্জির দরকার, নীল ও লাল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ফটোনে তা আছে। আশারাখি শ্রোতারা এ পর্যন্ত যা বলেছি তা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পরেছেন। যদি কোন সন্দেহ থাকে তাহলে জিজ্ঞেস করবেন কিন্তু। যাক, আমরা বলেছি, সূর্যের কিছু বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এনার্জি [আলোকরশ্মি - ফটোন] যাকে নীল ও লাল আলো বলা হয়, ক্লরোফিলের এটমকে অস্থির করে পুরো মলিকিউলে কম্পন শুরু করে। এখন আমরা আরো সামনে এগিয়ে যাবো।



ক্লরোফিলে আরো কিছু **পিগমেন্ট** [রঞ্জনদ্রব্য] আছে। এদেরকে বলে, **‘অতিরিক্ত রঞ্জন’**। আলোক-প্রতিক্রিয়াকে সাহায্য করা এদের কাজ। তারা স্পেকট্রামের চওড়া এলাকা থেকে এনার্জি **‘গ্রেফতার’** করে। ফলে পুরো প্রতিক্রিয়া আরো শক্তিশালী ও কার্যকর হয়। প্রথমত তারা নীল, লাল ও হলুদ রঙের রশ্মিকে চুষে নেয়। কিন্তু কোন পিগমেন্টই সবুজ আলোকে গ্রহণ করে না- চুষে না। ফলে সবুজ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি পুরোটাই প্রতিবিম্ব হয়। তাই বৃক্ষের পত্র ও শাখার বাকল সবুজ দেখায় আমাদের চোখে। বায়ের চিত্রটি দেখুন।

খ. ১. আলোক-নির্ভর প্রতিক্রিয়া: ফটোসিস্টেম-I

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে আমরা যা প্রতিষ্ঠিত করলাম তাহলো:

১. ক্লরোপ্লাস্ট স্তরে ক্লরোফিল ও অন্যান্য সবুজ রঞ্জনদ্রব্য বিদ্যমান।

২. ক্লরোফিলের এটম নীল ও লাল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মির ফটোনকে চুষে নেয়। সকলেই সবুজটি প্রতিবিম্ব করে। সুতরাং আমরা পত্রটির রঙ সবুজ দেখি।

৩. চুষে নেওয়া এনার্জির ফলে শুরু হয় সকল মলিকিউলে কম্পন। অর্থাৎ সূর্যের আলোকরশ্মিকে **‘কম্পন-এনার্জি’**-তে রূপান্তরের কাজ সম্পন্ন হলো।

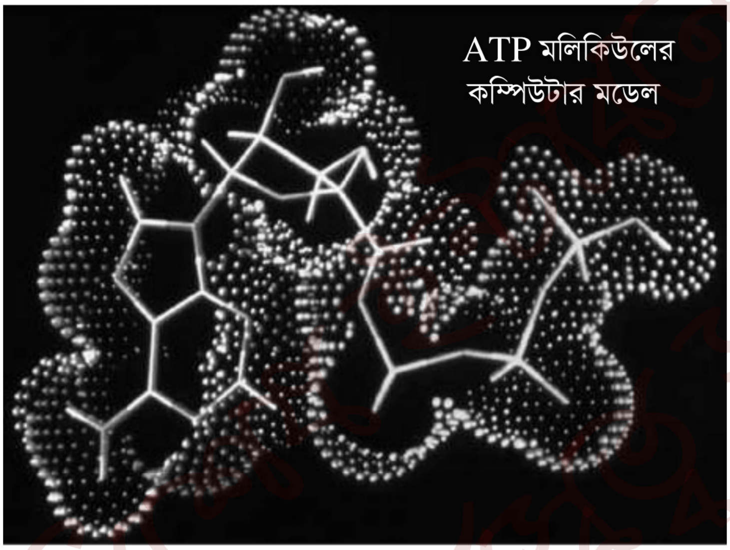
এখন, উক্ত এনার্জিকে কাজে লাগিয়েই শুরু হবে আসল প্রসেসটি। বিজ্ঞানীরা এখানে এসে দু'টি আলাদা ভাগে প্রসেসটির ব্যাখ্যা দেন। এর প্রথমটির নাম **‘ফটোসিস্টেম-I’** [Photosystem-I]।

খুব সংক্ষেপে, ফটোসিস্টেম-I এর কাজ হলো ক্লরোফিলে P_{700} নামক মলিকিউল দ্বারা **‘ইলেকট্রন’** চলমান করা। এ পর্যন্ত শুধুমাত্র কম্পন এনার্জি কার্যকর ছিলো। এখানে ‘৭০০’ অর্থ ৭০০ নানোমিটারে আগত ইলেকট্রমেগনেটিক বিকিরণের প্রতি দুর্বল মলিকিউল বুঝাচ্ছে। এই মলিকিউল দ্বারা এখন **‘ইলেকট্রন-ট্রান্সপোর্ট চেইন’** শুরু হতে পারে। অর্থাৎ ট্রেনের মতো ইলেকট্রন চলতে থাকে। মনে আছে **‘NADPH’** মলিকিউলের কথা? ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের শেষে এসে এই মলিকিউলটি তৈরী হয় আরেক **‘$NADP^{+}$’** নামক [চার্জকৃত] মলিকিউল থেকে। মোটকথা হাইড্রোজেন আয়োন সংযুক্ত হয়। সুতরাং ফটোসিস্টেম-I-এর ফলে তৈরী হলো কাঙ্ক্ষিত খাদ্যবস্তু

গ্লুকোজ তৈরীর প্রথম কাঁচামাল **'NADPH'** মলিকিউল। এ মলিকিউল হাইড্রোজেন সাপ্লাই দেবে। তবে ফটোসিস্টেম-I-এর ফাংশন সম্পূর্ণ শেষ হয় নি।

খ. ১. আলোক-নির্ভর প্রতিক্রিয়া: ফটোসিস্টেম-II

P_{700} নিজের ইলেকট্রন ট্রান্সফার করে **'ইলেকট্রন আকালে'** পতিত হয়। পুনরায় কাজ করতে হলে তাকে নতুন ইলেকট্রন যোগান দিতে হবে। ফটোসিস্টেম-II এই কাজটি আঞ্জাম দেয়। ঠিক ফটোসিস্টেম-I-এর মতো, আলোকরশ্মি ফটোসিস্টেম-II -এর কিছু বিশেষ পিগমেন্টকে **'অস্থির'** করে তুলে। তাদের কম্পন যেয়ে পৌঁছে **P_{680}** নামক এক ধরনের বিশেষ **ক্লোরোফিল মলিকিউলে**। এখানে '৬৮০' সংখ্যাটি দ্বারা ৬৮০ নানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোরশ্মির প্রতি সেনসিটিভ মলিকিউল বুঝাচ্ছে। এখানেও আরেক ইলেকট্রন ট্রান্সফার শুরু হলো। তবে এ ট্রান্সফার চেইনটি পূর্বের চেইন থেকে ভিন্নপথে চালিত। চলার সময় তারা **'ADP [adenosiine diphosphate]'** নামক একটি বসে থাকা মলিকিউলে যোগান দেয় ইলেকট্রন। ফলে এটি রূপান্তরিত হয় **'ATP [adenosine triphosphate]'** নামক মলিকিউলে। মনে আছে এই মলিকিউলের কথা? এটা হলো প্রসেস থেকে কাঙ্ক্ষিত খাদ্যদ্রব্য গ্লুকোজ তৈরীর দ্বিতীয় কাঁচামাল। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ মলিকিউল তৈরীর কাজ করেই ফটোসিস্টেম-II-এর কার্য শেষ হয় না।



ইলেকট্রন চেইন চলতে থাকে এবং ফটোসিস্টেম-I-এর **'ইলেকট্রন ঘাটতি'** পূর্ণ করে। এবার **P_{700}** মলিকিউল তার কাজে আবার লেগে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু একে নিজের ইলেকট্রন **'দান'** করে **P_{680}** মলিকিউল এবার নিজেই **'ইলেকট্রন আকালে'**র শিকার হলো। বৃক্ষের **'পানি সাপ্লাই'** তখন **P_{680}**-কে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। মূলের মধ্যদিয়ে পানি চলে আসে পত্রে। কিভাবে পানি থেকে ইলেকট্রন পায় **P_{680}**? মনে আছে **'এনজাইম'** নামক ক্যাটালিস্টের কথা? এই এনজাইম পানিকে ভেঙ্গে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও ইলেকট্রনে পরিণত করে। ইলেকট্রন চলে যায় ফটোসিস্টেম-II-এ। অর্থাৎ **P_{680}** মলিকিউলের ইলেকট্রন সংখ্যা আবার পরিপূর্ণ হয়। এনজাইম দ্বারা পানি থেকে মুক্ত **'অক্সিজেন'** কিন্তু বৃক্ষের কোন কাজে আসে না। এটা ক্লোরোপ্লাস্ট থেকে বেরিয়ে আসে ক্ষুদ্রকায় ছিদ্র দিয়ে বাইর জগতে- তথা বায়ুমণ্ডলে। ডানের ছবিতে অক্সিজেন বেরিয়ে আসার মুহূর্তটি সংরক্ষিত হয়েছে। পানির ফোটার ভেতর এই অক্সিজেন দেখা যাচ্ছে।



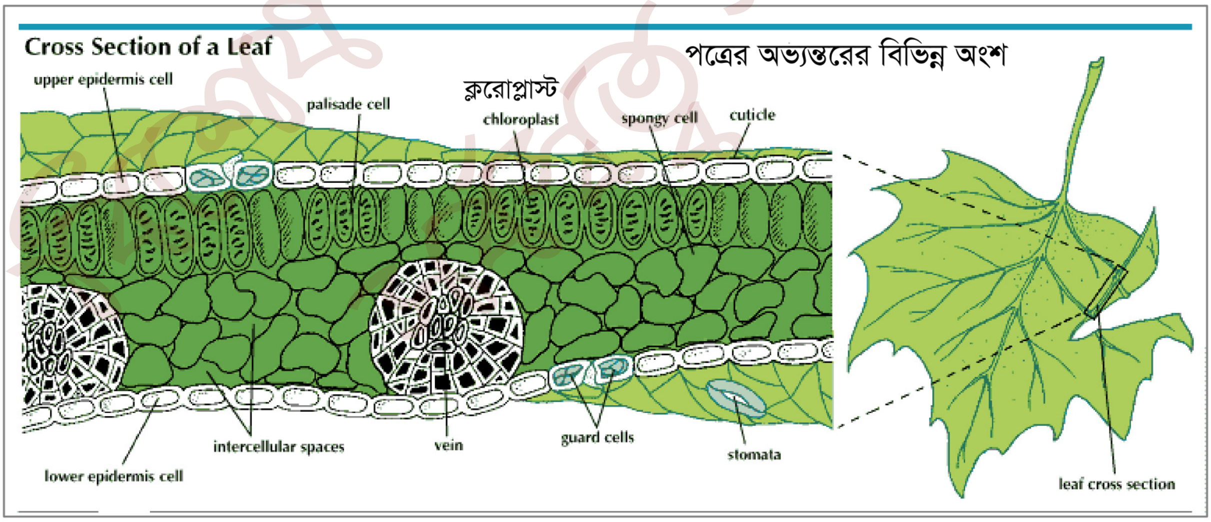
প্রিয় শ্রোতা! ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়া অর্ধেকটা এটাই। অর্থাৎ দু'টি প্রক্রিয়ার প্রথমটি- **'আলোক-নির্ভর প্রতিক্রিয়া'** সম্পর্কে আলোচনা

এখানেই শেষ। একটি কথা বাকী। ফটোসিস্টেম-I এবং ফটোসিস্টেম-II-এ ইলেকট্রন ট্রান্সফার প্রক্রিয়া পদে পদে ঘটে। এতে কিছু এনার্জি ক্ষয় হবেই। তা তাপ হিসাবে বিকিরণ হয়। কিন্তু পুরো প্রতিক্রিয়া এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতেকরে অতিরিক্ত তাপ এনার্জি থেকে ক্লরোপ্লাস্ট কোষের কোনো ক্ষতি না হয়। কারণ তাপ বেশী হলে পুরো সিস্টেম ভেঙ্গে পড়তো। আল্লাহর কী অপূর্ব মহিমা! সালোকসংশ্লেষণ নামক প্রতিক্রিয়াকে এমন সুন্দরভাবে ডিজাইন করেছেন! এই প্রতিক্রিয়ার উপরই পৃথিবীর বুকে মানবজীবনসহ সমগ্র প্রাণীজগৎ নির্ভরশীল। সুবহানাল্লাহ! এক বিজ্ঞানীর উক্তি, **'প্রভুর কী মহিমা, জীবনকে রেখেছেন চলমান কৌশলে সূর্যের আলো দিয়ে!'**।

গ. আলোক-স্বাধীন প্রতিক্রিয়া

সূর্যের আলোকরশ্মির কাজ শেষ। এ পর্যায়ে এসেই আমরা থেমে যেতে পারতাম। কারণ আমরা আলোকবিজ্ঞানের উপর আলোচনা করছি। কিন্তু ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে গেলে আলোকরশ্মি দ্বারা **'আরম্ভ-হওয়া'** প্রতিক্রিয়ার শেষাংশ তথা কাঙ্ক্ষিত খাদ্যবস্তু তৈরীর ক্রিয়াটি সম্পর্কেও জানতে হবে। এই দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া মূলত **'আলোক-স্বাধীন'** [light-independandt reaction]। কিভাবে তা সংঘটিত হয়- সে ব্যাপারে এখন বিস্তারিত আলোচনা করবো।

লাইট-ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিয়েকশনের জন্য যে কেমিক্যাল এনার্জির প্রয়োজন তা এখন প্রস্তুত। এই এনার্জি সংরক্ষিত হয়েছে **'ATP'** ও **'NADPH'** নামক দু'টি মলিকিউলে। উপরে আলোচিত প্রথম **'লাইট-ডিপেন্ডেন্ট রিয়েকশন'**-এর মূল উদ্দেশ্য তা-ই ছিলো। উভয় মলিকিউল এই রিয়েকশনের মাধ্যমে তৈরী হয়েছে ক্লরোপ্লাস্টে। এগুলো থেকেই এখন সৃষ্টি হবে গ্লুকোজ খাদ্য। তবে চক্রাকার এই **'আলোক-স্বাধীন প্রতিক্রিয়া'** ক্লরোপ্লাস্টের একটি বিশেষ অংশে সংঘটিত হয়। এই অংশের নাম **স্টোমা [stoma]** - বহুবচনে **স্টোমাটা [stomata]**। নীচের চিত্র দেখুন।



আলোক-স্বাধীন প্রতিক্রিয়ায় [চার্জকৃত] হাইড্রোজেন ও ইলেকট্রন **'NADPH'** মলিকিউল থেকে এনে কাজে লাগানো হয়। তবে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লুকোজ তৈরী করতে হলে আরো একটি উপাদানের প্রয়োজন। এটি হলো

ফসফরস। '**ATP**' মলিকিউল তা সাপ্লাই দেয়। কয়েকটি পদে এই প্রতিক্রিয়া ঘটে। একেকটির জন্য আছে একেক ধরনের ক্যাটালিস্ট- এনজাইম।

আলোক-স্বাধীন প্রসেসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো কার্বন ডাইওক্সাইড মলিকিউল। পত্রের ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে বায়ুমণ্ডল থেকে এই গ্যাসটি ভেতরে প্রবেশ করে। ক্লরোপ্লাস্টে পৌঁছে এটা স্ট্রোমা এলাকায় এসে বিস্তৃত হয়। এগুলো পৌঁছার পরই শুরু হয় আলোক-স্বাধীন প্রতিক্রিয়া। প্রাথমিক এই প্রসেসকে বলে '**কার্বন ফিক্সেশন**' [কার্বন যুক্তকরণ]।

একটি চিনি মলিকিউল আছে। এর নাম **ribulose bisphosphate [RuBP]**। এর অর্থ কি তা আমাদের জানার প্রয়োজন নেই। এটার সঙ্গে কার্বন এটম যুক্ত হয় একটি এনজাইমের সাহায্যে। এতে সৃষ্টি হয় ৬টি নতুন মলিকিউল। এগুলো সবই **কার্বন ডাইওক্সাইড**। এরপর বেশ ক'টি রিয়েকশন সৃষ্টি হয়। এতে থাকে এনজাইম, ATP ও NADPH মলিকিউল। এসব প্রতিক্রিয়ার উদ্দেশ্য হলো এ ৬টি মলিকিউলের কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এটমকে পুনর্বিন্যস্ত করা। ফলে শেষ প্রোডাক্ট হয় একটি নতুন গ্লুকোজ মলিকিউল ও ৫টি নতুনভাবে বিন্যস্ত RuBP মলিকিউল। বন্ধুরা! কেমিক্যাল রিয়েকশনের মতো জটিল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আমরাও হারিয়ে যাচ্ছি না তো?

যাক, ব্যাপারটি একটু সহজভাবে আবার বলতে পারি:

১. আলোক-স্বাধীন প্রসেস শুরু হয় যখন কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস বায়ুমণ্ডল থেকে এসে যোগ দেয়।

২. কার্বন ডাইওক্সাইড মলিকিউল **রিবোল্যুজ বাইফসফেইট [RuBP]** নামক একটি মলিকিউলের সঙ্গে যুক্ত হয়- এই প্রসেসকে বলে **কার্বন ফিক্সেশন**।

৩. এই প্রসেসে মোট ৬টি মলিকিউলে কার্বন ডাইওক্সাইড যুক্ত হয়ে ৬টি পুনর্বিন্যস্ত মলিকিউল তৈরী হয়।

৪. এরপর বেশ কটি প্রতিক্রিয়া হয়- যেখানে দরকার পড়ে **এটিপি**, **এনএডিপিএইচ** ও বিভিন্ন ধরনের **ক্যাটালিস্ট এনজাইম** মলিকিউল।

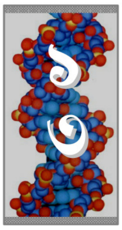
৫. এই প্রতিক্রিয়া শেষে তৈরী হয় একটি **গ্লুকোজ** ও ৫টি পরিবর্তিত RuBP মলিকিউল।

সুতরাং আলোক-স্বাধীন প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত বস্তু গ্লুকোজ তৈরী হলো। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। পুরো প্রক্রিয়া আবার শুরু হওয়া দরকার। যতক্ষণ পর্যন্ত কার্বন ডাইওক্সাইড, ATP ও NADPH মলিকিউল থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা চলবে। হাজার হাজার গ্লুকোজ মলিকিউল তৈরী হয় এভাবে। বৃক্ষ তার প্রয়োজন মতো এগুলো কাজে লাগায়। বাকী থাকা সবগুলো গ্লুকোজ **গুদামজাত** করে রাখে। যা প্রাণীদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সুবহানাল্লাহ! এ হলো প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেমিক্যাল প্রসেস যার মূল সূত্র সূর্যের আলোকরশ্মি।

প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা! ফটোসিনথেসিস বা সালোকসংশ্লেষণ নামক বিরাট গুরুত্ববহ প্রতিক্রিয়ার উপর আলোচনার এখানেই শেষ। আমি আশা করছি, আপনারা বিষয়টির উপর অন্তত মৌলিক ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন, এসব কথা থেকে। আলোকবিজ্ঞানের অংশ হিসাবে আমরা ফটোসিনথেসিসের উপর আলোকপাত করেছি। আসলে আলোকবিজ্ঞানের উপর আলোচনার শেষ এখানেই। এবার আমরা সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বিজ্ঞান-গবেষণা নামে খ্যাত, '**মহাকাশবিজ্ঞান**'-এ পদার্পণ করবো ইনশাআল্লাহ! এ বিষয়ের উপর মোট ৬টি লেকচার উপস্থাপনের আশা রাখি। আমরা জেনে নেবো, সৌরজগৎ, তারাজগৎ ও বিশ্বজগৎ কিভাবে গঠিত হয়েছে এবং চলছে। এ বিষয়ের প্রথমটির শিরোনাম হবে '**মহাকাশবিজ্ঞান: মানুষ ও চতুর্পাশ্বস্থ জগৎ**'। আগামী লেকচারে আবার সাক্ষাতের আশা ব্যক্ত করে শেষ করছি। আল্লাহ সহায়।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

গ. মহাকাশবিজ্ঞান: গঠনপ্রণালী ও মৌলিক গতিবিধি

বক্তৃতা ১৩ : মহাকাশবিজ্ঞান: ভূমিকা

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ! সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের লেকচারে। আধুনিক বিজ্ঞানের উপর বিশেষ এই বক্তৃতামালার ১৩তম সংখ্যায় পদার্পণ করেছি আমরা। আলহামদুলিল্লাহ! ইতোমধ্যে বস্তুজগতের বেশ কিছু বিষয় কাভার হয়েছে। আমরা অণুর ক্ষুদ্রতম অংশ **'ক্যুয়ার্ক'** দ্বারা গঠিত কেন্দ্রীয় কণা প্রটন ও নিউট্রন এবং বাইরে ঘুর্ণনরত ইলেকট্রন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। একাধিক অণুর সমন্বয়ে পরবর্তী বড় বস্তু মলিকিউল গঠিত। আর একাধিক মলিকিউল দ্বারা সৃষ্ট সকল বস্তু। আমাদের নিজের দেহসহ বস্তুজগতের যা কিছু আছে সবই গণনাতীত এটম, মলিকিউল ইত্যাদি দ্বারা গঠিত।

বিজ্ঞানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শাখার নাম পদার্থবিজ্ঞান। গত ১২টি লেকচারে এই শাখার উপরই আলোচনা হয়েছে। অণু পরমাণু থেকে শুরু করে আলোকবিজ্ঞান ও ফটোসিনথেসিসের উপর বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা! আমি আশা করি এসব বক্তৃতা থেকে আপনারা উপকৃত হয়েছেন। বিজ্ঞান কী, তার গবেষণার স্কোপ কী এবং কিভাবে জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে সে গবেষণা করছে, কিভাবে বিজ্ঞানের অনুসন্ধান দ্বারা আমরা উপকৃত হচ্ছি- ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব এখন আপনারা কিছুটা হলেও নিশ্চয় পেয়ে গেছেন। বিজ্ঞানের উপর এসব লেকচারের মূল উদ্দেশ্য তা-ই। আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের স্বরূপ বুঝার চেষ্টা করছি মাত্র। যাক, এবার মনোনিবেশ করতে হবে আজকের বিষয়ের উপর। বিজ্ঞানের ইতিহাসে সবচেয়ে পুরাতন জ্ঞানান্বেষা নামে খ্যাত, সর্বাধিক আকর্ষণীয় বিষয় বলে চিহ্নিত এ বিষয়টি হলো **মহাকাশবিজ্ঞান** [space science]। অপর নাম **আস্ট্রনোমি** [astronomy] - **জ্যোতির্বিজ্ঞান**। আমি **'মহাকাশবিজ্ঞান'** শব্দটি ব্যবহার করবো।

আমরা মানুষ। আমাদের পায়ের নীচে মাটি। চতুর্দিকে মহাকাশ। রাতের অন্ধকারে আকাশের দিকে তাকালে দেখতে পাই অসংখ্য তারা। দূর-দূরান্তে মিটিমিটি জ্বলছে। কোনোটা আবার অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল। এসব কি- প্রশ্ন

জাগে আমাদের মনে। দিনের বেলা বিরাট এক সূর্য- পূর্বাকাশে উদয় হয়ে সমগ্র পৃথিবীর জমিনকে আলোকিত করে তুলে, উত্তপ্ত করে সবকিছু। রাতে দেখা যায় বেশ উজ্জ্বল আরেক বস্তু- চন্দ্র। এসব কি- প্রশ্ন জাগে আমাদের মাঝে। দিন-রাতের আবর্তন, সমগ্র রাতের আকাশের ধীর-গতিতে পশ্চিমদিকে গমন, সূর্যের উদয় ও অস্ত যাওয়া, চাঁদের ঘুর্ণন ইত্যাদি গতিমতি কেন? প্রশ্নের সীমা নেই। আদি যুগ থেকে মানুষ এসব প্রশ্ন করে আসছে। খুঁজে বেড়াচ্ছে জবাব। প্রথমে অনেক ধারণা- অনেক কল্পনা দ্বারা মনকে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রণালীবদ্ধভাবে এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর বের করার প্রবণতা শুরু হলো। জন্ম নিলো **'মহাকাশবিজ্ঞান'**।

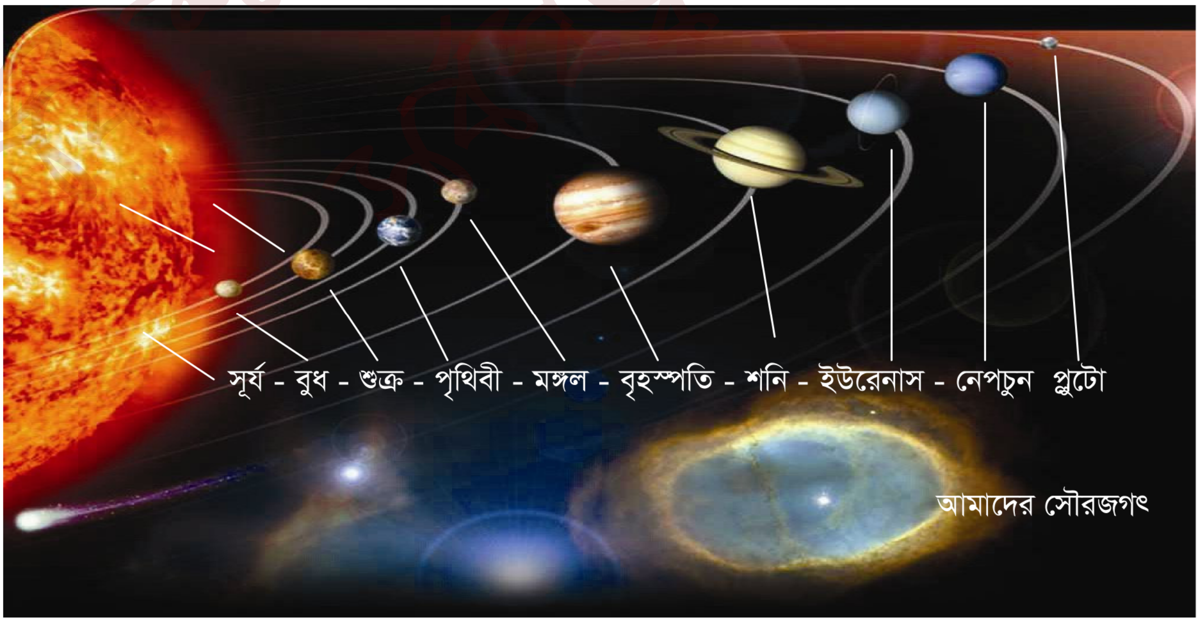
আজকের লেকচার মূলত মহাকাশবিজ্ঞান সম্পর্কে ভূমিকা মাত্র। এটা তো বিরাট ফিল্ড। যে ৬টি বক্তৃতায় কাভার করার ইচ্ছা পোষণ করছি তা নিতান্ত কম। কিন্তু তাতেই সারতে হবে। সুতরাং আজকের ভূমিকায় আমরা বিষয়টির গভীরত্ব যে কতো বিরাট তা একটু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করবো। যেসব বিষয় হবে আমাদের আলোচনার মূল ক্ষেত্র তাহলো:

১. সৌরজগৎ [solar system]; ২. তারা [stars]; ৩. গ্যালাক্সি [galaxy]; ৪. মহাকাশ অনুসন্ধান [space exploration] ও ৫. বিশ্বতত্ত্ব [cosmology]।

উপরোক্ত প্রথম বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত ভূমিকা আজকের লেকচারে উপস্থাপন করার ইচ্ছা রাখি। সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এক দু'টো চিত্রও আছে। ওগুলো প্রয়োজনে স্ট্যাডি করবেন। আগামী লেকচার থেকে মূল বিষয়ের কিছুটা গভীরে নিমজ্জিত হওয়ার আশা রাখি আমরা। সুতরাং কোথায় যাচ্ছি, কোথায় আমাদের বিচরণ, ইত্যাদি আগে থেকেই জেনে নেওয়া হবে সঠিক অভিগমন। এছাড়া আগেই বলেছি, মহাকাশবিজ্ঞান সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বিষয়। আজকের ভূমিকা থেকেই তা অনুধাবন করবেন- আশারাখি।

১. সৌরজগৎ

আমরা যে জগতে বাস করি তার একটি স্থিতিশীল কাঠামো আছে। এখানে **'স্থিতিশীল'** শব্দটির প্রয়োগ গুরুত্ববহ। আমাদের নিকট-আকাশে কিছু বস্তু আছে। এগুলো হলো: সূর্য, ৯টি গ্রহ, ১৭৪টির মতো চন্দ্র, অসংখ্য গ্রহাণুপুঞ্জ ও ধূমকেতু। এ বস্তুগুলো নিয়েই আমাদের জগৎ। সৌরজগৎ। নীচের চিত্রটি দেখুন।



সৌরজগতের বস্তুগুলো কিভাবে কোন্ গতিতে সূর্যকে **'প্রদক্ষিণ'** করে? কার দূরত্ব কতটুকু? কার আয়তন কি? ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব মিলবে আগামী লেকচারে। এখানে সংক্ষেপে কিছুটা তথ্য তুলে ধরা যায়। নিম্নের টেবিলটি দেখুন। লক্ষ্য করুন বাইরের তিনটি গ্রহ- ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোর বিকল্প নাম যথাক্রমে **গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ** উল্লেখ করেছি। এ ব্যাপারটি আমার ব্যক্তিগত। যদি পছন্দ লাগে তাহলে আপনারাও এ নামগুলো ব্যবহার করুন। গ্রীক পৌরাণিক কল্পকাহিনীর **'গড'** বা **'গডেস'**র নামানুসারে কেনো আমাদের গ্রহের নামকরণ হবে? যেখানে বাংলায় **'বারের'** নামানুসারে অধিকাংশ গ্রহের নামকরণ হলো সেখানে শেষ তিনটি গ্রহের নাম বাংলা **'ঋতুর'** নামানুসারে হতে দোষ কিসের? আমার মতে এটাই যথার্থ।

বৈশিষ্ট্য / নাম বিকল্প নাম	বুধ	শুক্র	পৃথিবী	চন্দ্র	মঙ্গল	বৃহস্প.	শনি	ইউরেনাস / গ্রীষ্ম	নেপচুন / বর্ষা	প্লুটো / শরৎ
ম্যাস- বস্তুর মাত্রা (*$১০^{২৮}$ কিগ্রা)	০.৩৩০	৪.৮৭	৫.৯৭	০.০৭৩	০.৬৪২	১৮৯৯	৫৬৮	৮৬.৮	১০২	০.০১২৫
ব্যাস (কিমি)	৪৮৭৯	১২,১০৪	১২,৭৫ ৬	৩৪৭৫	৬৭৯২	১,৪৩,০০০	১২০,৫৩৬	৫১,১১৮	৪৯,৫২৮	২৩৯০
ঘনাঙ্ক (কিগ্রা/$মি^{৩}$)	৫৪২৭	৫২৪৩	৫৫১৫	৩৩৪০	৩৯৩৩	১৩২৬	৬৮৭	১২৭০	১৬৩৮	১৭৫০
মহাকর্ষ (মি/$সে^{২}$)	৩.৭	৮.৯	৯.৮১	১.৬	৩.৭	২৩.১	৯.০	৮.৭	১১.০	০.৬
মুক্তগতি (কিমি/সে)	৪.৩	১০.৪	১১.২	২.৪	৫.০	৫৯.৫	৩৫.৫	২১.৩	২৩.৫	১.১
ঘূর্ণন পিরিওড (ঘণ্টা)	৪০৭.৬	-৫৮৩২.৫	২৩.৯	৬৫৫.৭	২৪.৬	৯.৯	১০.৭	-১৭.২	১৬.১	-১৫৩.৩
দিনের দৈর্ঘ্য (ঘণ্টা)	৪২২৩	২৮০২.০	২৪.০	৭০৮.৭	২৪.৭	৯.৯	১০.৭	১৭.২	১৬.১	১৫৩.৩
সূর্য থেকে গড় দূরত্ব (*$১০^{৬}$ কিমি)	৫৭.৯	১০৮.২	১৪৯.৬	০.৩৮৪*	২২৭.৯	৭৭৮.৬	১৪৩৩.৫	২৮৭২.৫	৪৪৯৫.১	৫৮৭০.০
সর্বনিম্ন দূরত্ব (*$১০^{৬}$ কিমি)	৪৬.০	১০৭.৫	১৪৭.১	০.৩৬৩*	২০৬.৬	৭৪০.৫	১৩৫২.৬	২৭৪১.৩	৪৪৪৪.৫	৪৪৩৫.০
সর্বোচ্চ দূরত্ব (*$১০^{৬}$ কিমি)	৬৯.৮	১০৮.৯	১৫২.১	০.৪০৬*	২৪৯.২	৮১৬.৬	১৫১৪.৫	৩০০৩.৬	৪৫৪৫.৭	৭৩০৪.৩
প্রদক্ষিণ পিরিওড (দিন)	৮৮.০	২২৪.৭	৩৬৫.২	২৭.৩	৬৮৭.০	৪৩৩১	১০,৭৪৭	৩০,৫৮৯	৫৯,৮০০	৯০,৫৮৮
প্রদক্ষিণ গতি (কিমি/সে)	৪৭.৯	৩৫.০	২৯.৮	১.০	২৪.১	১৩.১	৯.৭	৬.৮	৫.৪	৪.৭
প্রদক্ষিণ ঢাল (ডিগ্রী)	৭.০	৩.৪	০.০	৫.১	১.৯	১.৩	২.৫	০.৮	১.৮	১৭.২
অক্ষরেখার কাত (ডিগ্রী)	০.০১	১৭৭.৪	২৩.৪	৬.৭	২৫.২	৩.১	২৬.৭	৯৭.৮	২৮.৩	১২২.৫
গড় তাপমাত্রা (সেন্টি)	১৬৭	৪৬৪	১৫	-২০	-৬৫	-১১০	-১৪০	-১৯৫	-২০০	-২২৫
পৃষ্ঠদেশ চাপ (বার)	০	৯২	১	০	০.০১	অজানা	অজানা	অজানা	অজানা	০
রিং আছে কি?	না	না	না	না	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না
গ্রহে চুম্বকফিল্ড?	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	অজানা

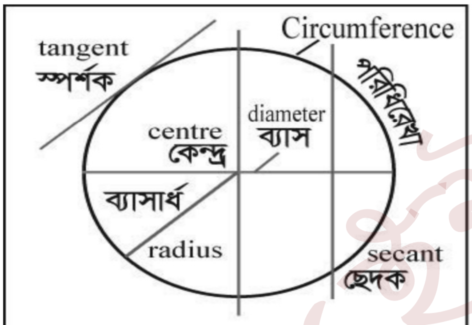
চন্দ্রের সংখ্যা	০	০	১	০	২	৬৩	৬২	২৭	১৩	৩

*পৃথিবী থেকে দূরত্ব। সূত্রঃ NASA, Goddard Space Flight Centre

উপরের টেবিলে দেওয়া তথ্যাদি সম্পর্কে আরো কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার ও অর্থ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিয়ে এবার আলোচনা করবো। এগুলো বুঝা একান্ত জরুরী।

ম্যাস বা ওজন (*১০^{২৮} কিগ্রা) [mass] : এই ওজন বলতে বস্তুর পরিমাণ বুঝতে হবে। টেবিলে দেওয়া সংখ্যাটির সাথে ১০ এর সঙ্গে ২৮টি শূন্য যুক্ত করে যে বিরাট সংখ্যা হবে তা দিয়ে পূরণ করতে হবে। গ্রহের মধ্যে কতটুকু বস্তু বা ম্যাস আছে তা থেকেই মহাকর্ষের মাত্রা নির্ণিত হয়। সুতরাং পৃথিবীর এক কেজি ওজনের কোন বস্তু বৃহস্পতি গ্রহে কয়েক গুণ বেশী হবে। বাস্তবে তা ২.৩ কেজি। আর সূর্যেও ওপর পৃথিবীর ১ কেজি = ২৭ কেজি!

ব্যাস (কিমি) [diameter] : ব্যাস শব্দের ইংরেজী হলো ডায়ামিটার [diameter]। কোন বৃত্তের ঠিক মধ্যম পয়েন্ট বরাবর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রেখাকে ব্যাস বলে। গ্রহের ব্যাস কিলোমিটার (কিমি) ইউনিটে দেওয়া হয়েছে। বৃত্তের বিভিন্ন অংশ জানতে আমরা নীচের চিত্রটি দেখতে পারি।



বৃত্ত ও তার বিভিন্ন অংশ
(Circle & parts)

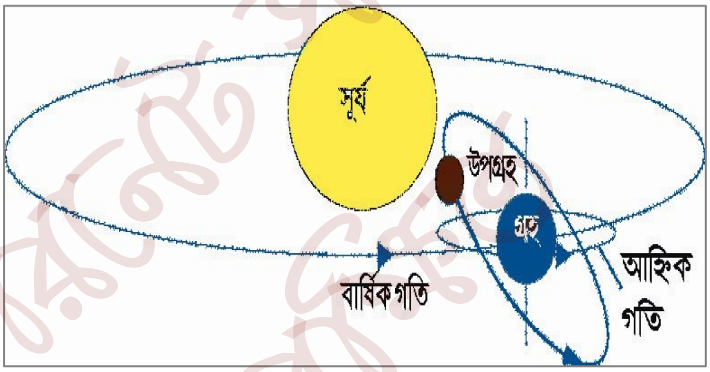
ঘনাঙ্ক (কিগ্রা/মি^{৩}) [density] : গ্রহ বা যে কোন বস্তুতে গড়ে প্রতি কিউবিক মিটার [ঘনমিটার] আয়তনে কি পরিমাণ ওজনের বস্তু [ম্যাস] আছে তার হিসাবকে ঘনাঙ্ক বলে। এ হিসাবটি কিলোগ্রাম প্রতি ঘনমিটারে (কিগ্রা/মি^{৩}) দেওয়া হয়েছে।

মহাকর্ষ (মি/সে^{২}) [gravity] : পৃথিবীসহ মহাকাশের যে কোন বস্তুর পৃষ্ঠদেশে ঠিক কেন্দ্রের দিকে একটি টানশক্তি বিদ্যমান। একে বলে মহাকর্ষ। মহাকর্ষ বস্তুর মাত্রার উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক বস্তু তার নিজস্ব ওজনের তুলনায় একটি ত্বরণ [acceleration] গতিতে কেন্দ্রের দিকে সকল বস্তুকে টেনে নেয়। যেমন পৃথিবীর মহাকর্ষের গতি হলো ৯.৮১ মিটার প্রতি সেকেন্ড-সেকেন্ড। এর অর্থ, এই ত্বরণ গতিতে যে কোন বস্তু পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে পতিত হবে। আপনি যদি কোন বিল্ডিংয়ের উপর থেকে লাফ মারেন তাহলে এই গতিতে মাটির উপর পড়বেন। যদিও এভাবে লাফ মারা আপনার জন্য সঠিক হবে বলে মনে হয় না!

মুক্তগতি (কিমি/সে) [escape velocity] : প্রত্যেক আস্ট্রনোমিক্যাল [মহাকাশের] বস্তুর পৃষ্ঠদেশ থেকে **'মুক্ত'** হতে একটি গতির প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ বস্তুর মহাকার্ষিক টান থেকে মুক্ত হয়ে মহাকাশে যেতে হলে এই গতি অর্জন অনিবার্য। সাধারণত আমরা কোন ঢিল উপরের দিকে ছুঁড়ে মারলে তা কিছুদূর উপরে ওঠে আবার মাটিতে পতিত হয়। কিন্তু ঢিলটির মধ্যে মুক্তগতি থাকলে তা উড়ে চলে যেতো মহাকাশে! ঠিক এভাবেই একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়। পৃথিবীর মুক্তগতি হলো ১১.২ কিমি/সে [৪০,৩২০ মাইল/ঘণ্টা]। এই গতি অর্জন চাট্টিখানি কথা নয়। আর এই গতি অর্জন জরুরী- যার কারণে রকেট উড্ডয়নের সময় আমরা দেখতে পাই বিরাট মাত্রার হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হতে। মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণে মুক্তগতির হিসাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ফেক্টর।

ঘূর্ণন পিরিওড (ঘণ্টা) [rate of spin] ও প্রদক্ষিণ পিরিওড (দিন) [rate of orbit]: সব গ্রহের মধ্যে সরাসরি দু'টি গতি বিদ্যমান। এগুলোকে **আহ্নিক** (দৈনিক - ঘূর্ণন পিরিওড) ও **বার্ষিক** (প্রদক্ষিণ পিরিওড) গতি

বলে। নীচের চিত্রটি স্ট্যাডি করলেই এই গতিগুলোর স্বরূপ ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন। আহ্নিক গতি হলো দৈনিক গতি। পৃথিবী তার নিজস্ব মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে দ্রুত চক্কর (স্পিন) দিচ্ছে। এই গতির ফলেই ২৪ ঘণ্টায় ১ দিন হয়। পৃথিবীর উপরে স্থির কোন বস্তু তাই প্রতি মিনিটে ২৭ কিলোমিটার বেগে পূর্ব দিকে যাচ্ছে। উপগ্রহ বা চন্দ্রের মধ্যে তিনটি ডাইরেক্ট গতি বিদ্যমান। উপগ্রহ যেহেতু গ্রহের চতুর্দিকে (মাসে) প্রদক্ষিণ করতে হয় তাই তার মধ্যে একটি অতিরিক্ত গতি বিদ্যমান থাকে। যা হোক, বুঝা গেল পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের দু'টি ও উপগ্রহের তিনটি ডাইরেক্ট গতি আছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আমরা পরবর্তীতে দেখবো পুরো সৌরজগৎ কিভাবে আমাদের তারা সিস্টেম মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিকে কেন্দ্র করে মহাকাশে এক অত্যাশ্চর্য উচ্চ গতিতে হু হু করে ঘুরছে।



সূর্য থেকে গড় দূরত্ব : সূর্য থেকে সর্বনিম্ন দূরত্ব : সূর্য থেকে সর্বোচ্চ দূরত্ব (*$১০^{৬}$ কিমি) : গ্রহগুলোর প্রদক্ষিণপথ ঠিক বৃত্তাকার নয় বরং ডিম্বাকৃতির [উপবৃত্তিক]। এর অর্থ, প্রদক্ষিণপথে চলার সময় সূর্য থেকে দূরত্বের তারতম্য ঘটে। টেবিলে দেওয়া সংখ্যাকে ১০০০০০০০ দ্বারা গুণ করতে হবে। উপবৃত্ত বা বৃত্তাকার প্রদক্ষিণ কি তা বুঝতে আমরা নীচের চিত্রটি দেখতে পারি।

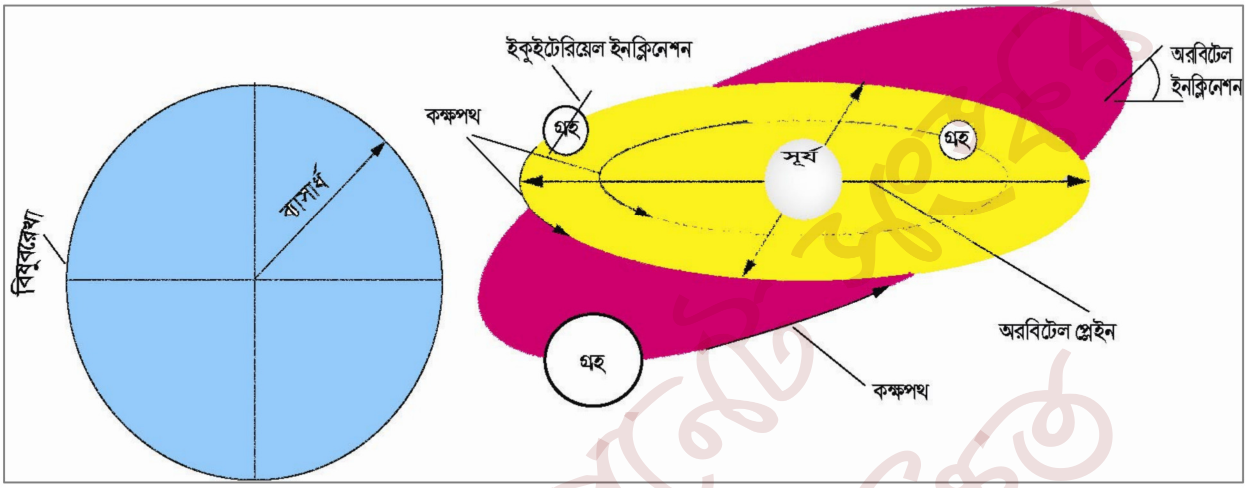


উপবৃত্ত [ellipse]

প্রদক্ষিণ পিরিওড (পৃথিবী দিবস) [orbital period] ও প্রদক্ষিণ গতি (কিমি/সে) [orbital velocity] : প্রতিটি গ্রহের **'গড়'** একটি গতি আছে। প্রদক্ষিণপথ উপবৃত্তিক। ফলে সর্বদা এই গতির মধ্যে তারতম্য ঘটে। এখানে গড় গতি দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য করুন, আমাদের পৃথিবী একবার প্রদক্ষিণ করতে ৩৬৫.২ দিন সময় নেয়। এটাই তার প্রদক্ষিণ পিরিওড। অপরদিকে তার গড় গতি হলো ২৯.৮ কিমি/সে। এটা কম না। **'এই এক সেকেন্ড'** সময়ের মধ্যে পৃথিবী তার কক্ষপথে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার এগিয়ে গেছে! ব্যাপারটি বুঝে এসেছে? লক্ষ্য করুন বুধের প্রদক্ষিণ গতি সর্বোচ্চ- প্রায় ৪৮ কিমি/সে। অপরদিকে সর্বনিম্ন প্রদক্ষিণ গতি হলো প্লুটোর- যা মাত্র ৪.৭ কিমি/সে। বুঝাই যাচ্ছে, দূরত্বের সাথে এই গতির মাত্রা কমে আসে।

প্রদক্ষিণ ঢাল (ডিগ্রী) [orbital inclination] : এটা দ্বারা গ্রহের প্রদক্ষিণপথ মূল অরবিট্যাল প্লেইন [orbital plane] থেকে কত ডিগ্রী বেশকম আছে তা বুঝানো হয়েছে। নীচের চিত্র থেকে বিষয়টি বুঝা সহজ হবে- আশাকরি।

অক্ষরেখার কাত (ডিগ্রী) [equatorial inclination] **:** প্রায় প্রতিটি গ্রহ নিজের অক্ষরেখা বা ইকুইটেরিয়েল লাইন থেকে কিছুটা **'কাত'** হয়ে চলে। এই কাত হওয়ার ফলেই সৃষ্টি হয় মৌসুম। নীচের চিত্রে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেছি। একটু স্ট্যাডি করে নিন।



গড় তাপমাত্রা (সেন্টি) [average temperature] : পৃষ্ঠদেশের গড় তাপমাত্রা ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হিসাবে দেওয়া হয়েছে টেবিলে। লক্ষ্য করুন, অভ্যন্তরীণ তিনটি গ্রহের তাপমাত্রার তারতম্য। বুধ নিকটতম গ্রহ। কিন্তু তার তাপমাত্রা ১৬৭ ডিগ্রী। এর পরের গ্রহ শুক্র। তাপমাত্রা ৪৬৪ ডিগ্রী! এই বিরাট তফাতের কারণ কি? শুক্রের ঘন বায়ুমণ্ডল এর কারণ। লক্ষ্য করুন টেবিলে দেওয়া **গড় পৃষ্ঠদেশ চাপ**। শুক্রের মতো এতো বেশী তাপমাত্রা পুরো সৌরজগতের কোনো গ্রহে এখনও মিলে নি। সূর্যের রশ্মি থেকে পতিত এনার্জি সে তার পৃষ্ঠদেশে **'গ্রেফতার'** করে রাখে। তাপমাত্রা এ কারণেই এতো বেশী। অপরদিকে বুধের বায়ুমণ্ডল নেই বললেই চলে। কাছে থাকার কারণে সূর্যের আলো ও তাপ সে বেশী পায়। কিন্তু তা ধরে রাখতে পারে না শুক্রের মতো। তবে তার যে দিকটি সূর্যের দিকে, সেদিকের তাপমাত্রা অনেক বেশী [৬৫০ ডি.সে.]। রাতের দিকের তাপমাত্রা অনেক অল্প- যিরো থেকেও ১৮৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড কম [-১৮৩ ডি.সে.]।

রিং সিস্টেম [ring system] : বড় চারটি গ্রহ তথা বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুনে রিং সিস্টেম আছে। তবে পৃথিবী থেকে শনি ছাড়া অন্য গ্রহগুলোর এই রিং দৃশ্যমান হয় না।

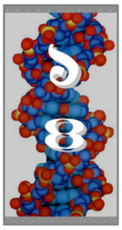
চুম্বকফিল্ড [magnetic field] : নয়টি গ্রহের মধ্যে পৃথিবীসহ ছয়টির চুম্বকফিল্ড আছে বলে নিশ্চিত জানা গেছে। প্লুটোর আছে কি না এখনো জানা যায় নি। চুম্বকফিল্ড থাকায় আমরা সূর্যের ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয়া থেকে অনেকটা নিরাপদ। এই ফিল্ড ওসব বিকিরণ প্রতিবিম্ব করে পুনরায় মহাকাশের দিকে পাঠিয়ে দেয়।

মোট চন্দ্রের সংখ্যা : বুধ ও শুক্রের কোনো উপগ্রহ বা চন্দ্র নেই। এ টেবিলে দেওয়া চন্দ্রের সংখ্যা নিশ্চিতভাবে জানা তথ্যাদি থেকে সংগ্রহিত হয়েছে। দূরবর্তী গ্রহগুলোর চন্দ্রের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। অর্থাৎ নতুন চন্দ্র আবিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! সৌরজগৎ সম্পর্কে এ পর্যন্ত আলোচনায় নিশ্চয় আপনাদের মনে জানার আগ্রহ বেড়েছে- ঠিক না? বাস্তবে আজকের ভূমিকাসর্বস্ব লেকচারের উদ্দেশ্য তা-ই। আগামী লেকচারে আমরা উপরের তথ্যাদির পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা তুলে ধরবো। সঙ্গে থাকবে অনেক ছবি ও চিত্রাঙ্কন। আজ এ পর্যন্তই। আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





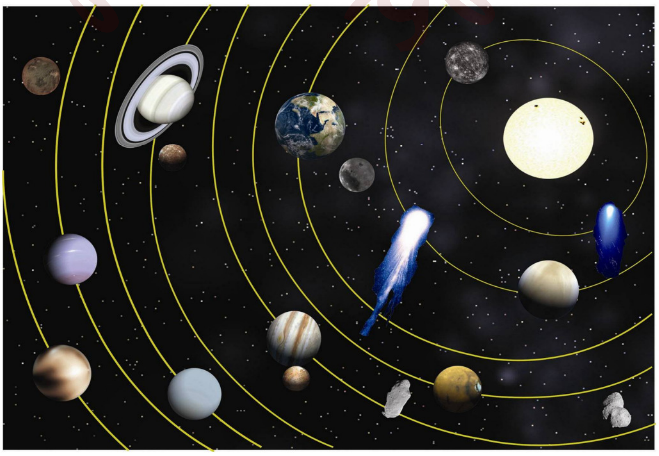
বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

গ. মহাকাশবিজ্ঞান: গঠনপ্রণালী ও মৌলিক গতিবিধি

বক্তৃতা ১৪ : সৌরজগৎ

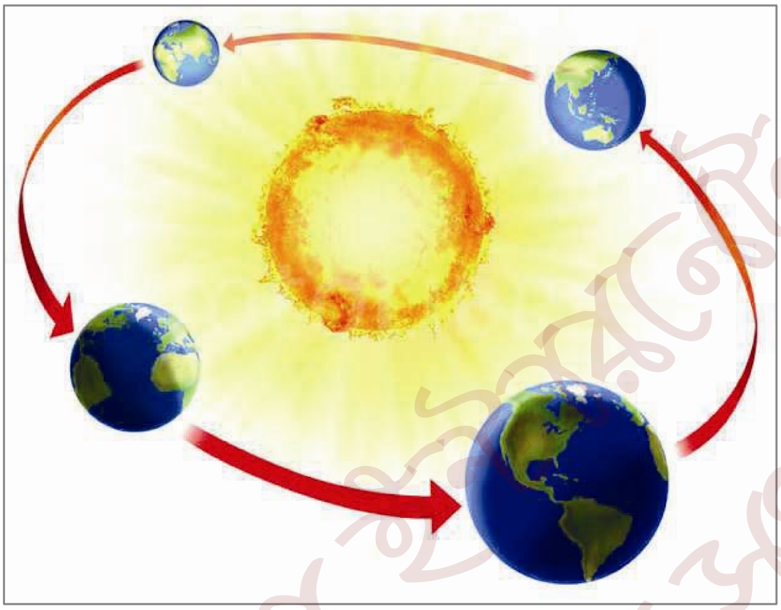
'বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান' বক্তৃতামালার ১৪তম লেকচারে সবাইকে উষ্ণ স্বাগত জানাচ্ছি। গত লেকচারে মহাকাশবিজ্ঞানের উপর ভূমিকা তুলে ধরেছি। শেষের দিকে আমরা সৌরজগতের উপর কিছুটা আলোচনা করেছি। গ্রহ-উপগ্রহের জানা তথ্যাদির একটি টেবিলও লিপিবদ্ধ করেছি লেকচার নোটে। আজকের বক্তৃতায় সৌরজগৎ সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য উপস্থাপন করবো। এতে আশা করছি, শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের এই জগতের কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেয়ে যাবেন। নিম্নে সমগ্র সৌরজগতের একটি চিত্র তুলে ধরেছি। এই চিত্রের উপর ভিত্তি করেই আমাদের তথ্যানুসন্ধানের শুরু। দেখুন, কেমন এক সুন্দর, সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত উপায়ে জগতের প্রতিপালক সূর্য ও তার পরিবারবর্গকে চালনা করছেন। আমাদেরকে বেঁচে থাকার কৌশল হিসাবে সবদিক বিবেচনা করে ভাসিয়ে রেখেছেন পৃথিবীকে সঠিক অবস্থানে। দিয়েছেন এতে সঠিক গতি, ওজন, বায়ুমণ্ডল, চুম্বকগোলক ... ইত্যাদি।



বায়ের ছবিতে সূর্যকে কেন্দ্র করে সবকিছুর ঘূর্ণনপথ বা প্রদক্ষিণপথ চিত্রিত হয়েছে। সূর্যের আয়তন, ওজন, বস্তুর মাত্রা, বড়ত্ব সৌরজগতের সকল বস্তুর তুলনায় বিরাট। ফলে সবকিছু তার নিয়ন্ত্রণাধীন আছে। মহাকাশে আমাদের নিকটতম তারা এটি। সুতরাং আমরা সূর্য সম্পর্কে জানা তথ্যাদি নিয়ে আলোচনা করবো সর্বপ্রথম।

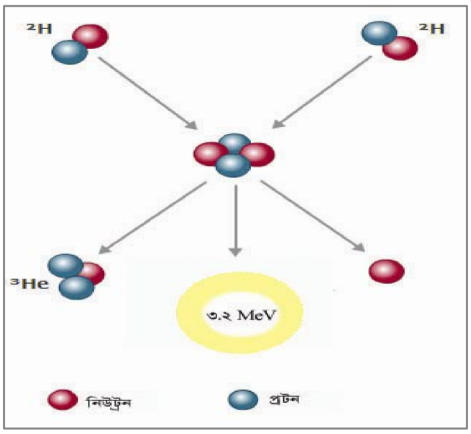
ক. সূর্য

সূর্যের শক্তিশালী মহাকর্ষ পৃথিবীসহ সৌরজগতের সকল গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, এ্যাস্টারোইড [গ্রহাণুপুঞ্জ] ইত্যাদি যাবতীয় বস্তু **'প্রদক্ষিণ'** অবস্থায় ধরে রেখেছে। সূর্যের আলো ও তাপ থেকে সমগ্র সৌরজগৎ প্রভাবান্বিত, উপকৃত। পৃথিবীতে প্রাণীজীবন সংরক্ষণে সূর্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দিনের আকাশ সূর্যালোকে উজ্জ্বল। রাতের অন্ধকারে সূর্যের আলো আকাশের চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহে পতিত হয়ে প্রতিবিম্ব হয়। পৃথিবীর জমিনে এ আলো পৌঁছলে আমরা এসব বস্তু দেখতে পাই। মোটকথা, সৌরজগতে সূর্যের একক প্রভাব সর্বত্র বিদ্যমান। সৌরজগৎ বলতে সূর্যকেই বুঝায়। গ্রহ-উপগ্রহ ও অন্যান্য বস্তু তো সবই তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাচ্চা মাত্র!



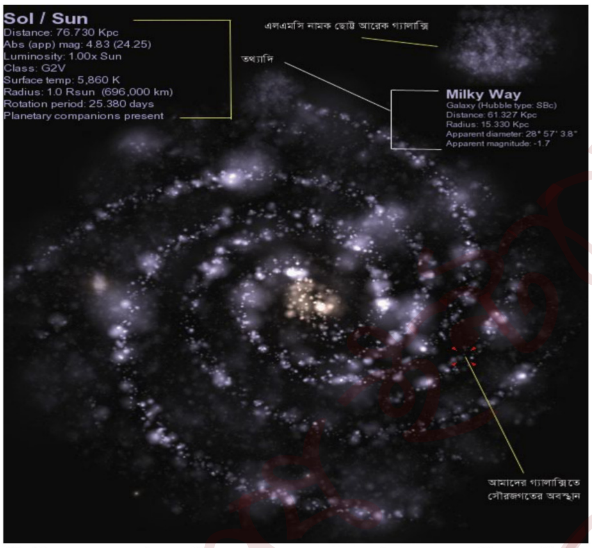
দৈহিক বৈশিষ্ট্য

সূর্য বিরাট দেহবিশিষ্ট একটি গ্যাসীয় জ্বলন্ত বস্তু। তার কেন্দ্র থেকে বাইর পর্যন্ত দূরত্ব [ব্যাসার্ধ] ৬,৯৫,৫০৮ কিলোমিটার [৪,৩২,১৬৯ মাইল]। ঘণ্টায় এক হাজার মাইল গতিতে বিমান চলে। এই গতিতে কেউ যদি সূর্যের কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে পাড়ি জমায় তাহলে দীর্ঘ ১৮ দিন সময় লাগবে! সূর্যের ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ১০৯ গুণ। মনে করুন সূর্যটি ফাঁপা। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ফাঁপা সূর্য পৃথিবীর সম-পরিমাপের বল দ্বারা ভর্তি করে দেবো! ক'টি বল লাগবে বলে মনে করেন? হিসাব করে দেখা গেছে ১০ লক্ষাধিক পৃথিবী লাগবে ফাঁপা সূর্যকে পরিপূর্ণ করতে! এ-তো গেল সূর্যের বিরাট আয়তনের হিসাব। তার মধ্যে কী পরিমাণ বস্তু আছে তা জানবেন? ১৯৮৯ সংখ্যার সঙ্গে ২৪টি শূন্য লিখেন। এই বিরাট সংখ্যক মেট্রিক টন [১০০০ কিগ্রা সমান ১ মেট্রিক টন] পরিমাণ বস্তু আছে সূর্যের মধ্যে। অন্যভাবে বলি- পৃথিবীর তুলনায় ৩,৩৩,০০০ গুণ বেশী ওজনবিশিষ্ট আমাদের এই তারাটি। তবে একদিকে সূর্য থেকে পৃথিবীর একটি পরিমাপ বেশী! এটা হলো ঘনাঙ্ক। সূর্য গ্যাসীয় বস্তু। ফলে তার মধ্যস্থ জড় তেমন বেশী টাইট-ফিট নয়। সূর্যের ঘনাঙ্ক ১.৪০৯ গ্রা/সেমি৩। অর্থাৎ গড়ে প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারে ১.৪০৯ গ্রাম জড়বস্তু আছে। এ মাত্রাটি পৃথিবীর গড় ঘনাঙ্কের এক-চতুর্থাংশ মাত্র। সূর্যের দৃশ্যমান অংশের তাপমাত্রাও কম না- ৫,৫০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। অভ্যন্তরের তাপমাত্রা ১ কোটি ৫৫ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড! এই বিরাট তাপমাত্রার কারণে অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত ঘটছে **'আনবিক ফিউশন প্রতিক্রিয়া'**। হাইড্রোজেন গ্যাস এই প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে হিলিয়াম পদার্থে পরিণত হচ্ছে। এই প্রসেসের ফলেই সূর্য থেকে বেরিয়ে আসছে বিরাট মাত্রার তাপ ও আলোক এনার্জি। ফিউশন মানে পরমাণু যুক্ত হওয়া। ডানে অতি সাধারণভাবে সূর্যের এনার্জিসূত্র এই প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ দেখানো হয়েছে।



আমরা সূর্য থেকে অনেক দূরে। বাস্তবে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল হলো এ দূরত্ব। সূর্য থেকে আলো আসতে কেটে যায় ৮ মিনিট সময়। তবে ভাগ্যিস, সূর্যের মতো এরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোন তারা আমাদের নিকটে নেই। প্রক্সিমা সেন্টরী নামক একটি তারা আছে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন এটাই নিকটতম তারা। এর দূরত্ব ৪.৩ আলোক-বৎসর। অর্থাৎ আলো আসতে কেটে যায় প্রায় ৪ বৎসর ৪ মাস!

সূর্য **'মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি'** [ছায়াপথ] নামক **'আমাদের'** নিজস্ব তারাজগতের একটি সদস্য। এই তারাজগতে প্রায় ৪ বিলিয়ন [৪ হাজার মিলিয়ন বা ৪০০ কোটি] তারা আছে। পেঁচানো এ তারাসিস্টেমের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তের দূরত্ব এক লক্ষ আলোক-বৎসর [অর্থাৎ একদিক থেকে অপরদিকে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে চলন্ত আলোকরশ্মি যেতে এক লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হয়!]। এর গভীরত্ব ১০ হাজার আলোক-বৎসর। সূর্য গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে অন্তত ২৫ হাজার আলোক-বৎসর দূরে অবস্থিত। নীচের চিত্রটি দেখুন। আমরা পরবর্তীতে জগতব্যাপী কোটি কোটি এরূপ গ্যালাক্সির গঠনপ্রণালীর উপর আলোচনা করার আশা রাখি।

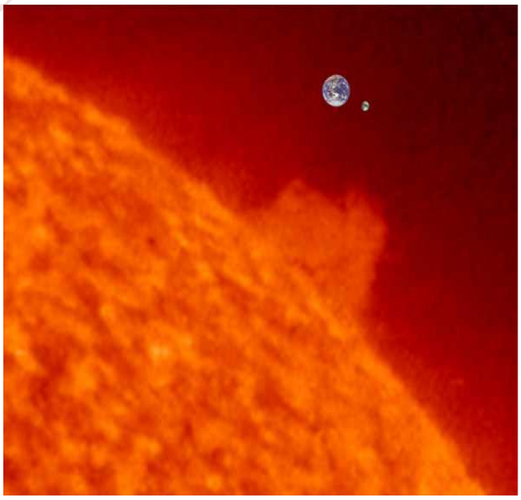


যাক, সূর্য সম্পর্কে আমাদের তথ্যানুসন্ধান আপাতত শেষ। যে ক'টি বিষয় এ মুহূর্তে আমাদের জানা থাকা দরকার তার সারাংশ হলো:

১. সূর্য মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির একটি মধ্যম বয়সী তারা।

২. সৌরজগতের সকল বস্তু তার বিরাট মহাকার্ষিক ফিল্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সবকিছু তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দূরত্ব ও গতিতে যারতার প্রদক্ষিণপথে ভ্রমণ করে প্রতিনিয়ত।

৩. সূর্যের নিজস্ব দু'টি সরাসরি গতি আছে। এর প্রথমটি হলো দৈনিক [স্পিন গতি]। এর মাত্রা ২৫ [বিষুবরেখায়] থেকে ৩০ [উভয় মেরুর কাছাকাছি] দিন। অর্থাৎ সূর্যের সব অংশ এক সঙ্গে ঘুরে না। গ্যাসীয় বস্তু হওয়ায় এমনটি হয়। দ্বিতীয় গতিকে বলে **'গ্যালাক্টিক পিরিওড'**। এই গতিতে সে সমগ্র সৌরজগৎ নিয়ে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির চতুর্দিকে খুব উচ্চ গতিতে প্রদক্ষিণরত আছে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন বর্তমানে এই গতি হলো ২২০ কিমি/সেকেন্ড [১৪০ মাইল প্রতি সেকেন্ড]। একটি মাত্র প্রদক্ষিণ সম্পন্ন করতে সময় লাগে ২৫ কোটি বৎসর! বিজ্ঞানীরা বলেন, ৪৬০ কোটি বৎসর পূর্বে জন্ম নেওয়ার পর এ পর্যন্ত মাত্র ৪৬০ / ২৫ = ১৮.৪ বার সূর্য ও সৌরজগৎ গ্যালাক্সির চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতে সক্ষম হয়েছে! অর্থাৎ সৌরজগতের বয়স **'১৮ গ্যালাক্টিক বৎসর'**। হয়তো আরো **'১৮ বা ২০ গ্যালাক্টিক বৎসর'** সূর্য ও সৌরজগতের অস্তিত্ব বজায় থাকবে।



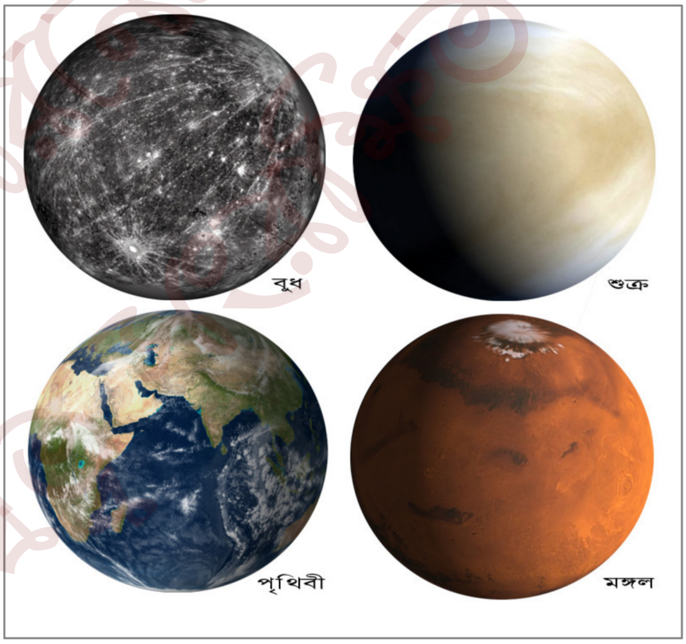
৪. সূর্যের ওজন [বস্তুর মাত্রা] বিরাট- ১.৯৯×১০^{৩০} কেজি। এর অর্থ ১৯৯ এর পরে ২৮টি শূন্য! বিরাট মাত্রার এই বস্তুর ৭১% হাইড্রোজেন, ২৭.১% হিলিয়াম এবং ২ শতাংশেরও কম অন্যান্য। সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা ১.৫৫ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

৫. সূর্যের উপর মুক্তগতি ৬১৮ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড। অর্থাৎ এই গতি অর্জন ছাড়া সূর্যের মহাকর্ষ থেকে কেউ মুক্ত হতে পারবে না কেউ।

৬. সূর্যের মূল জ্বালানি হলো হাইড্রোজেন গ্যাস। কেন্দ্রে আনবিক ফিউশন প্রতিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন এটম হিলিয়ামে পরিণত হচ্ছে। ফলে বেরিয়ে আসছে মোটা অঙ্কের এনার্জি। এই এনার্জি আলো, সৌরবাতাস, তাপ ইত্যাদি রূপে সমগ্র সৌরজগতে ছড়িয়ে পড়ছে। আলোকিত ও উত্তপ্ত করে রাখছে সকল গ্রহ-উপগ্রহ, এ্যাস্টারোইড ও ধূমকেতুসহ সৌরজগতের যাবতীয় বস্তুকে।

খ. অভ্যন্তরীণ চারটি '**পৃথিবীসদৃশ**' [terrestrial] গ্রহ

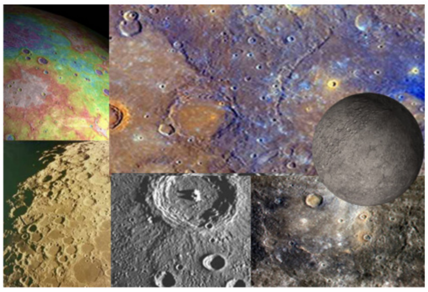
সূর্যের নিকটস্থ চারটি গ্রহ আছে যাদের ভূপৃষ্ঠে মাটি বিদ্যমান। শক্ত শিলাবৎ সম্মৃদ্ধ এসব গ্রহকে বলে '**টেরেস্ট্রিয়াল প্লানেট্স**'। এ চারটি গ্রহ হলো: **বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল**। আমরা এখন একে একে এদের উপর কিছু ইন্টারেস্টিং তথ্য তুলে ধরবো।



বুধ: নিকটতম গ্রহ এটি। পৃথিবী থেকে দু'টি সময় এটা দৃশ্যমান হয়: সূর্যোদয়ের কিছুটা পূর্বে ও সূর্যাস্তের কিছুটা পরে। এই সময় দু'টোর ইংরেজী নাম '**টুয়াইলাইট**' [twilight]। নিকটে থাকায় সূর্যের কাছ থেকে সে সর্বাপেক্ষা বেশী আলো পায়। তবে তার আলো-প্রাপ্তির তুলনায় আলো-প্রতিবিম্বের মাত্রা কম। এই হিসাবকে বলে '**আলবেদো**' [albedo]। এই হিসাব দ্বারা বুঝা যায় কোন আস্ট্রনোমিক্যাল বস্তু সূর্যের কি পরিমাণ আলো প্রতিবিম্ব করে। আলবেদো বেশী থাকলে বস্তুর ঔজ্জ্বল্য বেশী হবে- কম থাকলে অল্প। বুধের আলবেদো মাত্র ০.১। অপরদিকে আমাদের পৃথিবীর আলবেদো ০.৩৯।

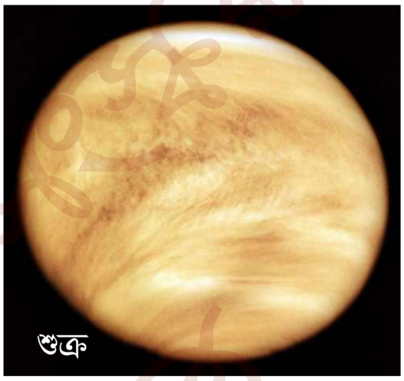
বুধ গ্রহের তথ্যাদি: ১. ওজন = ০.০৫৫৮ x পৃথিবী। ২. বিষুবরেখা বরাবর ব্যাস = ৪৮৮০ কিমি। ৩. প্রদক্ষিণ সময় = ০.২৪১ বৎসর। ৪. সূর্য থেকে গড় দূরত্ব = ৫৭.৯ x $১০^{৬}$ কিমি। ৫. ঘনাঙ্ক = ৫.৬ x পানির ঘনাঙ্ক। ৬. পৃষ্ঠদেশে মহাকর্ষ = ৩.৭৮ মিটার/সেকেন্ডীসেকেন্ড।

পর্যবেক্ষণ: ১৯৭৪ সালের ২৯ মার্চ আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ঘঅঝঅ [National Astronautics and Space Administration] কর্তৃক প্রেরিত মারিনার-১০ মহাকাশযান সর্বপ্রথম বুধ গ্রহ থেকে মাত্র ৭০৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থান নেয়। দ্বিতীয়বার ২১ সেপ্টেম্বর ও ১৯৭৪ এবং তৃতীয়বার ১৬ মার্চ ১৯৭৫ সালে মারিনার-১০ বুধের কাছে যায়। এ মহাকাশযান দ্বারা পৃথিবীতে প্রেরিত ছবি থেকে জানা যায়, সমগ্র গ্রহের উপর অসংখ্য পতন-গর্ত [impact crater] বিদ্যমান। ঠিক যেরূপ পতন-গর্তে ভরপুর আমাদের চাঁদের পৃষ্ঠদেশ। নিম্নে বুধের একটি ছবি কলাজ তুলে ধরেছি।



বুধ সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য সৌরজগতের উপর প্রথম লেকচারে উল্লেখিত হয়েছে।

শুক্র : সূর্য থেকে এ গ্রহের অবস্থান দ্বিতীয়। একে পৃথিবীর **'সহোদরা'** বলে। শুক্রের আয়তন প্রায় পৃথিবীর সমান। তবে তার মধ্যে আছে এক অতিঘন বায়ুমণ্ডল। পৃষ্ঠদেশ বাইর মহাকাশ থেকে দৃশ্যমান হয় না। শুধু শ্বেত মেঘমালা দেখতে পাওয়া যায় সমগ্র গ্রহের চতুর্দিকে। নিম্নের চিত্রটি দেখুন।


শুক্র

সকল গ্রহের মধ্যে শুক্র সর্বাধিক গরম। তার ঘন বায়ুমণ্ডল সূর্যের তাপকে আটকে রাখে। ফলে পৃষ্ঠদেশের কঠিন শিলাপাথর পর্যন্ত জ্বলে লাল বর্ণ ধারণ করে উচ্চ তাপমাত্রায়। গ্রহের আবহমণ্ডলের চাপও খুব বেশী। পৃষ্ঠদেশের একটি **'কম্পিউটার সৃষ্ট'** চিত্র নীচে তুলে ধরেছি। এখানে কোন প্রাণী যে থাকার সম্ভাবনা নেই তা সহজেই অনুমেয়।

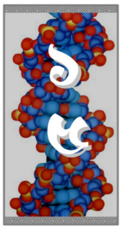
শুক্র গ্রহের তথ্যাদি: ১. এটি আয়তনে পৃথিবীর প্রায় সমান কিন্তু উল্টোদিকে তার দৈনিক গতি। আমাদের পৃথিবী দৈনিক ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসে। আর শুক্র ঘুরে আসে ২৪৩ দিনে! অর্থাৎ তার একদিন আমাদের ২৪৩ দিন। ২. বুধের কোন চন্দ্র কিংবা চুম্বকীয় ফিল্ড নেই। ৩. সূর্য থেকে সে ১০৮ মিলিয়ন কিমি [১০ কোটি ৮০ লক্ষ কিমি- ৬ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল] দূরে থেকে প্রত্যেক ২২৫ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে। এটাই তার বার্ষিক গতি। বুঝা গেল, শুক্রের **১** দিন তার **১** বৎসর থেকে বেশী! ৪. সূর্য ও চন্দ্রের পর, আমাদের আকাশে সর্বাধিক উজ্জ্বল বস্তু হলো শুক্র গ্রহ। ৫. সূর্যোদয়ের সময় যখন সে পূর্বাকাশে উদিত হয় তখন তাকে **'প্রভাত-তারা'** [morning star] বলে। সূর্যাস্তের সময় পশ্চিমাকাশে উদয় হলে তার নাম হয় **'সন্ধ্যে-তারা'** [evening star]। ৬. যখন কোন গ্রহ সূর্যবৃত্তকে অতিক্রম করতে পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান হয় একে বলে, **'ট্রানজিট'** [transit]। বাংলায় **'গ্রহের পরিক্রমণ'** বলা চলে। পৃথিবী থেকে দু'টি মাত্র গ্রহের ট্রানজিট সম্ভব। এগুলো হলো অভ্যন্তরীণ বুধ ও শুক্র গ্রহ। অবশ্য গ্রহের কোন নিজস্ব উপগ্রহ [চন্দ্র] যখন বৃত্তকে অতিক্রম করে আর তা যদি পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান হয় তাকেও ট্রানজিট বলা হয়। পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান **'শুক্র পরিক্রমণ'** সর্বপ্রথম রেকর্ড হয় **১৬৩৯** সালে। সাধারণত শুক্র ট্রানজিট জোড়ায় জোড়ায় হয়ে থাকে। শুক্র **১০৫** কিংবা **১২২** বৎসর পরপর ৮ বৎসর অন্তর দু'টি ট্রানজিট করে। বুধ প্রত্যেক শত বৎসরে **১৩** বার পরিক্রমণ করে। বিজ্ঞানীরা ট্রানজিট থেকে সূর্যের দূরত্ব নির্ণয় করার উপায় আবিষ্কার করেছেন। ৭. শুক্রের বায়ুমণ্ডলে আছে ৯৭% কার্বন ডাইঅক্সাইড আর আবহমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর তুলনায় ৯৭ গুণ বেশী! পৃষ্ঠদেশের গড় তাপমাত্রা ৪৬২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হয়ে থাকে কোন কোন স্থানে।



প্রিয় শ্রোতা! আজ এ পর্যন্তই। আমি ভেবেছিলাম সৌরজগতের উপর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি নিয়ে আলোচনা এ লেকচারেই শেষ করবো। তা আর হলো কৈ? সৌরজগৎ বিরাট। এর উপর প্রাথমিক ধারণা মনের মধ্যে স্থায়ী রেখাপাত করানোও সুকঠিন কাজ- আর আমি এটুকুই চেষ্টা করছি। কিন্তু এরপরও মনের খোরাক এ পরিমাণ যোগান যে কোন জ্ঞানপিপাসু জনকে প্রদান করতে হবে- যদ্দারা তিনি সন্তুষ্ট হন। অন্তত, যথেষ্ট জেনে আরো বেশী জানার আগ্রহ যাতে মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারে সেটুকু তথ্য উপস্থাপন করতেই হবে। সুতরাং সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আরো দু'টি বক্তৃতায় সৌরজগতের তথ্যাদির উপর আলোচনা করবো। আশারাখি সবাই উপস্থিত হবেন আগামী লেকচারগুলোতে। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

গ. মহাকাশবিজ্ঞান: গঠনপ্রণালী ও মৌলিক গতিবিধি

বক্তৃতা ১৫ : সৌরজগৎ

ওয়েলকাম প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! সৌরজগৎ নিয়ে আমাদের আলোচনা আজকের লেকচারে অব্যাহত থাকবে। গত লেকচারের শেষে আমরা অভ্যন্তরীণ চারটি পৃথিবীসদৃশ গ্রহ সম্পর্কে আলোচনার অংশ হিসাবে দ্বিতীয় গ্রহ শুক্রের উপর বেশ কিছু তথ্য তুলে ধরেছি। এখন বাকী দু'টো গ্রহের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক। এর প্রথমটি আমাদের প্রিয় নীল গ্রহ পৃথিবী।

খ. অভ্যন্তরীণ চারটি '**পৃথিবীসদৃশ**' [terrestrial] গ্রহ

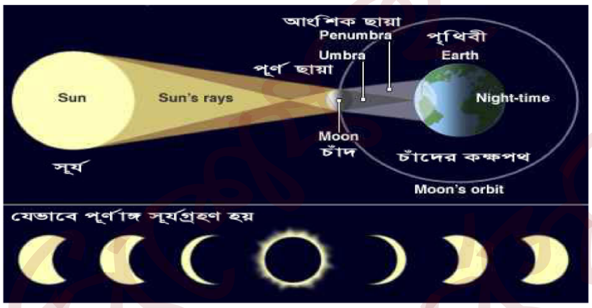
পৃথিবী : এটা আমাদের নিজস্ব গ্রহ। এই গ্রহের উপর কিছু তথ্যাদি জানা সবার জন্য ফরজে আইন! ঠিক বলি নি? এর উপর আমাদের বসবাস। জন্ম-মৃত্যু। সুতরাং অপূর্ব সুন্দর, সৌরজগতের একমাত্র নীল এই গ্রহ সম্পর্কে কিছু আকর্ষণীয় তথ্য জেনে নিই- কেমন?

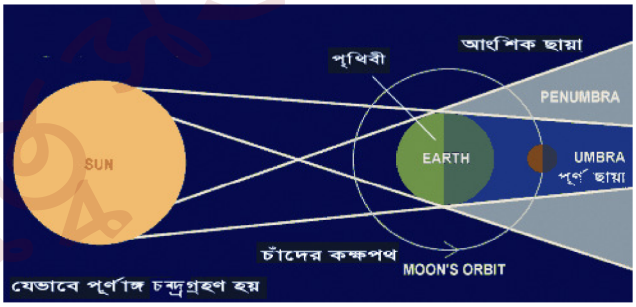
১. পৃথিবী, সৌরজগৎ ও গ্যালাক্সি : সূর্য থেকে বাইরের দিকে গ্রহ-পৃথিবী তৃতীয় স্থানে অবস্থিত। চার পৃথিবীসদৃশ অভ্যন্তরীণ গ্রহগুলোর মধ্যে পৃথিবী সর্ববৃহৎ। গড়ে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে তার প্রদক্ষিণপথ। ১,০৭,০০০ কিমি/ঘণ্টা [৬৭,০০০ মাইল/ঘণ্টা] হলো তার প্রদক্ষিণ গতি [orbital speed]। অন্যান্য গ্রহের তুলনায় আয়তনে পঞ্চম বৃহত্তম গ্রহ হলো পৃথিবী। আগেই বলেছি পুরো সৌরজগৎ একটি বিরাট তারাজগতের অংশ। এই জগতের নাম **'মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি'** [milky-way galaxy]। এই গ্যালাক্সির গঠন **'পেঁচানো'** [spiral]। এতে কয়েকটি পেঁচানো হাত [arms] আছে। **'অরাইওন আর্ম'** [Orion arm] নামক এরূপ একটি হাতে সৌরজগতের অবস্থান।

২. আয়তন ও বস্তুসমষ্টি : পৃথিবী একটি গোলক [বল]। উত্তর ও দক্ষিণ মেরু কিছুটা চাপা। পৃষ্ঠদেশের ৭১% পানি, বাকী প্রায় সবটুকু শুষ্ক মাটি। পৃথিবীর বিষুবরেখা [equator] বরাবর মাপলে তার ব্যাস হয় ১২,৭৫৬ কিমি [৭,৯২৬ মাইল]।

৯. উপগ্রহ : পৃথিবীর একটি প্রাকৃতিক উপগ্রহ আছে। এটা হলো চন্দ্র। এর ব্যস ৩,৪৮০ কিমি [২,১৬০ মাইল] যা পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ। পৃথিবীর ওজনের তুলনায় চন্দ্রের ওজন মাত্র ১.২ শতাংশ, আর ঘনাঙ্ক ৩/৫ গুণ। চন্দ্রের উপর মহাকর্ষ পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ মাত্র। চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে উপবৃত্তে। সে পৃথিবী থেকে গড়ে ৩,৮৪,৪০৩ কিমি [২,৩৮,৮৫৭ মাইল] দূরে থেকে ৩,৭০০ কিমি/ঘ [২,৩০০ মাইল/ঘ] বেগে প্রত্যেক ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে একবার পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে আসে। এটাই তার মাসিক গতি। অপরদিকে তার দৃশ্যতঃ তারতম্য বা কলা [phase] পূর্ণ করতে সময় লাগে ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট। এটাই হলো ইসলামী ক্যালেন্ডারে ব্যবহৃত চান্দ্রমাস। কক্ষপথের গতি ছাড়াও চন্দ্রের অপর আরেক সরাসরি গতি আছে যার নাম **'আহ্নিক গতি'** [spin]। তবে এই গতি ও প্রদক্ষিণ গতি সমান। ফলে চন্দ্রের এক গোলার্ধ সর্বদা পৃথিবী পানে স্থির থাকে। তার অপর **'অন্ধকার'** গোলার্ধ পৃথিবীর জমিন থেকে কখনো দৃশ্যমান হয় না।

১০. গ্রহণ : কোনো এক মুহূর্তে সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র এই তিনটি আস্ট্রনোমিক্যাল বস্তুর অবস্থানের উপর নির্ভর করে **'চন্দ্রগ্রহণ'** ও **'সূর্যগ্রহণ'** নামক ঘটনা। নিম্নের চিত্রে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ নকশার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এটি স্ট্যাডি করলে বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হবেন। এরপরও কিছুটা ব্যাখ্যা দিচ্ছি।





সূর্যগ্রহণ: উপরের [বায়ের] চিত্র থেকে স্পষ্ট, সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে চাঁদ এসে গেলেই সূর্যগ্রহণ হয়। এসময় চন্দ্র পৃথিবীর উপর দু'টি ছায়া ফেলে। এর প্রথমটি হলো পূর্ণাঙ্গ আর দ্বিতীয়টি আংশিক। পূর্ণাঙ্গ ছায়া যে অঞ্চলে পতিত হয়, অন্ধকারের ফলে আকাশের তারা পর্যন্ত দেখা যায়। চন্দ্র যেহেতু সর্বদা তার কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত তাই সূর্যগ্রহণ স্থায়ী কোন ঘটনা নয়। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ সূর্যগ্রহণ ৭.৫ মিনিটের বেশী হয় না। অধিকাংশ সূর্যগ্রহণ ৩ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

চন্দ্রগ্রহণ: যেভাবে চাঁদ কর্তৃক সূর্যের আলোকে আটকে রাখার কারণে সূর্যগ্রহণ হয়, ঠিক তদ্রূপ পৃথিবী কর্তৃক সূর্যের আলোকে আটকে রাখার কারণে চন্দ্রগ্রহণ হয়। উপরের দ্বিতীয় চিত্র থেকে বিষয়টি স্পষ্ট। চন্দ্র তার কক্ষপথে চলাকালে কোনো কোনো সময় পৃথিবীর ছায়া অতিক্রম করে। পৃথিবীর রাতের দিক থেকে চন্দ্র দৃশ্যমান হয় তার উপর সূর্যের আলো পতিত হওয়ার ফলে। কিন্তু পৃথিবীর ছায়া তার উপর পড়লে বেশ কিছুক্ষণের জন্য সে অদৃশ্য হয়ে

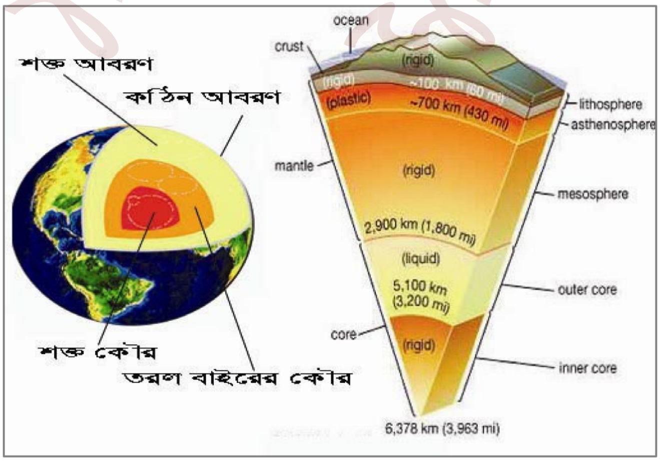
যায় কিংবা দেখতে মনে হয় অন্ধকারে সে নিমজ্জিত হচ্ছে। এটাই চন্দ্রগ্রহণ। সর্বোচ্চ ২ ঘণ্টা পর্যন্ত চন্দ্রগ্রহণ স্থায়ী থাকতে পারে।

১০. পৃথিবীর বার্ষিক ও আহ্নিক গতি : পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড। এটাই তার বাৎসরিক গতি। অপর গতির নাম **'আহ্নিক'** বা দৈনিক গতি। নিজের মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে সে ঘুরে। একবার ঘুরে আসতে লাগে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪.১ সেকেন্ড। পৃথিবীর মধ্যশলাকা ও বার্ষিক গতিপথে ঠিক ৯০ ডিগ্রী পার্থক্য নয়। বাস্তবে পৃথিবীটা ২৩.৫ ডিগ্রী কাত আছে। এর অর্থ প্রদক্ষিণপথে বিভিন্ন সময় পৃথিবীর উভয় গোলার্ধে সূর্যের আলোর পরিমাণ বা দিনের দৈর্ঘ্যে তারতম্য ঘটে। এর ফলে মৌসুমের সৃষ্টি হয়। বায়ের চিত্রটি দেখুন।



১১. পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল : জমিন থেকে ৬ হাজার মাইল উপর পর্যন্ত ব্যাপ্ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। এ মণ্ডলে আছে বিভিন্ন গ্যাস। জমিনের নিকটে আছে ৭৮% নাইট্রোজেন, ২১% অক্সিজেন ও অন্যান্য যেমন আর্গন [০.৯%], কার্বন ডাইওক্সাইড [০.০৩%], জলীয় বাষ্প, হাইড্রোজেন, নাইট্রাস ওক্সাইড, অজোন, মিথেইন, কার্বন মনোক্সাইড, হিলিয়াম, নিওন, ক্রিপ্টন ও জেনন গ্যাস। বায়ুমণ্ডলে কয়েকটি বিশিষ্ট স্তর আছেঃ ট্রপোস্ফিয়ার [troposphere - পৃষ্ঠদেশ থেকে ১০ মাইল উপর পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। এখানে আবহাওয়ার তারতম্য ঘটে।], স্ট্রাটোস্ফিয়ার [stratosphere - ১০ থেকে ৩০ মাইল উপর পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি।], মেজোস্ফিয়ার [mesosphere - ৩০ থেকে ৬০ মাইল উপর পর্যন্ত এই স্তরের ব্যাপ্তি।], থার্মোস্ফিয়ার [thermosphere - এই স্তরের তাপমাত্রা খুব বেশী- ১২০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হতে পারে।] এবং এক্সপোস্ফিয়ার [exosphere - ৬০ থেকে ৬০০ মাইল ও আরো বেশী ঊর্ধ্ব পর্যন্ত ব্যাপ্ত থার্মোস্ফিয়ার ও এই স্তরকে একত্রে আয়োনোস্ফিয়ার [ionosphere] বলে]।

১২. বায়ুমণ্ডল ও পানিচক্র : ভূমি, মহাসাগর ও বায়ুমণ্ডল মিলে সমগ্র পৃথিবীর পানিকে অবিরাম একটি চক্রের মধ্যে রেখেছে। এটার নামই পানিচক্র। কোটি কোটি বৎসর যাবৎ পৃথিবীর পানি ব্যবহৃত হচ্ছে বার বার। ইতোমধ্যে খুব অল্প পানিই সৃষ্টি কিংবা ক্ষয় হয়েছে! ভাবার ব্যাপার নয় কি? পানি মূলত সর্বদাই চলন্ত ও রূপ পরিবর্তনশীল একটি উপাদান। অধিকাংশ সময় তরল, কোনো সময় বরফ এবং সময় সময় [আকাশে] মেঘমালার রূপ ধারণ করে পানি।

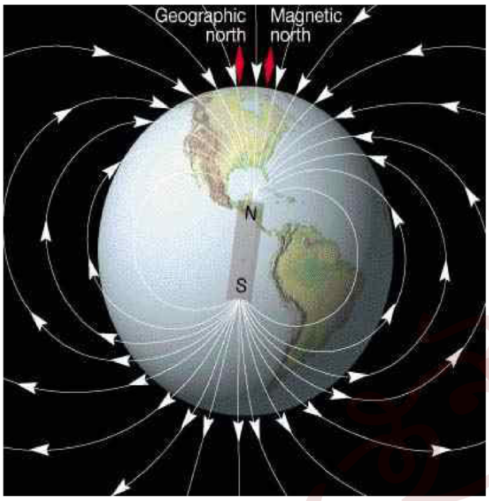


খুব সহজ ভাষায় পানিচক্রের শুরু সূর্যের তাপ থেকে। মহাসাগর, হাওর, জলাশয়, নদী-নালা, খাল-বিল, হ্রদ ইত্যাদিতে জমে থাকা তরল পানি সূর্যের তাপে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে আরোহণ করে। এরপর বাতাস এই জলীয় বাষ্পকে বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ে যায়। ঠাণ্ডা হওয়ার পর আবার

পৃথিবীতে পাতিত হয়। এই ক্রিয়াকে বলে **'প্রেসিপিটেশন'** [precipitation]। বৃষ্টি, তুষারপাত, বরফ শিলাবৃষ্টি ও বরফ শিলাপাথর আকারে এই precipitation ঘটে। পতিত পানি পুনরায় আকাশে আরোহণ করে এবং একই কায়দায় নেমে আসে।

১৩. পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ কাঠামো : এটা বায়ের চিত্রে দেখানো হয়েছে। কোন ব্যাপার আরো বুঝতে জিজ্ঞেস করুন।

১৪.পৃথিবীর মেগনিটোস্ফিয়ার [চুম্বকগোলক] : এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাইর মহাকাশ থেকে আগত অধিকাংশ ক্ষতিকর রশ্মি এই মণ্ডল আটকে রাখে বা মহাকাশের দিকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়। এই মণ্ডল থাকার কারণ হলো পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিরাট মাত্রার লৌহজাত দ্রব্য থাকা। বয়ে এই মণ্ডলের চিত্র তুলে ধরেছি।



মঙ্গল : লাল গ্রহ মঙ্গলের স্থান বাইরের দিকে পৃথিবী পরেই। এটি সর্বশেষ টেরেস্ট্রিয়েল গ্রহ। আয়তনে পৃথিবী থেকে ছোট হলেও এর একটি বায়ুমণ্ডল আছে। মৌসুমী আবহাওয়ার পরিবর্তনও ঘটে মঙ্গলের উপর। মঙ্গলের উপর আদি যুগ থেকে মানুষের আকর্ষণের সীমা নেই। অনেকে মনে করতেন, এর উপর 'বুদ্ধিমান' জাতি বসবাস করে। আসলে এরূপ কোন সভ্যতার নামগন্ধও সেথা নেই। যাক মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলো জানা দরকার।

১. প্রদক্ষিণ ও গতিমতি : মঙ্গল সূর্য থেকে গড়ে ২২৮ [২২ কোটি ৮০ লক্ষ] কিমি [১৪২ মিলিয়ন মাইল] দূরে থেকে ১.৮৮১ [৬৮৭ দিনে] বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে। তার দৈনিক গতি প্রায় পৃথিবীর সমান - ১.০৩ দিন।

২. আয়তন, ওজন ও পৃষ্ঠদেশের বৈশিষ্ট্য : মঙ্গল খুব একটা বড় নয়। তার ব্যাস হলো ৬,৭৯৪ কিমি [৪,২২২ মাইল]। ওজনে সে পৃথিবীর তুলনায় এক-দশমাংশ মাত্র। মহাকর্ষের মাত্রাও পৃথিবীর তুলনায় কম - ৩/৮ অংশ। মঙ্গলের পুরো জামিনের ক্ষেত্রফল পৃথিবীর শুষ্ক ভূমির সমপরিমাণ হবে। তার পৃষ্ঠদেশে পুরাতন অনেক আগ্নেয়গিরি আছে। সৌরজগতের সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি সৃষ্ট পর্বত 'অলিম্পাস মন্স' মঙ্গলের উপরই অবস্থিত। এর উচ্চতা ২৬ কিমি [১৬ মাইল - পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত এভারেস্ট থেকে দ্বিগুণেরও অধিক] ও একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত বেইজের দূরত্ব ৬০০ কিমি [৩৭৫ মাইল]। অনুরূপ আয়তনের আরো কয়েকটি পর্বত আছে।

সৌরজগতের সর্বোচ্চ পর্বত মঙ্গলের 'অলিম্পাস মনস' [Olympus Mons]



৩. বায়ুমণ্ডল : মঙ্গলের একটি বায়ুমণ্ডল আছে। পৃথিবীর তুলনায় এটি অনেকটা পাতলা। প্রাণীদের জন্য মারাত্মক কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস হলো আবহমণ্ডলের মূল বস্তু- পরিমাণ ৯৫%। এছাড়া নাইট্রোজেন [৩%], আর্গন [প্রায় ২%] ও অক্সিজেন [খুব অল্প] বায়ুমণ্ডলে আছে বলে নিশ্চিত জানা গেছে।

৪. চন্দ্র : মঙ্গলের **'ফবোস'** [phobos - বা গ্রীক] এবং **'ডিমোস'** [deimos - বা আরবী] নামক ছোট্ট দু'টি আলুর মতো আকৃতিবিশিষ্ট চন্দ্র আছে। ফবোস [গ্রীক] মঙ্গল থেকে গড়ে ৯,৩৭৮ কিমি [৫,৮২৭ মাইল] দূরে থেকে মাত্র ৭.৬৫ ঘণ্টায় একবার প্রদক্ষিণ করে। তার দৈনিক গতিও একই। ফবোসের সর্ববৃহৎ ব্যাসার্ধ ১৩.৪ কিমি [৮.৩ কিমি] এবং সর্বনিম্ন ব্যাসার্ধ ৯.২ কিমি [৫.৭ মাইল]।

ডিমোস [**বিকল্প নাম: আরবী**] বাইরের চন্দ্র। মঙ্গল থেকে তার গড় দূরত্ব ২৩,৪৬০ কিমি [১৪,৫৮০ মাইল]। পৃথিবীর ১.২৬ দিন সময় লাগে মঙ্গলকে একবার প্রদক্ষিণ করতে। তারও দৈনিক [ঘুর্ণন] গতি বার্ষিক [প্রদক্ষিণ] গতির সমান। এতে এটাই বুঝাচ্ছে উভয় চন্দ্রের একদিক সর্বদা মঙ্গলের দিকে থাকে। ডিমোস খুব ছোট্ট- সর্ববৃহৎ ব্যাসার্ধ ৭.৫ কিমি [৪.৭ মাইল] এবং সর্বনিম্ন ৫.২ কিমি [৩.২ মাইল]। বিজ্ঞানীদের ধারণা উভয় উপগ্রহ মূলত **'গ্রেফতারকৃত'** গ্রহাণুপুঞ্জ [এ্যাস্টারোইড] ছাড়া আর কিছু নয়। মঙ্গল ও পরবর্তী গ্রহ বৃহস্পতির মাঝখানে এরূপ বিশিষ্ট আকৃতিহীন অসংখ্য **'এ্যাস্টারোইড'** আছে। এগুলো বিভিন্ন গতিতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। **'এ্যাস্টারোইড বেল্ট'** সম্পর্কে একটু পরই কিছুটা আলোচনা করবো।
এখানে মার্সমুনঅরবিট

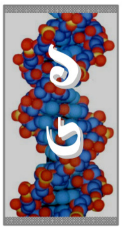
শ্রোতা বন্ধুরা! আজকের লেকচারের এখানেই শেষ। সৌরজগৎ সম্পর্কে জানার কিন্তু ইতি ঘটে নি। আমরা এ পর্যন্ত সূর্য ও অভ্যন্তরীণ চারটি পৃথিবীসদৃশ শক্ত শিলাসর্বস্ব গ্রহের উপর কিছু আলোচনা করেছি মাত্র। সৌরজগতের আরো ৪টি বৃহৎ গ্রহ এবং কয়েকটি **'বামন'** গ্রহ আছে। ধূমকেতু, এ্যাস্টারোইড বেল্ট, কাইপার বেল্ট, ওর্ট ক্লাউড ইত্যাদিও এ জগতের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা আগামী লেকচারে এগুলোর পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য, রহস্য ইত্যাদি উন্মোচন করবো ইনশাআল্লাহ! আবার দেখা হবে।



গ্যালাক্সির মিথস্ক্রিয়া : পাশের ছবিতে মহাকাশে অসংখ্য তারকা নিয়ে গঠিত দু'টি পেঁচানো তারাজগৎ দেখাচ্ছে। এরা স্পাইরাল গ্যালাক্সি [spiral galaxy]। ছবি থেকে স্পষ্ট, উভয় গ্যালাক্সির মধ্যে মিথস্ক্রিয়া চলছে। গ্যালাক্সির উপর কিছু আলোচনা পরবর্তী একটি লেকচারে হবে, ইনশাআল্লাহ!

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





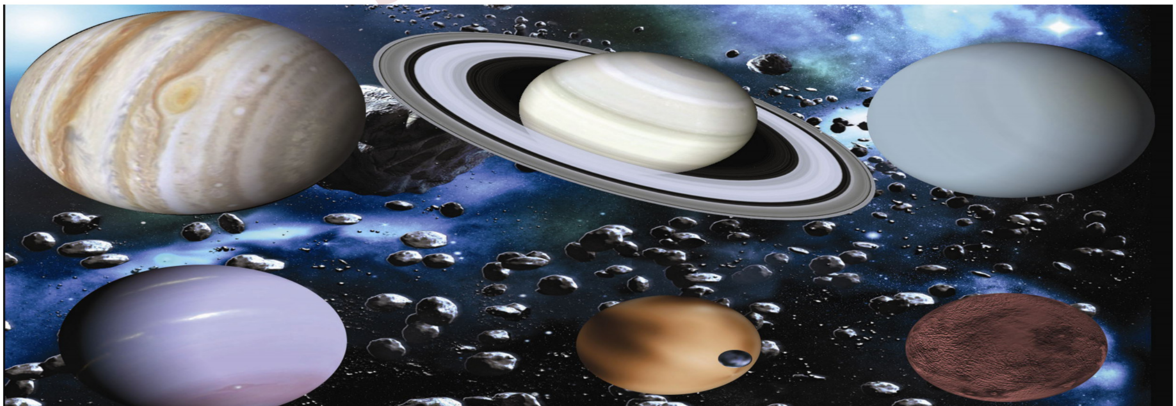
বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

গ. মহাকাশবিজ্ঞান: গঠনপ্রণালী ও মৌলিক গতিবিধি

বক্তৃতা ১৬: সৌরজগৎ

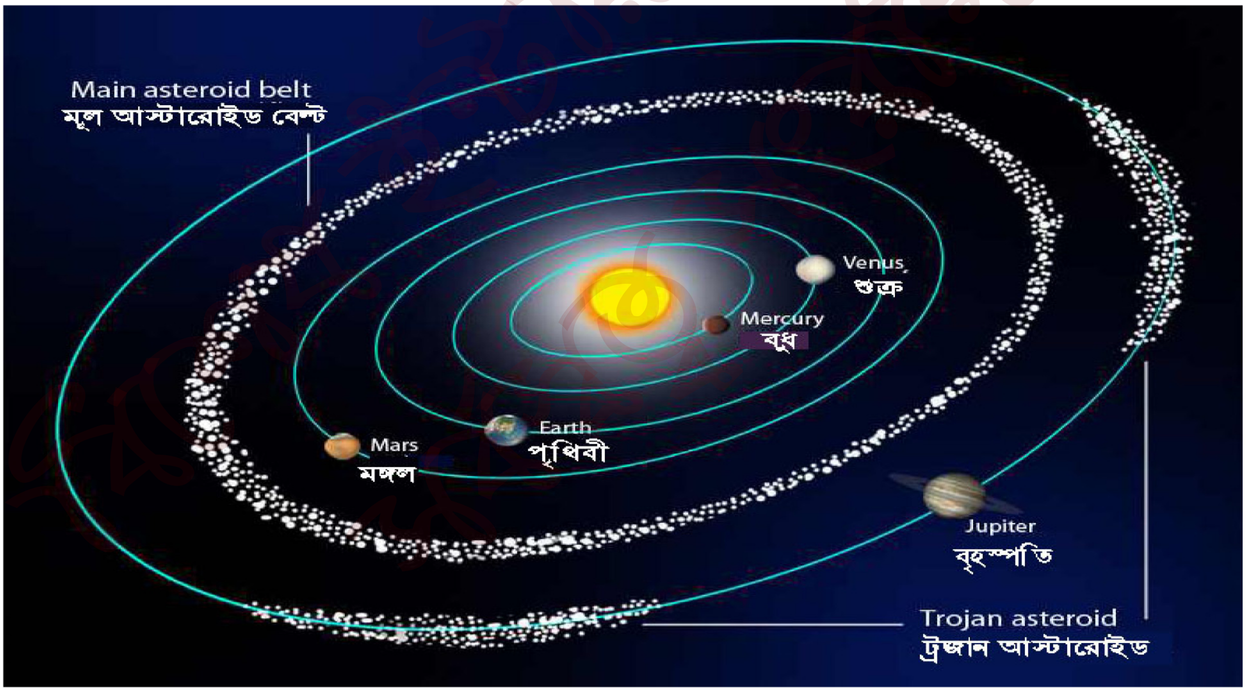
‘বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান’ বক্তৃতামালার **১৬তম** লেকচারে সবাইকে জানাচ্ছি সাদর সম্ভাষণ। আমি ভেবেছিলাম, দু’-তিনটা বক্তৃতায় সৌরজগৎ নিয়ে আলোচনা কাভার করে নেবো। কিন্তু না, তা সম্ভব হলো না। সৌরজগতের উপর এটা চতুর্থ লেকচার। হয়তো আরেকটা লাগবে। যাক, ইতোমধ্যে আমরা সৌরজগতের উপর তথ্যাদির টেবিল ও অভ্যন্তরীণ চারটে পৃথিবীসদৃশ শক্ত গ্রহের উপর বেশ কিছু আলোচনা করেছি। আমাদের গ্রহ-পৃথিবীর একমাত্র নেচারেল উপগ্রহ চাঁদ। এটির উপরও কিছু ইন্টারেস্টিং তথ্য উল্লেখ করেছি গত লেকচারে। এখন আমরা বাকী ৫-৬টি গ্রহ ও বেশ ক’টি প্রাকৃতিক উপগ্রহ এবং অসংখ্য এ্যাস্টারোইড সম্পর্কে আরো ইন্টারেস্টিং তথ্যাদির উপর আলোচনায় যাবো। কেমন?



গ. এ্যাস্টারোইড বেল্ট ও বাইরের গ্রহ-উপগ্রহ

উপরের চিত্রে বাইর-সৌরজগতের চারটি **'দৈত্য-গ্রহ'** ও দু'টি **'বামন-গ্রহ'** পেছনের এ্যাস্টারোইড ফিল্ডের উপর কলাজ করে দেখিয়েছি। বামন-গ্রহ প্লুটোর [শরৎ] নিকটে একটি উপগ্রহ আছে। এর নাম ক্যারন [এশিয়া]। চিত্রে একেও দেখানো হয়েছে। সৌরজগতের উপর আজকের লেকচারের বিষয়বস্তু এরাই। প্রথমে আমরা এ্যাস্টারোইড বেল্টের উপর কিছু তথ্য তুলে ধরবো।

এ্যাস্টারোইড বেল্ট: এ্যাস্টারোইড [asteroid] - মূলত আলুর মতো আকৃতিবিশিষ্ট অসংখ্য ছোট-বড় বস্তু যারা বিভিন্ন দূরত্বে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এগুলো গ্রহ নয়। অল্প একদল বিজ্ঞানীর ধারণা সুদূর অতীতে অজানা কারণে কোনো বড় গ্রহ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়েছিল। এ্যাস্টারোইড সে-ই টুকরোগুলোই। তবে অধিকাংশের মতে সৌরজগৎ সৃষ্টির সময় এগুলোও জন্ম নিয়েছে। বাস্তবে আরো একটি গ্রহ সৃষ্টির কথা ছিলো- কিন্তু নিকটস্থ বিরাট প্রভাবশীল গ্রহ বৃহস্পতির কারণে জন্ম নেয় নি- বরং টুকরো টুকরো হয়ে অস্তিত্বলাভ করে। প্রথমে কয়েক টুকরো ছিলো পরে একে অন্যের সঙ্গে সংঘৃষ্ট হয়ে ছোট-বড় অসংখ্য টুকরোতে পরিণত হয়েছে যা আমরা আজ দেখতে পাই। যাক, সৌরজগতের সর্বত্রই এক দু'টো এ্যাস্টারোইড আছে। তবে সর্বাপেক্ষা বড় দল মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে অবস্থান করে। এই দলকেই বলে **'এ্যাস্টারোইড বেল্ট'**। নীচে এই বেল্টের একটি চিত্র দেখাচ্ছে।



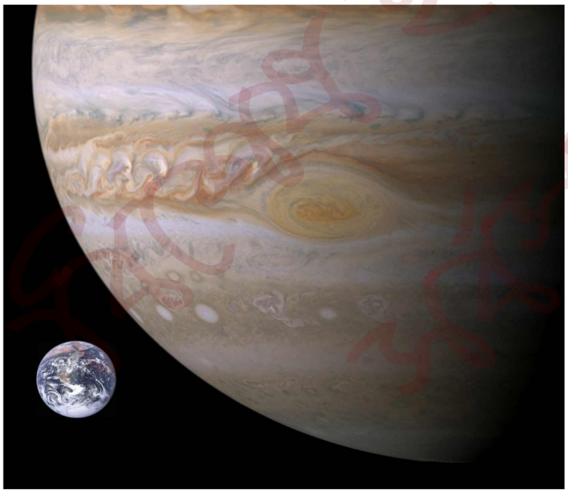
উপরের চিত্রে আরো দু'টি ছোট্ট দল দেখাচ্ছে। এগুলো বৃহস্পতি গ্রহের সামনে ও পেছনে একই প্রদক্ষিণপথে ঘুর্ণমান। এদেরকে বলে **'ট্রজান এ্যাস্টারোইড'** [trojan asteroid]। এ পর্যন্ত জানা সর্ববৃহৎ এ্যাস্টারোইডের নাম **'সেরেস'** [ceres]। এর ব্যাস ৯৫০ কিমি [৯৫০ মাইল]। বিজ্ঞানীরা একে এখন **'বামন গ্রহ'** [dwarf planet] হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। গ্রহ বা বামন-গ্রহ হওয়ার একটি শর্ত হলো বস্তুটি তার নিজের মহাকর্ষের প্রভাবে গোলক আকার ধারণ করবে। সেরেস তা-ই করেছে। পরবর্তী বৃহৎ এ্যাস্টারোইড দু'টি হলো **পালাস** [pallas] ও **ভেস্টা**

[vesta]। উভয়ের ব্যাস প্রায় ৫৩০ কিমি [৩২৯ মাইল]। আগেই বলেছি এ্যাস্টারোইড সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। অধিকাংশের মধ্যে দৈনিক গতিও আছে। অর্থাৎ তারা নিজে নিজে ঘুরেও। দেখা গেছে তাদের এই দৈনিক গতির পরিমাণ ৫ থেকে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত হয়ে থাকে।



বিজ্ঞানীরা মাঝে-মধ্যে এ্যাস্টারোইড দ্বারা ভূপৃষ্ঠ **'বম্বার্ডমেন্টের'** শিকার হতে পারে বলে আমাদেরকে ভয় দেখান। বাস্তবে দেখা গেছে ৩০০ টি এ্যাস্টারোইডের প্রদক্ষিণপথ পৃথিবীর প্রদক্ষিণপথের নিকটে অবস্থিত। কেউ কেউ বলেন, এখনো অনাবিস্কৃত আরো কয়েক হাজার এরূপ এ্যাস্টারোইড আছে। এদের মধ্যে ১৫০০ পর্যন্ত এ্যাস্টারোইডের আয়তন যথেষ্ট বড়। একটিও যদি পৃথিবীকে আঘাত হানে তাহলে গোলকব্যাপী বিরাট ধ্বংসলীলা ঘটাতে পারে। তবে এ সবই ধারণা মাত্র। বিজ্ঞানীরাই আবার বলেন, এরূপ মহাবিধ্বংসী এ্যাস্টারোইড পতনের সম্ভাবনা ৩ লক্ষ বৎসরে একবার মাত্র হতে পারে! আলহামদুলিল্লাহ! এটুকু জেনে আমরা স্বস্তি বোধ করছি- ঠিক না?

বৃহস্পতি: এটা বাইরের দিকে পঞ্চম স্থানে অবস্থিত সমগ্র সৌরজগতের সর্ববৃহৎ গ্রহ। ইংরেজী নাম **'জুপিটার'** [jupiter]। গ্রহটি মূলত গ্যাসীয়। নীচে সৌরজগতের এই দৈত্য গ্রহের একাংশ ও পৃথিবীর একটি ছবি তুলে ধরেছি। এ থেকেই বুঝা যাচ্ছে আয়তনে গ্রহটি পৃথিবীর তুলনায় কেমন বড়!

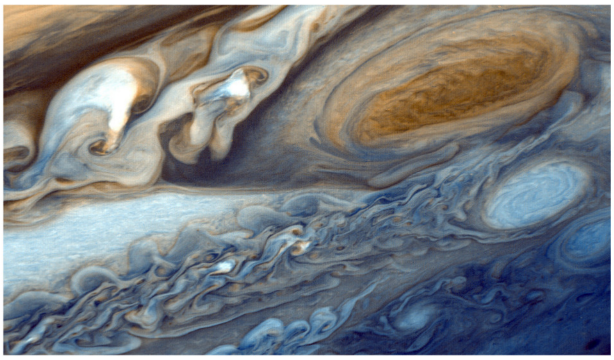


১. দূরত্ব ও গতি: বৃহস্পতি সূর্য থেকে গড়ে ৭৭ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোমিটার [৪৮ কোটি ৪০ লক্ষ মাইল - প্রায় ৫ আস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট (১ আস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট = ৯৩ মিলিয়ন মাইল - যা সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব।)] দূরে অবস্থান করে প্রতি ১১.৯ বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে। এটাই বৃহস্পতির এক বৎসর। তার একদিন আমাদের ৯.৯ ঘণ্টার সমান। অর্থাৎ এই সময়ের ভেতর নিজের মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে একবার ঘুরে আসে [স্পিন করে]।

২. আয়তন ও আকার: সকল গ্রহের মতো বৃহস্পতি গোলকাকৃতির। তবে উভয় মেরু খুব বেশী চাপা। এর কারণ, তার উচ্চ গতিশীল ঘুর্ণন বা স্পিন। আমরা বলেছি, মাত্র ৯.৯ দিনে সে একবার ঘুরে আসে। তার ইক্যুইটোরিয়্যাল [বিষুবরেখার] ব্যাস হলো ১,৪৩,০০০ কিমি [৮৯,০০০ মাইল]। অপরদিকে বেশ চাপা হওয়ার কারণে পোলার [মেরুর] ব্যাস হলো ১,৩৩,০০০ কিমি [৮৩,০০০ মাইল]- যা বিষুবরেখা বরাবর ব্যাসের তুলনায় ৬.৫% কম।

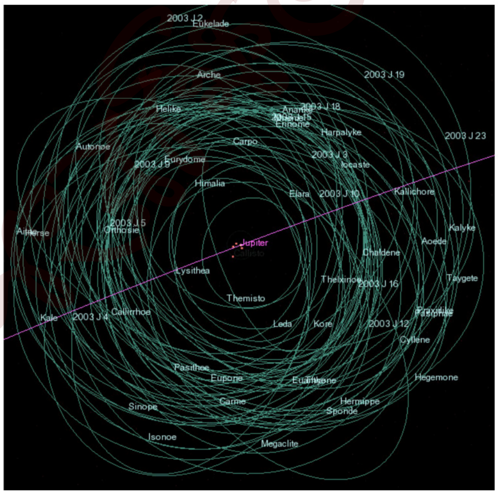
৩. বস্তুসমষ্টি ও গঠন: পৃথিবীর তুলনায় বৃহস্পতির ঘনক্ষেত্রফল [ভলিউম] ১,৩০০ গুণ বেশী। অপরদিকে তার ওজন বা ম্যাস [বস্তুর পরিমাণ] ৩১৮ গুণ। তার ঘনাঙ্ক [ডেনসিটি] হলো ৫.৫২ গ্রা/সেমি^{৩}- যা পৃথিবীর ০.২৫% থেকে কম। এ থেকে বুঝা যায় বৃহস্পতি মূলত পাতলা হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের তৈরী। গভীর ঘন বায়ুমণ্ডল দ্বারা

সমগ্র গ্রহ আবৃত। পুরো গ্রহব্যাপী বায়ুমণ্ডলে ঝড়-তুফান সংগঠিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বৃহস্পতির এরূপ একটি বিরাট ঝড়ের চিহ্ন পৃথিবী থেকেও দৃশ্যমান। শত শত বৎসর স্থায়ী এই দাগকে **'গ্রেট রেড স্পট'** [great red spot] বলে। এটার আয়তন এতো বড়, তিনটি পৃথিবী সারিবদ্ধভাবে খাড়া করলে একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছবে না! নীচে এই স্পটের একটি বাস্তব ছবি তুলে ধরেছি।

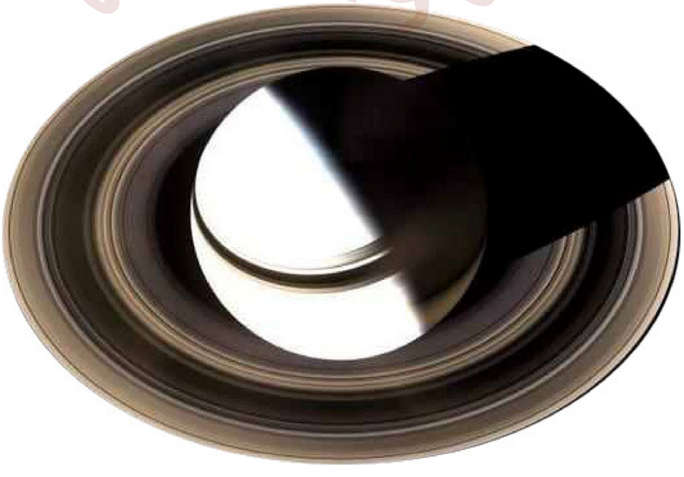


৪. নেচারেল উপগ্রহ: সৌরজগতের ভেতর আরেক বিরাট সৌরজগৎ হলো বৃহস্পতি সিস্টেম। এ পর্যন্ত গ্রহের চতুর্দিকে ৬৩টি ছোট-বড় উপগ্রহের সন্ধান নিশ্চিত জানা গেছে। আমরা এখানে বড় ক'টির নাম উল্লেখ করবো মাত্র। অবশ্য নীচের চিত্র থেকে বৃহস্পতি সিস্টেমের নমুনা কিছুটা ধরা যাবে- এটাই আশা।

বৃহৎ পাঁচ উপগ্রহ: (গ্রহের নিকট থেকে বাইরের দিকে) **১. মিটিস [বাংলা]:** বৃহস্পতি থেকে দূরত্ব: ১,২৭,৯৬০ কিমি। ব্যাস: ৪০ কিমি। ২. **এডরাস্টিয়া:** বৃহস্পতি থেকে দূরত্ব: ১,২৮,৯৮০ কিমি। ব্যাস: ২৬x১৬ কিমি। ৩. **আমলথিয়া [চাইনিজ]:** বৃহস্পতি থেকে দূরত্ব: ১,৮১,৩০০ কিমি। ব্যাস: ২৬২x১৩৪ কিমি। ৪. **থিবি [ইংলিশ]:** বৃহস্পতি থেকে দূরত্ব: ২,২১,৯০০ কিমি। ব্যাস: ১০০ কিমি। **৫. আয়ো [আষাঢ়]:** বৃহস্পতি থেকে দূরত্ব: ৪,২১,৬০০ কিমি। ব্যাস: ৩,৬২৯ কিমি। ৬. **ইউরোপা:** বৃহস্পতি থেকে দূরত্ব: ৬,৭০,৯০০ কিমি। ব্যাস: ৩,১২৬ কিমি। ৭. **গানিমিড [বৈশাখ]:** বৃহস্পতি থেকে দূরত্ব: ১০,৭০,০০০ কিমি। ব্যাস: ৫,২৭৬ কিমি। ও ৮. **কালিস্টো [জ্যৈষ্ঠ]:** বৃহস্পতি থেকে দূরত্ব: ১৮,৮৩,০০০ কিমি। ব্যাস: ৪,৮০০ কিমি। লক্ষ্য করুন, ক'টি উপগ্রহের **'বিকল্প নাম'**। আপনারা সমর্থন করলে এগুলোই হবে **'বাংলা'** নামকরণ।



শনি: এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। সূর্য থেকে বাইরের দিকে ষষ্ঠ এই গ্রহের চতুর্দিকে সুদৃশ্য রিং [আঙটি] বিদ্যমান। গ্যাসসর্বস্ব এই গ্রহেরও অনেক নেচারেল উপগ্রহ [চন্দ্র] আছে। পৃথিবী থেকে শনিকে একটা উজ্জ্বল হলুদ বস্তু দেখায়।

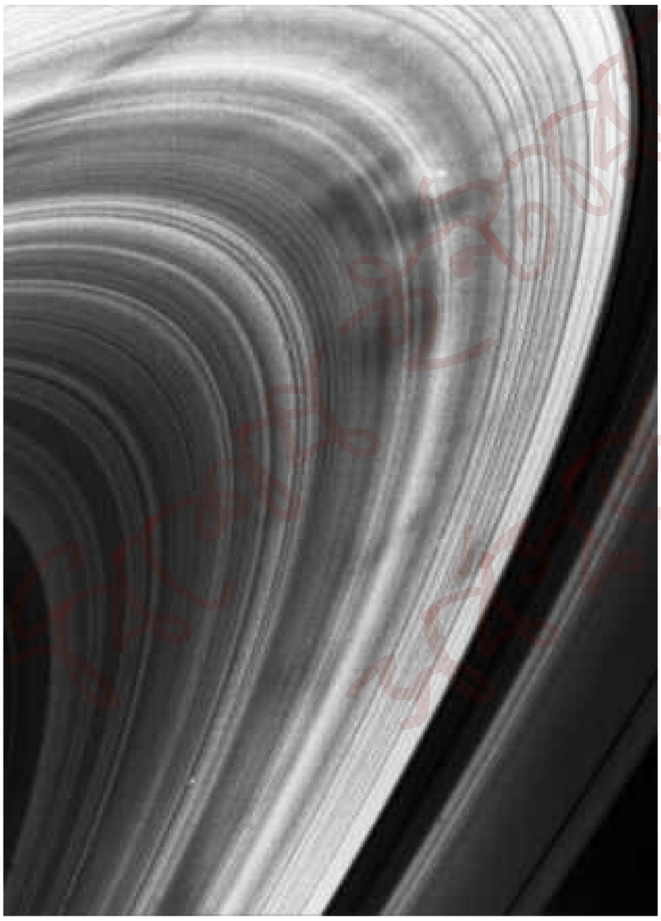


১. দূরত্ব ও গতি: পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের তুলনায় শনি ৯.৯৫ গুণ দূরে অবস্থান করে [১,৪৩৫ বিলিয়ন কিমি - ৮৯ কোটি ১৫ লক্ষ মাইল]। সে ২৯.৫ পৃথিবী-বৎসরে একবার সূর্যকে কক্ষপথে ভ্রমণ করে। বৃহস্পতির মতো শনিরও আহ্নিক [দৈনিক ঘূর্ণন] গতি খুব উচ্চ। সে প্রতি ১০.৫ ঘণ্টায় নিজের মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে একবার ঘুরে আসে। উচ্চ এই গতির ফলে উভয়

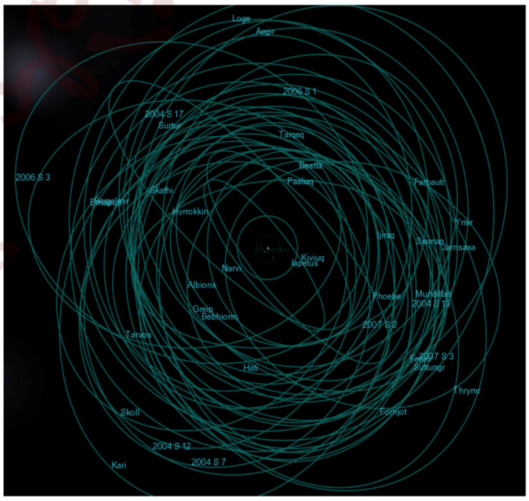
মেরু অনেকটা চাপা। তার রিংগুলোও খুব দ্রুত তাকে প্রদক্ষিণ করে।

২. আয়তন, ওজন ও বস্তু: শনি আরেক দৈত্য! তার বিষুবরেখার ব্যাস ১,২১,০০০ কিমি [৭৫,০০০ মাইল]। শনির মধ্যে বস্তুর মাত্রা পৃথিবীর তুলনায় ৯৫ গুণ বেশী। বৃহস্পতির মতো তার গ্যাস মূলত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। কেন্দ্রের উপর প্রচণ্ড চাপের ফলে সেখানকার তাপমাত্রা ১৫,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বলে জানা গেছে।

৩. শনির রিং সিস্টেম: শনির চতুর্দিকে একটি সুদৃশ্য রিং সিস্টেম বিদ্যমান। পৃথিবী থেকেও এটা দেখা যায়। ধারণা করা হয় মূল রিং সিস্টেম লক্ষাধিক একক রিংয়ের সমষ্টি। এর প্রত্যেকটি গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে। শনির সেন্টার থেকে বাইরে ১,৩৬,২০০ কিমি [৮৪,৬৫০ মাইল] মহাকাশ পর্যন্ত এই রিংগুলোর অবস্থান। এসব রিং শিলাপাথর, হিমায়িত গ্যাস ও বরফ দ্বারা সৃষ্ট। তাদের আয়তন ধূলো থেকে ৩৩ ফুট ব্যাস পর্যন্ত। তবে সকল রিং মিলেও ওজন হবে আমাদের চাঁদের ৬ ভাগের ১ ভাগ মাত্র। নীচে রিংয়ের একটি ছবি তুলে ধরলাম।



৪. শনির নেচারেল উপগ্রহ: বৃহস্পতির মতো শনিও সৌরজগতের ভেতর আরেক সৌরজগৎ। জানা মোট ৬২টি চন্দ্র তাকে বিভিন্ন দূরত্বে থেকে প্রদক্ষিণ করে। নীচের চিত্র থেকে বিষয়টি স্পষ্ট। আমরা কয়েকটি বড় চন্দ্রের নাম কিছু তথ্যসহ এখানে উল্লেখ করবো।

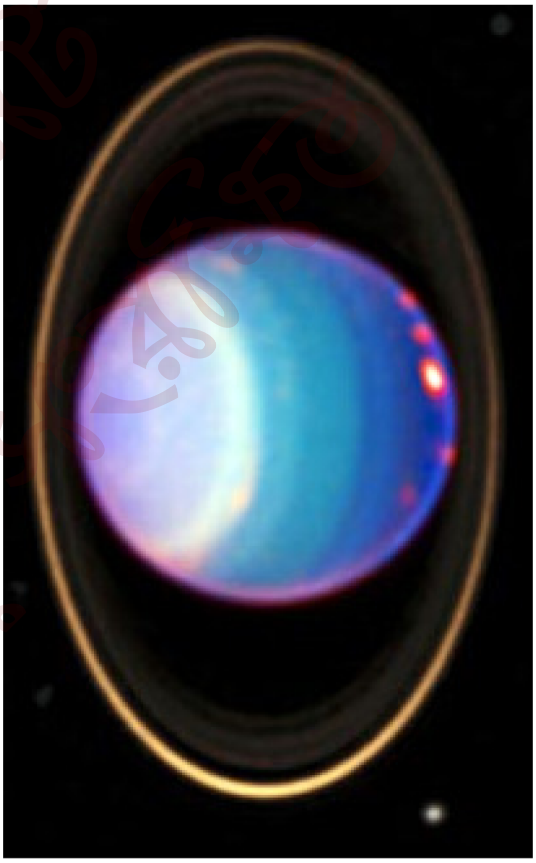


বৃহৎ ক'টি উপগ্রহ: ১. মাইমাস [জাভানিজ]: শনি থেকে দূরত্ব: ১,৫৮,৫২০ কিমি। ব্যাস: ৩৯৮ কিমি। ২. **এনসেলেডাস [জার্মান]:** শনি থেকে দূরত্ব: ২,৩৮,০২০ কিমি। ব্যাস: ৪৯৮ কিমি। ৩. **টিদিস [জাপানিজ]:** শনি থেকে দূরত্ব: ২,৯৪,৬৬০ কিমি। ব্যাস: ১০৬০ কিমি। ৪. **ডাইওনি [রাশিয়ান]:** শনি থেকে দূরত্ব: ৩,৭৭,৪০০ কিমি। ব্যাস: ১১২০ কিমি। ৫. **রিয়া [ভাদ্র]:** শনি থেকে দূরত্ব: ৫,২৭,০৪০ কিমি। ব্যাস: ১৫২৮ কিমি। ৬. **হাইপারিওন [লাহন্দা]:** শনি থেকে দূরত্ব: ১৪,৮১,০০০ কিমি। ব্যাস: ৩৬০ৗ২২৬ কিমি। ৭. **আইয়াপেটাস [আশ্বিন]:** শনি থেকে দূরত্ব: ৩৫,৬১,৩০০ কিমি। ব্যাস: ১৪৩৬

কিমি। ৮. **ফয়েবি [তেলুগু]:** শনি থেকে দূরত্বঃ ১,২৯,৫২,০০০ কিমি। ব্যাসঃ ২২০ কিমি। ৯. **টাইটান [শ্রাবণ]:** শনি থেকে দূরত্বঃ ১২,২১,৮৫০ কিমি। ব্যাসঃ ৫,১৫০ কিমি।

ইউরেনাস [গ্রীষ্ম]: সূর্য থেকে বাইরের দিকে সপ্তম স্থানে আছে বড় আরেক গ্যাসীয় গ্রহ গ্রীষ্ম [ইউরেনাস]। আয়তনে সে সকল গ্রহের তুলনায় তৃতীয়। আর ওজনে চতুর্থতম স্থানের অধিকারী। অপর কোন গ্রহই তার মতো এতো বেশী কাত হয়ে ঘুরে [স্পিন করে] না। অর্থাৎ যে কক্ষপথে সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, তার তুলনায় নিজের ঘুর্ণন [দৈনিক] গতিপথ প্রায় নব্বুই ডিগ্রী কাত। ফলে গ্রীষ্মের বায়ুমণ্ডলে সূর্যের এনার্জির তারতম্য ঘটে সর্বাধিক। সৃষ্টি হয় গ্রীষ্মের বাৎসরিক আবহাওয়ার মধ্যে বিরাট রদবদল। গ্রীষ্মের মোট ২৭টি চাঁদ আছে। এছাড়া শনির মতো মোট ১৩টি রিংও আবিস্কৃত হয়েছে। গ্যাসীয় এই গ্রহ মূলত বরফ, এমোনিয়া ও মিথেইনের তৈরী। তার বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশ গ্যাস হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও মিথেইন বলে নিশ্চিত জানা গেছে।

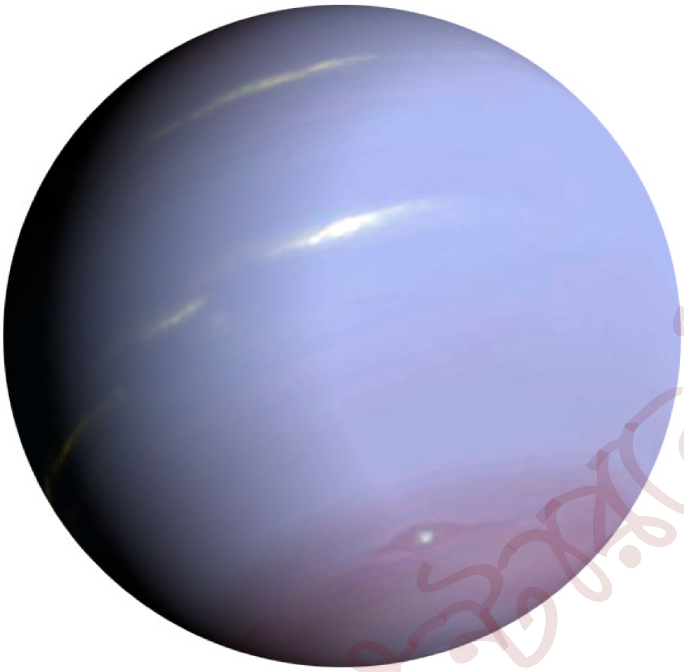
১. দূরত্ব, গতি, আয়তন, ওজন ও মহাকর্ষের টানঃ গ্রীষ্ম সূর্য থেকে গড়ে ২৮৬ কোটি কিমি [১৭৮ কোটি মাইল] দূরে অবস্থান করে। সূর্যকে একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় ৮৪ পৃথিবী বৎসর। সে পৃথিবীর তুলনায় মাত্র চার শত ভাগের এক ভাগ আলোকরশ্মি পায়। গ্রীষ্মের বিষুবরেখা বরাবর [সর্বোচ্চ] ব্যাস হলো ৫১,১১৮ কিমি [৩১,৭৬৩ মাইল]। গ্রহের ওজন পৃথিবীর তুলনায় ১৪.৫৪ গুণ। তার পৃষ্ঠদেশে মহাকার্ষিক টান পৃথিবীর তুলনায় ১.১৭ গুণ। এর মানে ১ কেজি ওজনের কোন বস্তু গ্রীষ্মের উপর ১.১৭ কেজি হবে। আমরা আশা করছি ওজনের তারতম্যের উপর আকর্ষণীয় একটি টেবিল পরবর্তী লেকচার নোটে তুলে ধরবো।



২. ১৩টি রিং ও ২৭টি চন্দ্রঃ গ্রীষ্ম সিস্টেমকেও সৌরজগতের ভেতর আরেক সৌরজগৎ বলা যায়। এছাড়া তার চতুর্দিকে যে তেরোটি রিং আছে তা-তো সেদিন আবিস্কৃত হয়েছে। ১৯৭৭ সালের আগে এটা কেউ জানতো না। প্রথমে আবিস্কৃত পাঁচটি রিংকে যথাক্রমে আলফা, বিটা, গামা, ডেলটা ও এপসিলন নামে অভিহিত করা হয়েছে। এগুলো সবই গ্রীক ভাষার বর্ণ। ভয়েজার নামক মহাকাশযান আবিষ্কার করে আরো ৫টি রিং ১৯৮৬ সালে। এরপর হাবল মহাকাশ টেলিস্কোপ দ্বারা বাকীগুলো আবিস্কৃত হয় ২০০৫-এ। নিকটস্থ রিংগুলো গ্রীষ্ম থেকে ৬৭,০০০ কিমি ও বাইরের ক'টি ৯৭,৭০০ কিমি দূরে থেকে প্রদক্ষিণরত আছে। গ্রহের মোট ২৭টি উপগ্রহের ক'টির বর্ণনা নীচে তুলে ধরছি।

১. **আরিয়েল [পর্তুগিজ]:** গ্রীষ্ম থেকে দূরত্বঃ ১,৯১,২৪০ কিমি। ব্যাসঃ ১১৬০ কিমি। ২. **মিরান্ডা [মারাঠি]:** গ্রীষ্ম থেকে দূরত্বঃ ১,২৯,৭৮০ কিমি। ব্যাসঃ ৪৭২ কিমি। ৩. **অবেরন [অগ্রহায়ণ]:** গ্রীষ্ম থেকে দূরত্বঃ ৫,৮২,৬০০ কিমি। ব্যাসঃ ১৫২৬ কিমি। ৪. **টাইটানিয়া [কার্তিক]:** গ্রীষ্ম থেকে দূরত্বঃ ৪,৩৫,৮৪০ কিমি। ব্যাসঃ ১৫৭৮ কিমি। ৫. **আম্ব্রিয়েল [পৌষ]:** গ্রীষ্ম থেকে দূরত্বঃ ২,৬৫,৯৭০ কিমি। ব্যাসঃ ১১৯০ কিমি।

নেপচুন [বর্ষা]: সূর্য থেকে বাইরের দিকে অষ্টম গ্রহ এটি। গ্রহ হিসাবে আয়তনে বর্ষা চতুর্থতম স্থান অধিকার করে আছে। বাইর সৌরজগতের কাইপার বেল্ট নামক একটি অঞ্চল আছে। সেখানে অসংখ্য বরফীয় বস্তু প্রদক্ষিণরত। বর্ষা গ্রহ এদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। এই কাইপার বেল্টের সদস্যরাই ধূমকেতুর সূত্র। এছাড়া নবম বামন গ্রহ প্লুটো [শরৎ] এবং দশম বামন গ্রহ হোমিয়া [হেমন্ত] এই কাইপার বেল্টের সদস্য। নীচে বর্ষার একটি চিত্র তুলে ধরেছি।



১. দূরত্ব ও গতি: বর্ষা সূর্য থেকে গড়ে ৪৪৯ কোটি কিমি [২৭৯ কোটি মাইল] দূরে থেকে প্রতি ১৬৫ পৃথিবী-বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর তুলনায় সে সূর্য থেকে মাত্র ৯০০ ভাগের ১ ভাগ আলো পায়। নিজের মধ্যশলাকার উপর বর্ষা একবার মাত্র ঘুরে আসতে সময় লাগে ১৬ ঘণ্টা। এটাই তার দৈনিক বা আহ্নিক গতি। সে নিজের প্রদক্ষিণপথ থেকে ২৯.৬ ডিগ্রী কাত হয়ে ঘুরে। ফলে তার বায়ুমণ্ডলে আবহাওয়ার পরিবর্তন তথা মৌসুমের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই কাত হওয়ার পরিমাণ হলো ২৩.৫ ডিগ্রী।

২. আয়তন, ওজন ও ঘনক্ষেত্রফল: বিষুবরেখা বরাবর বর্ষার ব্যাস ৪৯,৫২০ কিমি [৩০,৭৬৭ মাইল]। তার ওজন [ম্যাস] পৃথিবীর ৭২ গুণ। আর ঘনক্ষেত্রফল ১৭.১৫ গুণ।

৩. গঠনবস্তু ও গঠনপ্রণালী: বর্ষা মূলত শিলাপাথর ও পানির তৈরী। তার ঘন বায়ুমণ্ডলে আছে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস। তার কেন্দ্র পাথরের তৈরী এবং এর ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের বেশী হবে। বর্ষার বাইর পৃষ্ঠদেশ মূলত বিরাট মহাসাগর। পানি ও মিথেইন গ্যাসে পরিপূর্ণ এই মহাসাগর কিন্তু খুব বেশী গরম- তাপমাত্রা অন্তত ৪,৭০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয়। সকল বড় গ্রহের মতো বর্ষারও বায়ুমণ্ডল এবং চুম্বকমণ্ডল আছে।

৪. রিং ও চন্দ্র: বর্ষার চতুর্দিকে চারটি রিং আছে। এরা ১৫ কিমি থেকে ৫,৮০০ কিমি পর্যন্ত চওড়া। বিষুবরেখা বরাবর মহাকাশে থেকে এগুলো বর্ষাকে প্রদক্ষিণ করে। এ পর্যন্ত ১৩ টি চন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলো নিশ্চিতভাবে বর্ষার নিজস্ব অকৃত্রিম উপগ্রহ। গেল শতকের নব্বুই দশকের পূর্বে দু'টি মাত্র বৃহৎ চন্দ্র পৃথিবী থেকে টেলিস্কোপের মাধ্যমে সরাসরি দেখা যেতো। আমরা নিম্নে বৃহৎ ক'টি চন্দ্রের নাম কিছু তথ্যসহ তুলে ধরছি।

১. ট্রাইটন [মাঘ]: বর্ষা থেকে দূরত্ব: ৩,৫৪,৮০০ কিমি। ব্যাস: ২৭০৫ কিমি। ২. **প্রটিউস [ফাল্গুন]:** বর্ষা থেকে দূরত্ব: ১,১৭,৬০০ কিমি। ব্যাস ৪২০ কিমি। ৩. **নিরিদ [চৈত্র]:** বর্ষা থেকে দূরত্ব: ৫৫,১৩,৪০০ কিমি। ব্যাস ৩৪০ কিমি। ৪. **লারিস্‌সা [উর্দু]:** বর্ষা থেকে দূরত্ব ৭৩,৬০০ কিমি। ব্যাস: ২০০ কিমি। ৫. **ডেসপিনা [তুর্কি]:** বর্ষা থেকে দূরত্ব: ৬২,০০০ কিমি। ব্যাস: ১৬০ কিমি।

প্লুটো [শরৎ]: এটি **'বামন গ্রহ'** [dwarf planet] হিসাবে স্বীকৃত। ইন্টারনেশন্যাল আস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিয়ন [IAU] নামক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে। ২০০৬ ঈসায়ী সনে এই সংস্থা শরৎ গ্রহকে **'বামন গ্রহ'** হিসাবে স্বীকৃতিদান করে। তবে এখনো অনেকে সৌরজগতের নবম গ্রহ হিসাবেই শরৎ গ্রহকে মেনে নেন।

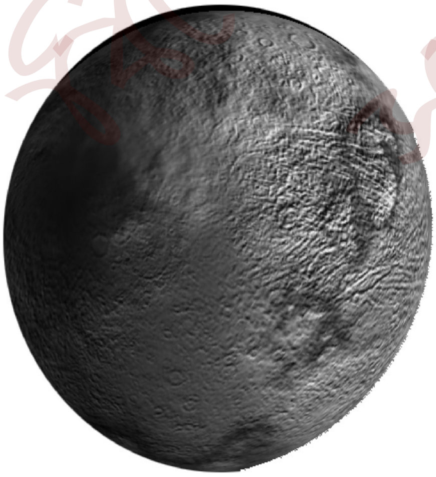
১. দূরত্ব ও গতি: শরৎ সূর্য থেকে অনেক অনেক দূরে। তার গড় দূরত্ব হলো ৫৮৮ কোটি কিলোমিটার [৩৬৫ কোটি মাইল]। তার কক্ষপথে সূর্যকে একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে পৃথিবীর ২৪৭.৯ বৎসর। গ্রহের প্রদক্ষিণপথ খুব বেশী উপবৃত্তিক [ডিম্বাকৃতির]। ফলে কোন কোন সময় সে অষ্টম গ্রহ বর্ষার [নেপচুনের] কক্ষপথের ভেতরে এসে পড়ে। এ সময় তার দূরত্ব বর্ষা থেকেও কম থাকে।

২. আয়তন ও ম্যাস [ওজন]: আমার জানা মতে এখনো কোন মহাকাশযান শরতের নিকটে যায় নি। যদিও **'নিউ হরাইজন'** নামক আমেরিকার একটি স্পেইস ক্রাফ্ট ২০১৫ সাল নাগাদ কাছে যাওয়ার কথা। সুতরাং এ গ্রহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনো সীমিত। পৃথিবী এবং নিকট মহাকাশ থেকে পর্যবেক্ষণ করে জানা গেছে শরৎ গ্রহের ব্যাস ২,৩৬০ কিমি [১৪৭৫ মাইল] এর কাছাকাছি। এতে বুঝা গেল আমাদের চন্দ্র থেকেও সে অনেক ছোট- ২/৩ অংশ মাত্র। কাইপার বেল্ট নামক অঞ্চলের সঙ্গে সে সম্পৃক্ত। গ্রহটি মূলত বরফসর্বস্ব।

৩. শরতের তিনটি চন্দ্র: শরৎ গ্রহের বিষুবরেখা বরাবর বিভিন্ন দূরত্বে প্রদক্ষিণরত এ পর্যন্ত তিনটি বস্তু চন্দ্র আবিস্কৃত হয়েছে। **১. ক্যারন [এশিয়া]:** শরৎ থেকে দূরত্ব: ১৯,৫৭১ কিমি। ব্যাস: ১২০৭ কিমি। **২. নিক্স [আমেরিকা]:** শরৎ থেকে দূরত্ব: ৪৮,৬৭৫ কিমি। ব্যাস: ৪৪ থেকে ১৩০ কিমি। **৩. হাইড্রা [আফ্রিকা]:** শরৎ থেকে দূরত্ব: ৬৪,৭৮০ কিমি। ব্যাস: ৪৪ থেকে ১৩০ কিমি।


পৃথিবী থেকে নেওয়া শরৎ [প্লুটো] ও এশিয়ার [ক্যারন] ছবি

হোমিয়া [হেমন্ত]: এটাও একটি বামন গ্রহ। ২০০৫ সালে এটি আবিস্কৃত হয়েছে। আমরা খুব একটা জানি না হেমন্ত সম্পর্কে। যাকিছু জানা গেছে তা নিম্নে তুলে ধরছি।



১. দূরত্ব ও গতিমতি: সূর্য থেকে এই বামন গ্রহ অন্তত ৫১ আস্ট্রনোমিক্যাল দূরে অবস্থিত। মাইলের হিসাবে তা হবে ৪৭৪ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। কাইপার বেল্টের বাইরে থেকে সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। তার ঘূর্ণন গতি ৪ ঘণ্টা। হেমন্তের বার্ষিক গতি [প্রদক্ষিণ গতি] এখনও জানা যায় নি। কেউ কেউ মনে করেন, সুদূর ভবিষ্যতে **'ধূমকেতু'** হিসাবে হেমন্ত সূর্যের নিকটে আসবে।

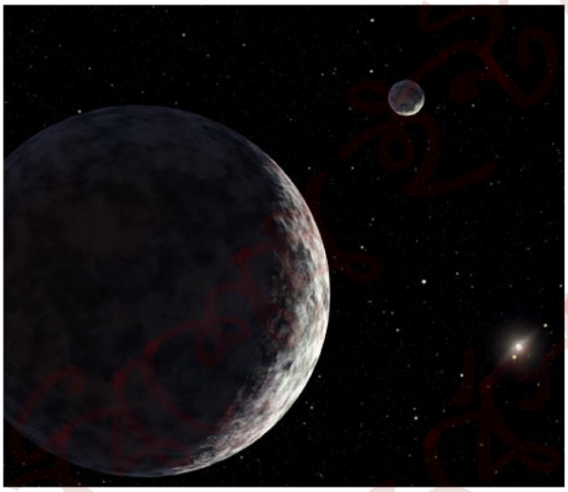
২. আয়তন ও দেহবস্তু: হেমন্তের আকার অনেকটা **'আমেরিকান ফুটবলের'** মতো। অর্থাৎ একদিকে লম্বাটে। হিসাব করে দেখা গেছে লম্বার দিকে তার ব্যাস প্রায় শরৎ [প্লুটো] গ্রহের মতো। অপরদিকের ব্যাস এর ৫ ভাগের এক ভাগ মাত্র। হেমন্ত কৃষ্ণ শিলাপাথরের তৈরী। তবে পৃষ্ঠদেশ খুব পাতলা বরফ দ্বারা আবৃত।

৩. হেমন্তের দু'টি চন্দ্র: ১. নামাকা [ইউরোপ]: হেমন্ত থেকে দূরত্ব: ৩৯,০০০ কিমি। ব্যাস: আনুমানিক ১৭০ কিমি। ২. **হাইইয়াকা [অস্ট্রেলিয়া]:** হেমন্ত থেকে দূরত্ব: ৪৯,৫০০ কিমি। ব্যাস: আনুমানিক ৩১০ কিমি।

এরিস [শীত]: এটাও আরেক বামন গ্রহ। শীত গ্রহ কাইপার বেল্টের বস্তু। সে দেখতে গোলকাকৃতির। এ গ্রহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেকটা সীমিত। এরপরও যাকিছু জানা গেছে তা নীচে লিপিবদ্ধ করছি।

১. আয়তন, দূরত্ব ও দেহবস্তু: শীতের ব্যাস ২৪০০ কিমি [১৪৯০ মাইল]। সুতরাং এটা প্লুটো [শরৎ] থেকেও কিছুটা বড়। বর্তমানে শীত গ্রহ সূর্য থেকে ৯৬.৫ এইউ [৮৯৭ কোটি ৪৫ লক্ষ মাইল] দূরে অবস্থিত। তবে তার উচ্চ উপবৃত্তিক প্রদক্ষিণপথে চলতে যেয়ে সর্বনিম্ন ৩৮ এইউ [৩৫০ কোটি মাইল] দূরে এসে পৌঁছে। ২২৫৭ ঈসায়ী সনে সে এটুকু দূরত্বে অবস্থান করবে। সে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে সময় নেয় ৫৬০ বৎসর। বর্তমানে গ্রহ হিসাবে শীতের দূরত্ব সৌরজগতের মধ্যে সর্ববৃহৎ। শীতের দেহ মূলত অনেকটা শরতের মতো। ধারণা করা হয় তার কেন্দ্র পাথরের তৈরী। মধ্য বহিরাবরণ বরফের ও পৃষ্ঠদেশ হিমায়িত মিথেইন গ্যাস দ্বারা সৃষ্ট।

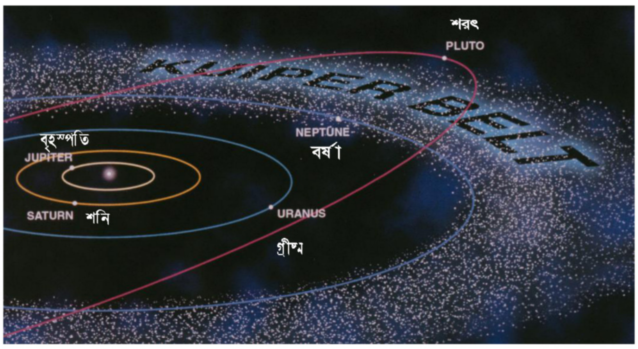
২. শীতের একটি মাত্র চন্দ্র: ডিসমোনিয়া [এ্যানটার্কটিকা]: শীত থেকে দূরত্ব: ৩০ থেকে ৩৬ হাজার কিমি। ব্যাস: আনুমানিক ৩০০ কিমি। প্রদক্ষিণ গতি: ১৪ পৃথিবী দিবস। নীচে শীত ও তার চন্দ্রের একটি কাল্পনিক ছবি তুলে ধরেছি।



সেরেস [বসন্ত]: আমরা বামন এই গ্রহের কথা সবশেষে আলোচনা করছি। কিন্তু এর অবস্থান আসলে এ্যাস্টারোইড বেল্টের নিকটে। এই বেল্টটি মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। বসন্তকে বামন গ্রহ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে কিছুদিন পূর্বে। যাক, এ গ্রহ সম্পর্কে জানা কিছু তথ্যাদি এখন তুলে ধরছি।

১. দূরত্ব ও গতি: বসন্ত বর্তমানে সূর্য থেকে ২.৬৮৫ এইউ [২৮ কোটি ৯৭ লক্ষ মাইল] দূরে অবস্থান করছে। তার গড় দূরত্ব হলো ২৫ কোটি ৫৯ লক্ষ মাইল। বসন্ত সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় ৪.৬ বৎসর। সে তার নিজের মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে প্রতি ৯ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসে। এটাই তার দৈনিক গতি।

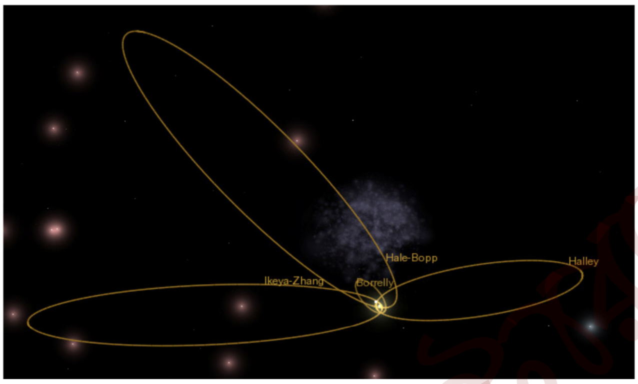
২. আয়তন ও গঠনবস্তু: আগে মনে করা হতো বসন্তের আয়তন বেশ বড়ো। কিন্তু ইদানিং জানা গেছে তার ব্যাস ৪৮৬ কিলোমিটারের বেশি নয়। তবে সে গোলকাকৃতির। মহাকাশে স্থাপিত হাব্‌ল স্পেইস টেলিস্কোপ দ্বারা বসন্তকে গবেষণা করা হয়েছে। জানা গেছে তার অভ্যন্তর মূলত শিলাবৎ এবং বাইরের আবরণ বরফের তৈরী। দেখতে সে খুব কালো।

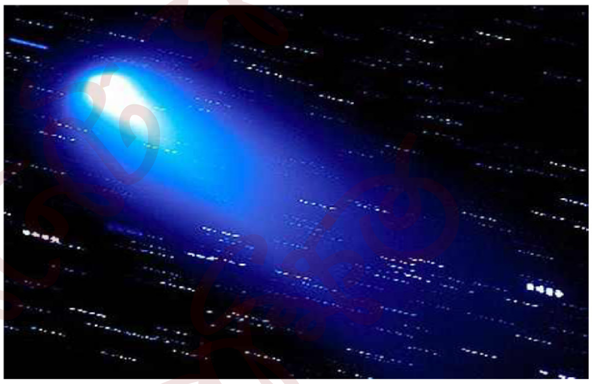


কাইপার বেল্ট [Kuiper Belt]: প্রিয় ছাত্র-বন্ধুরা! আমরা কিছুক্ষণ পরই সৌরজগতের উপর তথ্যানুসন্ধানের ইতি টানবো। এরপর আমরা তারাজগতে পদার্পণ করার ইচ্ছে রাখি। তবে সৌরজগৎ

সম্পর্কে আরো এক দু'টো ব্যাপার আছে যা জানা একান্ত আবশ্যক। পাশের কল্পিত চিত্রে **'কাইপার বেল্ট'** নামক একটি অঞ্চল দেখাচ্ছে। এখন এই অঞ্চলের উপর আলোচনা করবো।

অধিকাংশ বিজ্ঞানীর ধারণা কাইপার বেল্টে অনেক ছোট-বড় হিমায়িত বরফ, ধূলোবালি ও পাথরের তৈরী বস্তু আছে। এসব বস্তুর আয়তন অতি ছোট্ট বরফখণ্ড থেকে প্লুটোর সমপরিমাণ হতে পারে। বিজ্ঞানীরা এগুলো শক্তিশালী দূরবীক্ষণযন্ত্রের মাধ্যমে দেখতে সক্ষম হয়েছেন। এতে বুঝা যায় সমগ্র বেল্টটি মূলত একটি ডিস্কের মতো। এ পর্যন্ত হাজার খানেক কাইপার বেল্ট বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে মহাকাশ বিজ্ঞানীদের ধারণা এদের মোট সংখ্যা লক্ষাধিক হবে। কাইপার বেল্টের শুরু বর্ষার [নেপচুনের] প্রদক্ষিণপথের একটু বাইরে। এর শেষ শরতের [প্লুটোর] প্রদক্ষিণপথ থেকেও বেশ বাইর পর্যন্ত।



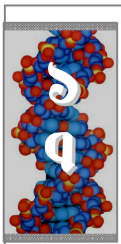


ধূমকেতু [comet]: বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে দীর্ঘ লেজবিশিষ্ট এসব বস্তুকে **লেঞ্জাতারা** [লেজ-তারা] বলে। দেখতে বাস্তবেই তা-ই। ইংরেজী **'কমেট'** শব্দটির অর্থও প্রায় একই- **'চুলবিশিষ্ট তারা'**। এরা মূলত বরফের তৈরী ছোট্ট বস্তু। সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্যের কাছে আসলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ফলে দেহের বরফীয় বস্তু গ্যাসে পরিণত হয়। সৃষ্টি করে দীর্ঘ লেজ। কোটি কোটি মাইল পর্যন্ত এই লেজের দৈর্ঘ্য হতে পারে। নীচে চারটি বিখ্যাত ধূমকেতুর কক্ষপথ দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় ছবিতে একটি ধূমকেতুর চিত্র তুলে ধরেছি।

প্রিয় ছাত্র-বন্ধুরা! সৌরজগতের উপর আমাদের দীর্ঘ আলোচনার এখানেই শেষ। আমরা আশা করছি আগামী লেকচারে তারাজগতের উপর আলোচনা শুরু করবো। আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

গ. মহাকাশবিজ্ঞান: গঠনপ্রণালী ও মৌলিক গতিবিধি

বক্তৃতা ১৭ : তারাজগৎ

স্বাগতম! সবাইকে এবার নিয়ে যাবো দূর-দূরান্তে অবস্থিত তারাজগতে। সবাই যেতে প্রস্তুত তো? মহাকাশবিজ্ঞানের প্রাথমিক অংশের উপর আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। সেটা ছিলো আমাদের সৌরজগৎ। সূর্যসহ যাবতীয় জানা গ্রহ-উপগ্রহ, এ্যাস্টারোইড, বামন গ্রহ ও ধূমকেতুর উপর আমরা অবগত হয়েছি। কিন্তু সমগ্র সৌরজগতের যাবতীয় বস্তুর মাত্রার তুলনায় একমাত্র সূর্যের মধ্যেই আছে প্রায় ৯৯%! মোটকথা সৌরজগৎ বলতে সূর্যকেই বুঝায়। আর সূর্য একটি তারা। আকাশে দৃশ্যমান অসংখ্য তারার একটি মাত্র। যা বলতে চাচ্ছি, বস্তুজগৎ বলতে তারাজগতকে বুঝায়। একাধিক তারা মিলে বিভিন্ন দল সমগ্র দৃশ্যমান জগতব্যাপী বিস্তৃত। একেক দলের একেক নাম: **তারাক্লাস্টার [star cluster], গ্লোবুলার ক্লাস্টার [globular cluster], অপেন ক্লাস্টার [open cluster], বাইনারি তারা সিস্টেম [binary star], গ্যালাক্সি [galaxy], গ্যালাক্সি ক্লাস্টার [galaxy cluster], সুপার (গ্যালাক্সি) ক্লাস্টার [supercluster]** ইত্যাদি সবই তারাদের দল। আমরা এই লেকচারে এসব দলের উপর আলোচনার আশা রাখি। প্রথমেই জেনে নিই **'তারা'** [star] বলতে কি বুঝায়।

ক. তারা

ভাবতে পারেন, তারা তো তারাই! আকাশে জ্বলন্ত আছে তারারা, বিভিন্ন দূরত্বে। কোনটা ছোট্ট, কোনটা বড়, কোনটা উজ্জ্বল আর কোনটা মিটিমিটি মাত্র। সব কথা ঠিক। কিন্তু তারা সম্পর্কে অনেক অনেক কিছু জানার আছে। এক সময় মানুষ তারাদেরকে খুব ছোট্ট বস্তু ভাবতো। এমনকি পৃথিবীতে তারারা পতিত হতো! আসলে এগুলো যে

সূর্যের মতো বিরাট ও কোন কোনটি শত গুণ পর্যন্ত বড় তা এই ক'দিন পূর্বে মানুষ জানতে সক্ষম হয়েছে। আর তারা পতিত হওয়া? তা-তো মূলত অতি ক্ষুদ্রকায় বস্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে জ্বলে যাওয়ার দৃশ্য বৈ নয়। এগুলোকে বলে **'মিটিওর'**। যাক, এবার তারকারাজি সম্বন্ধে জানা তথ্যাদির উপর কিছু আলোচনা করা যাক।



বিজ্ঞান বলে, **'মহাকাশে বিরাট ওজনবিশিষ্ট গোলকাকৃতির উজ্জ্বল জ্বলন্ত গ্যাসীয় বস্তু হলো তারা।'** মহাকাশে যেসব তারা রাতের আকাশে দৃশ্যমান হয় তা সবই মূলত আমাদের **'মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি'** নামক তারাজগতের সদস্য। আমরা মনে করি অসংখ্য তারা দেখি- বাস্তবে গুণে দেখা গেছে নগ্ন-চোখে মাত্র ৫,০০০ তারা দৃশ্যমান হয়। একটি ছোট্ট টেলিস্কোপের সাহায্যে এ সংখ্যা বাড়িয়ে লক্ষাধিক পর্যন্ত নেওয়া যেতে পারে। আর সর্ববৃহৎ টেলিস্কোপ দ্বারা আকাশের দিকে তাকলে দৃশ্যমান হয় কোটি কোটি গ্যালাক্সি যাদের একেকটিতে আছে কোটি কোটি তারা। আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণা পুরো জগতব্যাপী অন্তত $১০^{২২}$ সংখ্যক তারা আছে। এই সংখ্যাটি বিরাট। ১ এর সঙ্গে ২২টি শূন্য লিখলে যে বিরাট সংখ্যা হয়- এটা তা-ই।

তারাদের আয়তনে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। এ পর্যন্ত জানা সর্ববৃহৎ তারা যদি সূর্যের স্থানে এনে রাখা হয় তাহলে তার বাইর মণ্ডলের ভেতর অতি সহজেই পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিগ্রহ ঢুকে পড়বে! অপরদিকে সর্বাপেক্ষা ছোট্ট **'সাদা বামন'** তারার আয়তন পৃথিবীর সমান হবে মাত্র। এরচেও আরো ছোট্ট আরেক তারা আছে। এটার নাম **'নিউট্রন তারা'**। তার ব্যাস ২০ কিমি মাত্র! বিজ্ঞানীরা মনে করেন, তারাদের জন্ম অতীতে হয়েছে, এখনও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তারারা চিরস্থায়ী নয়। তাদের মৃত্যুও ঘটে। তারা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেছে। তাদের নিয়ে গবেষণায় বিশেষ কিছু ব্যাপার জানা থাকা জরুরী। আমরা এখন এসব ব্যাপার তুলে ধরবো।

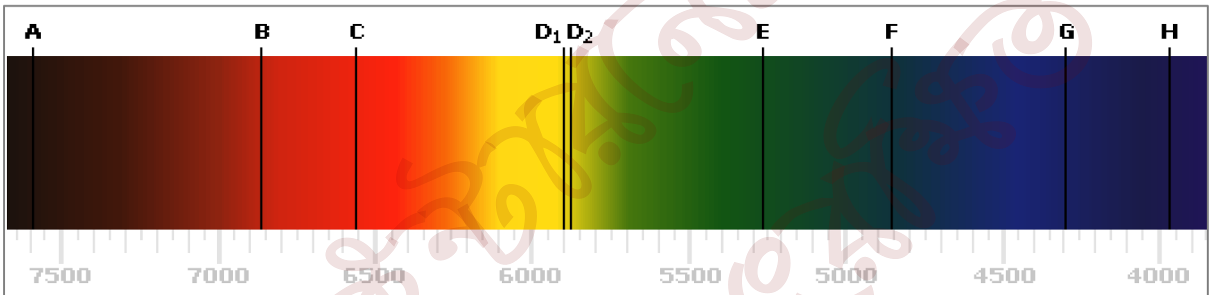
১. দৃশ্যত ঔজ্জ্বল্য [apparent brightness]: খালি-চোখে দেখা যায় এমন সকল তারাকে ছয়টি **'দৃশ্যত ঔজ্জ্বল্য'** দলে বিভক্ত করা হয়েছে। ১ম থেকে ৬ষ্ঠ ঔজ্জ্বল্য-বিশিষ্ট তারা একটা আরেকটার তুলনায় ২.৫ গুণ কম উজ্জ্বল। আপনি যদি নগ্ন-চোখে রাতের আকাশের দিকে তাকান তাহলে বড়জোর ৬ষ্ঠ ঔজ্জ্বল্যের তারা দেখতে পাবেন। মহাকাশে স্থাপিত **'হাবল টেলিস্কোপ'** দিয়ে নিম্নে ২৮তম ঔজ্জ্বল্যের তারা পর্যন্ত দেখা যায়।

২. প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য [absolute magnitude]: নির্দিষ্ট কোন দূরত্ব থেকে তারাটির ঔজ্জ্বল্য কি হবে সে মাপকে বলে প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য। এই ঔজ্জ্বল্য দ্বারা বিজ্ঞানীরা যে কোন তারার সঠিক ঔজ্জ্বল্যতা নির্ণয় করেন।

৩. এনার্জি বিকিরণ মাত্রা [luminosity]: প্রতি সেকেন্ডে মোট কি পরিমাণ [আলো ও তাপ] এনার্জি যে কোন তারা চতুর্দিকে বিকিরণ করছে তার হিসাব এটি। প্রায় সব তারার এনার্জি সূত্র হলো কেন্দ্রে সংঘটিত **'ফিউশন'** নামক আনবিক প্রতিক্রিয়া। আমরা সূর্যের উপর আলোচনাকালে এই প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছি। তবে সকল তারাই বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় [electromagnetic] উপায়ে বিকিরণ করে তাদের এনার্জি। এতে আছে দৃশ্যমান আলো,

আলট্রাভাইলোট, ইনফ্রারেড ও রেডিও তরঙ্গ। তারাদের এনার্জি বিকিরণ মাত্রায় বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। কোন কোন তারা আছে যারা সূর্যের তুলনায় মাত্র ৫০০ ভাগের ১ ভাগ এনার্জি বিকিরণ করে। কোন কোনটা আছে যার এনার্জির মাত্রা সূর্যের তুলনায় ৫ লক্ষাধিক গুণেরও বেশী!

৪. বর্ণচ্ছটা ধরন [spectral type]: মনে আছে স্পেকট্রামের কথা? পদার্থবিজ্ঞানের উপর আলোচনাকালে আমরা এই বর্ণচ্ছটা বা স্পেকট্রামের উপর বিস্তারিত বলেছি। তারা থেকে যে রশ্মি পৃথিবীতে বা পৃথিবীর নিকট মহাকাশে আসে তার বর্ণচ্ছটা গবেষণার মাধ্যমে অনেক কিছু জানা যায় ঐ তারা সম্পর্কে। নীচের চিত্রটি দেখুন ও ক্যাপশন পাঠ করুন। কোন্ তারা কোন্ ধরনের বর্ণচ্ছটা বিকিরণ করবে তার হিসাব নির্ধারণ করে তারাটি কোন্ স্পেকট্রেল টাইপের। বিজ্ঞানীরা যে ক'টি ধরন সনাক্ত করেছেন তাহলো: l = তাপমাত্রা: ২৫,০০০ ডিগ্রী কেলভিন, তারার রঙ নীল; B = তাপমাত্রা: ১১,০০০ - ২৫,০০০ ডিগ্রী কেলভিন, তারার রঙ সাদা-নীল; A = তাপমাত্রা: ৭,৫০০ - ১১,০০০ ডিগ্রী কেলভিন, তারার রঙ সাদা; F = তাপমাত্রা: ৫,০০০ - ৬,০০০ ডিগ্রী কেলভিন, তারার রঙ হলুদ [আমাদের সূর্য]; K = তাপমাত্রা: ৩,৫০০ - ৫,০০০ ডিগ্রী কেলভিন, তারার রঙ কমলা-হলুদ; এবং M = তাপমাত্রা: ৩,৫০০ ডিগ্রী কেলভিন, তারার রঙ লাল।



A	extreme red	Made by terrestrial oxygen
B	red	Made by terrestrial oxygen
C	red	Made by solar hydrogen
D_1	yellow	Made by solar sodium
D_2	yellow	Made by solar sodium
E	green	Made by solar iron
F	blue	Made by solar hydrogen
G	violet	Made by solar iron and calcium group
H	extreme violet	Made by solar calcium

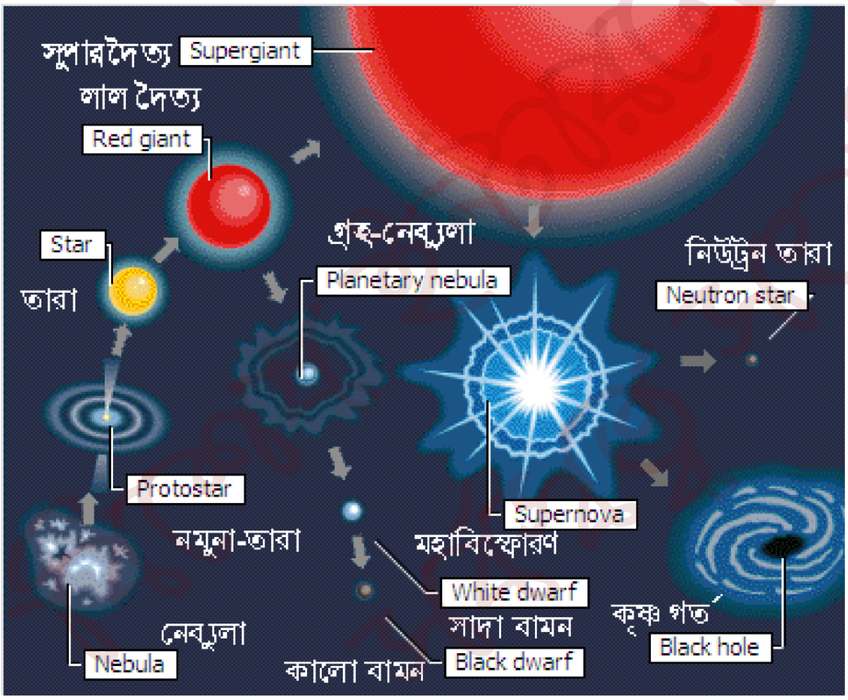
সূর্যের বর্ণচ্ছটা: কালো লাইনগুলোকে বলে '**এবজর্পশন লাইন**' [শোষণ রেখা]। সূর্যের বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাস কর্তৃক বিরকিণ 'শোষণের' কারণে এই রেখার সৃষ্টি হয়। সুতরাং এসব লাইন পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা সূর্যের বায়ুমণ্ডলে কোন ধরনের গ্যাস বিদ্যমান তা নির্ণয় করতে পারেন। উপরের চিত্রে কোন্ লাইন দ্বারা কোন্ পদার্থ বুঝাচ্ছে তা দেখানো হয়েছে।

৫. আয়তন: ইন্টারফেরোমিটার নামক একটি যন্ত্রের মাধ্যমে তারাদের আয়তন [ব্যাস] নির্ণয় করা যায়। অপর আরেক উপায়ে ব্যাস মাপা যায়। মহাকাশে অনেক জোড়া তারা আছে। এদেরকে ইংরেজীতে বাইনারি স্টার [binary star] বলে। এসব জোড়া একটা আরেকটাকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী থেকে এই প্রদক্ষিণ দৃশ্যমান হলে তাদের ঔজ্জ্বল্যে আনুপাতিক রদবদল নির্ণয় করা যায়। এ থেকেই অঙ্ক কষে আয়তন বের করা সম্ভব। তারার মোট পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফলও তার এনার্জির মাত্রা থেকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করে বের করা সম্ভব। এ থেকেও ব্যাস নির্ণয় হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ৪০ আলোক-বৎসর দূরে অবস্থিত '**কাপেলা**' বাইনারি তারা সিস্টেমের কথা বলা যায়।

আকাশে কাপেলা একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে দৃশ্যমান। তার বর্ণচ্ছটা অনেকটা সূর্যের মতো। সুতরাং উভয়ই হলুদ রঙের F-টাইপ তারা। কিন্তু এতো দূরে থেকেও কাপেলার ঔজ্জ্বল্য অধিক হওয়ায় অঙ্ক কষে দেখা গেছে তার আয়তন সূর্য থেকে অন্তত ১৬ গুণ বেশী। সুতরাং ঔজ্জ্বল্য ও দূরত্ব থেকেও সূর্যের সঙ্গে তুলনা করে তারাদের আয়তন নির্ণয় সম্ভব।

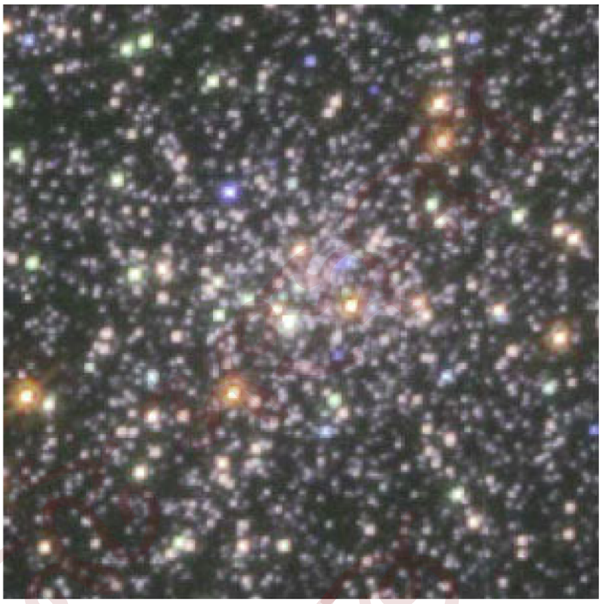
৬. বস্তুর মাত্রা বা ওজন: তারার মধ্যে কি পরিমাণ বস্তু আছে তা-ও মাপা যায় বিভিন্ন উপায়ে। জোড়া তারা কোন্ গতিতে একটা আরেকটাকে প্রদক্ষিণ করে তা তাদের মধ্যস্থ বস্তুর মাত্রার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বাইনারি তারা সিস্টেমের গতিমতি মেপে তাদের আনুপাতিক ওজন বের করা যেতে পারে। এছাড়া অন্যান্য পন্থায়ও ওজন নির্ণয় হতে পারে।

৭. রসায়নিক পদার্থ: অধিকাংশ তারা হাইড্রোজেন গ্যাসের তৈরী। মূলত এই গ্যাসটি হলো তাদের জ্বালানি। তবে কিছু কিছু তারা আছে যাদের মধ্যে ভারী রসায়নিক বস্তু, যেমন ধাতু- বিদ্যমান। বয়স্ক সাদা বামন তারায় বিরাট মাত্রার হিলিয়াম গ্যাস থাকতে পারে। আর লাল দৈত্যদের মধ্যে তো হাইড্রোজেন গ্যাস অত্যল্প- কারণ, দীর্ঘ জীবনে তারা ইতোমধ্যে জ্বালানি হিসাবে এই গ্যাসটি ব্যবহার করে নিয়েছে। ফিউশন রিয়েকশনের মাধ্যমে হাইড্রোজেন গ্যাস হিলিয়াম গ্যাসে রূপান্তর হয়।



৮. গতি: প্রত্যেক তারায় আছে উচ্চ গতি। এই গতি রাতের বেলা পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাওয়ার দৃশ্যত গতি নয়। এটা পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে আমরা পর্যবেক্ষণ করে থাকি। আসল গতি বিজ্ঞানীরা তারার বর্ণচ্ছটা পরীক্ষা করে বের করতে পারেন। যে নেচারেল ক্রিয়ার ফলে তা সম্ভব এটাকে বলে **'ডপলার এফেক্ট'** [Doppler effect]। সংক্ষেপে এর অর্থ: কোন বস্তু যদি দূরে চলে যায় তাহলে তার বর্ণচ্ছটার লাইনগুলো লালের দিকে প্রতিস্থাপন হয়। অপরদিকে যদি কাছে আসে তাহলে তা নীলের দিকে প্রতিস্থাপন হয়। প্রথম প্রতিস্থাপনকে বলে **'লাল-শিফ্‌ট'** [red shift] এবং দ্বিতীয়টিকে বলে **'নীল-শিফ্‌ট'** [blue shift]। সুতরাং তারাদের গতিমতি তার বর্ণচ্ছটার প্রতিস্থাপন থেকে নির্ণয় করা যায়। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, আমাদের সৌরজগতের আশেপাশে তারারা বিভিন্ন দিকে গতিশীল আছে। একে অন্য থেকে তাদের গড় গতি ২৪ কিমি/সেকেন্ড। পার্শ্ববর্তী তারাদের সাথে তুলনা করলে আমাদের সূর্যের গতি হলো ২৬ কিমি/সেকেন্ড। সূর্য [তার সৌরজগৎ নিয়ে] এই গতিতে ভেগা নামক তারার দিকে দ্রুত এগুচ্ছে।

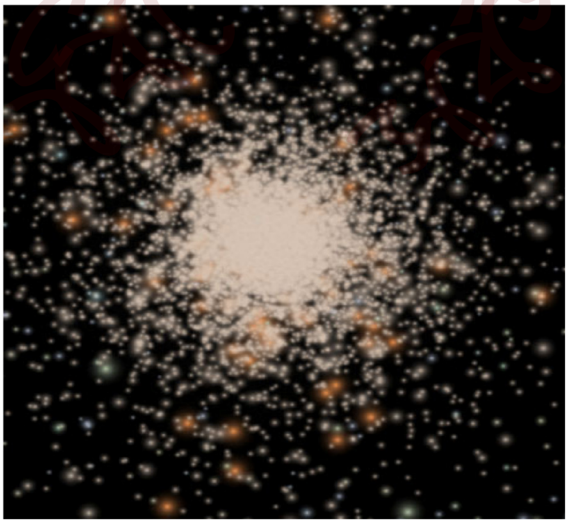
খ. তারা ক্লাস্টার



ইতোমধ্যে আমার উল্লেখ করেছি, মহাকাশে বহু তারা জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। এরা মূলত একে অন্যের **'ব্যারিসেন্টার'** [barycenter] এর উপর নির্ভর করে প্রদক্ষিণ করে। ব্যারিসেন্টার অর্থ, উভয় তারার [বা দু'টির অধিক তারার] যৌথ মহাকর্ষের কেন্দ্র। এই জায়গাটি কোথায় তা নির্ভর করবে বস্তুগুলোর মোট ওজন ও দূরত্বের উপর। যেমন আমাদের সূর্যের ওজন বেশী হওয়ায় সমগ্র সৌরজগতের সকল বস্তুর ব্যারিসেন্টার সূর্যের ভেতরই অবস্থিত। যাক, আমাদের তারাসিস্টেম বা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির তারারা বিভিন্ন দলে অস্তিত্বশীল আছে। এর একটি হলো তারা ক্লাস্টার। তারা ক্লাস্টার দুই ধরনের: **ক. খোলা ক্লাস্টার [open cluster] ও খ. বটিকাকার ক্লাস্টার [globular cluster]**।

ক. খোলা ক্লাস্টার: এদের আরেক নাম **গ্যালাক্টিক ক্লাস্টার**। বিজ্ঞানীরা আমাদের গ্যালাক্সিতে এ পর্যন্ত ১২০০ এরূপ খোলা ক্লাস্টার সনাক্ত করেছেন। এদের প্রত্যেকটিতে অন্তত ১০ থেকে শত শত তারা আছে। বাইরের বিভিন্ন গ্যালাক্সিতেও শত শত খোলা ক্লাস্টারের সন্ধান পাওয়া গেছে। ক্লাস্টারের বৈশিষ্ট্য হলো- সকল তারা মহাকাশে একটি দল হিসাবে একত্রে গতিশীল থাকে। নিম্নে (ডানে) **'প্লিয়াডিস'** [Pleiades] নামক অপেন ক্লাস্টারের একটি ছবি তুলে ধরেছি।

খ. বটিকাকার ক্লাস্টার: এদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারারা একটা আরেকটা থেকে অনেকটা নিকটে থাকা। কয়েক হাজার থেকে কোটি কোটি পর্যন্ত তারা মিলে বটিকাকার ক্লাস্টার হয়। আমাদের গ্যালাক্সিতে এ পর্যন্ত ২ শতেকেরও অধিক বটিকাকার ক্লাস্টারের সন্ধান পাওয়া গেছে। জগতের অধিকাংশ গ্যালাক্সিতে এরূপ ক্লাস্টার আছে। কোন কোনটিতে হাজার হাজার গ্লোবুলার তারা ক্লাস্টার আছে। এসব ক্লাস্টার মূলত পুরাতন তারাদের সমন্বয়ে গঠিত। সাধারণত গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে এরা দূরে অবস্থান করে। নীচে দু'টি গ্লোবুলার ক্লাস্টারের ছবি দিয়েছি।



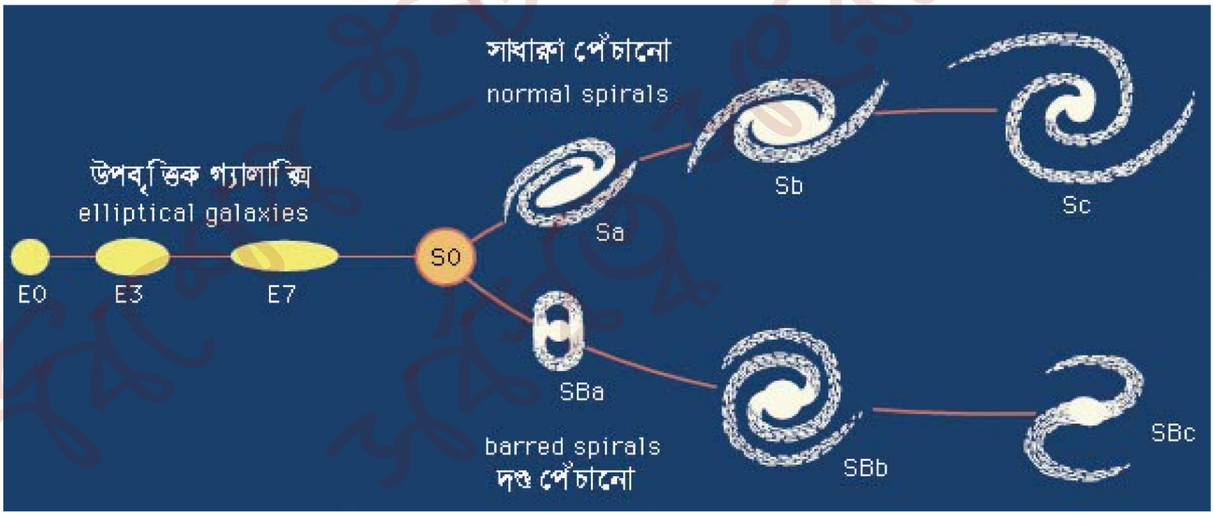


গ. গ্যালাক্সি [galaxy]

ক্লাস্টার, জোড়া এবং একক অবস্থায় হলেও তারারা মূলত একেকটি বিরাট জগতের সদস্য হিসাবে অস্তিত্বশীল আছে। এসব তারাজগতের নামই গ্যালাক্সি [galaxy] [ছায়াপথ]। আধুনিক যুগ পর্যন্ত মাত্র ক'টি গ্যালাক্সির সন্ধান মানুষ জানতে পেরেছিল। গ্যালাক্সির সর্বপ্রথম আবিষ্কারক ছিলেন মুসলিম মহাকাশবিজ্ঞানী আস-সূফি। ঈসায়ী ৯৬৪ সালে প্রকাশিত একটি কিতাবে তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন। যে গ্যালাক্সির কথা তাঁর লেখায় উল্লেখিত হয়েছিল সেটা হলো পৃথিবী থেকে ২২ লক্ষ আলোক-বৎসর দূরে অবস্থিত আন্ড্রমেডা স্পাইরাল গ্যালাক্সি। এর অপর নাম **M31** [মেসিয়ার ৩১]।

১. বস্তুসমষ্টি: এটা সহজে অনুমেয়, গ্যালাক্সি মূলত একক তারা, জোড়া ও দলভুক্ত তারা, খোলা ও বটিকাকার তারা ক্লাস্টার ইত্যাদি নিয়ে সৃষ্ট। আমাদেরটির মতো অনেক সৌরজগৎ আছে বলেও প্রমাণ মিলেছে। নিশ্চিত আরো জানা গেছে, গ্যালাক্সিতে এটোমিক ও মলিকিউলার স্কেলে হাইড্রোজেন গ্যাস; হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ও সিলিকনের সমন্বয়ে গঠিত জটিল মলিকিউল; কজমিক [মহাজাগতিক] রশ্মি ইত্যাদিও আছে।

২. গ্যালাক্সির ধরন: বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ থেকে গ্যালাক্সির বেশ ক'টি ধরন সনাক্ত করেছেন। নিম্নে এসব ধরনের একটি চিত্র তুলে ধরেছি। মূল ক'টি ধরন হলো: **ক. উপবৃত্তিক, খ. পেঁচানো ও গ. অনিয়মিত**। এই তিনটি মৌলিক ধরনকে আবার বিভিন্ন উপ-ধরনে বিভক্ত করা হয়েছে। নিম্নের চিত্র দেখুন।



৩. গ্যালাক্সি ক্লাস্টার: ঠিক তারাদের মতো স্বয়ং গ্যালাক্সিরাও দলে দলে থাকতে ভালোবাসে। এসব দলকে বলে **গ্যালাক্সি ক্লাস্টার** [galaxy cluster]। খুব অল্প গ্যালাক্সি পাওয়া গেছে যারা এককভাবে অস্তিত্বশীল। বিভিন্ন ধরনের ক্লাস্টার সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য মিলেছে। মূল ক'টি হলো: **ক. গ্রুপ [group]; খ. অনিয়মিত দল [irregular cluster] এবং গ. গোলকাকার [spherical]**।

গ্রুপ ক্লাসে ১০ থেকে ৫০টি পর্যন্ত গ্যালাক্সি পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের সদস্য নিয়ে এসব গ্রুপ গঠিত। এরা মূলত ৫০ লক্ষ আলোক-বৎসর দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। মানে, যে কোন একটি গ্রুপ মহাকাশের এ পর্যন্ত স্থান দখল করে রেখেছে। এই গ্রুপের দৃষ্টান্ত আমাদের **'লকেল গ্রুপ অব গ্যালাক্সিজ'** [local group of galaxies]। নিম্নের [পরবর্তী ২ পৃষ্ঠায় দেওয়া] টেবিলটি দেখুন।

Members of the Local Group of galaxies - স্থানীয় গ্যালাক্সি দলের সদস্য তালিকা				
name of galaxy (গ্যালাক্সির নাম)	type (ধরন)	dimensions (light-years) (আয়তন -আ.ব.)	distance (10^6 light-years) (দূরত্ব - মিলি. আ.ব)	year of discovery (আবিষ্কার সন)
WLM	Irr	11,000 x 3,600	3.1	1909
IC 10	Irr	4,600 x 4,000	2.15	1889
Cetus dwarf	E4	3,700 x 3,200	2.54	1999
NGC 147	E5	9,400 x 5,900	2.15	1829
Andromeda III	E	3,200 x 2,200	2.48	1970
NGC 185	E3	9,100 x 7,800	2.15	1787
M110	E5	14,000 x 9,000	2.48	1773
Andromeda VIII	dSph	35,000 x 7,900	2.7	2003
M32	E2	7,900 x 5,300	2.48	1749
Andromeda Galaxy	Sb	200,000	2.48	964
Andromeda I	E	1,900	2.64	1970
Small Magellanic Cloud	Irr	16,000 x 9,100	0.20	*
Andromeda IX	dSph	4,200	2.90	2004
Sculptor dwarf	E3	3,400 x 2,600	0.29	1937
LGS 3	Irr	1,500	2.64	1978
IC 1613	Irr	13,600 x	2.35	1906

		12,600		
Andromeda X	dSph	5,900	2.90	2005
Andromeda V	dSph	1,800	2.64	1998
Andromeda II	E	2,300 x 1,600	2.22	1970
M33	Sc	60,000	2.58	1654
Phoenix dwarf	Irr	1,900 x 1,600	1.30	1976
Fornax dwarf	E3	1,600 x 1,400	0.46	1938
UGCA 92	Irr	2,700 x 1,400	4.70	1974
Large Magellanic Cloud	Irr	31,000 x 26,000	0.16	*
Carina dwarf	Irr	2,200 x 1,500	0.33	1977
Canis Major dwarf	Irr	5,200	0.03	2003
Leo A	Irr	3,300 x 2,000	2.25	1966
Sextans B	Irr	7,000 x 4,800	4.70	1966
NGC 3109	Irr	21,000 x 3,800	4.50	1835
Antila dwarf	E3	2,700 x 2,000	4.60	1985
Leo I	E3	2,300 x 1,800	0.82	1950
Sextans A	Irr	6,900 x 5,800	4.00	1942
Sextans dwarf	E3	7,700 x 5,500	0.29	1990
Leo II	E0	2,400 x 2,200	0.69	1950
GR 8	Irr	2,800 x 2,200	7.90	1946
Ursa Minor dwarf	E5	2,300 x 1,500	0.20	1954
Draco dwarf	E3	3,900 x 2,400	0.26	1954

Milky Way Galaxy	Sb/c	144,000		*
SagDEG	E7	5,400 x 14,000	0.10	1994
SagDIG	Irr	3,200 x 2,300	3.85	1977
NGC 6822	Irr	7,300 x 6,400	1.63	1884
Aquarius dwarf	Irr	2,100 x 1,100	3.10	1966
Tucana dwarf	Irr	2,400 x 1,000	2.84	1990
UKS 2323-326	Irr	2,100 x 1,600	4.70	1978
Andromeda VII	dSph	1,600 x 1,300	2.25	1998
Pegasus dwarf	Irr	3,600 x 1,900	2.48	1958
Andromeda VI	dSph	8,300 x 2,600	2.54	1998

*Naked-eye object; known since antiquity. [নগ্ন-চোখো দুশ্যমান এমন বস্তু; আদি যুগ থেকে জানা।]

ইরেগুলার ক্লাস্টার আয়তনে খুব বড়। এদের সদস্যসংখ্যা ১ হাজার থেকেও বেশী হয়ে থাকে। অধিকাংশ গ্যালাক্সি পেঁচানো ও উপবৃত্তিক। মহাকাশের ১ কোটি থেকে ৫ কোটি আলোক-বৎসর পর্যন্ত স্থান তাদের একেকটির দখলে। ভারগো ও হারকিউল্স নামক ক্লাস্টার এই ক্লাসের অন্তর্ভুক্ত।

গোলকাকার ক্লাস্টার বিরাট আয়তনবিশিষ্ট। এদের সদস্য মূলত উপবৃত্তিক গ্যালাক্সি। মহাকাশের ৫ কোটি আলোক-বৎসর স্থান তাদের একেকটির দখলে। কোন কোন গোলকাকার ক্লাস্টারে মোট গ্যালাক্সি সংখ্যা ১০ হাজার পর্যন্ত দেখা গেছে।

সুপারক্লাস্টার

আমরা তিন ধরনের গ্যালাক্টিক ক্লাস্টার বা দল নিয়ে ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। এসব দলও কিন্তু এককভাবে অস্তিত্বশীল নয়। একাধিক ক্লাস্টার মিলে সৃষ্টি হয়েছে বেশ ক'টি সুপারদল। এদের ইংরেজী নাম **'সুপারক্লাস্টার'** [supercluster]। প্রতিটি সুপারদলের সদস্যসংখ্যা ৩ থেকে ১০টি পর্যন্ত ক্লাস্টার হয়ে থাকে। একেকটি সুপারক্লাস্টার মহাকাশে বিরাট অঞ্চল দখলে রেখেছে। কোনো কোনোটি ২০ কোটি আলোক-বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত। আমাদের সৌরজগৎ **লকেল সুপারক্লাস্টারের** সদস্য। এটাকে **ভারগো সুপারক্লাস্টারও** বলে।

গ্যালাক্সির কেন্দ্র

আমরা জানি গ্যালাক্সি মূলত ছোটবড় অসংখ্য তারার দ্বারা সৃষ্ট। এছাড়া জানা-অজানা অনেক সৌরজগতও আছে। স্বভাবতই কেন্দ্রের দিকে যতোই অগ্রসর হবো তারাদের সংখ্যা ততো বেশী ও ঘন দেখা যাবে। এখন প্রশ্ন জাগে গ্যালাক্সির কেন্দ্র কিরূপ? জেনে নেই, আধুনিক বিজ্ঞান কি বলে।


কৃষ্ণ গর্ত [কল্পিত ছবি]

আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রের নিকটে তারাদের সংখ্যা খুব বেশী। আর ঠিক কেন্দ্রে একটি বিরাট শক্তিশালী **'ব্ল্যাক হোল'** [black hole] বা **'কৃষ্ণ গর্ত'** আছে বলে অনেকে মনে করেন। কেউ কেউ এটাও বলেছেন, প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য আয়তনের গ্যালাক্সির কেন্দ্রে একেকটি কৃষ্ণ গর্ত আছে। এখন প্রশ্ন রইলো, ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ গর্ত বলতে কী বুঝায়?

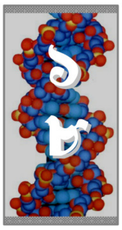
এখনো কৃষ্ণ গর্ত **'থিওরী'** পর্যায়ে আছে। তবে ইদানিং বেশ ক'টি বস্তুর সন্ধান মিলেছে যারা কৃষ্ণ গর্ত হওয়ার জন্য শক্তিশালী ক্যান্ডিডেট বলে অনেকে মনে করেন। আমরা জানি প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে কেন্দ্রের দিকে একটি টানশক্তি বিদ্যমান। একে বলে মহাকর্ষ [gravity]। এখন, মহাকর্ষ কতটুকু শক্তিশালী তা নির্ভর করে বস্তুর মধ্যে কি পরিমাণ ওজন [ম্যাস] আছে। মহাকাশে অনেক তারা আছে যাদের ওজন বা ম্যাস বিরাট। এরা জীবন শেষ করে এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে। একে বলে **'সুপারনোভা'** [supernova] বিস্ফোরণ। তবে তারার সকল বস্তু এই বিস্ফোরণে মহাকাশে উড়ে যায় না। যা থাকে তা যথেষ্ট হতে পারে মহাকর্ষের প্রচণ্ড চাপের শিকার হতে। ফলে ছোট্ট আয়তনের বিরাট ওজনবিশিষ্ট দু'টি বস্তুর একটি অবশিষ্ট থাকবে। প্রথমটি হলো **'নিউট্রন স্টার'** [neutron star] - নিউট্রন তারা। আর দ্বিতীয়টি **'ব্ল্যাক হোল'** [black hole] - কৃষ্ণ গর্ত। নিউট্রন তারা ঐ-টি যার মধ্যে বস্তু প্রচণ্ড মহাকর্ষের চাপে এটমের নিউট্রন অবস্থায় বিদ্যমান। কৃষ্ণ গর্ত সেটি যার প্রচণ্ড মহাকর্ষের চাপে নিজের মধ্যে সৃষ্টি করেছে এমন শক্তিশালী মহাকার্ষিক **'মুক্তগতি'** যার পরিমাণ আলোকের গতি থেকে বেশী। অন্য কথায়, ব্ল্যাক হোল থেকে কোন এনার্জি বেরিয়ে আসতে পারে না- এমনকি আলোকরশ্মিও নয়।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, অধিকাংশ গ্যালাক্সির কেন্দ্রে এরূপ একটি বিরাট ক্ষমতাধর ব্ল্যাক হোল আছে। ব্ল্যাক হোল-নিকটস্থ বস্তু - সে যাই হোক, তারা, আন্তঃতারা গ্যাস কিংবা অন্য কোন বস্তু, নিজের দিকে টেনে নেয়। সে কিছুই নির্গত করে না- শুধু টেনে নিজের মধ্যে পতিত করে। এরূপ শক্তিশালী মহাকার্ষিক ফিল্ডবিশিষ্ট বস্তু ও তার নিকটস্থ মহাকাশের ফিজিক্স [পদার্থবিজ্ঞানের আইন-কানুন] সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে থাকে সেখানে। আইনস্টাইনের **'রিলেটিভিটি'** [আপেক্ষিকতাবাদ] থিওরী ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা বলেন, ব্ল্যাক হোলের নিকট-মহাকাশের স্থান-কাল [space-time] এতোই বেশী বক্র হয়ে যায় যে, খোদ সময়ও সেখানে বন্ধ হয়ে যেতে পারে! এছাড়া ব্ল্যাক হোলের ভেতর দিয়ে বস্তু [বা মহাকাশযান] ভ্রমণ করে অতীত বা ভিন্ন কোন স্পেইস-টাইমে চলে যেতেও পারে! যাক, এসব বৈজ্ঞানিক-কাল্পনিক কেচ্ছাসদৃশ কথা আর বলে লাভ নেই। আমরা এটুকু বলতে পারি, ব্ল্যাক হোল নামক অদ্ভুত বস্তু থাকার সম্ভাবনা আছে। এদের ফিজিক্স সম্পর্কে যাকিছু বলা হচ্ছে তা সবই **'থিওরী'**। কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ এখনো মিলে নি।

প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা! আমাদের আজকের লেকচারের শেষ এখানেই। মহাকাশ বিজ্ঞানের উপর আরো একটি লেকচার রাখার আশা রাখি। আমরা তখন **'কজমোলজি'** বা বিশ্বতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবো। আগামী লেকচারে আবার সাক্ষাতের আশা ব্যক্ত করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

গ. মহাকাশবিজ্ঞান: গঠনপ্রণালী ও মৌলিক গতিবিধি

বক্তৃতা ১৮ : কজমোলজি [বিশ্বতত্ত্ব]

আস্‌সালামু আলাইকুম! ওয়েলকাম, প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! আধুনিক বিজ্ঞানের উপর প্রাথমিক জ্ঞানার্জনমূলক বক্তৃতামালার ১৮তম লেকচারে আপনাদেরকে জানাচ্ছি সাদর সম্ভাষণ। ইতোমধ্যে আমরা দীর্ঘ ১৭টি বক্তৃতা উপস্থাপন করেছি। বিজ্ঞানজগতের অনেকদূর পর্যন্ত আমরা বিচরণ করেছি। জেনেছি অনেক অজানা ব্যাপার। বস্তুজগতের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত মহাবিশ্ব। আমরা বেশ ক'টি লেকচারে মহাবিশ্বের গঠনপ্রণালী ও গতিবিধির উপর ইতোমধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আশা করছি শিক্ষার্থীরা বস্তুজগতের স্বরূপ সম্পর্কে আগে থেকে অনেকটা বেশী অবগত হতে পেরেছেন। তবে বস্তুজগৎ গবেষণার আরেকটি দিক আছে যার উপর অন্তত কিছুটা আলোচনা ছাড়া সবকিছু অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তবে এ বিষয়টি বিজ্ঞানের অনেক ব্যাপারের মতো অনেকটা **'থিওরীসর্বস্ব'** হওয়ায় আমরা তেমন গভীরে যাবো না। কারণ শক্ত প্রমাণাদির উপর নির্ভরশীল বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি এ লেকচার সিরিজে উপস্থাপন করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। যাক, প্রথমে জেনে নিই এই বিষয়টি কী।

ইংরেজীতে শব্দটি হলো **'কজমোলজি'** [cosmology]। গ্রীক **'kosmos'** শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। এর অর্থ **'মহাবিশ্ব'** [universe]। শব্দটির সঙ্গে -ology সংযুক্ত থাকায় এটা একটি **'বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়'** হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ঠিক যেরূপ, আমরা 'Geology' [ভূতত্ত্ব], 'Biology' [জীববিদ্যা], 'Zoology' [প্রাণীবিদ্যা] ইত্যাদি বিষয়কে **'বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা'** বলে চিহ্নিত করে থাকি। কজমোলজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে **'বিশ্বতত্ত্ব'**। এ লেকচারে আমি কজমোলজি শব্দটিই ব্যবহার করবো। মোটকথা, পুরো বিশ্বজগৎ নিয়ে গবেষণার নাম হলো কজমোলজি। সুতরাং অতীত বক্তৃতামালায় ইতোমধ্যে যা কিছু তথ্য আমরা তুলে ধরেছি তা-ও মূলত

আংশিকভাবে কজমোলজির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সেক্ষেত্রে এই শব্দের ব্যবহার হয় নি। এর কারণ হলো কজমলোজিস্টরা কিছুটা ভিন্নভাবে গবেষণা করেন। তাদের কাজ হলো পর্যবেক্ষণ ও তাত্ত্বিক গবেষণা দ্বারা মহাজগতের জন্ম, জীবনেতিহাস, সম্ভাব্য মৃত্যু ইত্যাদির উপর তাত্ত্বিক **'মডেল'** তৈরী করা। এক কথায়, কজমোলজি দ্বারা বিজ্ঞানীরা বিশ্বজগৎ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণমূলক জানা তথ্যাদির উপর নির্ভর করে পদার্থবিজ্ঞানের আইন-কানুন [ফিজিক্যাল আইন-কানুন] ও থিওরী ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বজগতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়া-কলাপ কিরূপ ছিলো, আছে বা হবে তার ধারণা আমাদেরকে দিয়ে থাকেন। এ বাক্যটি বেশ বড় হয়ে গেছে! কিন্তু এরচেও সরল ভাষায় বুঝানো কিভাবে সম্ভব তা এ মুহূর্তে আমি খুঁজে পাচ্ছি না। হয়তো ব্যাপারটির উপর আরো কিছু আলোচনা দ্বারা বুঝা সহজ হয়ে পড়বে।



হাবল ডীপ ফিল্ড: মহাকাশের সামান্য একটু এলাকায় দীর্ঘ ১০ দিন হাবল স্পেইস টেলিস্কোপ স্থির রেখে এই ছবিটি তোলা হয়। প্রতিটি দৃশ্যমান বস্তুই একেকটি দূরের গ্যালাক্সি। আর প্রতিটি গ্যালাক্সিতে আছে কোটি কোটি তারা।

ক. আধুনিক যুগের পূর্ব-পর্যন্ত কজমোলজিক্যাল চিন্তা-চেতনা

মানুষ স্বভাবতই অনুসন্ধিৎসু। সে জানতে চায়, বুঝতে চায়। জানার আগ্রহ থেকেই সুদূর অতীত থেকে মহাবিশ্বের জন্ম, বড়ত্ব, গঠনপ্রণালী, সম্ভাব্য শেষ পরিণতি ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে আসছেন অসংখ্য চিন্তাশীল মানুষ। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন বিশ্বতাত্ত্বিক থিওরী প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক যুগেও হচ্ছে। সর্বাধুনিক কজমোলজিক্যাল থিওরীসমূহের উপর আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে প্রথমে জেনে নিই অতীতের যুগ যুগ ধরে গ্রহণীয় ওসব বিশ্বতত্ত্বের কথা।

ক. ১. আদি যুগ

খৃস্টপূর্ব ১৮০০ সনের দিকে বর্তমান ইরাক অঞ্চলে গড়ে ওঠে দুই-নদের-তীরবর্তী **'মেসোপটামিয়ান'** সভ্যতা। একে **'ব্যাবিলনীয়'** সভ্যতাও বলে। এই সভ্যতার ইতি ঘটে খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে। খৃস্টপূর্ব ১১০০ শতকের দিকে ব্যাবিলনের বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম **'নক্ষত্রপুঞ্জ'** চিত্রাঙ্কন করেন। পৃথিবী থেকে দৃশ্যত এসব **'চিত্র'** মানুষ এখনো ব্যবহার করেন। অবশ্য আজকাল এদের গুরুত্ব তেমনটি নেই- কারণ, বাস্তবে এসব **'কাল্পনিক চিত্র'** দ্বারা কিছুই বুঝায় না। যেসব তারা নিয়ে এসব কল্পিত চিত্র তৈরী তাদের একেকটির দূরত্ব বিরাট। অধিকাংশ তারা একে অন্যের সঙ্গে মোটেই সম্পৃক্ত নয়। ব্যাবিলনীয় ওসব কল্পচিত্র থেকেই কিন্তু পরবর্তীতে **'আস্ট্রলোজি'** বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের জন্ম নেয়। এই শাস্ত্রটির সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। মহাকাশে তারাদের অবস্থান মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রমাণ নেই। সুতরাং আমরা সেদিকে যাবো না।

তবে আদি যুগে কিছু কিছু বিজ্ঞানীও মনে করতেন আমাদের এ পৃথিবী **'সমগ্র মহাবিশ্বের কেন্দ্রে'** অবস্থিত। দৃশ্যত তা-ই মনে হয়। কারণ আমাদের পৃথিবীর দৈনিক গতির ফলে পুরো নভোমণ্ডল পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে দৈনিক একবার ঘুরে আসছে বলে সুস্পষ্ট দেখা যায়। দৃশ্যত এই সত্য থেকেই **'পৃথিবীকেন্দ্রিক বিশ্ব'** থিওরীটি গড়ে উঠেছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার, অনেক বিজ্ঞানীসহ প্রায় সকল মানুষ ঈসায়ী ষষ্ঠদশ শতক পর্যন্ত এই থিওরীতে বিশ্বাস করে আসছিলেন। অবশ্য বিজ্ঞানী হিসাবে প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল পৃথিবীকেন্দ্রিক থিওরী সেই ৩৫০

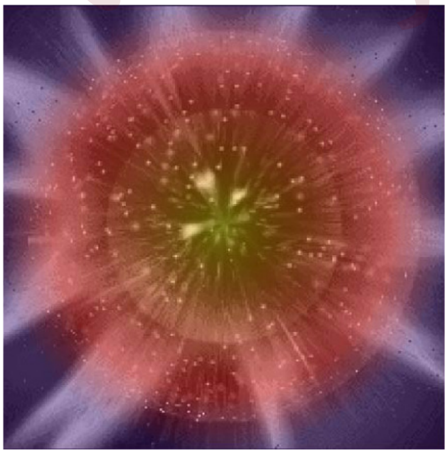
খৃস্টপূর্ব সনে সর্বপ্রথম তুলে ধরেছিলেন। যাক, এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বর্ণনা এখানে উদ্দেশ্য নয়। প্রসঙ্গক্রমে কথাগুলো বললাম। বিশ্বতত্ত্ব কিভাবে সর্বদা রদবদল হচ্ছে তার কিঞ্চিৎ ইশারা মিলবে এসব ইতিহাস থেকে। পরবর্তীতে **'সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব'** সবার নিকট গ্রহণযোগ্যতা পায়। কিন্তু তা-ও কয়েক শতাব্দি পরে বদলে যায়। আধুনিক যুগে এসে উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ও শক্তিশালী দূরবীক্ষণযন্ত্র সেসাথে ফটোগ্রাফিক ও বর্ণচ্ছটা গবেষণা কৌশল ইত্যাদির সাহায্যে বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের আসল চেহারা, গতিমতি, বড়ত্ব, তারার মাত্রা ও কাঠামো ইত্যাদি উন্মোচন করেছেন। আগের একাধিক লেকচারে এসব বিষয়ের উপর আলোচনা হয়েছে। সুতরাং অত্যাধুনিক কজমোলজিক্যাল থিওরীগুলোর উপর এবার আলোচনার স্কোপ নিবদ্ধ রাখাই হবে সঠিক উপস্থাপন।

খ. আধুনিক যুগে কজমোলজি

এই গেল শতকের দ্বিতীয় দশকের শুরুতেও বিজ্ঞানীরা জানতেন না, মহাকাশের যেসব বস্তু টেলিস্কোপে পেঁচানো তারাকাঠামো বলে দৃশ্যত হচ্ছিলো, ওগুলো বাস্তবে আমাদের **'মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির'** সদস্য কি না? অর্থাৎ তখনো সকলে ভাবতেন, পুরো মহাবিশ্ব বলতে এই মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি-ই! সুতরাং পেঁচানো তারাসিস্টেমকে তারা নামকরণ করলেন **'পেঁচানো নেব্যুলাই'** [spiral nebulae]। শেষ পর্যন্ত আমেরিকান মহাকাশবিজ্ঞানী এডউইন হাবল [১৮৮৯-১৯৫৩] ঈসায়ী ১৯২৪ সালে প্রমাণ করলেন ওসব স্পাইর‍্যাল নেব্যুলা আসলে আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির সদস্য নয়, তারা নিজেরাই একেকটি গ্যালাক্সি। হঠাৎ বিশ্বজগতের আয়তন শতগুণ বৃদ্ধি পেল! মানুষ বুঝতে পারলো, এ মহাবিশ্ব প্রায় অসীম এক জগৎ। এর মধ্যে বিদ্যমান কোটি কোটি তারাসম্বলিত কোটি কোটি গ্যালাক্সি।



হাবল ১৯২৯ সালে আবিষ্কার করলেন আরেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। তিনি পর্যবেক্ষণ, বর্ণচ্ছটা, ডপলার ইফেক্ট ইত্যাদি গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করলেন বিশ্বজগতের সকল গ্যালাক্সি একটা আরেকটা থেকে দূরে সরে পড়ছে বিভিন্ন গতিতে। এতে স্পষ্ট হলো, সমগ্র মহাবিশ্ব দিন দিন বর্ধিত হচ্ছে। হাবলের এই আবিষ্কারই জন্ম দিল আধুনিক কজমোলজির।



খ. ১. দ্যা বিগ ব্যাং থিওরী [মহাবিস্ফোরণ বিশ্বতত্ত্ব]

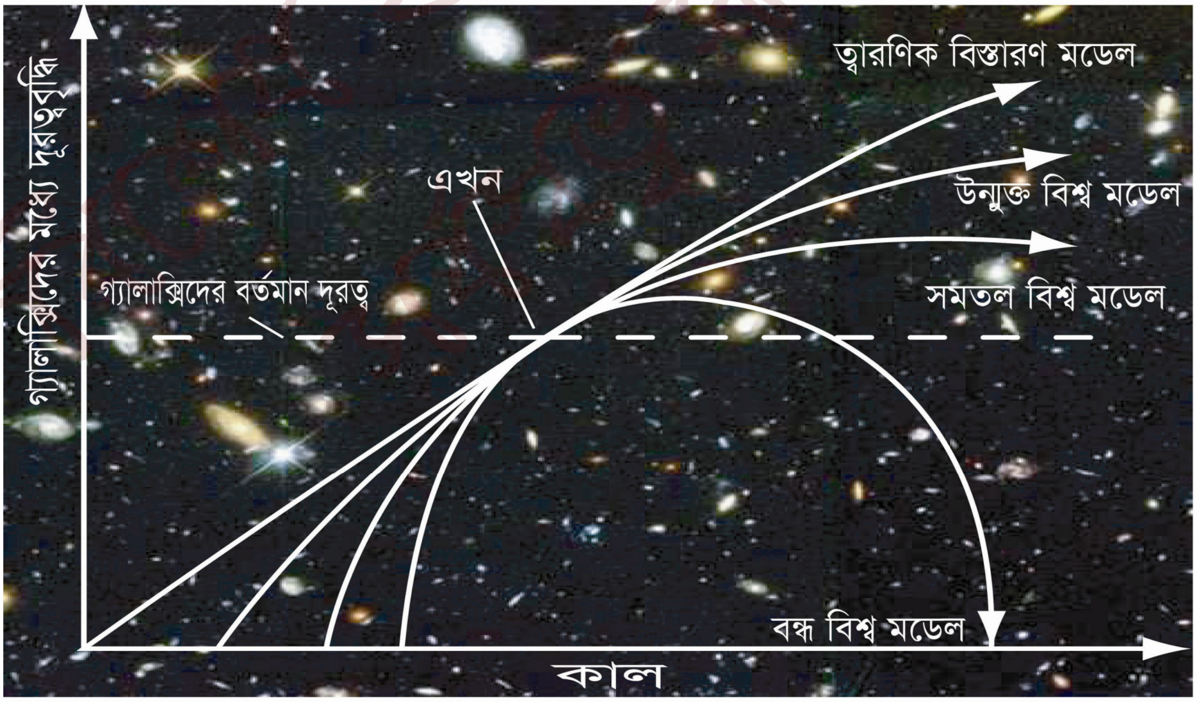
যে বিশ্বতত্ত্বের উপর আজকের বিজ্ঞান বেশী আস্থাশীল তার নাম দ্যা বিগ ব্যাং থিওরী [big bang theory]। সংক্ষেপে এতে বলা হয়েছে, সুদূর অতীতে [১৩৭০ কোটি বৎসর পূর্বে] অজানা এক কারণবশত শূন্য থেকে হঠাৎ এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে বিশ্বের জন্ম হয়েছে। প্রথমে অকল্পনীয় তাপমাত্রা ছিলো পুরো মহাবিশ্বে। সময়ে তাপমাত্রা অনেকটা কমে আসে। তবে শুরু থেকেই মহাবিশ্ব দ্রুত চতুর্দিকে বড় হতে থাকে- যা এখনো হচ্ছে।

এই থিওরী নির্ভরশীল- পর্যবেক্ষণ ও গণিতের উপর। থিওরীর ফলাফল মুতাবিক সমগ্র মহাবিশ্ব মহাবিস্ফোরণের প্রচণ্ড ফোর্সের কারণে চতুর্দিকে বর্ধিত হওয়ার কথা। এটা পর্যবেক্ষণ থেকে সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন এডউইন হাবল। ইতোমধ্যে ব্যাপারটি উল্লেখ করেছি। গণিতের সমর্থন আসে আলবার্ট আইনস্টাইনের [১৮৭৯-১৯৫৫] **'রিলেটিভিটি'** [relativity] বা **'আপেক্ষিকতাবাদ'** থেকে। ঈসায়ী **১৯১৫** সালে এই থিওরী প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে **'ফিল্ড ইক্যুয়েসন্স'** [field equations] নামক এক সেট গাণিতিক সমীকরণ ছিলো। ঈসায়ী **১৯২২** সালে এসব সমীকরণের সমাধান তুলে ধরেন রুশ বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যান [১৮৮৮-১৯২৫]।

উপরোক্ত ফিল্ড ইক্যুয়েশন্স বা সমীকরণে **'সময়'** একটি ফেক্টর। যেই মুহূর্তে সময় ইউনিটকে '০' দ্বারা সমীকরণে ব্যবহৃত হবে তখনোই সমগ্র সমীকরণ ব্যর্থ বা ফেল করে বসে। এতে এটাই বুঝাচ্ছে, জগতসৃষ্টির মুহূর্তে কী হয়েছিল বা কোন্ শক্তি এতো বড় বিস্ফোরণ ঘটালো তা কখনো জানা যাবে না। ফিল্ড ইক্যুয়েশন্স শুধুমাত্র সৃষ্টিলগ্নের পরের যে কোন মুহূর্তে কার্যকর। মোটকথা আসল **'বিগ ব্যাং'** বা **'বড় ঘটনা'** বিজ্ঞানীদের নাগালের বাইরে।

মহাবিস্ফোরণ থিওরীর অপর আরেক শক্তিশালী প্রমাণ মিলেছে। একে বলে **'কজমিক বেকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন'** [cosmic background radiation]। বাংলায় বলতে পারি **'মহাজাগতিক নেপথ্য রশ্মি'**। থিওরী থেকে জানা যায়, কোটি কোটি বৎসর পরও সে-ই মহাবিস্ফোরণের একটি স্বাক্ষর এখনো বিদ্যমান থাকার কথা। আর এ স্বাক্ষরই হলো ১৯৬৫ সালে আবিস্কৃত কজমিক বেকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন। এই রশ্মির মাত্রা ৩ কেলভিন [**-২৭০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপ**]।

যদি মহাবিস্ফোরণ বিশ্বতত্ত্ব সঠিক হয়ে থাকে তাহলে বিশ্বের পরিণতি কি হতে পারে? এ প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানো ঠিক হবে না। তবে বিজ্ঞান কি বলে তা একটু তলিয়ে দেখা যায় আমাদের চিন্তার খোরাক বৃদ্ধির স্বার্থে। কেমন?



উপরের চিত্রে সম্ভাব্য চারটি **'মডেল'** তুলে ধরেছি। এই চারটির নাম: **১. ত্বারণিক বিস্তারণ মডেল [accelerating expansion model]; ২. উন্মুক্ত বিশ্ব মডেল [open universe model]; ৩. সমতল বিশ্ব মডেল [flat universe model];** এবং **৪. বন্ধ বিশ্ব মডেল [closed universe model]**। এদের ব্যাখ্যা অতি সংক্ষেপে নিম্নে আলোচিত হলো।

১. ত্বারণিক বিস্তারণ মডেল: এই মডেল অনুযায়ী মহাবিশ্বের যাবতীয় বস্তু একটা আরেকটা থেকে ক্রমান্বয়ে গতি বৃদ্ধি করে [ত্বারণিক গতিতে] দূরে সরে পড়বে। একদা বস্তুর এটমগুলো পর্যন্ত ঐ গতির শিকার হবে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

২. উন্মুক্ত বিশ্ব মডেল: এই মডেল অনুযায়ী পুরো মহাবিশ্ব চিরদিনের জন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক গ্যালাক্সি নিকটস্থ গ্যালাক্সি থেকে চিরকাল যাবৎ সরে পড়তে থাকবে।

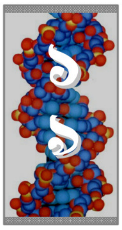
৩. সমতল বিশ্ব মডেল: এই থিওরী বলছে, বিশ্বজগৎ তার নিজের মহাকর্ষের টানে পুনরায় ছোট হয়ে ধ্বংস হবে না। এক সময় বর্ধিত হওয়ার মাত্রা শূন্যের কোঠায় এসে যাবে। স্থির হবে বৃদ্ধি-হওয়া। সুতরাং গ্যালাক্সিদের মধ্যে দূরত্ব থাকবে ঠিক, কিন্তু একটা আরেকটা থেকে দূরত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কিংবা সংকোচন হবে না।

৪. বন্ধ বিশ্ব মডেল: এই মডেলের তত্ত্ববিদরা বলেন, আজ থেকে কোটি কোটি বৎসর পরে মহাবিশ্বের বর্তমান বৃদ্ধি-হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর বিশ্বজগৎ তার নিজের ওজন হেতু পুনরায় একটা আরেকটার দিকে মহাকর্ষের ফলে আকর্ষিত হবে। দিন দিন পুরো মহাবিশ্ব এভাবে ছোট্ট হয়ে একদিন বিরাট আরেক বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রিয় সন্ধানী শিক্ষার্থীরা! উপরোক্ত চারটে মডেলের কোন্‌টি সঠিক তা কেউ জানে না। এছাড়া অপর কোন আজো অনাবিস্কৃত মডেল সঠিক হতে পারে। এই চারটে সম্পর্কে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা দেওয়ার কারণ হলো বর্তমান চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া- এই যা। যাক, মহাকাশবিজ্ঞানের উপর ক'টি লেকচারের এখানেই শেষ। আমরা আশা করছি আগামী লেকচার থেকে **'বিশুদ্ধ বিজ্ঞান'** ও **'ব্যবহারিক বিজ্ঞান'** সম্পর্কে আলোচনায় যেতে। এ সম্পর্কে আমাদের প্রথম বক্তৃতা [১৯তম লেকচার] হবে **'বিশুদ্ধ বিজ্ঞান: কিভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান শুরু হয়? হাইপোথিসিস ও পর্যবেক্ষণ'** এই বিষয়গুলোর উপর।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বক্তৃতা ১৯ : আধুনিক প্রযুক্তি

'বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান' শীর্ষক বক্তৃতামালার উনিশতম লেকচারে সবাইকে জানাচ্ছি উষ্ণ সম্ভাষণ। সন্ধানী শ্রোতা বন্ধুরা! বিজ্ঞান জগতের অনেক দূর পর্যন্ত আমরা ইতোমধ্যে বিচরণ করেছি। তবে একটা বিষয় সবাই লক্ষ্য করে থাকবেন হয়তো, আলোচনাকালে আমরা খুব অল্পই প্রযুক্তির উপর কথা বলেছি। আজকের লেকচারে সেদিকে মোড় নেওয়ার ইচ্ছা রাখি। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ তার অনুসন্ধিৎসার স্পৃহার সঠিক জবাব পায়। বস্তুজগতের চলন-বলন, স্বরূপ, কার্যকারিতা ইত্যাদি জানা যায়। জগৎস্রষ্টা কোন্ কোন্ কৌশলে স্বীয় সৃষ্ট বস্তুজগতকে পরিচালনা করছেন তা বুঝার মাধ্যমে জ্ঞানের আলো জ্বলে ওঠতে পারে হৃদয়ে। সঠিক জ্ঞানান্বেষার মাঝে যে লুকিয়ে আছে এক অপূর্ব স্বাদযুক্ত রহস্য তা উন্মোচন হয় সন্ধানীর মনে। তবে আজকের বিজ্ঞান-গবেষণা শুধু মনের স্পৃহা পূরণ ও জ্ঞানান্বেষার আনন্দ উপভোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সমগ্র বস্তুজগতব্যাপী মওজুদ আছে বিশাল মাত্রার এনার্জি। অনেকের মতে বস্তুজগৎ মানেই এনার্জি বা বল। আইনস্টাইনের **'বস্তু ও এনার্জি সমার্থক'** সমীকরণ থেকে শুধু এ কথাটির সমর্থন মিলে না বরং তা-ও স্পষ্ট, অতি সামান্য বস্তুর মধ্যেও লুকিয়ে আছে বিরাট মাত্রার এনার্জি। আমরা এখানে সে-ই প্রখ্যাত সমীকরণটি তুলে ধরতে পারি: $E=mc^2$ **[এখানে E অর্থ এনার্জি, m অর্থ বস্তুর ম্যাস (ওজন) এবং c অর্থ আলোকের গতি]**

লক্ষ্য করুন, উপরের সমীকরণে আলোকের গতির গুণফল নেওয়া হয়েছে। c = ৩ লক্ষ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড। সুতরাং এ থেকেই অনুমেয় বস্তুর মধ্যে কী বিরাট অঙ্কের এনার্জি লুকানো আছে। আর এই এনার্জির স্বরূপ জানা ও কৌশলে মানবকল্যাণে কাজে লাগানোই হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্দেশ্য। জানার নাম বিশুদ্ধ বিজ্ঞান আর কাজে লাগানোর নাম ব্যবহারিক বিজ্ঞান। আধুনিক যুগে **'কাটিং-এজ টেকনোলজি'** [cutting edge technology]

নিয়ে হৃদয়াকর্ষক আলোচনা হবে একটু পরই। প্রথমে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও এর স্বরূপ আরো একটু বেশী জানার প্রয়োজন মনে করছি।

ঘ. ১. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান: বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

লিখিত ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য অংশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুসন্ধান থেকে মানবজীবন তেমন বেশী উপকৃত হয় নি। বিজ্ঞান বিজ্ঞানের জন্যই ছিলো। কিন্তু আধুনিক যুগে তা খুব দ্রুত পাল্টে গেছে। এখন বিপরীত কথাটি সত্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা আমাদের সকলের জীবন একরূপ নিয়ন্ত্রিত। এর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ততা ও প্রভাব থেকে আজকের বিশ্বের কেউ-ই আর মুক্ত নন।

বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ডাইরেক্ট যোগসূত্র আধুনিককালে পুরোদমে আত্মপ্রকাশ করেছে ঠিকই। কিন্তু যুগে যুগে আবিস্কৃত অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য মানবকল্যাণে কখনো কার্যকর হবে কি না, সে ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত ছিলেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আজকের বিশ্বে বহুল ব্যবহৃত **'রেফ্রিজারেটর'**র কথা বলা যায়। বিজ্ঞানীরা অনেক আগে আবিষ্কার করলেন, যখন কোন তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হয় তখন সেই পদার্থ **'এনার্জি'** গ্রহণ করে। এই ক্রিয়ার নাম **'লেইটেন্ট হিট'**। মৌলিক এই আবিষ্কার থেকেই শেষ পর্যন্ত প্রযুক্তির মাধ্যমে ফ্রিজ-ফ্রিজার ঘরে ঘরে এসেছে খাদ্যদ্রব্য দীর্ঘদিন সংরক্ষণের উপায় হিসাবে। অনুরূপ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সুবাদে আজকের বিশ্বের মানুষ ব্যবহার করছে বিভিন্ন ধরনের মনাবতৈরী ফাইবার বা প্লাস্টিক। আজকের পৃথিবীর এমন কোন জায়গা নেই যেখানে প্লাস্টিকজাত দ্রব্য কাজে লাগছে না। কম্পিউটার ও ইন্টারনেট আজকের যুগে সমগ্র পৃথিবীকে বানিয়েছে গ্লোবাল ভিলেজে [বিশ্বগ্রামে]। কিন্তু গণিত ও বস্তুবিজ্ঞানের মৌলিক বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন ছাড়া এই সত্যিকার যাদুসদৃশ যন্ত্রটি উদ্ভাবন হতো না। মোটকথা, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান হলো প্রযুক্তির মেরুদণ্ড। অনেক সময় প্রযুক্তির উন্নয়নে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের উন্মেষ ঘটে। বিশেষ কোন টেকনোলজিকেল উদ্ভাবনের ভীষণ প্রয়োজন দাঁড়ালে দেখা যায় নতুন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার হচ্ছে বা আবিস্কৃত সত্য কাজে লাগছে। বিষয়টি আরো অনুধাবন করতে নীচের চিত্রটি দেখে নিতে পারি আমরা।



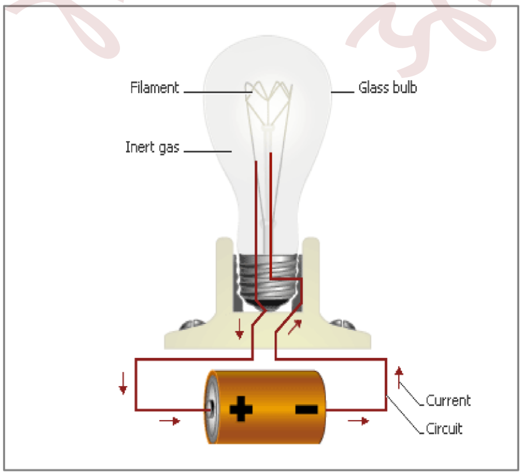
ঘ. ২. ব্যবহারিক বিজ্ঞান: প্রযুক্তি

'বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান' বক্তৃতামালা মূলত বিজ্ঞানের স্বরূপ জানার উপর আলোচনা বৈ নয়। কিন্তু আজকের বিশ্বসমাজ প্রযুক্তিনির্ভর। এটা বিবেচনা করে আধুনিক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের উপর ব্যাখ্যাসম্বলিত দু'চারটে বক্তৃতা সবাইকে উপহার দিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের বিবেচনায় নিম্নোল্লিখিত ১৫টি প্রযুক্তি আধুনিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং বহুদিন পর্যন্ত করবে।

১. ইলেকট্রিক লাইট বাল্‌ব।
২. মোবাইল ফোন।
৩. প্রিন্টিং প্রেস।
৪. পকেট কালক্যুলেটার।
৫. যান্ত্রিক যানবাহন।
৬. উড়োজাহাজ।
৭. স্থির ও চলচিত্র ক্যামেরা।
৮. টেলিভিশন।
০৯. এটম বোমা।
১০. ব্যক্তিগত কম্পিউটার।
১১. ইন্টারনেট।
১২. যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহ।
১৩. অপটিক্যাল ও রেডিও টেলিস্কোপ।
১৪. মাইক্রস্কোপ।
১৫. চিকিৎসাশাস্ত্রের যন্ত্রাদি।

আমরা এই লেকচার ও পরবর্তী আরো দু'একটা বক্তৃতায় উপরোক্ত তালিকায় উল্লেখিত সকল প্রযুক্তির উপর কিছুটা অতিরিক্ত আলোচনার আশা রাখি। প্রথমে বৈদ্যুতিক বাল্‌বের উপর আরো কিছু জেনে নেবো- কেমন?

১. বৈদ্যুতিক বাল্‌ব: বিদ্যুৎ এখন আমাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রাতের অন্ধকারে বিদ্যুতের সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহার যে যন্ত্রটির মাধ্যমে হয়ে থাকে তাহলো ইলেকট্রিক ল্যাম্প। আমাদের আধুনিক শহরগুলোর রাস্তাঘাট থেকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি কাঁচা-পাকা ঘরের কক্ষে জ্বলে ওঠে দিনের শেষে অসংখ্য উজ্জ্বল আলোকরশ্মি দানকারী এসব বাল্‌ব।



বিদ্যুৎ উৎপাদনের টেকনোলজির মূলে আছে জেনারেটর পরিচালনার উপায় অবলম্বন। জেনারেটর ঘুরিয়ে উৎপাদন করতে হবে বিদ্যুৎ। আধুনিক যুগে পানিবিদ্যুৎ, খনিজদ্রব্য থেকে বিদ্যুৎ, পারমাণবিক বিদ্যুৎ ইত্যাদি টেকনোলজির মাধ্যমে জাতীয় গ্রীডে পাওয়ার যোগান দেওয়া হচ্ছে। ইলেকট্রিক বাল্‌বে বিদ্যুৎ বা কারেন্ট চলমান হলেই তা জ্বলে ওঠে। বিকিরণ করে ফটোন বা আলোকরশ্মি যার ফলাফল চতুর্পাশ্বস্থ এলাকা আলোকিত হওয়া। বায়ের ছবিতে বাল্‌বের মৌলিক টেকনোলজি দেখানো হয়েছে।

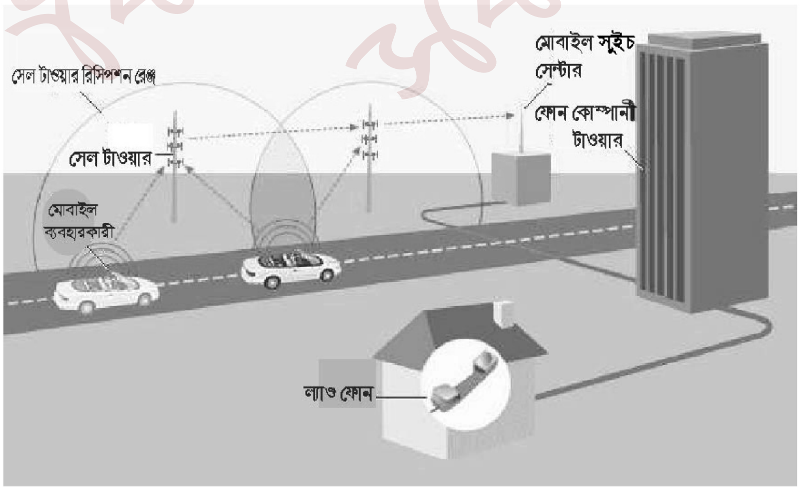
তবে ইলেকট্রিক লাইটিং টেকনোলজি আরো ব্যাপক। সাধারণ লাইট-বাল্ব ছাড়াও আমরা দেখতে পাই টিউব বালব, নিওন বালব, এনার্জি সেভার বালব ইত্যাদি।

কিভাবে ইলেকট্রিক লাইট বালব কাজ করে তা উপরের চিত্র থেকে স্পষ্ট। যে বস্তুটি কারেন্ট চলার ফলে জ্বলে ওঠে তাহলো **'টাংস্টেন'** নামক পদার্থের তৈরী খুব চিকন একটি তার। একে বলে **'ফিলামেন্ট'**। কারেন্ট ফিলামেন্ট তারকে ৩,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা দ্বারা উত্তপ্ত করে তোলে। ফলে এটা বিকিরণ করে আলো ও তাপ। ফিলামেন্ট তার যাতে সহজে জ্বলে **'ছিড়ে'** না যায় এজন্য প্রয়োজন **'অভিজাত গ্যাস'**। আমরা কোন এক পর্যায়ে ৬টি প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত অভিজাত গ্যাসের কথা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি। নাইট্রোজেন ও আরগন গ্যাসের মিশ্রণ দ্বারা অনেক বৎসর যাবৎ বৈদ্যুতিক বাতির ভেতর পরিপূর্ণ করা হয়েছে। ইদানিং **'ক্রিপটন'** গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে একই উদ্দেশ্যে। এই গ্যাস বাতির মধ্যে যোগান দেয় আরো ঔজ্জ্বল্যতা এবং ফিলামেন্টের জীবনকাল করে দীর্ঘ।

২. মোবাইল ফোনঃ বাংলায় মুঠোফোন শব্দটির ব্যবহার এখন সর্বত্র। তবে এ শব্দটি ইংরেজী **'মোবাইল ফোন'** শব্দদ্বয়ের সরাসরি অনুবাদ নয়। যা চলতে পারে তা-ই মোবাইল। সুতরাং **'চলন্তাফোন'** বলা অনেকটা সঠিক হবে। যাক, **'মুঠোফোন'** কিংবা **'মোবাইল ফোন'** উভয় কথা মুক্তভাবে বলবো।

এগুলোকে ইংরেজীতে মোবাইল ফোন [mobile phone] ছাড়াও **'সেল ফোন'** [cell phone], **'সেল্যুলার রেডিও টেলিফোন'** [cellular radio telephone] ইত্যাদিও বলে। মূলত যে যন্ত্রটিকে আমরা মুঠোফোন বা মোবাইল হ্যান্ড সেট বলি তা একটি রেডিও **'ট্রান্সরিসিভার'** [transceiver] ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ এটা রেডিও তরঙ্গ গ্রহণ ও প্রেরণ এই উভয় কাজ আঞ্জাম দেয়। যন্ত্রটি আবিষ্কারের সময় থেকে বেশ কিছুদিন যাবৎ শুধুমাত্র কথা আদান-প্রদানের কাজে লাগানো হতো- মোটকথা **'তারছাড়া টেলিফোন'** হিসাবে। আজকাল অবশ্য টেলিফোনে কথা বলা, ছবি, ভিডিও, ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান, রেডিও-অডিও-ভিডিও-রেকর্ডিং ইত্যাদি সকল তথ্য রদবদলের যন্ত্রে রূপান্তর হয়েছে, এই একবিংশ শতাব্দির সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত ছোট্ট ইলেকট্রনিক্স এ যন্ত্রটি। আজকাল মোবাইল হ্যান্ড সেট এতো বেশী স্মার্ট হয়েছে, আমরা একে **'মোবাইল কম্পিউটার'** বললেও অত্যুক্তি হবে না মোটেই।

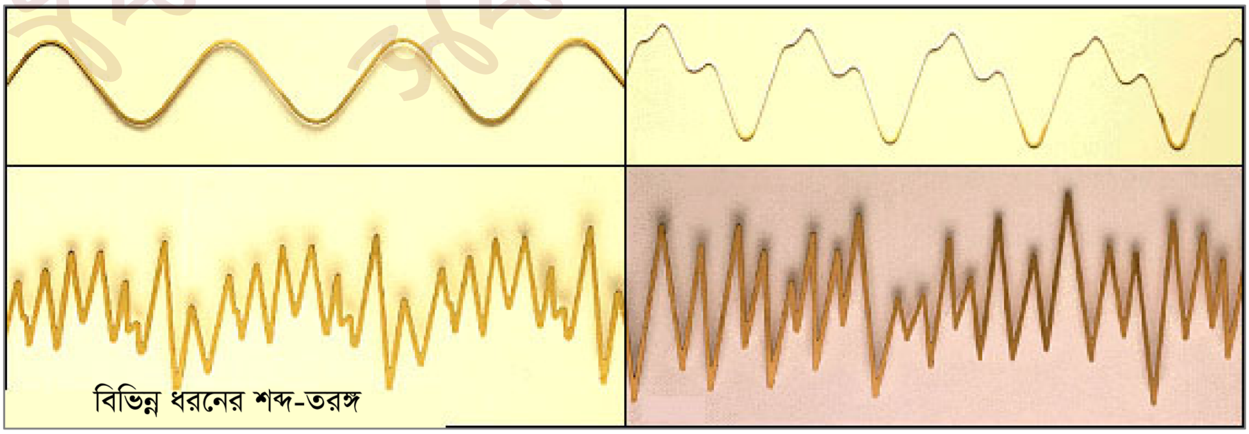
কিভাবে মোবাইল ফোন কাজ করে? এ প্রশ্নের জবাব অতি সহজ! ঐ যে এখানে-সেখানে আমরা মোবাইল টাওয়ার দেখি, এগুলোতে আপনার আমার কথা, ছবি, ভিডিও-অডিও ইত্যাদি মোবাইল সেট থেকে **'ডিজিটেল রেডিও সিগনাল'**-এ রূপান্তর হয়ে চলে যায় প্রথমে। টাওয়ারের **'রিসিভার'** মাইক্রওয়েভ সিগনালের মাধ্যমে এই তথ্য পাঠিয়ে দেয় একটি সেন্ট্রাল সুইচিং স্টেশনে। সেখান থেকে সিগনালটি যে নাম্বারযুক্ত ফোনে যাবে সেখানে পাঠিয়ে দেয়। এ সব কাজই আলোকের গতিতে সাধিত হয়। ফলে আমরা এখান থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম কিংবা ইংল্যান্ড-আমেরিকায় ফোন করলেও খুব একটা সময় অতিবাহিত হয় না যোগাযোগ সৃষ্টি করতে। নীচের চিত্রে বিষয়টি স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো **'ডিজিটেল'** সিগনাল কি?



ডিজিটেল সিগনালঃ শোনা যায়, **'ডিজিটেল বাংলাদেশ'** গড়ার শ্লোগান। আধুনিক কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার আরো বেশী জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়াস এই শ্লোগানের মূল। বিশ্বসমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রাযুক্তিক উন্নয়ন সাধনও এর উদ্দেশ্য। তবে কোন্ কারণে ডিজিটেল শব্দটির প্রয়োগ?

শব্দটির অর্থ, **'সংখ্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত'**। **'সাংখ্যিক'** শব্দটি মূল ইংরেজী শব্দের অর্থের কাছাকাছি। উচ্চ-প্রযুক্তিতে যখন ডিজিটেল শব্দের ব্যবহার হবে তখন বুঝতে হবে, সংখ্যাস্বরূপ ইলেকট্রিকেল সিগনাল। কম্পিউটার বিজ্ঞানে শূন্য (০) ও এক (১) এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই দু'টি মাত্র **'ডিজিট'** [সংখ্যা] দ্বারা তৈরী হয় সকল সংখ্যা- যার অপর নাম বাইনারি সিস্টেম। কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা ০-কে ইলেকট্রিক সুইচ **'অফ'** ও ১-কে **'অন'** হিসাবে নির্দিষ্ট করেছেন। কম্পিউটারে যাবতীয় তথ্য- ছবি, বর্ণ, অডিও-ভিডিও ইত্যাদি সবই এই দু'টি সংখ্যার মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়। সুতরাং কম্পিউটিংয়ের যাবতীয় তথ্যাদি মূলত **'ডিজিটেল সিগনাল'**। আধুনিক যুগে কম্পিউটারের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় সব ধরনের ইলেকট্রনিক সিগনাল মূলত ডিজিটেল। এটা নিম্নে আলোচিত **'এনালগ সিগনাল'** থেকে অনেকটা উন্নতমানের। ফলে আধুনিক টেলিভিশন ট্রান্সমিশন ও মোবাইল ফোনসহ যাবতীয় টেলিযোগাযোগ সিস্টেমে ব্যবহৃত হচ্ছে **'ডিজিটেল সিগনাল'**। অবশ্য শব্দতরঙ্গসহ অধিকাংশ **'ইলেকট্রমেগনেটিক সিগনাল'** মূলত এনালগ সিগনাল। ডিজিটেল টেকনোলজি এসব সিগনালকে ডিজিটেল সিগনালে রূপান্তর করে। ডিজিটেল তথ্যাদি অতিরিক্ত দ্রুত গতিতে প্রেরণ করা যায়। অবশ্য ডিজিটেল সিগনাল **'বুঝে'** এমন প্রাপকযন্ত্রও দরকার।

এনালগ সিগনালঃ বাস্তব **'ফিজিক্যাল'** সিগনাল। যেমন, ইলেকট্রিক কারেন্ট, ভলটেজ, শব্দতরঙ্গ ইত্যাদি। কেউ যখন কথা বলে, বাতাসের মধ্যে চতুর্দিকে শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গটি নির্দিষ্ট গতিতে [কক্ষতাপে এই গতি হলো ৩৪৪ মিটার/সেকেন্ড (১১২৯ ফুট/সেকেন্ড)] চলন্ত হয়ে শ্রোতার কানের পর্দায় কম্পন শুরু করে। এভাবেই শ্রবণ সম্ভব হয়। যে সিগনালের মাধ্যমে শব্দতরঙ্গ চলে তা মূলত **'এনালগ সিগনাল'**। নীচের চিত্রটি দেখুন। এনালগ সিগনালকে প্রয়োজনে ডিজিটেল এবং ডিজিটেল সিগনালকে এনালগে রূপান্তর করা হয় বিভিন্ন যন্ত্রাদি দ্বারা। যেমন কম্পিউটারের মডেম। শব্দটি মূলত দু'টি ইংরেজী শব্দের সংক্ষেপ- **'modulation'** ও **'demodulation'**। প্রথমটির অর্থ পরিবর্তন ও দ্বিতীয়টির অর্থ মূলে ফের পরিবর্তন। কম্পিউটারে **'বুঝে'** এমন তথ্যকে বলে **'ডিজিটেল সিগনাল'**। সুতরাং যে কোন এনালগ [বাস্তব] সিগনালকে মডেমের মাধ্যমে পরিবর্তন করে ডিজিটেল সিগনাল বানাতে হবে। অনুরূপ প্রয়োজনে ডিজিটেল সিগনালকে এনালগে পরিবর্তন করার কাজও এই মডেম দ্বারা সম্ভব।


বিভিন্ন ধরনের শব্দ-তরঙ্গ

৩. প্রিন্টিং প্রেস: আপনারা অনেকেই নিশ্চয় প্রিন্টিং প্রেস দেখেছেন। সংবাদপত্র, বই-পুস্তক, ম্যাগাজিন ইত্যাদি সকল **'প্রিন্ট মিডিয়া'** মূলত এই প্রেসের উপর নির্ভরশীল। ঠিক কিভাবে এই প্রেস কাজ করে?

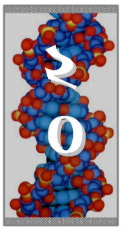
প্রিন্টিং প্রেস মূলত প্রিন্টিং প্লেটে অঙ্কিত **'ইমেজ'** কাগজে ছাপ দেওয়ার একটি যন্ত্র। আমাদের ধারণায় ঈসায়ী ষষ্ঠদশ শতকে আবিস্কৃত এই যন্ত্রটি আধুনিক যুগের **'আকারসৃষ্টির'** কয়েকটির একটি। কারণ এই প্রেস না থাকলে কোটি কোটি বই-পুস্তক ও সংবাদপত্র থাকতো না। যাক, প্রাথমিক যুগে প্রিন্টিং প্রেসে ঘণ্টায় ২৫০টি ছাপ দেওয়া যেতো মাত্র। আধুনিক যুগে হাইডেলবার্গ, কমোরি, সলনা ইত্যাদি উন্নতমানের ইলেকট্রিক প্রেসে ঘণ্টায় বিশ হাজার পর্যন্ত ছাপ দেওয়া সম্ভব। এছাড়া রঙিন প্রিন্টিং কাজের জন্য এক থেকে ছয় রঙের পর্যন্ত মেশিন আছে। এগুলো একসঙ্গে পূর্ণ রঙিন ছাপার কাজ করতে পারে।

কম্পিউটার দ্বারাও অল্পমাত্রার রঙিন ও সাদাকালো প্রিন্টিং কাজ করা যায়। এসব প্রিন্টার মূলত **'লেইজার'** ও **'ইংকজেট'** হয়ে থাকে। এছাড়া সাদাকালো কাজের জন্য লেইজার প্রিন্টার দ্বারা **'ট্রেসিং পেপারে'** প্রিন্ট করা হয় যা থেকে প্রিন্টাররা প্রিন্টিং প্লেট তৈরী করতে পারেন।

প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা! আজকের লেকচারের ইতি এক্ষুণি টানবো। যাবার আগে বলে রাখি, আগামী দু'টি লেকচারে বাকী ১২টি যন্ত্রের উপর কিছুটা আলোচনা করার আশা রাখি। পরের লেকচারে দেখা হবে। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বক্তৃতা ২০ : আধুনিক প্রযুক্তি

আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ! আধুনিক বিজ্ঞানের উপর তথ্যমূলক আলোচনাসর্বস্ব এই বিশেষ লেকচারে আবারো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। গত লেকচারে বিজ্ঞানের সফল নির্যাস **'আধুনিক টেকনোলেজি'**র উপর আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা শুরু করেছি। সংক্ষিপ্ত বলার কারণ, যেসব যন্ত্রাদি এই আলোচনায় কাভার করবো তাদের উপর শুধুমাত্র ন্যুনতম কিছু তথ্য তুলে ধরা ছাড়া গভীরে যেয়ে তলিয়ে দেখা এ প্রসঙ্গে সম্ভব নয়। আজকের লেকচারে ভূমিকা স্বরূপ আলোচনা করবো এ যুগের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রের উপর। যেমন: পকেট কালক্যুলেটার, যান্ত্রিক যানবাহন ও উড়োজাহাজ।

৪. পকেট কালক্যুলেটার

এগুলো সত্যিই পকেটের বস্তু। তবে এদের বিচরণ এখন মোবাইল হ্যান্ডসেট, হাতঘড়ি, কম্পিউটার ইত্যাদিতে বিস্তৃত। কালক্যুলেটারে কি করে তা আমরা সবাই জানি। সাধারণ যোগ, বিয়োগ, ভাগ ও পূরণ অঙ্ক ছাড়াও এই যন্ত্রটি বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক হিসাব-নিকাশে ব্যবহৃত হয়। বাস্তবে এটি একটি কম্পিউটারও বটে- যদি আমরা হিসাবযন্ত্র অর্থে কম্পিউটারকে গ্রহণ করে নিই। কম্পিউটারকে ঠিক কালক্যুলেটারের মতো নেপথ্যে অনবরত হিসাব তথা অঙ্ক কষতে হয়। এরপর আপনার ইচ্ছেমাফিক ডিসপ্লে বা স্ক্রীনে ফলাফল দৃশ্যত হবে। যেমন: লেখা, ছবি, চলচিত্র, খেলা, গ্রাফিক্স, শব্দ ইত্যাদি।

প্রাথমিক যুগে মানে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কালক্যুলেটার মাত্র ক'টি সাধারণ হিসাবের কাজ সারতো। কিন্তু আজকাল সত্যিই এসব যন্ত্র অনেক গুরুত্বপূর্ণ হিসাব করতে সমর্থ। কোনো কোনো যন্ত্রের মাধ্যমে গাণিতিক উচ্চ

পর্যায়ের হিসাব-নিকাশ সম্ভব। এসব যন্ত্রকে **'সাইন্টিফিক কালক্যুলেটার বলে'**। আধুনিক ডিজিটেল কালক্যুলেটার কিভাবে কাজ করে তা এবার কিছুটা তলিয়ে দেখা যাক।



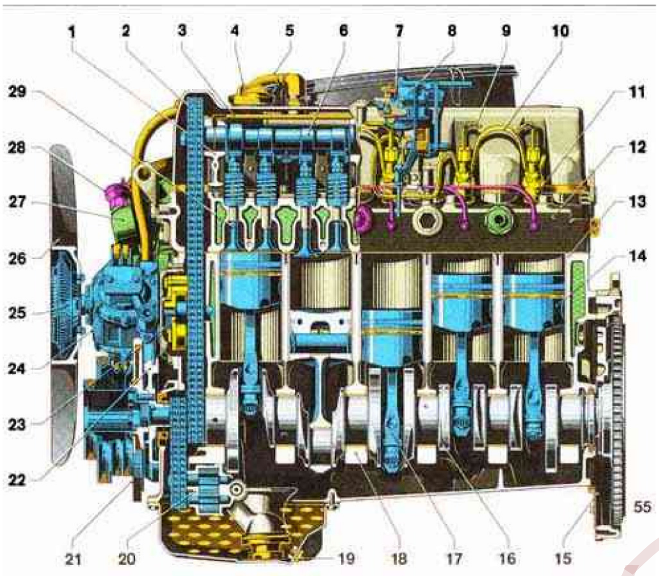
বর্তমানে প্রাপ্ত কালক্যুলেটার মূলত **'মাইক্রপ্রসেসর'** [microprocessor] দ্বারাা চালিত। **১৯৭১** সালের ফেব্রুয়ারী মাস। আমেরিকায় প্রকাশিত **'ইলেকট্রনিক ডিজাইন'** ম্যাগাজিনে রিপোর্ট বেরুলো, কালিফোর্নিয়ার মাউন্টেন ভিউয়ে ইন্টেল কর্পোরেশন **'বিজিকম'** নামক আমেরিকান কালক্যুলেটার তৈরী প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি **সিঙ্গুল-চীপ সেন্ট্রাল মাইক্রপ্রসেসর ইউনিট** উদ্ভাবন করেছে। জন্ম নিলো প্রথম সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট [central processing unit - CPU]। পরবর্তীতে এই ইউনিট থেকেই উদ্ভাবন হয় আজকের বিশ্বের সর্বত্র ব্যবহৃত পার্সোনাল পিসি ও ল্যাপটপ কম্পিউটার। এই ইউনিটে মূলত লক্ষ লক্ষ **'ট্রানজিস্টার'** [transistor] - বা **ইলেকট্রনিক সুইচ** আছে। এগুলো সিলিকন নামক বস্তুর তৈরী এবং আয়তনে অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায়। কালক্যুলেটার [বা কম্পিউটারের] কিবোর্ডের বোতাম টিপে সিগনাল প্রেরণ করা হয় এই চীপে। সিগনাল প্রসেস বা হিসাব করে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বের করা এর কাজ। ইলেকট্রনিক সিগনাল আলোকের গতিতে চলে তাই যাবতীয় প্রসেসিং অতি দ্রুত সম্পাদিত হয়। নীচে একটি আলট্রা-পাতলা চীপ দেখানো হলো।



৫. যান্ত্রিক যানবাহন

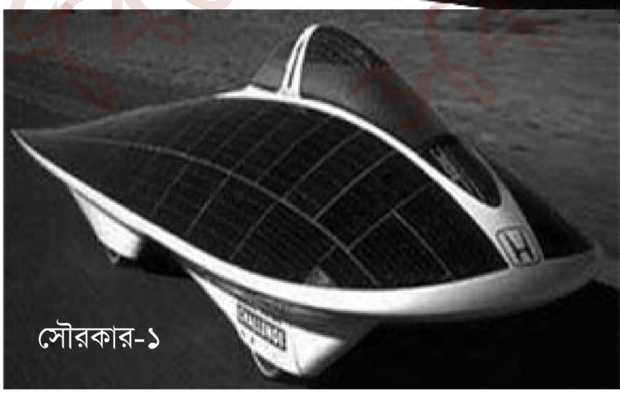
এ যুগে কে আছেন যিনি কোনো দিন গাড়ি চড়েন নি? এক দু'জন থাকতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ- বরং বলবো, ৯৯ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনো যানবাহনের আরোহী হয়েছেন দ্রুত চলে যেতে এক স্থান থেকে অপরটিতে। আধুনিক যুগে কার, বাস, ট্রেন ইত্যাদি জমিনের উপর চলমান যানবাহন দ্বারা সমগ্র পৃথিবীব্যাপী মানুষ কতটুকু উপকৃত হচ্ছে তা ভাষায় বুঝিয়ে বলা যাবে না। সামাজিক জীবী হিসাবে মানুষ সর্বদাই মানুষের কাছে বিভিন্ন কারণে যাতায়াত করে থাকে। যাতায়াত ব্যবস্থা এক সময় শুধু পায়ে হেঁটে সম্ভব ছিলো। ঘোড়াকে যাতায়াতের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে অনেক যুগ ধরে। এরপর আবিস্কৃত হলো চাকা। তারপর গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি। আর এখন যন্ত্র-চালিত কৃত্রিম যানবাহন সকলের সুবিধার্থে পুরো বিশ্বজুড়ে গড়েওঠা এক দু' মাইল থেকে হাজার হাজার মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ পাকা রাস্তা-নেটওয়ার্কে প্রতি মুহূর্তে চলমান আছে। যানবাহনের ইঞ্জিন আবিষ্কার যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। যে ইঞ্জিনের মাধ্যমে সব ধরনের যানবাহন যেমন: প্রাইভেট কার, ট্রাক, বাস, লরি, কোচ ইত্যাদি চালিত তা মূলত একই ধরনের। এই ইঞ্জিনের নাম **'ইন্টারনেল কমবাস্শন ইঞ্জিন'** [internal combustion engine]। নীচে (পরের পৃষ্ঠায়) একটি ইঞ্জিনের চিত্র তুলে ধরেছি।

ইঞ্জিনের কাজ হলো পেট্রোল বা গ্যাসকে গতি-এনার্জিতে রূপান্তর। পেট্রোল বা গ্যাস মূলত কেমিকেল এনার্জি সূত্র। এগুলো ইঞ্জিনের জ্বালানি বা ফিউল [fuel]। কমবাস্শন অর্থ পুড়ানো। ইঞ্জিনের অভ্যন্তরে তা পুড়ে বলে একে অভ্যন্তরীণ বা ইন্টারনেল কমবাস্শন বলে। এখানে ইঞ্জিনের প্রযুক্তি বুঝিয়ে বলা আদৌ সম্ভব নয়। তবে দু'টি ব্যাপার



মনে রাখা উচিৎ: ১. কয়েক ধরনের ইন্টারনেল কমবাস্‌শন ইঞ্জিন আছে যেমন: ডিজেল, গ্যাস টারবাইন, টু স্ট্রোক, ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিন ইত্যাদি। ২. এক্সটারনের কমবাস্‌শন [external combustion engine] ইঞ্জিনও আছে। যেমন: স্টীম ইঞ্জিন। আগের যুগের [এবং আমাদের দেশে এখনো ব্যবহৃত] ট্রেন, স্ট্রীমার, লঞ্চ, জাহাজ ইত্যাদিতে এই ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়েছে। এই ইঞ্জিনের বৈশিষ্ট্য হলো জ্বালানি মূল ইঞ্জিনের বাইরে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ কার, বাস ইত্যাদি চাকা-চালিত যানবাহনের ইঞ্জিন মূলত চার-স্ট্রোক ইঞ্জিন।



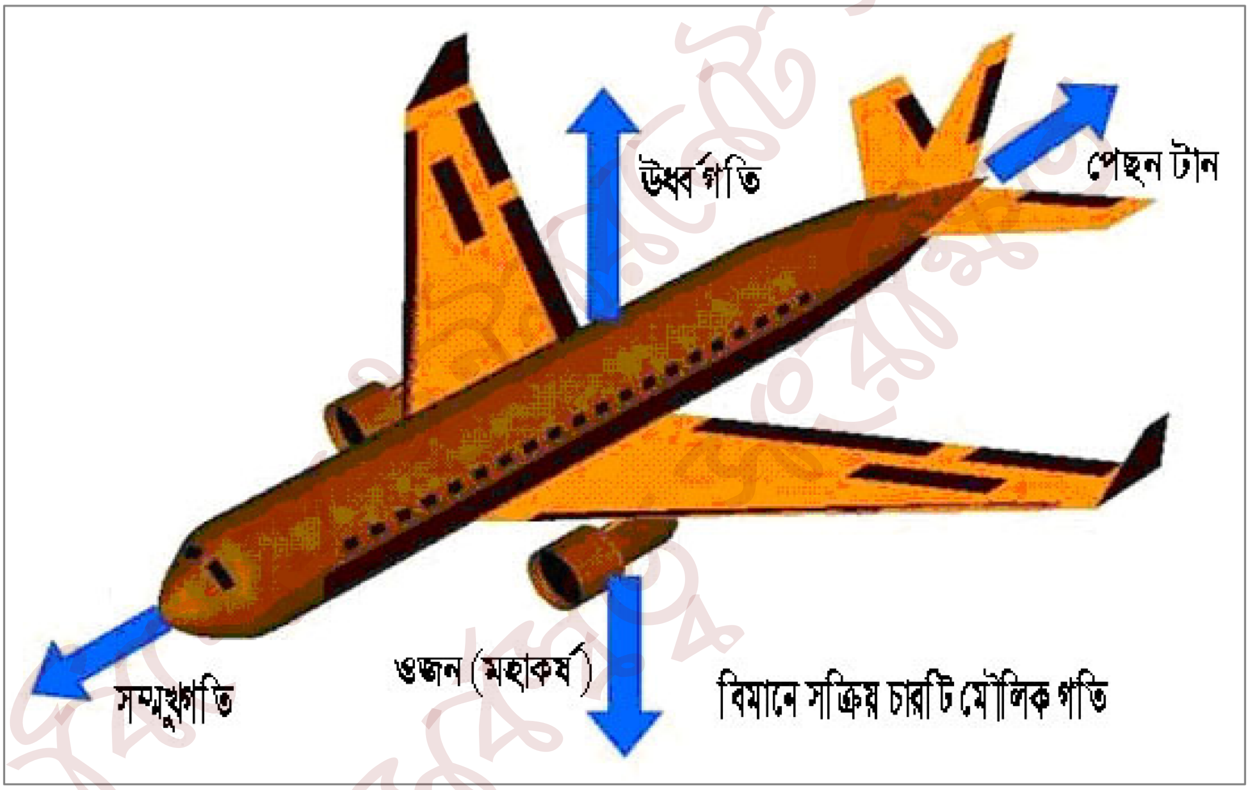


সৌরকার-১



৬. উড়োজাহাজ

আপনারা কেউ উড়োজাহাজ কি তা জানেন না, এ ধারণা করাই হবে উদ্ভট! তবে ঠিক কিভাবে এ যুগের আন্তর্জাতিক ও আন্তঃমহাদেশ যাতায়াতের দ্রুততম উড়োযন্ত্র **'এয়ারপ্লেন'** [airplane] কাজ করে তা হয়তো সবাই অবগত নন। সুতরাং বিজ্ঞানের নির্যাস তথা প্রযুক্তির উপর এই আলোচনায় অতি সংক্ষেপে উড়োজাহাজ প্রযুক্তির মৌলিক দিকগুলো তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি। মোট চারটি মৌলিক শক্তি বিমানে সক্রিয় থাকে। এগুলো হলো: ৭.ক. ওজন [weight- মহাকর্ষ], ৭.খ. উর্ধ্বগতি [lift], ৭.গ. পেছন টান [drag] ও ৭.ঘ. সম্মুখগতি [thrust]। এ শক্তিগুলো কিভাবে সক্রিয় থাকে তার ব্যাখ্যা এখন সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরছি। নীচের চিত্রটিও দেখুন।



৭.ক. ওজন [weight- gravity]: এ শক্তিটি মূলত মহাকর্ষ। এটি সর্বদা পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে ধাবিত। মহাকর্ষ থেকে মুক্ত কোনো বস্তু এ জগতে নেই। বিমানের উপর এ শক্তিটি সর্বদাই সক্রিয় থাকে। যদি বিপরীত কোনো উর্ধ্বগতি সৃষ্টি করা না হয় তাহলে বিমানটি আকাশে উড়ন্ত থাকবে না। পুরো বিমানের যাবতীয় বস্তুর [প্যাসেঞ্জার ও তাদের মালপত্রসহ] সমষ্টি হলো তার ওজন। ওজন বেশী- নিম্নদিকে মহাকর্ষের গতিও বেশী। ওজনজণিত গতি সর্বত্র থাকলেও আকাশে উড়ান্তবস্থায় বিমানের মধ্যে এই গতি তার **'সেন্টার অব গ্রাভিটি'** [center of gravity] বা মহাকার্ষিক কেন্দ্রের মধ্যে পঞ্জীভুত থাকে। এই পয়েন্টের উপর ভিত্তি করেই বিমানখানা উড়ন্ত অবস্থায় ঘুরে বা দিগ্‌পরিবর্তন করে।

বিমান উড়ানোতে দু'টি মৌলিক সমস্যার সমাধান সর্বদা আঞ্জাম দিতে হয়: ১. বিপরীতমুখী কোন গতি দ্বারা এই ওজনগতিকে নিষ্ক্রিয় করা। এখানে নিষ্ক্রিয় মানে, সঠিক গতির মাধ্যমে ওজনের শক্তির টানকে নিয়ন্ত্রণে রেখে বিমানটি স্বস্থানে রাখা। ২. উড়ান্তাবস্থায় পুরো বিমানকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। যে গতির মাধ্যমে ওজনগতিকে নিষ্ক্রিয় করতে হয় তার নাম লিফ্‌ট বা ঊর্ধ্বগতি।



পৃথিবীর সর্ববৃহৎ যাত্রীবাহী বিমান: এয়ারবাস-A380

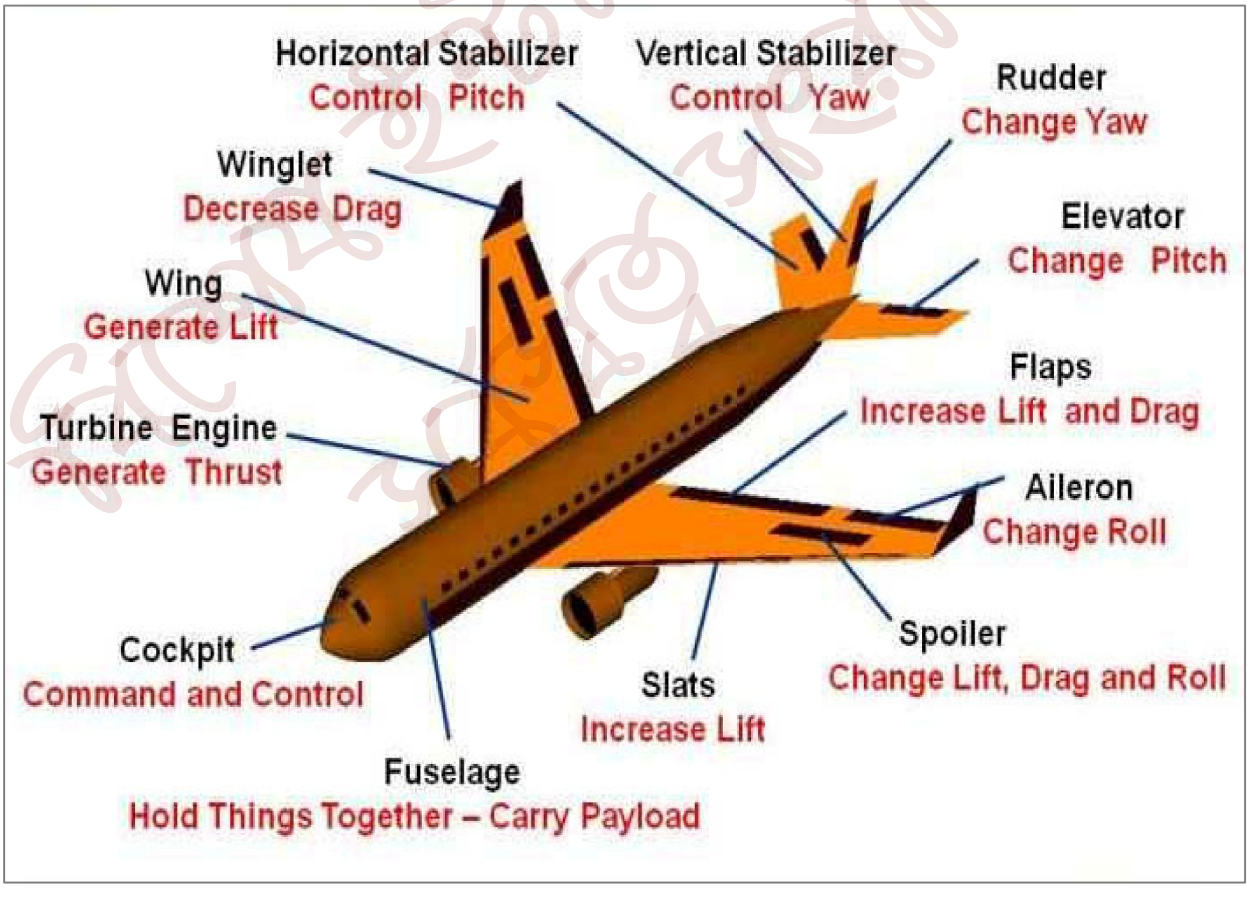
৭.খ. ঊর্ধ্বগতি [lift]: একটি বিমান উড়ন্ত থাকার প্রথম শর্ত হলো তার মধ্যে নীচ থেকে উপরের দিকে সৃষ্টি করতে হবে ফোর্স। এ ফোর্সের নাম লিফ্‌ট বা ঊর্ধ্বগতি। এ গতি দ্বারাই বিমানকে ওজনগতির ক্রিয়া থেকে রক্ষা করা হয়। এই লিফ্‌ট সৃষ্টি করতে হবে বাতাসের উপর উড়োজাহাজের চলন্ত গতি থেকে। একে বলে **'এরোডাইনামিক ফোর্স'** [aerodynamic force]। এখানে **'এরো'** শব্দের অর্থ বাতাস ও **'ডাইনামিক'** শব্দের অর্থ গতি। সুতরাং বাংলায় আমরা এরোডাইনামিক শব্দকে **'বাতাসগতি'** বলে সম্বোধন করতে পারি। বিমানের গতির দিক থেকে ৯০ ডিগ্রী ঊর্ধ্বদিকে এই গতি সর্বদা থাকে। লিফ্‌ট এর পরিমাণ নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর। যেমন: বিমানের আকার, আয়তন, গতি, ওজন ইত্যাদি। বিমানের প্রতিটি অংশই কোনো না কোনোভাবে লিফ্‌ট সৃষ্টিতে সক্রিয় থাকে। তাই বিমান ডিজাইনারদেরকে বাতাসগতির উপর খুব সতর্কতাসহ গবেষণা করতে হয়। তবে অধিকাংশ লিফ্‌ট ফোর্স তৈরী হয় বিমানের উভয় পাখাতে। বিমান উড্ডয়ন, উড়ানো, ঘোরানো, নামানো ইত্যাদি কার্য সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিতে এরোডাইনামিক ডিজাইন একান্ত জরুরী।

৭.গ. পেছন টান [drag]: এই ফোর্সটি মূলত বাতাসগতি থেকে সৃষ্ট। সামনে এগুতে যেয়ে বিমানকে বাতাস ধাক্কা দিতে হবে সর্বদা। এতে সৃষ্টি হয় বিপরীতমুখী গতি- এটাই ড্রাগ বা পেছন টান। ঠিক লিফ্‌ট গতির মতো,

ড্রাগের মাত্রাও নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর। যেমনঃ আকার, আয়তন, দেহের পিচ্ছিলতা, বাতাসের গতি ও আদ্রতা, বিমানের গতি ইত্যাদি।

৭.ঘ. সম্মুখগতি [thrust]: ড্রাগ গতিকে নিষ্ক্রিয় রাখতে দরকার হয় এই শক্তির। এটাই বিমানের ইঞ্জিনশক্তি। আজকাল অধিকাংশ যাত্রীবাহী বিমানের ইঞ্জিন থাকে উভয় পাখার নীচে। বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিন আছে, যেমনঃ টারবাইন, জেট, প্রপেলার ইত্যাদি। জেট ইঞ্জিনে গরম গ্যাস পেছনের দিকে দ্রুত গতিতে বেরিয়ে যায়। ফলে একটি বিপরীতমুখী ফোর্স [প্রতিক্রিয়া শক্তি] সৃষ্টি হয়। এই শক্তিই বিমানের থ্রাস্ট বা সম্মুখগতি।

উপরে বিমানের মধ্যে সক্রিয় চারটি মৌলিক গতির উপর আলোচনা করলাম। তবে একখানা বিমান আকাশে উড্ডয়ন, নিয়ন্ত্রণ, উড়ানো, গন্তব্যে পৌঁছানো, লেন্ডিং ইত্যাদি চাট্টিখানি কথা নয়! যেমনঃ রাডার দ্বারা সর্বদা বিমানের অবস্থান [উচ্চতা, পৃথিবীর কোন্ স্থানে উড়ন্ত, যাত্রাশুরু-বিমানবন্দর ও গন্তব্য-বিমানবন্দরের দূরত্ব ইত্যাদি জানা], উড়ান্তাবস্থায় পাইলট ও ইঞ্জিনিয়ারদের কর্তৃক বিমানখানা চালনা, অনবোর্ড কম্পিউটার দ্বারা অনেক ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। এসব আঞ্জাম দিতে দরকার পড়ে অনেক উচ্চ পর্যায়ের টেকনোলজির। এসব ব্যাপার এ প্রসঙ্গে আলোচনার সুযোগ নেই। তবে আমি আশা রাখি শ্রোতাবন্ধুরা হয়তো এটুকু আলোচনা দ্বারা বিমান প্রযুক্তির উপর কিছুটা ধারণা পেয়ে গেছেন। নীচের চিত্রে একটি বিমানের বিভিন্ন অংশ ও তাদের কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আজকের জন্য এখানেই শেষ। আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ!



বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর শীর্ষক বক্তৃতামালা

বক্তা : ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
Diploma in Science & Technology, England



লেকচার নোট্স

লেকচার নোট্স

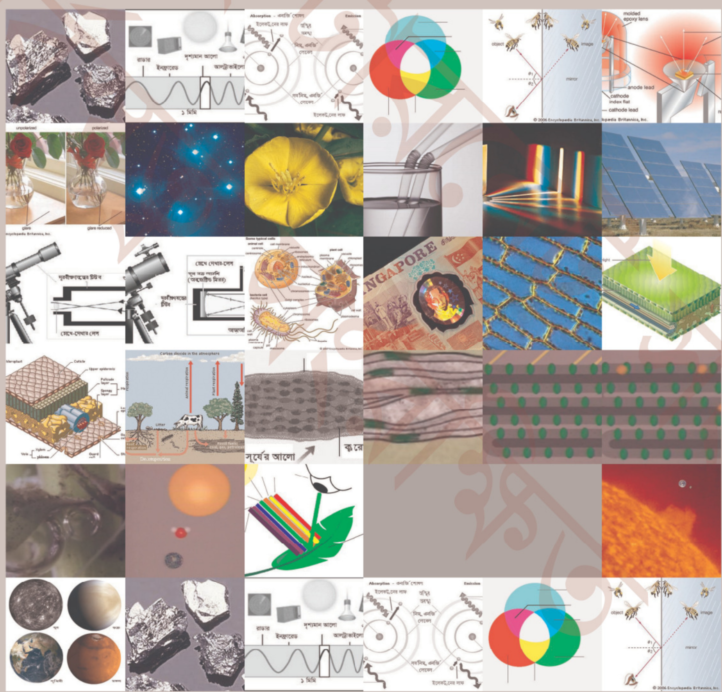
বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর শীর্ষক বক্তৃতামালা

২১-৪১

বক্তা : ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

Diploma in Science & Technology, England

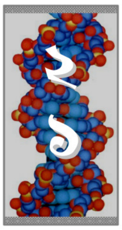


KAA Publication

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার পয়েন্ট, সিলেট।





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বক্তৃতা ২১ : আধুনিক প্রযুক্তি

‘বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান’ লেকচারের একুশতম সংযোজনে সকল শিক্ষার্থী বন্ধুদের উষ্ণ স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা এ লেকচারেও আধুনিক কয়েকটি প্রযুক্তির উপর আলোচনা করবো। বিজ্ঞান শুধু মনের ভেতর জাগ্রত **‘জানার আগ্রহ’** মেটানোর বিষয় নয়। মানবকল্যাণে একে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করার কাজও বিজ্ঞানের। আর এ পদ্ধতির নামই টেকনোলজি বা প্রযুক্তি। যাক, আমরা ইতোমধ্যে ৬টি প্রযুক্তির উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। আমাদের ধারণায় এগুলো ও পরবর্তীতে ব্যাখ্যাত আরো ৮টি আধুনিক প্রযুক্তি আজকের মানব-সভ্যতায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং দূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত রাখবেও। তবে হয়তো প্রতিটি প্রযুক্তি দিন দিন আরো পরিবর্তিত, সংশোধিত ও উন্নততর হবে। অন্তত অতীতের ইতিহাস তা-ই প্রমাণ করে। আজকে আমরা তিনটি বিষয়ের উপর বর্ণনা সীমিত রাখবো। এগুলো হলো: **১. স্থির ও চলচিত্র ক্যামেরা, ২. টেলিভিশন ও ৩. এটম বোমা।**

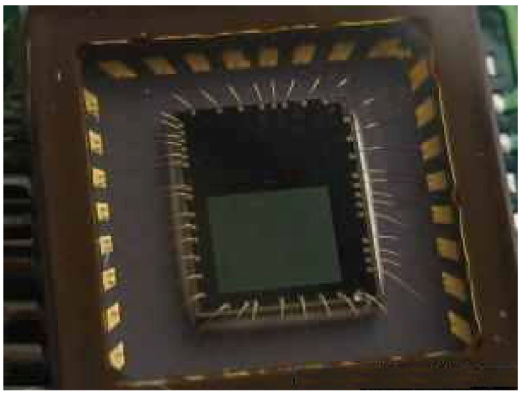
৭. স্থির ও চলচিত্র ক্যামেরা

আজকাল আমাদের মোবাইল সেটে স্থির ও চলচিত্র [**অডিও ও ভিডিও**] রেকর্ড ও প্রদর্শনের সুযোগ হয়েছে। আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে যাই এবং বক্তা বা অনুষ্ঠানের স্থির চিত্র, শব্দ না হয় ভিডিও রেকর্ড করে নিই। এরপর নিজের ল্যাপটপ বা কম্পিউটারে ব্লুটুথ, সরাসরি ইউএসবি পোর্টের সঙ্গে যুক্ত করে কিংবা মেমরী কার্ড সংযুক্ত করে ছবি, অডিও-ভিডিও রেকর্ডিং কপি করে নিই। এখন এগুলো ই-মেইলে বন্ধু-বান্ধবের নিকট পাঠানো বা এমনকি ইন্টারনেটের ওয়েভসাইটে আপলোড [upload] করা যাবে। আধুনিক এই প্রযুক্তির সুফল আমরা ভোগ করছি সবাই। তবে একথা নিশ্চিত, সকলে এই টেকনোলজির মূলে কী আছে তা জানি না। এবার তা উন্মুক্ত হবে- কিন্তু খুব সংক্ষেপে।

আমরা সবাই সাধারণ ক্যামেরা দেখেছি। যে কোনো মুহূর্তকে ছবি আকারে **'ফ্রিজ'** করার যন্ত্র এটি। ক্যামেরার পেছনে ফটোগ্রাফিক ফিল্মে ছবির ছাপ পড়ে আলোকরশ্মি পতিত হয়ে। সামনের **'লেন্স'** দিয়ে দৃশ্য থেকে আলোকরশ্মি প্রতিবিম্ব হয়ে ঢুকে ঐ ফিল্মে পতিত হয়। কতক্ষণ **'শাটার'** [আলোকরশ্মি ভেতরে প্রবেশের সময়নিয়ন্ত্রক] খোলা রাখতে হবে তা নির্ভর করে দৃশ্যের মধ্যে সূর্য বা অন্য কোন সূত্রের অংশুজালের মাত্রার উপর। আকাশের তারাদের ছবি ওঠাতে সময় সময় ঘন্টার পর ঘন্টাব্যাপী শাটার খুলে রাখতে হয়। অপরদিকে সূর্যের তীব্র আলোকরশ্মি দ্বারা উদ্ভাসিত যে কোন সিনারির ফটো ওঠাতে অতি ক্ষুদ্র একটি ক্ষণ মাত্র শাটার খোলা রাখতে হবে- অন্যথায় ফিল্ম জ্বলে যাবে। এ পর্যন্ত ছবি ওঠানোর প্রযুক্তি যেটুকু বুঝিয়ে বলেছি, তাহলো **'ট্রেডিশনাল'** ছবি উত্তোলন কৌশলের অন্তর্গত। আজকাল এরূপ ক্যামেরার ব্যবহার তেমন নেই। এ যুগের ক্যামেরা মূলত **'ডিজিটেল'** টেকনোলজির উপর নির্ভরশীল। তা-ই এ নাম: ডিজিটেল ক্যামেরা।



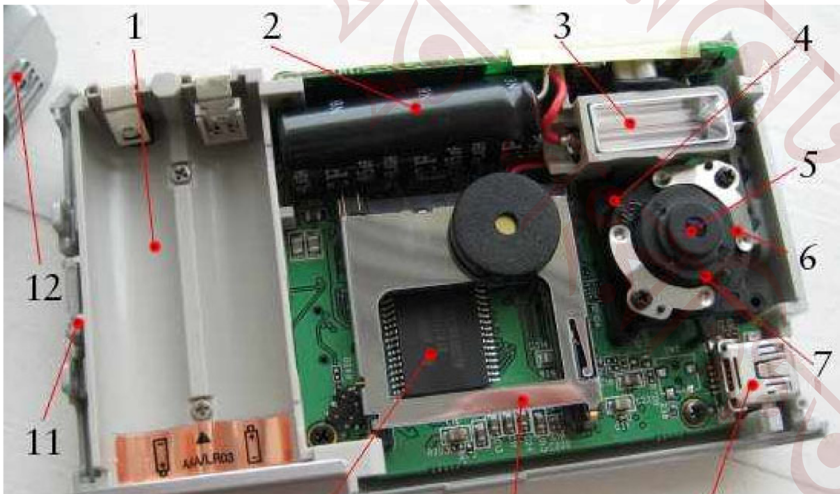
আমরা কোনো এক লেকচারে বলেছি, ডিজিট [digit] শব্দের অর্থ সংখ্যা। উপরে বর্ণিত সাধারণ আলোক-ক্যামেরা দ্বারা ফটোগ্রাফিক ফিল্মে যে ছবি সংরক্ষিত হয় তা মূলত আলোকরশ্মির রঙের মধ্যে ঔজ্জ্বল্যতা ও আঁধারের ছাপ। কিন্তু ডিজিটেল সংরক্ষণ হলো এই একই জিনিস সংখ্যা হিসাবে ধরে রাখা ইলেকট্রনিক উপায়ে। ঠিক সাধারণ লাইট-ক্যামেরার মতো ডিজিটেল ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি ওঠানোর সময় সামনের লেন্সের দ্বারা দৃশ্যের আলো ভেতরে ঢুকাতে হবে। এ পর্যন্ত প্রযুক্তি সাধারণ ফিল্ম-ক্যামেরা থেকে ভিন্ন কিছু নয়। আপনি বোতামে টিপ দিলেন, দৃশ্যের ছবি থেকে আগত আলোকরশ্মি ক্যামেরার অভ্যন্তরে চলে গেল। কিন্তু এই আলোক-দৃশ্য এবার কিভাবে সংরক্ষণ হবে, সেখানে কিন্তু বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। আর এটাই হলো ডিজিটেল প্রযুক্তির কাজ। একখণ্ড ইলেকট্রনিক যন্ত্র আছে যার কাজ হলো এই আলোকরশ্মিকে **'ইলেকট্রিকেল সিগনালে'** [electrical signal] পরিবর্তন করা। এ যন্ত্রটির নাম **'চার্জ-কাপল্ড ডিভাইস'** [charge-coupled device -CCD]। নীচে একটি আধুনিক 'CCD' চীপ দেখানো হলো।



টিভি'র স্ক্রীন কিংবা ল্যাপটপ কম্পিউটারের ডিসপ্লে স্ক্রীনে কিভাবে আমরা ছবি, লেখা ইত্যাদি দেখি? খুব মেগনিফাই বা বড় করে ছবি বা লেখার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো এগুলো মূলত বিভিন্ন ঔজ্জ্বল্যতায় সৃষ্ট অতি ক্ষুদ্রকায় সমচতুর্ভুজ মাত্র- যার নাম **'পিক্সেল'** [pixel]। এরূপ হাজার হাজার পিক্সেল মিলে ছবি তৈরী করে। খুব দ্রুত এসব পিক্সেল **'অন-অফ'** হতে থাকে- যা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না- দ্রুততার কারণে। সিসিডি চীপ ক্যামেরায় প্রবেশ-হওয়া অংশুজালকে [**বা ছবিকে**] কয়েক মিলিয়ন

পিক্সেলে ভেঙ্গে ফেলে। প্রতিটি পিক্সেলের বিভিন্ন রঙ ও ঔজ্জ্বল্যতাকে একেকটি সংখ্যা [**০ ও ১** এর সমন্বয়ে সৃষ্ট বাইনারি (দু'টি বেইজের)] হিসাবে সংরক্ষণ করে রাখে। এই ক্রিয়ার নামই সিগনালকে **'ডিজিটাইজ'** [**সংখ্যায় পরিবর্তন**] করা। এর কারণ কি? কারণ অনেক। এভাবে বাইনারি সংখ্যায় পরিবর্তন হওয়ার ফলে সংরক্ষিত তথ্য অতি সহজে আধুনিক সকল ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রেরণ ও প্রদর্শন অনেকটা সহজ, পরিষ্কার ও অপরিবর্তিত অবস্থায় সম্ভব হয়। মূল সিগনাল বা তথ্য ছিলো **'এ্যানালগ'**। সিসিডি তা পরিবর্তন করে **'ডিজিটেল'** বানালো।

সিসিডি কর্তৃক সংরক্ষিত ডিজিটেল **'ছবি'** আপনি কম্পিউটারে নিয়ে আসতে পারেন। কম্পিউটার এই তথ্যকে প্রদর্শন করবে ছবি হিসাবে। এরপর আপনি লেইজার বা অন্য কোনো প্রিন্টার দ্বারা তা কাগজে প্রিন্ট করতে সক্ষম হবেন। আপনি এই ছবিকে যতোদিন প্রয়োজন কম্পিউটারের মেমোরীতে সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন। ডিজিটেল ক্যামেরার মাধ্যমে অবশ্য শুধুমাত্র স্থির ছবি নয়, চলচিত্র বা ভিডিও ফিল্মও করতে পারেন। ডিজিটেল টেকনোলজি আজকের ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাদির **'ভাষা'**। এই ভাষায় প্রায় সব যন্ত্রাদি, যেমন: মোবাইল সেট, কম্পিউটার, রেডিও ও টিভি ইত্যাদি তথ্য আদান-প্রদান করে। আপনার সংরক্ষিত ছবি বা ভিডিও কম্পিউটারের বিভিন্ন ছবি-সংস্কার সফ্‌টওয়ার দ্বারা অতি সহজে উন্নততর করতে পারেন। যেমন: ফটোশপ নামক প্রোগ্রাম দ্বারা ছবির ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে ইচ্ছা করলেন। কমান্ড প্রেরণ করার পর সফ্‌টওয়ার সংরক্ষিত ডিজিট বা সংখ্যার মধ্যে রদবদল করবে মাত্র। অনুরূপ ছবি ঘুরানো, আয়তন বৃদ্ধি ইত্যাদি অনেক ধরনের সংস্কার কাজে সফ্‌টওয়ার সংশ্লিষ্ট সংখ্যার উপর রদবদল ঘটাবে- এতেই আপনার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আসবে। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে, ডিজিটেল তথ্য নিয়ে সংস্কার কাজ, সংরক্ষণ, প্রেরণ, প্রিন্ট, প্রাপ্তি ইত্যাদি সবই সহজভাবে সম্ভব। নীচের চিত্রে একটি ডিজিটেল ক্যামেরার অভ্যন্তর দেখাচ্ছে।



১. ব্যাটারির স্থান, ২. ফ্লাস-কেপাসিটর, ৩. ফ্লাসের বাতি, ৪. আলো-নির্গতকারী-ডায়োড [LED], ৫. লেন্স, ৬. ফোকাসযন্ত্র, ৭. সিসিডি [CCD], ৮. ইউএসবি [USB] পোর্ট, ৯. নিরাপদ ডিজিটেল কার্ড ঢুকানোর স্লট, ১০. প্রসেসর চীপ, ১১. কব্জি সংযুক্তিকারক এবং ১২. উপরস্থ কেইস।

৮. টেলিভিশন

টিভি- আমরা পছন্দ করি বা না- সহজে চলে যাবে না ড্রইং কক্ষ থেকে। অতীতে টিভি কাজ করতো কেথড-রে-টিউবের [cathode-ray tube] মাধ্যমে। অবশ্য এখনো, বিশেষ করে আমাদের দেশে এসব পুরাতন স্টাইলের টিভি সেট ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব টিভি **'এ্যানালগ'** সিগনালের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু অত্যাধুনিক টিভির সিগনাল মূলত **'ডিজিটেল'** প্রযুক্তিনির্ভর। আশারাখি শিক্ষার্থীরা ডিজিটেল সিগনাল বলতে কী বুঝায় তা এখন পুরোদমে বুঝে নিয়েছেন। আমরা এ লেকচারের শুরুতেও এ সম্পর্কে বলেছি। **'কেথড-রে টিউব টিভি'**র চলচিত্র বনে শূন্যস্থান-

টিউবের [vacuum tube] মাধ্যমে। এ সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু বলার দরকার নেই- কারণ, আজ থেকে দু'চার বৎসর পর এ ধরনের টিভি মিউজিয়াম-পিস হিসাবেই থাকবে মাত্র। ডিজিটেল টিভি কিভাবে কাজ করে তা কিন্তু বুঝার ব্যাপার আছে। এখন তা-ই বুঝানোর চেষ্টা চালাবো। তাওফিকদাতা আল্লাহ তা'আলা।

আমাদের চক্ষু ও ব্রেন: টিভি স্ক্রীনে যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু তৈরী হয় তাকে বলে পিক্সেল। এগুলো আলোকরশ্মি দ্বারা সৃষ্ট। ইলেকট্রমেগনেটিক সিগনালের মাধ্যমে টিভি প্রেরকযন্ত্র থেকে আগত ডিজিটেল সিগনাল অনবরত টিভির পর্দায় পিক্সেল হিসাবে জ্বলতে-নিভতে থাকে। আমরা দর্শকের চোখে এসব পিক্সেলের আলোকরশ্মি পতিত হয়ে ব্রেনে চলে যায়। সেখানে এসব পিক্সেল থেকে সৃষ্টি হয় পরিচয়মূলক **'ছবি'**। ফলে আমরা দেখি। প্রতি সেকেন্ডে টিভি সেট এসব ছবি শত শতবার রেফ্রেশ বা পুনঃসৃষ্টি করতে থাকে। এই রদবদল আমাদের চোখে ধরা পড়ে না- বেশী দ্রুত হওয়ায়। ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, চিত্রের মধ্যে গতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ চলচিত্র প্রদর্শিত হয়। কিন্তু আসলে প্রতিটি পিক্সেল একেকটি **'স্থির'** চিত্র। দ্রুত রদবদল হওয়ায় এগুলো ভিডিও সিগনাল হিসাবে দৃশ্যমান হয়। ভিডিও সিগনালকে আস্তে আস্তে চলন্ত করলে এই সত্যটি ধরা পড়ে। ফ্রেম-বাই-ফ্রেম এই রদবদল দেখতে পাওয়া যায়।

ক্যামেরা থেকে টিভির স্ক্রীনে: অধিকাংশ টিভি ক্যামেরা ৩টি মৌলিক জিনিসের উপর নির্ভরশীল। এগুলো হলো: ১. দৃশ্য গ্রেফতারের জন্য একটি অপটিকেল সিস্টেম [optical system], ২. ইলেকট্রনিক সিগনালে দৃশ্য রূপান্তরের জন্য একটি পিকাপ যন্ত্র [pickup device] এবং ৩. একটি এনকোডার যন্ত্র [encoding device] যাতে, এই সিগনালকে সম্প্রচার করা যায়। আমরা এখনই খুব সংক্ষিপ্তভাবে এ তিনটি পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করবো।



১. অপটিকেল সিস্টেম [optical system]: অপটিকেল শব্দ আলোকবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যে কোনো দৃশ্য থেকে আলোকরশ্মি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। টিভি ক্যামেরার উদ্দেশ্য হলো এই রশ্মিকে অনবরত গ্রেফতার করে প্রযুক্তির মাধ্যমে ঘরে ঘরে টিভির পর্দায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা। অপটিকেল সিস্টেমে আছে লেন্স, প্রিজম ও আয়না। সামনের দৃশ্যকে ফোকাসে আনতে এসব বস্তু ব্যবহৃত হয়। আলোকরশ্মিকে এই সিস্টেম তিনটি মৌলিক রঙ তথা লাল, নীল ও সবুজ আলোতে আলাদা করে। উল্লেখ্য এই তিন রঙের আলো প্রয়োজনমাফিক মিশ্রণ করে যে কোন রঙের ছবি তৈরী সম্ভব।

২. পিকাপ যন্ত্র [pickup device]: এটির কাজ হলো দৃশ্যকে ইলেকট্রিক সিগনালে রূপান্তর। কারণ, সিগনালে রূপান্তর ছাড়া দৃশ্যকে আলোকের গতিতে প্রেরণ আদৌ সম্ভব নয়। ইতোমধ্যে আলোচিত সিসিডি [**চার্জড-কাপল্ড ডিভাইস**] যন্ত্র দ্বারা দৃশ্যকে সিগনালে রূপান্তর করা হয় সাংখ্যিকভাবে। অর্থাৎ ক্যামেরার সামনের দৃশ্য থেকে প্রাপ্ত আলো এই যন্ত্রে এতে পতিত হয়। এরপর এটা একে ডিজিটেল সিগনালে পরিবর্তন করে।

৩. এনকোডার যন্ত্র [encoding device]: পিকাপ যন্ত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত সিগনালকে কোডিং করতে হবে। এর অর্থ হলো টিভির রিসিভার যন্ত্রের জন্য প্রস্তুত করা। ফলে প্রাপ্ত ইলেকট্রনিক তথ্য পুনরায় ছবিতে পরিবর্তন সম্ভব হয়।



দেওয়ালে ঝুলন্ত 'চেপ্টা-স্ক্রীন সিনেমা-টিভি'

সিগনাল সম্প্রচার: ক্যামেরায় ধারণকৃত টিভি সিগনালকে সম্প্রচার [transmit] করতে হবে। এ কাজটি আঞ্জাম দেয় প্রেরকযন্ত্র [transmitter]। ইলেকট্রনিক টিভি সিগনালকে এটি তৈরী করে চলন্ত [carrier wave] তরঙ্গে। টিভি সিগনালে থাকে দু'টি অংশ: **চলচিত্র ও শব্দ**। প্রেরকযন্ত্র এ দু'টি সিগনালকে যথাক্রমে আমপ্লিটিউড মডুলেশন [amplitude modulation] ও ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন [frequency modulation] দ্বারা প্রস্তুত করে। এ উভয় কাজ কিভাবে হয় তা বুঝিয়ে বলা আদৌ সম্ভব নয় এ লেকচারে। সংক্ষেপে এর অর্থ হলো সিগনালকে উন্নততর করা। সিগনাল চলন্ত করার জন্য এটা জরুরী। উন্নততর করার পর উভয় সিগনাল একত্রিত করে তৈরী হয় একটি ক্যারিয়ার ওয়েভ। এতে থাকে ভিডিও ও অডিও সিগনাল।

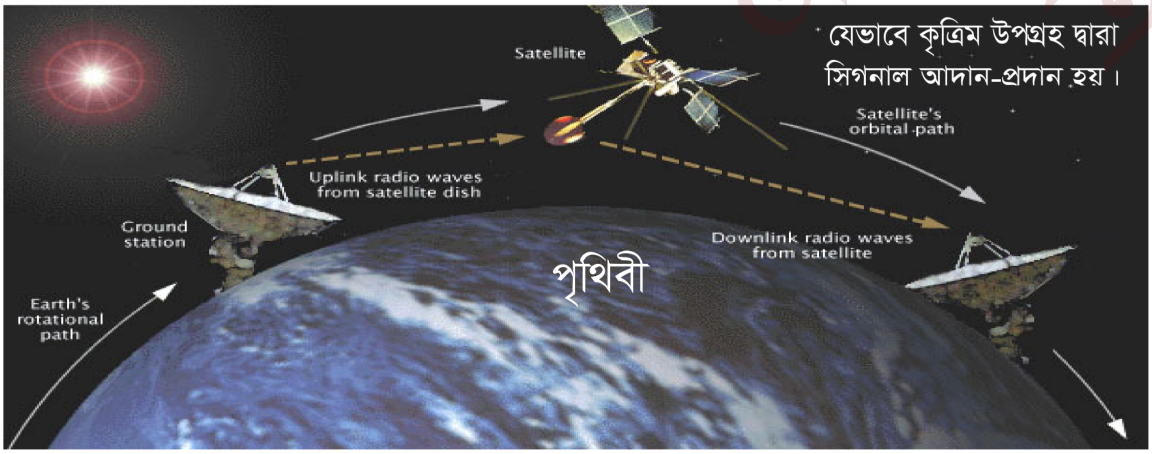
এবার অডিও-ভিডিও সিগনাল প্রেরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। টিভির ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে এবার এই সংস্কারকৃত সিগনাল প্রেরণ করা হবে ইলেকট্রমেগনেটিক রেডিয়েশনের মাধ্যমে। এই সিগনাল আলোকের গতিতে চলে। তিনটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় সিগনাল সম্প্রচারে: **১. ক্যাব্‌ল, ২. মাইক্রওয়েভ রিলে স্টেশন ও ৩. যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহ**। এ তিনটির উপর আরো কিছু ব্যাখ্যা এবার তুলে ধরছি।

১. ক্যাব্‌ল ট্রান্সমিশন: এ কাজে ব্যবহৃত হয় ফাইবার-অপটিক ক্যাব্‌ল। কাচের তৈরী শত শত টিউবের ভেতর দিয়ে চলে আসে ডিজিটেল টিভি সিগনাল সরাসরি সেটের মধ্যে। ঊর্ধ্বে ৫০০ পর্যন্ত চ্যানেল একই ক্যাবলের মাধ্যমে প্রেরণ সম্ভব। আজকাল ক্যাব্‌ল টিভি সর্বত্র মাকড়সার জালের মতো বিস্তার লাভ করছে।

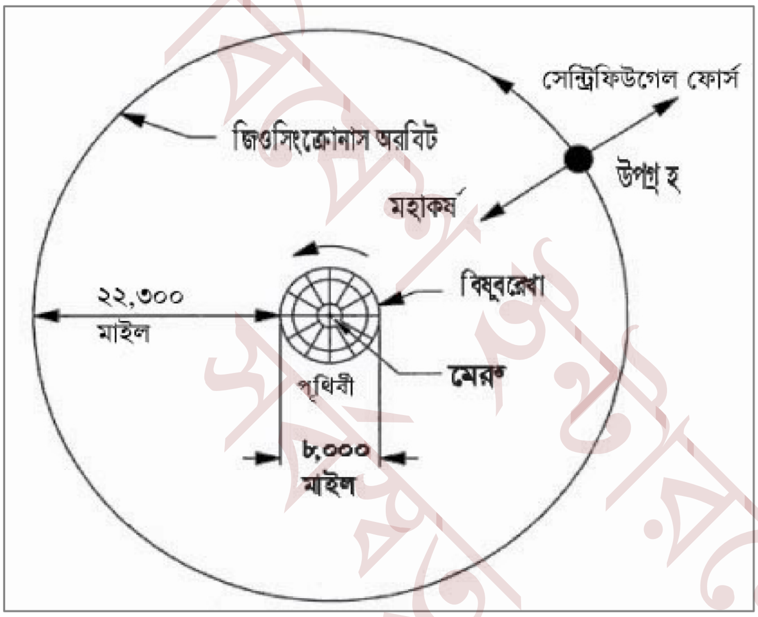
২. মাইক্রওয়েভ রিলে ট্রান্সমিশন: এগুলো এখনো বাংলাদেশে চালু আছে। আমাদের সিলেটে সুউচ্চ এরূপ একটি টিভি টাওয়ার আছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনুরূপ টাওয়ার বিদ্যমান। এগুলো সকলে মিলে টিভি সিগনাল আমাদের ঘরের সেটে প্রেরণ করে থাকে। টিভি স্টেশন [তা যেখানেই আছে] থেকে প্রেরিত সিগনাল চলে আসে নিকটস্থ টাওয়ারে। মাইক্রওয়েভ [ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সিগনাল] ব্যবহারের মাধ্যমে সিগনালটি চলে যায় পরবর্তী টাওয়ারে, সেখান থেকে পরবর্তীটিতে। এভাবে টাওয়ার থেকে টাওয়ার হয়ে সমগ্র দেশব্যাপী টিভি সিগনাল সম্প্রচার হয়। এ সিস্টেমকে **'টেরেস্ট্রিয়েল টিভি'** [terrestrial TV] বলে। অপরদিকে ইতোমধ্যে বর্ণিত ক্যাব্‌ল টিভির অপর নাম **'সাবটিরানিয়ান টিভি'** [subterranean TV], অর্থাৎ মাটির নীচের টিভি।

৩. স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন: সঙ্গত কারণে এই টিভি সিস্টেমের নামকরণ হয়েছে, স্যাটেলাইট টিভি। মহাকাশে স্থাপিত যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে সিগনাল প্রেরণ এখন প্রায় সবদেশে বিস্তারলাভ করেছে। গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে টিভি সিগনাল স্যাটেলাইটে পোঁছে। প্রয়োজনীয় সংস্কার, আমপ্লিফিকেশন শেষে সিগনাল পুনরায় পৃথিবীপানে পাঠানো হয়। টিভি'র এ্যারিয়েল বা আন্টেনা তা ধরে চলচিত্র হিসাবে সেটের পর্দায় প্রদর্শন করে।

মহাকাশে ৩৫,৮০০ কিমি [২২,৩০০ মাইল] ঊর্ধ্বে পৃথিবীর বিষুবরেখা [equator] বরাবর প্রদক্ষিণরত একাধিক কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপিত হয়েছে। এসব উপগ্রহ যে প্রদক্ষিণপথ অনুসরণ করে তার নাম **'জিওসিংক্রোনাস অরবিট'** [geosynchronous orbit]। বৃত্তাকার এই প্রদক্ষিণপথের বৈশিষ্ট্য হলো, পৃথিবীর দৈনিক গতির সমপরিমাণ গতিতে এবং একই দিকে কৃত্রিম উপগ্রহ চলন্ত থাকে। ফলে পৃথিবীর যে কোন বিশেষ অংশের উপর স্টেশনারী বা স্থায়ী থেকে ভূ-কেন্দ্র হতে প্রেরিত যে কোনো ধরনের ইলেকট্রমেগনেটিক সিগনাল আদান-প্রদান সহজ হয়ে ওঠে। নীচের চিত্রটি দেখুন।



জিওসিংক্রোনাস অরবিটে স্থাপিত কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে টেলিভিশন, টেলিফ্যাক্স, রেডিও, টেলিফোন ইত্যাদি সব ধরনের এ্যানালগ ও ডিজিটেল তথ্য আদান প্রদান সম্ভব হচ্ছে। পৃথিবীর একপ্রান্তে বসে অপরপ্রান্তে অনুষ্ঠিতব্য আপনার ফেভারিট অনুষ্ঠান, ক্রিকেট-ফুটবল-টেনিস ম্যাচ্, সংবাদ ইত্যাদি সরাসরি উপভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে এসব কৃত্রিম উপগ্রহ। নীচের চিত্রে জিওসিংক্রোনাস অরবিট তুলে ধরেছি। আমরা কৃত্রিম উপগ্রহের উপর একটি বিশেষ লেকচার উপস্থাপনের আশা রাখি।



০৯. এটম বোমা

টিভি সম্পর্কে অল্প বলতে যেয়ে অনেক বললাম। এ লেকচারে পারমাণবিক বোমা বা এটম বোমা কাভার করতে পারবো কি না ভাবছিলাম। অবশেষে কিছুটা অতিরিক্ত ধৈর্য ধারণ করে বর্ণনা তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শিক্ষার্থী শ্রোতা বন্ধুরাও আশারাখি একটু বেশী ধৈর্য ধারণ করে মনোযোগসহ শ্রবণ করে নেবেন।

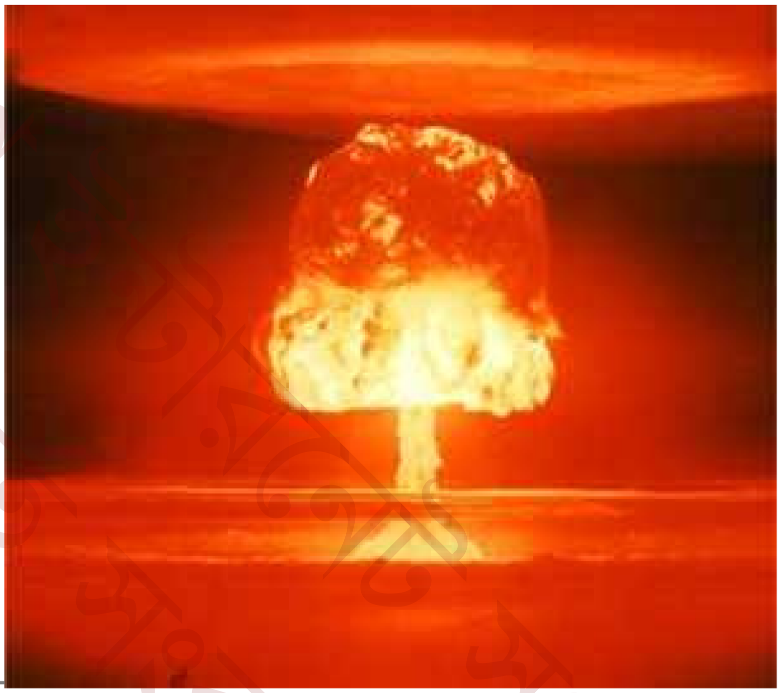
বস্তুর ক্ষুদ্র অংশ অণুর ভেতর কী পরিমাণ এনার্জি [বল] লুকানো আছে তা আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি। পদার্থবিজ্ঞানের উপর লেকচারের সময় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ১৯০৫ সালে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন প্রকাশ করেন তার থিওরী অব রিলেটিভিটি। এই থিওরীর অনুসরণেই পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা আনবিক বোমা উদ্ভাবন করেছিলেন। ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম পদার্থ ব্যবহৃত হয় আনবিক বোমায়। উভয় পদার্থ তেজস্ক্রিয়সম্পন্ন। আনবিক বোমা বিস্ফোরিত হয় যখন রেডিওএক্টিভ এটমের কেন্দ্র থেকে এনার্জি বেরিয়ে আসে। এনার্জি বেরিয়ে আসার দু'টি প্রক্রিয়া আছে: ১. নিউক্লিয়ার ফিশন প্রতিক্রিয়া ও ২. নিউক্লিয়ার ফিউশন প্রতিক্রিয়া। প্রথমটির বৈশিষ্ট্য হলো, কেনো মুক্ত নিউট্রন কণা এটমের কেন্দ্রে আঘাত হানলে তা ভেঙ্গে পড়ে। এতে নির্গত হয় বিরাট মাত্রার এনার্জি। দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া হলো, হাইড্রোজেনের এটম প্রচণ্ড চাপ ও তাপে '**একত্রিত**' [fuse] হওয়া। এতে সৃষ্টি হয় হিলিয়াম এটম। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার সময় বেরিয়ে আসে বিরাট মাত্রার এনার্জি। এরূপ প্রতিক্রিয়াই প্রতিনিয়ত সংঘটিত হচ্ছে আমাদের সূর্যের কেন্দ্রে। ফিউশন প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর বুকে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে সংঘটন সম্ভব নয়। তবে ফিশন প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত উপায়ে সংঘটন সম্ভব। এটাই ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে আনবিক চুল্লিতে। এটম বোমার জন্য উভয় প্রতিক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।


এটম বোমা

আধুনিক এটমিক প্রক্রিয়া: এ যুগে আনবিক বোমা বলিস্টিক মিসাইলের ভেতর ফিট করে রাখা হয়। এছাড়া এগুলো কোন বিমান থেকে পতনও করা হতে পারে (বায়ের চিত্র দ্রঃ)। বিভিন্ন '**আনবিক শক্তিসম্পন্ন**' দেশে যে পরিমাণ এটম বোমা আছে তা যদি বিস্ফোরিত হয় পৃথিবীর বুকে তাহলে পুরো পৃথিবীটাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আনবিক বিস্ফোরণ থেকে তাৎক্ষণিক উচ্চ তাপ ও তেজস্ক্রিয়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েই ধ্বংসযজ্ঞের শেষ হবে না। সমস্যাটা হবে দীর্ঘ মেয়াদী।

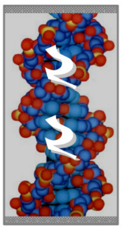
যেমনটি আমরা দেখছি জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে। সে-ই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় উভয় শহরে আমেরিকা কর্তৃক দু'টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। তাৎক্ষণিক বিরাট ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটনের পর আজো উভয় শহরের মানুষ স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারছেন না। তবে আসল কথা হলো, কোনো আনবিক যুদ্ধ বাঁধলে সমগ্র পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ধূলোবালিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। ফলে সূর্যের আলো পৃথিবীর জমিনে পৌঁছতে পারবে না। শুরু হবে, বিরাট ফ্রিজিং প্রতিক্রিয়া। একে বিজ্ঞানীরা **'গ্লোবাল গ্লাসিয়েটিং'** [global glaciating] বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ পুরো পৃথিবীব্যাপী উত্তর-দক্ষিণমেরু মতো গ্লাসিয়ার বা হিমায়িত বরফ সৃষ্টি হবে। চিরতরে নিশ্চিহ্ন হবে প্রাণীজীবন। আমরা এ থেকে আল্লাহর দরবারে ফানাহ চাই।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আজকের জন্য এটুকুই। আশাকরি এই দীর্ঘ বক্তৃতা থেকে সকলে কিছুটা উপকৃত হয়েছেন। আগামীতে আধুনিক প্রযুক্তির উপর আরো কিছু তথ্য তুলে ধরার আশা ব্যক্ত করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।



এটম বোমা বিস্ফোরণ থেকে সৃষ্ট 'মাশরুম'





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

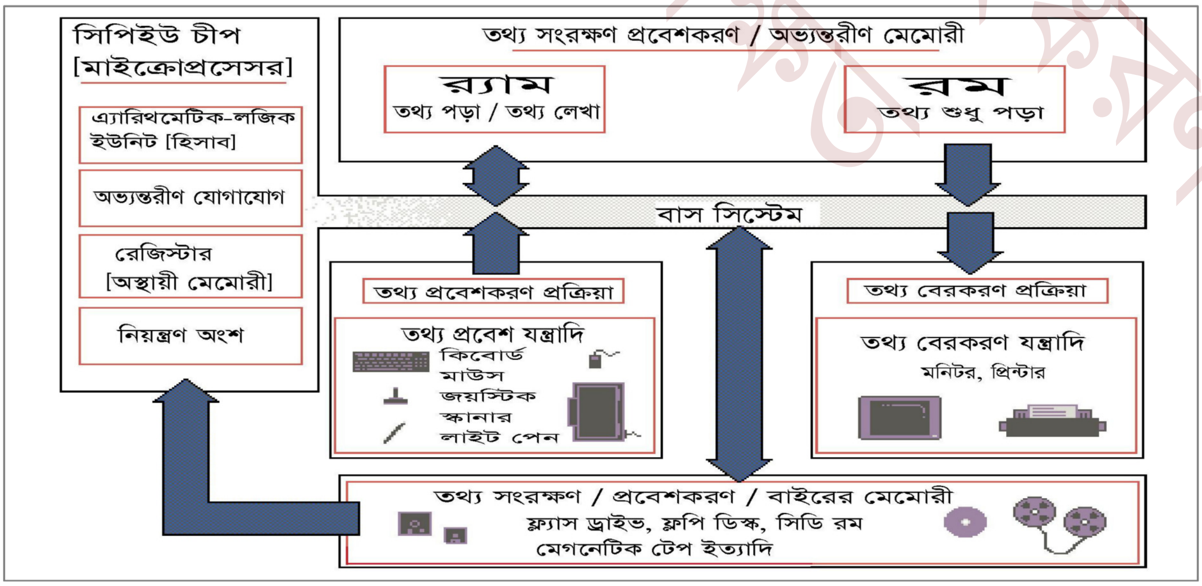
স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বক্তৃতা ২২ : আধুনিক প্রযুক্তি

১০. ব্যক্তিগত কম্পিউটার [পিসি]

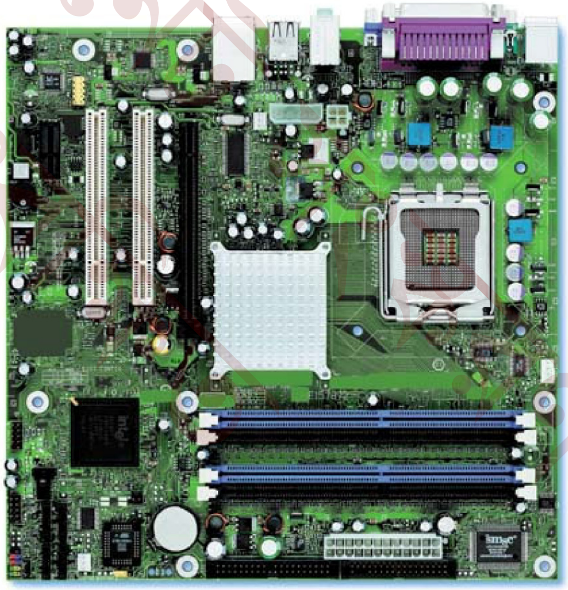
প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! সবাইকে জানাচ্ছি সাদর সম্ভাষণ। আজকের লেকচার কম্পিউটারের উপর। সম্ভবত আরো এক দু'টো বক্তৃতাও সংযুক্ত হবে আধুনিক যুগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এই যন্ত্রটিকে বুঝিয়ে দিতে। আর বুঝিয়ে



দেওয়াই উদ্দেশ্য। কম্পিউটার বিজ্ঞানের উপর বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই এখানে। এরপরও যেটুকু সম্ভব ব্যাখ্যা তুলে ধরবো। আমি আশা করছি আপনাদের মতো ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা এ থেকে কম্পিউটারের উপর **'এক্সপার্ট'** না হলেও অন্তত **'নবিস'** থাকবেন না- অনেকটাই বুঝ এসে যাবে, প্রযুক্তির এই সর্বাপেক্ষা অত্যাশ্চর্য উদ্ভাবন সম্পর্কে। আগের পৃষ্ঠায় কম্পিউটার সিস্টেমের একটি **'স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম'** [schematic diagram] তুলে ধরেছি।

ব্যবহার: কম্পিউটার আজকের যুগে কতো ব্যাপক আকারে ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্নভাবে তার তালিকা খুব দীর্ঘ। এখানে ক'টি মাত্র উল্লেখ করছি: ব্যবসা-বাণিজ্যে হিসাব-নিকাশ, বিলিং, বার কোড সৃষ্টি, কাস্টমার ক্রেডিট কন্ট্রোল, ইলেকট্রনিক উপায়ে ফান্ড আদান-প্রদান, ইন্টারনেট ব্যাংকিং ইত্যাদি শত শত কাজ; ঘরে ঘরে অধিকাংশ ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সার্কেট, নিয়ন্ত্রণ, চালনা, এয়ারকন্ডিশনারের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, বাড়ির নিরাপত্তা সিস্টেম, সময় নির্ণয়, টিভি, অডিও, ভিডিও, ফ্রিজ ইত্যাদি চালনা ও নিয়ন্ত্রণসহ অনেক কাজ ক্ষুদ্র কম্পিউটার মাইক্রপ্রসেসর দ্বারা চলে; যানবাহনে কম্পিউটার জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ, গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ, সংকেত সিস্টেম ইত্যাদি আরো অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া, ইন্টারনেট, প্রকাশনা, মেশিন কন্ট্রোল, রবটিক্স, বিমান চালনা, কৃত্রিম উপগ্রহ, টিভি সম্প্রচার, মোবাইল ও ল্যান্ড টেলিফোন সিস্টেম, পুরো শিক্ষাব্যবস্থাসহ সর্বত্র কম্পিউটার আর কম্পিউটার। কোন্‌টি রেখে কোন্‌টি বলবো? এককথায় আধুনিক যুগটিই এখন কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আপনাদের সম্মুখে যে লেকচার নোটবই আছে, তা-ও আমি সম্পূর্ণটাই ল্যাপটপে টাইপ ও ডিজাইন করেছি। সুতরাং শ্রোতাবন্ধুরা বুঝতেই পারছেন, আজকের এই অত্যাধুনিক টেকনোলজি-নির্ভর যুগ-সৃষ্টিতে কম্পিউটার কী বিরাট পরিমাণ অবদান রাখছে। দূর-ভবিষ্যৎ পর্যন্ত উন্নত থেকে উন্নততর চেহারা ও শক্তিতে কম্পিউটার আরো বেশী অবদান রাখবেও। মূলত কম্পিউটার একটি **'অত্যাশ্চর্য বিপ্লবের নাম'**। এ প্রসঙ্গে আমরা কম্পিউটারের ইতিহাস বর্ণনায় যাবো না। প্রসঙ্গক্রমে হয়তো অতীতের কিছুটা তথ্য উল্লেখ কবরো মাত্র।

১০.ক. কিভাবে কম্পিউটার কাজ করে



কম্পিউটারের দু'টি আলাদা অংশ আছে: **১. কঠিন যন্ত্রাংশ [hardware]** এবং **২. তরল যন্ত্রাংশ [software]**। হার্ডওয়্যারের অন্তর্ভুক্ত হলো যাবতীয় যন্ত্রাদি। যেমন: মেমোরী [memory - সংরক্ষণ] ইউনিট যা প্রোগ্রাম নির্দেশনা সংরক্ষণ করে রাখে; সেন্ট্রেল প্রসেসিং ইউনিট [central processing unit - CPU] যার কাজ প্রোগ্রাম নির্দেশনা প্রসেস করা; প্রবেশ সিস্টেম [input device] ও বেরকরণ সিস্টেম [output device], প্রথমোক্ত সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যবহারকারী কম্পিউটারের ভেতর কিছু তথ্য প্রবেশ করে থাকেন। এ লক্ষ্যর্জনে ব্যবহৃত হয় কিছু যন্ত্রাদি যেমন: কিবোর্ড, মাউস, স্কানার, মাইক্রফোন, ডিজিটেল ক্যামেরা, মোবাইল ফোন ইত্যাদিতে সংরক্ষিত অডিও-ভিডিও তথ্যাদি। দ্বিতীয়োক্ত সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যবহারকারী কম্পিউটারের ভেতর থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বের করে থাকেন। এ লক্ষ্যর্জনেও ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন আউটপুট ডিভাইস যেমন: প্রিন্টার, ভিডিও ডিসপ্লে মনিটর, স্পিকার ইত্যাদি। প্রসেস হওয়া তথ্যাদি কম্পিউটারের সংরক্ষণ সিস্টেমে রাখা যায় পরবর্তীতে ব্যবহার কিংবা অন্যত্র বহন করার জন্য। আমরা দেখেছি এ যুগে বহুল-ব্যবহৃত ফ্ল্যাস-ড্রাইভ যন্ত্রটি। একে পেন-ড্রাইভও বলে। ১২৪ গিগাবাইট পর্যন্ত তথ্য ছোট্ট এরূপ একটি ড্রাইভে সংরক্ষণ সম্ভব।

আমার নিকট একটি ফ্ল্যাস-ড্রাইভ আছে যাতে ১৬ গিগাবাইট মেমোরী বিদ্যমান। এতে এক বিরাট লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত যাবতীয় গ্রন্থাদির লেখা সংরক্ষণ করা যাবে। সুতরাং কম্পিউটারের ব্যবহার কতো ব্যাপক তা আর বুঝিয়ে বলার উপেক্ষা রাখে না।

১০.খ. কঠিন যন্ত্রাংশ [hardware]

কম্পিউটারে যাকিছু আমরা দেখি- তা সবই কঠিন যন্ত্রাংশ বা হার্ডওয়্যার। তিনটি অংশে এটা বিভক্তঃ ১. মূল হিসাব-নিকাশ ইউনিট যাকে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট [central processing unit - CPU] বলে, ২. মূল সংরক্ষণ ইউনিট যাকে বলে র‍্যান্ডম এক্সেস মেমোরী [random access memory - RAM] এবং ৩. অন্যান্য যন্ত্রাদি যেগুলো **'পেরিফেরলস্'** [peripherals] নামে পরিচিত। এবার এগুলো সম্পর্কে আরো জানার প্রয়োজন আছে।

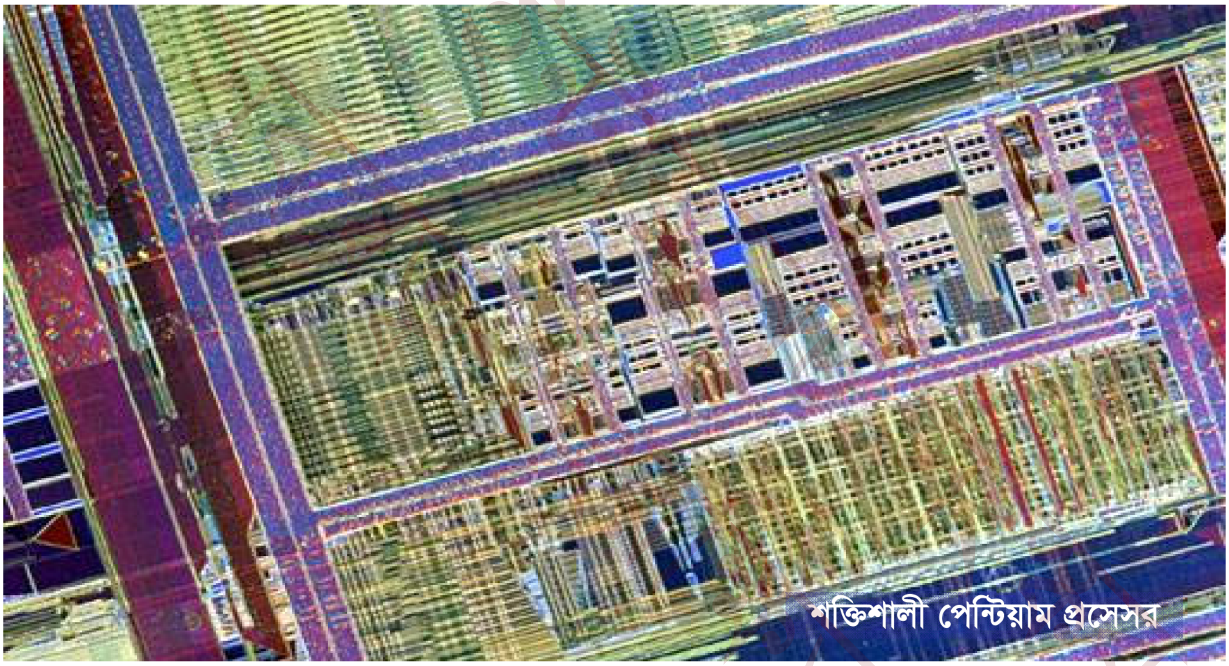


১. সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট [central processing unit - CPU]: কম্পিউটারের ব্রেন এ অংশটি। এটাই যাবতীয় তথ্য প্রসেস করে। সাধারণত একটি মাত্র মাইক্রপ্রসেসর ইউনিট এ কাজটি আঞ্জাম দেয়। সেমি-কন্ডাক্টিং পদার্থ **'সিলিকন'** [silicon - যে পদার্থ দ্বারা বালুকণা সৃষ্ট] এর তৈরী এই ইউনিটে থাকে কোটি কোটি অতি ক্ষুদ্রকায় ইলেকট্রিকেল যন্ত্রাদি। তবে আজকাল কম্পিউটারের সিপিইউ মানে একাধিক মাইক্রচীপ ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদির সমন্বিত ইউনিটকে বুঝায়। সিপিইউ সফ্টওয়্যার নির্দেশনাবলী প্রাপ্ত হয়ে বেশ কিছু কাজে জড়িত হয়। যেমন: নির্দেশকে ইলেকট্রনিক্সভাবে বুঝা, সে হিসাবে প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশ করা, লজিকেল বা যৌক্তিক সিদ্ধান্তগ্রহণ [অর্থাৎ সত্য-মিথ্যা নির্ণয় যা মূলত বূলিয়ান বীজগণিত নামক কম্পিউটার অঙ্কের উপর নির্ভরশীল], সাময়িকভাবে কম্পিউটারের অপর কোন অংশের জন্য তথ্য সংরক্ষণ করা, প্রোগ্রামের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ সচেতন থাকা, সমগ্র কম্পিউটারের অন্যান্য যন্ত্রাদির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদি। সিপিইউ মূলত একটি কালক্যুলেটার। তবে এটা অনেক বেশী শক্তিশালী। এর মূল কাজ হলো এ্যারিথমেটিকেল ও লজিকেল [arithmetical and logical] অপারেশন পরিচালনা। অপারেশনের মাল-মশলা বা তথ্যাদি আসে কম্পিউটারের মেমোরী কিংবা বিভিন্ন পেরিফেরল যন্ত্র থেকে- যেমন: কিবোর্ড, স্কানার, মাউস, জয়স্টিক ইত্যাদি। সিপিইউ নিয়ন্ত্রিত হয় সফ্টওয়্যার নির্দেশনাবলী দ্বারা, যার নাম কম্পিউটার প্রোগ্রাম। সকল সফ্টওয়্যার সংরক্ষিত থাকে হার্ড ডিস্ক, ফ্ল্যাস ড্রাইভ, সিডি রম ড্রাইভ, ডিভিডি, স্কানার ইত্যাদিতে। মেমোরী যন্ত্র থেকে নির্দেশনা প্রবেশ করে কম্পিউটারের মূল রান্ডম এক্সেস মেমোরীতে। সেখানে প্রতিটি নির্দেশকে একেকটি একক ঠিকানা বা সংরক্ষণ স্থান [address or memory location] নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। সিপিইউ এসব লকেশন থেকে প্রয়োজনে যে কোন তথ্য তুলে নিতে পারে তথ্যের এড্রেসকে সনাক্ত করে।

ঠিক কিভাবে সিপিইউ তার ফাংশনগুলো সমাধা করে? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আমরা কম্পিউটারের প্রোগ্রাম থেকে শুরু করতে পারি। র‍্যাম মেমোরী থেকে তথ্যাদি **'বাস'** [bus] হয়ে পৌঁছে যায় সিপিইউতে। এখানে **'বাস'** অর্থ একাধিক তারের সৃষ্ট রিবোন। কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশে তথ্যাদি এই বাসের মাধ্যমে চলাচল করে।

আগত তথ্য প্রথমে ডিকোড করতে হবে। এ কাজটি নির্দেশনা ডিকোডার ইউনিট সেরে দেয়। এবার তথ্য চলে যায় এ্যারিথমেটিক এন্ড লজিক ইউনিটে। এখানে অঙ্ক কষা ও লজিকেল অপারেশন শেষ হয়। প্রসেসকৃত তথ্য এএলইউ এর সাময়িক মেমোরী লকেশন **'রেজিস্টার'**-এ সংরক্ষিত থাকতে পারে। এখান থেকে খুব তাড়াতাড়ি তথ্য সংগ্রহ করা সফ্‌টওয়্যার নির্দেশনা দ্বারা সম্ভব। এএলইউ যোগ, বিয়োগ, ভাগ, পূরণসহ কন্ডিশনাল পরীক্ষা রেজিস্টার থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আঞ্জাম দেয়। এরপর ফলাফল পুনরায় পাঠিয়ে দেয় র‍্যাম বা অন্য কোন সংরক্ষণ যন্ত্রের নিকট। এছাড়া প্রয়োজনে আবারো ব্যবহারের জন্য অন্য কোনো রেজিস্টারে সংরক্ষণও করতে পারে।

আমরা প্রায়ই শুনি, প্রসেসর গতির কথা। যেমন: ২ গিগাহার্টজ, ৩ গিগাহার্টজ সিপিইউ। এর অর্থ কী? মনে রাখা দরকার, কম্পিউটার মূলত কয়েকটি ইলেকট্রিকেল যন্ত্র। সিপিইউ এর সার্কেটে ইলেকট্রিকেল সিগনাল দ্রুত চলতে থাকে। আর এই ইলেকট্রিক সিগনালই হলো সফ্‌টওয়্যারের নির্দেশনা। প্রতি সেকেন্ডে সিপিইউ এর মধ্য দিয়ে ক'টি সিগনাল চলে যায়- তা-ই নির্ধারণ করে কতো গতিশীল এই যন্ত্রটি। সুতরাং ২ গিগাহার্টজ সিপিইউ মানে ২ বিলিয়ন সিগনাল বা **'ক্লক পাল্‌স'** [clock pulse] এর মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে চলে যেথে সক্ষম।



শক্তিশালী পেন্টিয়াম প্রসেসর

২. র‍্যান্ডম এক্সেস মেমোরী [random access memory - RAM] ও রীড অনলি মেমোরী [read only memory - ROM]: দু'টি কাঠামোয় কম্পিউটারের মেমোরী সিস্টেমকে বিভক্ত করা যায়। এর প্রথমটি অভ্যন্তরীণ ও দ্বিতীয়টি বাইরের। অভ্যন্তরীণ মেমোরী সর্বোচ্চ গতিতে ব্যবহারযোগ্য এবং এটাই সিপিইউ কাজে লাগায়। ইলেকট্রনিক চীপে এই মেমোরী সংরক্ষিত থাকে। এই মেমোরীর অপর নাম **'র‍্যান্ডম এক্সেস মেমোরী'** [random access memory - RAM]। অপর আরেক অভ্যন্তরীণ মেমোরী আছে যাকে **'রীড অনলি মেমোরী'** [read only memory - ROM]' বলে। দ্বিতীয় ধরনের এই মেমেরী শুধুমাত্র পড়া যায়- যেমন কম্পেক্ট ডিস্ক মেমোরী [CD ROM]। র‍্যাম মেমোরীকে **'ডাইনামিক রান্ডম এক্সেস মেমোরী'** [dynamic random access memory - DRAM], **'সিংক্রোনাইজ্‌ড ডাইনামিক রান্ডম এক্সেস মেমোরী'** [synchronized dynamic random access memory - SDRAM] এবং **'স্টেটিক রান্ডম এক্সেস মেমোরী'** [static random access

memory - SRAM] ইত্যাদিও বলে। এসব মেমোরী ইউনিট একই কাজ তথা তথ্য সংরক্ষণ বিভিন্ন ভাবে করে থাকে।



রম মেমোরী র‍্যাম থেকে ভিন্ন। সাধারণত এই মেমোরী শুধুমাত্র সংরক্ষণের সুবিধার্থে ব্যবহৃত হয়। কম্পিউটারের অভ্যন্তরে এই মেমোরী অপারেটিং সিস্টেমকে চালু করতে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম চালনার একটি কাঠামো আছে যাকে **'বেসিক ইনপুট-আউটপুট সিস্টেম'** [basic input-output system - BIOS] বলে। এতে সংরক্ষিত নির্দেশনা কখনো মুছে যায় না- এমনকি কম্পিউটার সূইচ্ অফ থাকলেও এটি সংরক্ষিত থাকে। স্থায়ী মেমোরী বস্তুর মধ্যে **'সিডি রম'** [CD ROM- write protected or re-writeable], **'ফ্ল্যাস ড্রাইভ'** [FLASH drive], **'ডিজিটেল ভিডিও ডিস্ক'** [DVD] ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

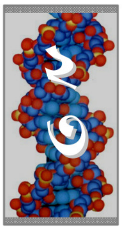
কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটা মূলত একটি মেগনেটিক মেমোরী ইউনিট। লেইজার আলোকরশ্মি দ্বারা এতে তথ্য চুম্বকীয় উপায়ে সংরক্ষণ করা হয়। কম্পিউটারের ফাইলগুলো এখানেই থাকে। এসব ফাইল বের করা, সংস্কার ও পুনরায় সংরক্ষণ, মুছে ফেলা, নতুন ফাইল বানিয়ে সংরক্ষণ ইত্যাদি এই হার্ড ড্রাইভের মাধ্যমে সম্ভব হয়। সুতরাং হার্ড ড্রাইভের মেমোরী ক্ষমতা যতো বেশী হবে ততো বেশী সুবিধাও ব্যবহারকারীর জন্য। বর্তমানে মেমোরী ইউনিট **'মেগাবাইট্স'** [1 megabytes=1000 kilobytes] হিসাবে মাপা হয়। আগের যুগে মেমোরী মাপা হতো, **'কিলোবাইট্স'** [১০০০ বাইটস্=1 kilobyte] দ্বারা। অদূর ভবিষ্যতে **'গিগাবাইট্স'** [1000 megabytes = 1 gigabytes] হিসাবে মাপা হবে। বাস্তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখনোই তা হচ্ছে। আগের যুগে মেমোরী ইউনিটের দামও বেশী ছিলো। এখন অনেকটা সস্তা।

৩. প্রান্তিক কঠিন যন্ত্রাদি [peripheral]: একটা সিপিইউ অর্থহীন হবে যদি না এর দ্বারা প্রসেস তথ্যাদি উল্লেখযোগ্য কাজে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং সিপিইউকে সত্যিকার অর্থে কল্যাণে ব্যবহারের জন্য কম্পিউটার সিস্টেমে বেশ কিছু প্রান্তিক কঠিন যন্ত্রাদি থাকে। এসব যন্ত্রকে কম্পিউটার বিজ্ঞানে, **'পেরিফেরল'** [peripheral] বা প্রান্তিক যন্ত্রাদি বলে। পেরিফেরল থেকে তথ্যাদি সিপিইউ এর সাথে কোনো না কোনোভাবে যোগাযোগ সৃষ্টি করে থাকে। যেমন: ডিস্ক ড্রাইভ, প্রিন্টার, মডেম, জয়স্টিক, মাউস, কিবোর্ড ইত্যাদি। এ সবই কম্পিউটারের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত থাকে ইলেকট্রিক তারের মাধ্যমে। শব্দ ও চলচিত্র প্রসেসিং করতে যেয়ে আমরা ব্যবহার করতে পারি মাইক্রফোন ও ডিজিটেল ক্যামেরা। এ দু'টো পেরিফেরল সরাসরি কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে কিংবা না-ও থাকতে পারে। অর্থাৎ এগুলো ওয়েরলেস হতে পারে। আমরা এ প্রসঙ্গে যেসব পেরিফেরলের উপর আলোচনা করবো তাহলো: ১. ডিসপ্লে ইউনিট, ২. মাউস, ৩. কিবোর্ড, ৪. হার্ড ডিস্ক, ৫. জয়স্টিক, ৬. প্রিন্টার, ৭. ফ্ল্যাস ড্রাইভ, ৮. সিডি রম, ৯. মডেম, ১০. স্কানার ও ১১. লাইট পেন।

প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! আজকের লেকচারের ইতি টানছি এক্ষুণি। উপরে উল্লেখিত **১১**টি যন্ত্রের উপর পরবর্তী লেকচারে বিস্তারিত আলোচনার আশা রাখি। এর পরের লেকচারে কম্পিউটারের দ্বিতীয় **'লজিকেল'** অংশ তরল যন্ত্রাংশ বা সফ্‌টওয়্যারের উপর আমরা তথ্যানুসন্ধান চালাবো ইনশাআল্লাহ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বক্তৃতা ২৩ : আধুনিক প্রযুক্তি

১০. ব্যক্তিগত কম্পিউটার [পিসি]

১০.খ. কঠিন যন্ত্রাংশ [hardware] : পেরিফেরলস্

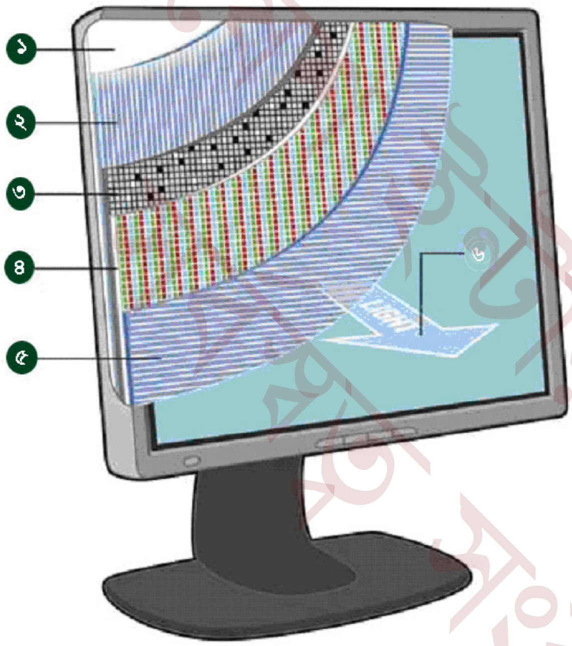
প্রিয় ছাত্র-বন্ধুরা! আধুনিক বিজ্ঞানের উপর এ লেকচারমালার ২৩তম সংযোজনে সবাই ওয়েলকাম! আমরা এ যুগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির উপর আলোচনা করছি। গত সংযোজনে শুরু হয়েছে কম্পিউটার নিয়ে বক্তব্য। এ লেকচারও একই বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ থাকবে। সম্ভবত আরো দু'তিনটি লেকচার সংযুক্ত করতে হবে কম্পিউটারের উপর বেসিক জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে। আর এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। যাক, গত লেকচারে বলেছি, কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের অংশ হিসাবে ১১টি যন্ত্রের উপর আমরা আলোচনা করতে চাচ্ছি। এসব যন্ত্র মূল কঠিন যন্ত্রাংশ সিপিইউ এর সাথে সংযুক্ত থাকে। কম্পিউটার বিজ্ঞানের ভাষায় সামগ্রিকভাবে এ যন্ত্রগুলোকে **'পেরিফেরলস্'** [peripherals] বলে। এসব মূলত **'ইনপুট/আউটপুট'** [input/output] যন্ত্র। অর্থাৎ তথ্য প্রবেশ/বেরকরণ উপায়-অবলম্বনের যন্ত্রাদি। এবার আমরা একে একে এ যন্ত্রগুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার প্রয়াস পাচ্ছি।

১. ডিসপ্লে ইউনিট [প্রদর্শন যন্ত্র]

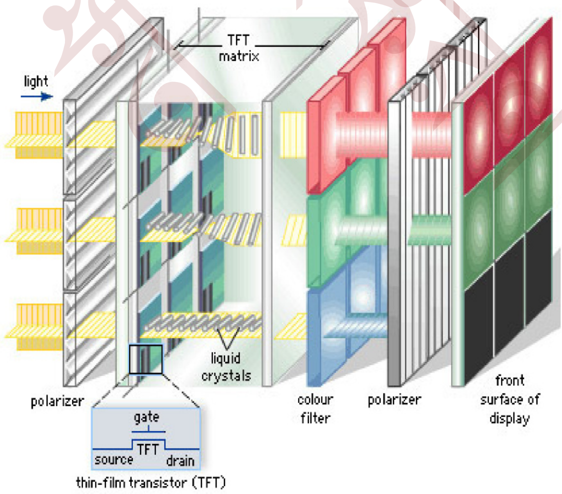
কম্পিউটারের ডিসপ্লে ইউনিট কয়েক ধরনের আছে। আজকাল সে যুগের **'সিআরটি'** [CRT] মনিটরের ব্যবহার দিন দিন মুছে যাচ্ছে। CRT- এ অক্ষরগুলোর অর্থ হলো: cathode-ray-tube। আপনারা দেখেছেন

কিছু কিছু লম্বা মনিটর আছে, সিআরটি ওগুলোই। এ প্রসঙ্গে সিআরটি সম্পর্কে আলোচনায় যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। তা আদৌ প্রয়োজন বলেও মনে করি না। তবে এ যুগের যেসব মনিটর জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে, সেগুলোর উপর তো জানতেই হয়।

১.ক. 'টিটিএফ' [thin film transistor - TFT] এলসিডি [light emitting diode -LED] মনিটর: অফিস-আদালত, ব্যাংক-বীমা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে আকর্ষণীয় এ ডিসপ্লে ইউনিট দেখতে পাওয়া যায়। নিম্নে আমরা একটি টিটিএফ মনিটরের ছবি দিয়েছি। তাতে ৬টি সংখ্যা আছে। মনিটরের ফাংশন বুঝাতে যেয়ে আমরা এসব সংখ্যার দিকে ইঙ্গিত করবো।



মনিটর প্যানেলের পেছনে থাকে **'ফ্লুরেসেন্ট'** [fluorescent] আলোকসূত্র। এটা এমন ধরনের আলো যা জ্বলে ওঠার পর কিছুক্ষণ স্থায়ী থাকে। চিত্রে সংখ্যা ১ দ্বারা তা সম্বোধন করেছি। আজকাল এই **'পেছনের আলোকসূত্র'** [backlight source] লাইট প্রদানকারী ডাইওড [LED] থেকেও আসতে পারে কোনো কোনো মডেলে। এই পেছন-প্যানেলে আছে দু'টি কাচের-তৈরী **'পোলারাইজিং ফিল্টার'** [polarizing filter]। আলোকসূত্রের তরঙ্গ অপরদিকে চলে যেতে পারবে কি না, তা নিয়ন্ত্রণ করে এই ফিল্টার। ছবিতে সংখ্যা ২ এবং ৫ দ্বারা তা দেখানো হয়েছে। ফিল্টারগুলো একে অন্য থেকে কিছুটা দূরে স্থাপিত। মাঝখানে আছে কিছু তরল ক্রিস্টেল মলিকিউল [liquid-crystal molecules]। চিত্রে সংখ্যা ৩ দ্বারা দেখানো হয়েছে এ অংশটি। তরল ক্রিস্টেল স্বভাবতই কিছু বিশেষ ভঙ্গিমায় থাকতে ভালোবাসে যা বিজ্ঞানীদের জানা। ফিল্টারের মধ্যে আছে গর্ত। ক্রিস্টেল এগুলোর সাথে সমান্তরালভাবে থাকে। অতিরিক্ত মলিকিউল নিজেদেরকে ফিল্টারের মধ্যস্থ ক্ষুদ্রকায় স্থান দখল করে নেয়। নিজেদেরকে তারা **'হিলিক্স'** [helix] আকার ধারণ করে বসে থাকে। হিলিক্সের অর্থ সর্পিল। যখন আলোকরশ্মি পেছন থেকে এসে এসব সর্পিল ক্রিস্টেলে পতিত হয় তখন আলোকের গতি সঠিক দিকে কিছুটা মুচড়ে পড়ে। এর কারণ হলো সামনের পোলারাইজ ফিল্টার ভেদ করা। সুতরাং মনিটরের সামনে বসা আমাদের চোখে এসে এই আলোকরশ্মি পতিত হয়। অপরদিকে আলোকরশ্মি যদি মুচড়ে না যায়, তাহলে সামনের ফিল্টার একে সম্পূর্ণরূপে কিংবা আংশিকভাবে ব্লক করে দেবে। দেখুন ডানের চিত্রটি।



উপরে টিটিএফ-এলসিডি মনিটরের গঠনপ্রণালী সম্পর্কে কিছুটা অবগত হয়েছি আমরা। এ ব্যাপারে আরো একটু বাড়িয়ে বলতে হবে। অন্যথায় হারিয়ে যেতে পারি অজানা এক দেশে! আপনার কম্পিউটারের মূল সার্কেটবোর্ডের নাম **'মাদারবোর্ড'** [motherboard]। নীচের চিত্রটি দেখুন। এখানেই থাকে সকল গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ। মাদারবোর্ডে **'ডিসপ্লে কন্ট্রোলার'** [display controller] নামক একটি ইউনিট আছে। একে বাংলায় প্রদর্শন নিয়ন্ত্রক বলা যায়। ভিডিও এডাপ্টার থেকে এই প্রদর্শন ইউনিটে ইলেকট্রিকেল সিগনাল আসে। ভিডিও এডাপ্টারের কাজ হলো মনিটরে প্রদর্শিত হবে এরূপ ইলেকট্রিক সিগনালকে ধরে প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত করা ও কন্ট্রোলারের নিকট পাঠানো। যেমন আপনি যদি টাইপ করেন, তাহলে প্রতিটি অক্ষর সঠিকভাবে মনিটরে প্রদর্শিত হতে হবে। কিবোর্ড থেকে ভিডিও এডাপ্টার ইলেকট্রিক সিগনাল হিসাবে প্রতিটি কি-স্ট্রোক গ্রহণ করে নেয় এবং পাঠিয়ে দেয় মাদারবোর্ডে স্থাপিত কন্ট্রোলারের নিকট। ডিসপ্লে কন্ট্রোলার দু'টি জিনিস নিয়ন্ত্রণ করে: **১. তরল ক্রিস্টেলে প্রেরিত ইলেকট্রিক সিগনাল** ও **২. পেছনের আলো**। শুরুতে প্রথম কাচের ভেতর দিয়ে পেছনের আলো চলে যেতে সুযোগ সৃষ্টি করে ডিসপ্লে কন্ট্রোলার। একই সময় সে তরল ক্রিস্টেলে পাঠিয়ে দেয় ইলেকট্রিকেল কারেন্ট- যা এসেছে ভিডিও এডাপ্টার থেকে। ফলে বিভিন্ন ধরনের ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ আলো চলে যায় শেষের কাচে, যাতে সৃষ্টি হয় কাঙ্ক্ষিত **'ছবি'** স্ক্রীনের উপর। রঙিন মনিটরে প্রতিটি **'পিক্সেল'** [pixel] লাল, নীল ও সবুজ এই তিনটি ক্রিস্টেল কোষের তৈরী। এসব রঙিন পিক্সেলে আলোকরশ্মির তারতম্য থেকে সৃষ্টি করে কোটি কোটি রঙিন ছায়া। আর তা-ই আমাদের চোখে অক্ষর, ছবি ইত্যাদি হিসাবে ধরা দেয়।

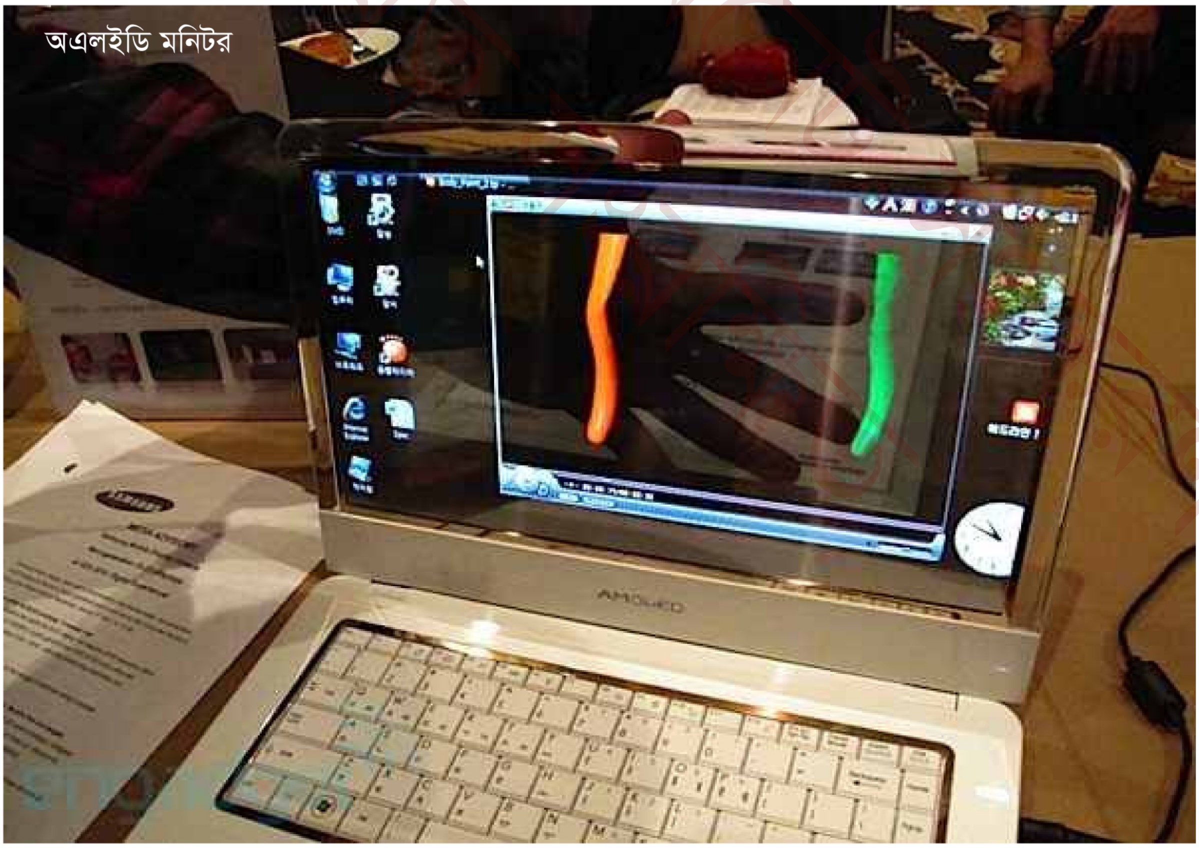


১. খ. আধুনিক মনিটর: কম্পিউটার এবং টিভি'র মনিটর হিসাবে নতুন দু'টি টেকনোলজি দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে। এর প্রথমটি হলো **'প্লাজমা মনিটর'** [plasma monitor]। দ্বিতীয়টির নাম **'অরগ্যানিক লাইট-এমিটিং ডাইওড মনিটর'** [organic light-emitting diode monitor], একে সংক্ষেপে **'অএলইডি মনিটর'**ও [OLED monitor] বলে। প্লাজমা প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য হলো, ছবি সৃষ্টির পিক্সেল তৈরীতে ব্যবহৃত হয় অতি ক্ষুদ্রকায় রঙিন ফ্লুরেসেন্ট আলো। প্রতিটি পিক্সেলে থাকে তিনটি রঙ: **লাল, সবুজ ও নীল**। প্লাজমা ডিসপ্লেতে আরো ব্যবহৃত হয় **'জিনোন'** [xenon] ও **'নিওন'** [neon] গ্যাস। এসব গ্যাসে মুক্তভাবে ইলেকট্রন ও আয়োন [চার্জ হওয়া কণা] চলন্ত থাকে। যখন ইলেকট্রিকেল

কারেন্ট চলে এই গ্যাসের মধ্য দিয়ে, তখন ঋণাত্মকভাবে চার্জ হওয়া কণাগুলো ধনাত্মকভাবে চার্জ-হওয়া কণার দিকে আকর্ষিত হয়। এর ফলে উভয় কণায় সৃষ্টি হয় ঘর্ষণ। এতে গ্যাসের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে এনার্জি আলো হিসাবে। যাকে **'ফটোন'** বলে। নিশ্চয় শ্রোতাবন্ধুরা ফটোন কি তা জানেন। আমরা ফিজিক্সের উপর আলোচনাকালে এদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। কম্পিউটারের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট [CPU] থেকে প্লাজমা মনিটরে সিগনাল আসলেই এরূপ আলোর সৃষ্টি হয় যা সামনের স্ক্রীনে ভেসে আসে ছবি হিসাবে।


প্লাজমা মনিটর

অএলইডি মনিটর হলো সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। নামের মধ্যেই এই প্রযুক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অরগ্যানিক বা জৈবিক পদার্থ যেমন কার্বন, প্লাস্টিক বা পলিমার ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় এই মনিটরে। ইলেকট্রিক কারেন্ট এসব বস্তুতে চলন্ত হলে সৃষ্টি হয় ফটোন বা লাইট। খুব ক্ষুদ্র এলইডি [LED] সরাসরি ব্যবহৃত হয় ছবি সৃষ্টিতে। ফলে মনিটরের জন্য কোনো পেছন আলোকরশ্মির প্রয়োজন হয় না। পেছনের আলো না থাকায় এসব মনিটরের পাওয়ার কনজামশন কম এবং এগুলো বেশ পাতলাও। দ্রুত ছবিসৃষ্টি, চওড়া দৃশ্যসৃষ্টি, উন্নত কনট্রাস্ট লেবেল এবং সঠিক ঔজ্জ্বল্য থাকায় অএলইডি ডিসপ্লে ভবিষ্যতের মনিটর হবে নিশ্চয়ই।

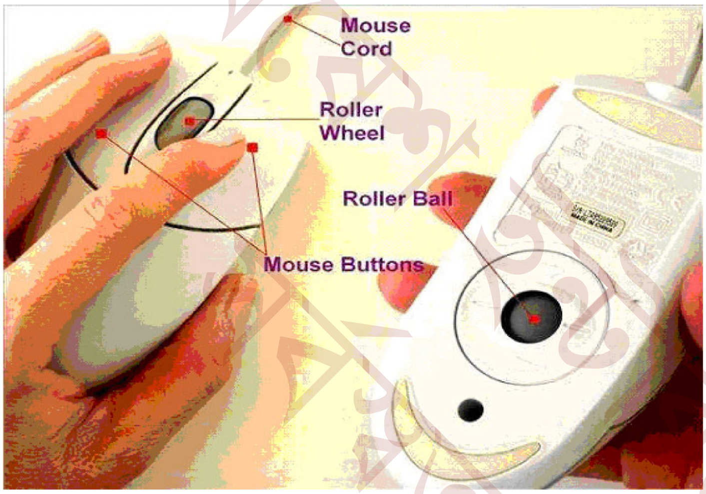


অএলইডি মনিটর

মনিটর টেকনোলজির উপর আর বেশী কিছু আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। যা হয়েছে, তা থেকেই এই গুরুত্বপূর্ণ কম্পিউটার পেরিফেরল সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা জন্মেছে বলে আমি আশা করি।

২. মাউস

হ্যাঁ, মাউস অর্থ- ইঁদুর! আর এটা ছাড়া কম্পিউটার চলে না! যদিও ল্যাপটপ মাউস ছাড়া চালনা সম্ভব। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মাউস ছাড়া কিছুটা অস্বস্তিবোধ করি। কম্পিউটারের পেরিফেরল হিসাবে মাউস একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এবার দেখে নিই এটি ঠিক কিভাবে কাজ করে।



কম্পিউটারে সাধারণত দু'ধরনের মাউস ব্যবহৃত হয়: **১. রোলার বল মেকানিকেল মাউস ও ২. অপটিকেল ডিজিটেল মাউস**। আরো যেসব মাউস ইদানিং মার্কেটে আসছে তাদের মধ্যে লেইজার ও কর্ডলেস মাউস উল্লেখযোগ্য। আমরা প্রথমোক্ত দু'টির উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

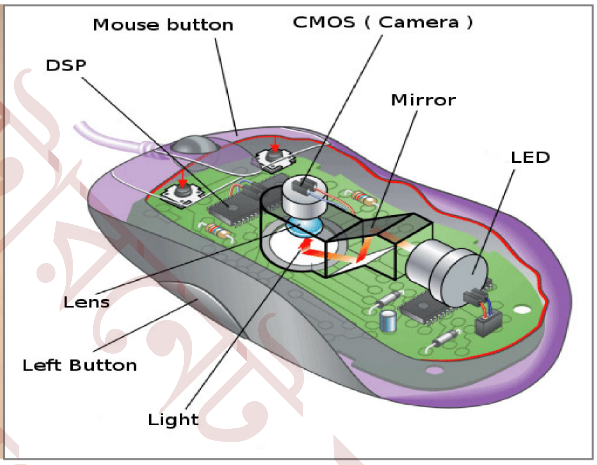
১. রোলার বল মাউস: এসব মাউসের মৌলিক কাজ হলো কয়েকটি গতিশীল অংশের এনার্জিকে ডিজিটেল সিগনালে পরিবর্তন করা। যারা রোলার বল মাউস ব্যবহার করেছেন তারা জানেন এতে আছে চারটি চলন্ত অংশ: নীচে একটি রোলার বল, উপরে ডানে ও বামে একেকটি সুইচ এবং মাঝে একটি রোলার চাকা। মাউসের সামনে থাকে কম্পিউটারের ইউএসবি পোর্টের [USB port] সঙ্গে যুক্ত করার একটি কোর্ড তার [cord wire]। উপরের চিত্রটি দেখুন।

মাউসের ভেতরে কী আছে? রোলার বলকে আরো দু'টি চাকা ঘিরে রেখেছে। এগুলো একটা আরেকটা পারপেন্ডিকুলার [৯০ ডিগ্রী ভিন্ন দিকে] অবস্থায় স্থাপিত। ফলে রোলারটি সামন-পেছন ও ডানে-বামে ঘুরতে পারে। মাউস পয়েন্টারকে [স্ক্রীনের তীরকে] চতুর্দিকে ঘুরানো সহজ করার জন্য এই ব্যবস্থা। বলের গতিকে ইলেকট্রিক সিগনালে পরিবর্তন করতে হবে। এ কাজটি আঞ্জাম দেয় দু'টি **'এনকোডার ডিস্ক'** [encoder disk]। এগুলো চলন্ত চাকা। উভয়টির বাইরের দিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। অপরদিকে স্থাপিত ইনফ্রারেড [লাল তরঙ্গের] আলোক নির্গতকারী ডাইওড [IR LED] থেকে সৃষ্ট সিগনাল এসব ছিদ্রে সর্বদা পতিত হয়। ফলে রোলার বলের গতি থেকে সৃষ্টি হয় সিগনালের মধ্যে তারতম্য যা ইলেকট্রিকেল সার্কেট কম্পিউটার কোডে [code] পরিবর্তন করে। এভাবে মাউস পয়েন্টার কোথায় থাকবে তা নির্ণিত হয়। এ কাজটি যতক্ষণ কম্পিউটার চলন্ত থাকবে ততক্ষণই অব্যাহতভাবে চলবে।

সুইচ ও রোলার চাকা থেকে যেসব সিগনাল প্রেরণ করা হয় তা-ই নির্ধারণ করে ইউনডো বা জানালা খোলা না বন্ধ হবে। ফাইল খুলবে না বন্ধ হবে ইত্যাদি। মোটকথা, মাউসের প্রযুক্তি খুব সাধারণ, অথচ বেশ কার্যকরী। এক যুগ ছিলো যখন কম্পিউটার পরিচালনার জন্য অনেকদিন ট্রেনিং নিতে হতো। কারণ, তখনকার দিনে কম্পিউটারকে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ কমান্ড কিবোর্ড থেকে প্রেরণ করা জরুরী ছিলো। মাউসের উদ্ভাবন হেতু, সত্যিই কম্পিউটার হয়ে ওঠেছে সবার জন্য ব্যবহারযোগ্য একটি মেশিনে। আজকাল ৩ বৎসরের একটি শিশুও কম্পিউটার চালাতে পারে। আমরা এবার অপটিকেল মাউসের উপর কিছুটা আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি।

২. অপটিকেল ডিজিটেল মাউস: একবিংশ শতকের শুরুতে নতুন এই মাউস বাজারে আবির্ভুত হয়। সে-ই থেকে এ ডিভাইসটির জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়তে থাকে। আজকের যুগে প্রায় সবাই অপটিকেল ডিজিটেল মাউস ব্যবহার করে থাকেন। এই মাউস চালাতে কোনো বিশেষ ধরনের প্যাড তথা মাউস প্যাডের প্রয়োজন হয় না। এটি পরিষ্কার, অধিক সঠিক ও দীর্ঘদিন কার্যকরী। এই মাউস টেকনোলজির মূল হচ্ছে ছোট্ট একটি ক্যামেরা। মাউসের নীচের দিকে এটা স্থাপিত। প্রতি সেকেন্ড হাজার হাজার ছবি তুলে এ ক্যামেরা। আপনি যে বস্তুর উপর মাউসটি চালনা করবেন, ঐ ক্যামেরা অনবরত সে বস্তুর ছবি তুলে একটি সেন্সর দ্বারা **‘ডিজিটেল সিগনাল প্রসেসর’** [Digital Signal Processor - DSP] নামক চীপে প্রেরণ করে। ডিএসপি’র কাজ হলো আগের মুহূর্তের ছবির সঙ্গে বর্তমানটির পার্থক্য নির্ণয়। এরপর নির্ধারণ করা মাউসটি কোন্‌দিকে কতটুকু পরিমাণ দূরে সরে গেছে। এই তথ্যের উপর নির্ভর করে স্ক্রীনের মাউস পয়েন্টার চলন্ত হয়। ক্লিক, রোলার ইত্যাদি ঠিক উপরে বর্ণিত রোলার বল মাউসের মতোই কাজ করে। নীচের চিত্র দু'টো দেখুন।





৩. কিবোর্ড

কম্পিউটারের কিবোর্ড মূলত মাউসের মতোই কাজ করে। অনেক মাউসের ক্রিয়া কিবোর্ড [shortcut] দ্বারা সম্ভব। পুরো কিবোর্ডব্যাপী অনেক বোতাম আছে। এর প্রতিটি একেকটি বিশেষ কার্য আঞ্জাম দেয় ইলেকট্রনিকেলী। আসলে প্রত্যেকটি বোতামই একেকটি সুইচ। টিপ দিলেই অভ্যন্তরের সার্কেট বোর্ডে সিগনাল প্রেরিত হয়। প্রথমে আমরা কিবোর্ডের বিভিন্ন বোতাম সম্পর্কে আরো কিছু জেনে নেবো। এরপর টেকনিকেল ব্যাপারটি তুলে ধরবো।



ফাংশন কীজ [function keys]: বোর্ডের উপরের সারিতে আছে এসব ফাংশন বোতাম। প্রতিটির মধ্যে ইংরেজী অক্ষর 'F', সেসঙ্গে সংখ্যা লেখা আছে। কোনো কোনো কিবোর্ডে ১ থেকে ১২ পর্যন্ত সংখ্যা দেখতে পাওয়া যায়। সফ্টওয়্যার ডিজাইনাররা এসব বোতাম বিভিন্ন কাজে [ফাংশনে] লাগান। আপনি সফ্টওয়্যার ব্যবহারকারী এসব ফাংশন ব্যবহার করতে পারেন শুধুমাত্র ওসব বোতামে টিপ দিয়ে।

নাম্বার বোতাম [number keys]: বড় কিবোর্ডের ডানে একটি অংশ আছে। সেখানে থাকে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা বোতাম কীপ্যাড। এতে আরো আছে *, +, -, / ও 'Enter' বোতাম। এগুলো দ্বারা অঙ্ক কষা হয়। আরেকটি 'Number Lock' নামক কী আছে। এটির দ্বারা কীপ্যাড সক্রিয় বা অকেজো করা হয়।

তীর বোতাম [Arrow Keys]: ডান সাইডে এসব কী বিদ্যমান। উপর, নীচ, ডান ও বামে কারসর [cursor] চালনার জন্য এসব কী ব্যবহৃত হয়। এদের অপর নাম **'ন্যাভিগেশন কী'** [Navigation kyes]। এদের আরেক নাম **'ডাইরেকশন কী'** [direction keys]।

টাইপরাইটার বোতাম [typewriter keys]: মধ্যখানে স্থাপিত এ টু জেড অক্ষরসহ **'স্পেইস বার'** [space bar] ও সংখ্যা আছে এই অংশে। আপনি এই অংশেই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অঙ্গুলি চালনা করে থাকেন।

বিশেষ বোতাম [special keys]: এসব বোতামের মধ্যে আছে 'Esc', 'Tab', 'Caps Lock', 'Shift', 'Return', 'Backspace', 'Control', 'Alt', 'End', 'Page On', 'Page Up', 'Home', 'Delete', 'Insert', 'Print Scrn', 'Num Lk / Scroll Lk' ইত্যাদি।

উপরোক্ত প্রতিটি বোতামের একেকটি ফাংশন বা কাজ আছে। তবে অধিকাংশ বোতাম আপনি ব্যবহার করবেন না। কিছু আছে ইন্টারনেটের জন্য, আর এক দু'টো আছে যা সফ্টওয়্যার নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়। যেমন 'Esc' বোমাতটি। যে কোন অপারেশন কেন্‌সেল করতে এটি টিপ দিতে হয়।



কিবোর্ড প্রযুক্তি: এবার খুব সংক্ষেপে কিবোর্ড কিভাবে কাজ করে তা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা চালাবো। আগেই বলেছি প্রতিটি বোতাম মূলত একেকটি সুইচ। যে মুহূর্তে আপনি কোনো কী'তে চাপ দিবেন তখোনি একটি ইলেকট্রিকেল সিগনাল সৃষ্টি হয়ে চলে যায় কম্পিউটারের প্রসেসরে। কিবোর্ডের সার্কেট **'বন্ধ'** [close] হয় যখন চাপ দেবেন। অন্যথায় সর্বদাই তা **'খোলা'** [open]। প্রসেসরের মধ্যে ইলেকট্রনিকভাবে সংরক্ষিত আছে একটি **'কীম্যাপ'**

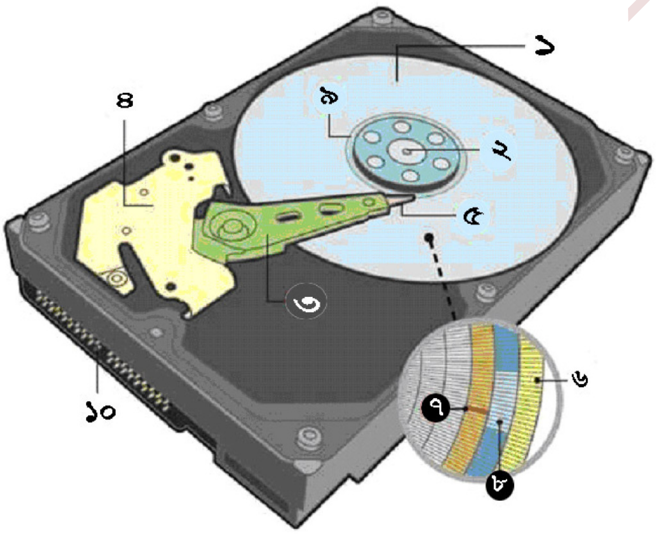
[keymap]। এর অপর নাম **'ক্যারাক্টার ম্যাপ'** [character map]। বন্ধ অবস্থায় প্রসেসর বুঝতে পারে কোন্ বোতামটি টিপ দেওয়া হয়েছে। কম্পিউটারের অপরেটিং সিস্টেম এই কীম্যাপ প্রসেসরে আগে থেকেই সংরক্ষণ করে রাখে। সুতরাং কিবোর্ড **'রিডিং'** প্রসেসরের জন্য অতি সহজ ব্যাপার। যে বোতামেই চাপ পড়বে সে বোতামের ফাংশন অনুযায়ী প্রসেসর তার কাজ চালাবে এবং প্রয়োজনে স্ক্রীনে [অর্থাৎ উইন্ডোতে] প্রদর্শন করবে।



ল্যাপটপ ছাড়া টাওয়ার ও অন্যান্য কম্পিউটারে কিবোর্ড ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে সংযুক্ত করতে হয়। কিবোর্ড ও কম্পিউটারের মধ্যে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। এই যোগাযোগ প্রক্রিয়া মূলত উভয় দিকে হয়ে থাকে। একে বলে **'বাই-ডাইরেকশনেল কমিউনিকেশন'** [bi-directional communication]। এর অর্থ কম্পিউটার ও কিবোর্ড একই সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদান করতে সমর্থ। কিবোর্ডের সিগনাল কম্পিউটার গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত কি না তা আগে জানার দরকার। যতক্ষণ পর্যন্ত কম্পিউটার তথ্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত কিবোর্ড সিগনাল ধরে রাখবে। এভাবে কম্পিউটারের কিবোর্ড থেকে তথ্য প্রসেসরে যায়।

৪. হার্ড ডিস্ক

ইতোমধ্যে আমরা এ পেরিফেরল সম্পর্কে একাধিকবার উল্লেখ করেছি। একটি কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র এটি। কম্পিউটারের অভ্যন্তরে এই হার্ড ডিস্ক থাকে। অবশ্য প্রয়োজনে বাইরে রেখেও তারের মাধ্যমে সংযুক্ত করে চালনা সম্ভব। আজকাল হার্ড ড্রাইভ বা ডিস্ক মোবাইল স্টোরেজ যন্ত্র হিসাবে আর ব্যবহৃত হচ্ছে না। এখন ব্যবহৃত হয় সিডি রম, ডিভিডি ও ফ্ল্যাস ড্রাইভ। আমরা এগুলোর উপর আলোচনা পরবর্তীতে করবো।



বায়ের চিত্রে আমরা ডিস্কের বিভিন্ন অংশ দেখতে পাচ্ছি। এখন এসব অংশের উপর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা একে একে তুলে ধরছি। আয়নার মতো এলুমিনিয়াম কিংবা কাচের তৈরী প্লাটার [platter] কম্পিউটার **'অন'** [ON] অবস্থায় অনবরত ঘুরতে থাকে। চিত্রে সংখ্যা ১ দ্রঃ। প্লাটার একটি মসৃণভাবে চলন্ত স্পিন্ডলের [spindle] উপর স্থাপিত [চিত্রে সংখ্যা ২]। এটার ঘূর্ণন সহজ করা হয়েছে পিচ্ছিল তৈল-পরিপূর্ণ বিয়ারিংয়ের মাধ্যমে। স্পিন্ডলকে ঘুরানোর জন্য আছে খুব

দ্রুতগতিসম্পন্ন একটি মোটর। প্লাটার হিসাবে কাচের ব্যবহার নোটবুক বা ল্যাপটপে বেশ উপযোগী। এতে হার্ড ড্রাইভের প্রস্থ অনেকটা পাতলা করা সম্ভব, যা এ ধরনের কম্পিউটারের জন্য জরুরী। অপরদিকে অপেক্ষাকৃত গাঢ় এলুমিনিয়াম প্লাটার শক্ত, তাই টাওয়ার কম্পিউটারে এরূপ প্লাটারের ব্যবহার দেখা যায়।

চিত্রে সংখ্যা ৩ দ্বারা দেখানো হয়েছে পাতলা **'একশূয়েটার আর্ম'** [actuator arm]। প্লাটারের অপরদিকেও এরূপ একটি হাত আছে। এগুলো স্থাপিত হয়েছে **'পিভট মেকানিজমের'** [pivot mechanism] উপর [চিত্রে সংখ্যা ৪]। হাতের মাথায় স্থাপিত আছে **'ড্রাইভ হেড'** [drive head], চিত্রে সংখ্যা ৫। এই ড্রাইভ মাথার ডিজাইন এমন যে, যখন প্লাটার দ্রুত গতিতে ঘুরতে থাকে তখন এটা একটু উপরে ওঠে আসে এবং উড়ন্ত অবস্থায় থাকে। যে থিওরীর উপর ভিত্তি করে এটি ডিজাইন হয়েছে তাকে বলে **'বেরনোলি'জ প্রিন্সিপাল'** [Bernoulli's principle]। এই থিওরীর অর্থ হলো দ্রুত ঘুর্ণনের ফলে উপরের দিকে বাতাসে চাপের সৃষ্টি হয়। এই চাপের ফলে আর্মের মাথা সামান্য উপরের দিকে উঠে আসে।

প্লাটারের উপরিভাগ খুব পাতলা ফিল্ম দ্বারা লেপা আছে। চুম্বকীয়ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল কণায় পরিপূর্ণ থাকে পুরো ডিস্কটি। ঐ পাতলা ফিল্ম এগুলোকে স্থিত রাখে। চুম্বকীয় এসব কণাই ডাটা সংরক্ষণের কাজ আঞ্জাম দেয়। পজিটিভ ও নেগিটিভ চার্জসম্পন্ন কণা তথ্য সংরক্ষণের মূল। ঠিক যেভাবে টেপ রেকর্ডারের ক্যাসেটে চুম্বকীয়ভাবে তথ্য [শব্দ] সংরক্ষিত থাকে। তথ্য **'লোখার'** অর্থ হলো কয়েলের মধ্যে কারেন্ট চালনা করে এসব কণার চার্জ পরিবর্তন করা। মূলত ড্রাইভের মাথা কণাগুলো প্রয়োজনমাফিক **'ওলটপালট'** করে মাত্র।

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে হার্ড ডিস্কে তথ্য **'লিখে'** রাখার উপর আমাদের কিছুটা ধারণা হলো। এখন জেনে নিই ঠিক কোন্ উপায়ে উপরে বর্ণিত ওলটপালট কাজটি সংঘটিত হয়। ডিস্ককে ফরমেট করতে হয় প্রথমে। এর অর্থ সবকিছু মুছে নতুন তথ্য লিখার জন্য প্রস্তুত করা। এটা কম্পিউটার এসেম্বলীর সময় করা হয়ে থাকে। ফরমেট করা প্লাটার অসংখ্য **'ট্রাক'**এ [track] ভাগ করা হয়। চিত্রে সংখ্যা ৬ দ্রঃ। এছাড়া অসংখ্য **'সেক্টরে'** [sector] ভাগ করা জরুরী [চিত্রে সংখ্যা ৭]। ফরমেটিংয়ের সময় **'উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম'** [windows operating system] এসব ট্রাক সেক্টরকে অনেকগুলো দলে বিভক্ত করে। এগুলোকে বলে **'ক্লাস্টার'** [cluster]- চিত্রে সংখ্যা ৮ দ্রঃ। যে কোনো ফাইল সর্বনিম্ন কী পরিমাণ স্থান দখল করবে এই ক্লাস্টার দ্বারা তা নির্ধারিত হয়। এতে এটাই বুঝা যায়, ক্লাস্টার সাইজ যতো কম হবে মেমোরীর স্থান ততো কম অকেজো থাকবে। প্লাটারের আরেক এলাকার নাম **'ল্যান্ডিং এরিয়া'** [landing area]। চিত্রে সংখ্যা ৯ দ্বারা এটা দেখানো হয়েছে। কেন্দ্রের হাবের নিকটে এ স্থানটির জায়গা। এখানে নিষ্ক্রিয় থাকাবস্থায় লেখার মাথা অবস্থান করে। এ এলাকা **'পার্কিং স্থান'** হিসাবে ধরে নিতে পারি আমরা। এখানে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় **'পড়ার হাতে'**র মাথা **'পার্ক'** করা থাকে।



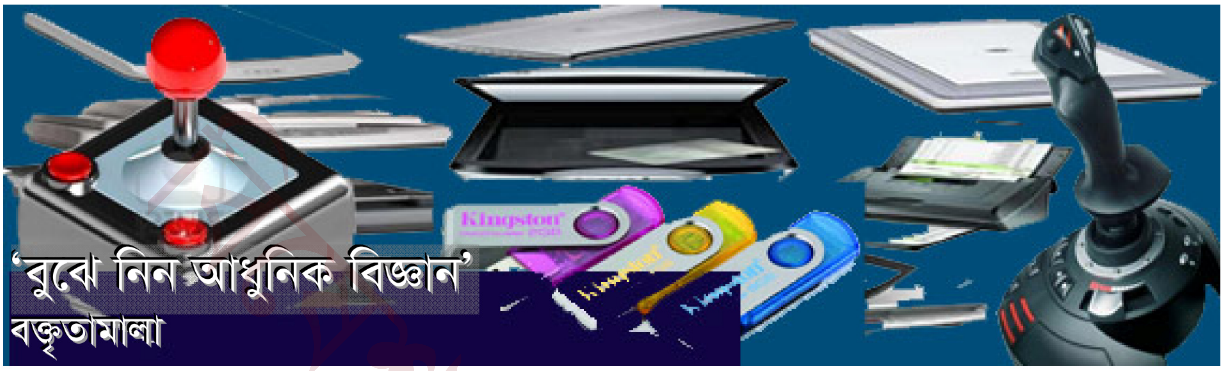
কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী একটি লেকচারে হবে) কর্তৃক নির্দেশ মুতাবিক উপরোক্ত 'actuator arm' বা তথ্য পড়া-লেখার হাত তার কাজে লেগে যায়। উপরের [প্রথম] চিত্রে এই যোগাযোগ সূত্র ১০ সংখ্যা দ্বারা দেখানো

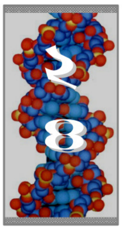
হয়েছে। একে বলে **'ইন্টারফেইস'** [interface]। ঠিক কিভাবে হাতটি নির্দেশ মান্য করে?

ধরুন আপনি মাইক্রসফ্‌ট ওয়ার্ডে একটি ফাইল লিখে তা সংরক্ষণের জন্য **'সেইভ'** [save] করবেন। আপনি সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়ার পরই একটি **'লিখো'** [write] কমান্ড তথ্যসহ অপারেটিং সিস্টেম প্রেরণ করবে ইন্টারফেইসের মাধ্যমে লিখার হাতে। এটা ঘুরে চলে যাবে এই ফাইলের [যদি আগেই সংরক্ষণ হয়ে থাকে] ট্র্যাকে। ডিস্ক আর্মের নীচে ঘুরে আসলেই লিখে নেবে। ডিস্কের যাবতীয় ফাইল **'ডাইরেক্টরী টেবিল'** [directory table] নামক একটি ডাইরিতে সংরক্ষিত থাকে যাতেকরে সহজে তা বের করা সম্ভব হয়। কোনো **'পড়ো'** [read] নির্দেশ আসলে ড্রাইভ এই টেবিলে খোঁজ করে তা পড়ার জন্য হাতকে জানায়। হাত সেখানে পৌঁছে তা পড়ে অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে সফ্‌টওয়্যারে পাঠিয়ে দেয়- যা এই তথ্য ব্যবহার, প্রদর্শন ইত্যাদি করে। আর এভাবেই তথ্য সংরক্ষণকারী ডিস্ক, অপারেটিং সিস্টেম ও সফ্‌টওয়্যারের মধ্যে সংরক্ষিত ডাটা আদান-প্রদান হয়।

প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! আজকের লেকচারে আমরা কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ চারটি পেরিফেরল তথা ডিসপ্লে ইউনিট, মাউস, কিবোর্ড ও হার্ড ডিস্কের উপর বেশ কিছু আলোচনা করলাম। আমি আশারাখি এ থেকে সকলেই উপকৃত হয়েছেন। এক্সপার্ট তো হন নি- তবে অন্তত আগের থেকে এখন আপনারা কম্পিউটারের এসব কঠিন যন্ত্রাংশ সম্পর্কে অনেকটা বেশী ওয়াকিফহাল- এটুকু বলা যায়। ঠিক না? যাক, আগামী লেকচারে আরো ক'টি পেরিফেরল সম্পর্কে আলোচনার আশা ব্যক্ত করে আজকের লেকচার শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বক্তৃতা ২৪ : আধুনিক প্রযুক্তি

১০. ব্যক্তিগত কম্পিউটার [পিসি]

১০.খ. কঠিন যন্ত্রাংশ [hardware] : পেরিফেরলস্

আধুনিক বিজ্ঞানের উপর পরিচিতিমূলক লেকচারের ২৪তম সংযোজনে সবাইকে জানাচ্ছি উষ্ণ স্বাগত। কম্পিউটার প্রযুক্তির উপর আমরা গেল দু'টি লেকচারে অনেক বলেছি। তবে আরো বাকী আছে! কম্পিউটারের মূল যন্ত্রাংশের নাম **'মাদারবোর্ড'** [motherboard]। এর সঙ্গে বিভিন্নভাবে সংযুক্ত হয়ে কাজ করে এমন অনেক যন্ত্র আছে যাদেরকে কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা **'পেরিফেরল'** [peripherals] বলে সম্বোধন করেন। আমরা ইতোমধ্যে চারটি পেরিফেরল সম্পর্কে কিছুটা তথ্য তুলে ধরেছি। এখন আরো কয়েকটির উপর আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

৫. জয়স্টিক

আপনাদের অনেকেই হয়তো এই বিশেষ পেরিফেরল সম্পর্কে অবগত নন- থাকার কথাও নয়। এটি মূলত কম্পিউটারে **'গেম্‌স'** খেলার একটি যন্ত্র। আপনাদের তুলনায় অল্প বয়স্কদের নিকট অবশ্যই **'জয়স্টিক'** [joystick] বলতে কি বুঝায় তা ভালোভাবে জানা আছে। কম্পিউটারের গেম্‌স একটি **'নেশা'** হিসাবে ধরে নিয়েছেন অনেকে। ছোট থেকে বড়দের অনেকেই এই নেশা থেকে মুক্ত নন- অন্তত পশ্চিমা দেশের সর্বত্র এ কথাটি সত্য হিসাবে বিবেচিত ও প্রমাণিত। যাক জয়স্টিকের কাজ অনেকটা মাউসের মতোই। তবে এই যন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রাফিক্যাল

বস্তু যেমন গাড়ি, মোটরসাইকেল, মহাকাশযান, গোলা-বারুদ, বন্দুক, মেশিনগান, বিমান পরিচালনা, বোমা নিক্ষেপ, ফুটবল, টেনিস বল, ক্রিকেট বল ইত্যাদি চলন্ত জিনিসকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেকটা সহজ। কিভাবে? এক্ষুণি এ প্রশ্নের উত্তর আমরা জেনে নেবো।



কয়েকটি জয়স্টিক

মৌলিক ডিজাইন: উপরের চিত্রে কয়েক ধরনের জয়স্টিক দেখানো হয়েছে। ব্যবহারকারীর নিকট উপরের দৃশ্যত অংশটি জরুরী- যেমন, একটি মোটা লাঠি ও এর মধ্যস্থ বোতামগুলো। এগুলো নাড়াচাড়া ও টিপ দিয়ে সামনের ডিসপ্লে ইউনিট বা মনিটরে দৃশ্যমান গ্রাফিক্স নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তবে আসল প্রযুক্তি লুকানো থাকে বাক্সের অভ্যন্তরে। সেখানে আছে একাধিক **'ইলেকট্রনিক সার্কেট'** [electronic circuit]। কারেন্ট কোন্ দিকে কি পরিমাণ কতক্ষণ চলমান আছে বা নেই- তাই নির্ধারণ করে দৃশ্যত বস্তুটি [যা জয়স্টিক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত] কোন্ দিকে কোন্ গতিতে কতো সময় চলবে। যখন লাঠি স্থির থাকে তখন কোনো কারেন্ট চলে না। সুতরাং জয়স্টিকের নিয়ন্ত্রণে থাকা বস্তুটিও স্থির থাকবে। গেম্স ডিজাইনাররা জয়স্টিকের বিভিন্ন বোতামের ফাংশন কাজে লাগান। যেমন বায়ের লাল বোতামের অর্থ বন্দুকের গুলি, সবুজটির অর্থ গাড়ির ব্রেক কষা, নীলটি মানে উচ্চগতিতে চলা ইত্যাদি। জয়স্টিক সাধারণত ইউএসবি তারের মাধ্যমে কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। নীচে আরো একটি জয়স্টিকের ছবি তুলে ধরেছি।



৬. প্রিন্টার

কম্পিউটারের এই পেরিফেরলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার লেখা, আর্টওয়ার্ক, ডিজাইন ইত্যাদি **'বাইরে'** প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম হলো এই প্রিন্টার যন্ত্রটি। এছাড়া বই, পুস্তকসহ, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি **'প্রিন্টেড মিডিয়া'** [printed media] বলতে যা-ই বুঝায় তা সবই এই প্রিন্টারের উপর নির্ভরশীল। আর আজকাল **'যাবতীয় প্রিন্টেড মিডিয়া'** মূলত কম্পোজ ও ডিজাইন হয় কম্পিউটারের মাধ্যমে। তিন ধরনের প্রিন্টার আছে: **১.** পুরাতন ডট-মেট্রিক্স, ২. আধুনিক ইঙ্কজেট ও **৩.** সর্বাধুনিক লেইজার।



ডট-মেট্রিক্স প্রিন্টারের ব্যবহার আজকাল নেই বললেই চলে। প্রাথমিক যুগে এগুলো ব্যবহৃত হতো। প্রিন্টাররা সাধারণত প্রিন্ট-হেড নামক অংশ দ্বারা প্রিন্ট করার কাজটি করে থাকে। এই প্রিন্ট-হেডে ৭-পিন, ৯-পিন, ২৪-পিন ইত্যাদি সংখ্যক পিন বা সূঁই ব্যবহৃত হতো এসব প্রিন্টারে। নীচের চিত্রের দিকে খিয়াল করলে বিষয়টি বুঝা যাবে সহজে। এসব প্রিন্টার নীচে কাপড়ের তৈরী কালিমাখা রিবোনের উপর দ্রুত আঘাত হেনে কাগজে ছাপ দিয়ে অক্ষর, ছবি ইত্যাদি প্রিন্ট করতো।

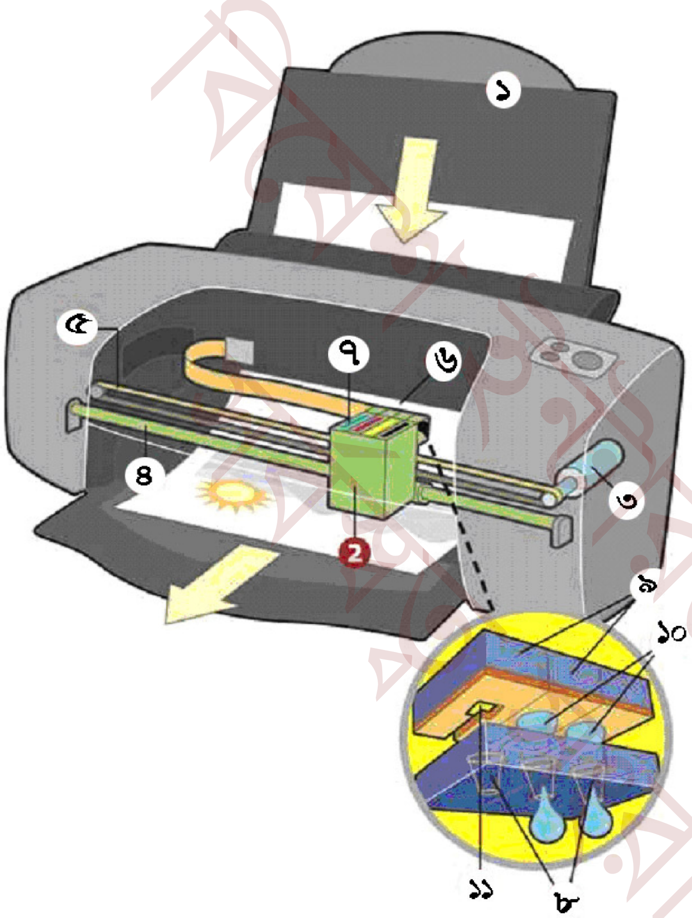
ডানের ছবিতে আমরা তিন ধরনের **'প্রিন্ট-কুয়ালিটি'** [print quality] দেখতে পাচ্ছি। লক্ষ্য করুন সর্বাধুনিক লেইজার প্রিন্ট কুয়ালিটি কতো উচ্চ মানের।

This is an example
of dot-matrix printed
text (9-pin).

This is an example
of dot-matrix printed
text (24-pin).

This is an example of text
printed on a Ricoh PC Laser
6000 laser printer.

আধুনিক ইঙ্কজেট প্রিন্টার: আধুনিক যুগে সর্বাধিক ব্যবহৃত এই গতিশীল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন উচ্চমানের প্রিন্টারের উপর আমরা যেটুকু সম্ভব তথ্যাদি তুলে ধরার ইচ্ছা রাখি। এ লক্ষ্যর্জনে শিক্ষার্থীদের প্রতি অনুরোধ, নিম্নোক্ত ছবিটির প্রতি খিয়াল রাখবেন পরবর্তী লেখাটুকু পাঠের সময়। ছবিতে ১ থেকে ১২ পর্যন্ত ইংরেজী সংখ্যা দ্বারা প্রিন্টারের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করা হয়েছে। আমরা একে একে এসব অংশের কাজ কি তা জেনে নেবো।

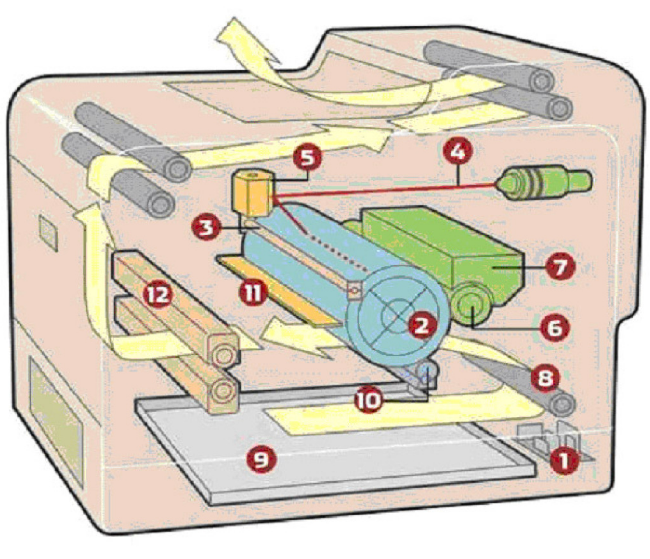


আপনার পিসি'তে **'প্রিন্টার ড্রাইভার'** [print driver] নামক একটি সফ্টওয়্যার আছে। আপনি যখন কোনো ডকুমেন্ট প্রিন্ট করতে ইচ্ছে করেন, এই ড্রাইভার তথ্য প্রেরণ করে দেয় প্রিন্টারে। উপরের চিত্রাঙ্কনে আমরা ইঙ্কজেট প্রিন্টারের ১১টি অংশ চিহ্নিত করেছি। প্রয়োজনে এগুলোর ব্যাখ্যা তুলে ধরবো আলোচনাকালে। প্রিন্টারের অভ্যন্তরস্থ ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রিন্টিং কাজ শুরুর সময় **'পেপার ট্রে'** [paper tray -চিত্রে সংখ্যা ১ দ্বারা চিহ্নিত] থেকে রোলার একটি কাগজ টেনে নিয়ে যায়। যে মূল যন্ত্রাংশ প্রিন্টিং কাজটি করে থাকে তার নাম **'প্রিন্ট হেড'** [print head]। এর অপর নাম **'ক্যাট্রিজ এসেম্বলী'** [cartridge assembly] - চিত্রে সংখ্যা ২। রোলার কাগজকে নিয়ে যায় ক্যাট্রিজের নীচে। সাথে সাথে **'প্রিন্ট হেড স্টেপার মটর'** [print head stepper motor] তার কার্য শুরু করে। সে প্রিন্টহেডকে একটি **'স্লাইডিং রড'** [sliding rod -চিত্রে সংখ্যা ৩ দ্বারা চিহ্নিত] এর উপর দিয়ে চলন্ত করে নিয়ে যায় তার শুরুর অবস্থানে। এই কাজে সাহায্য করে একটি **'বেল্ট'** [belt] - চিত্রে সংখ্যা ৪।

মূল প্রিন্টিং যন্ত্র **'প্রিন্ট হেড'** [print head -চিত্রে সংখ্যা ৬ দ্বারা চিহ্নিত] অত্যাশ্চর্য ক্ষুদ্রাকার প্রযুক্তি [miniaturization technology]। এই ছোট্ট যন্ত্রাংশই আসল প্রিন্টিং কাজটি করে থাকে। কোনো কোনো প্রিন্টারে প্রিন্টহেড ও **'ইঙ্ক ক্যাট্রিজ'** [ink cartridge -চিত্রে সংখ্যা ৭ দ্বারা চিহ্নিত] একই ইউনিটে যুক্ত থাকে। প্রিন্টহেডের ক্ষুদ্রকায় **'নজোল্‌স'** [nozzles -চিত্রে সংখ্যা ৮] দিয়ে বেরিয়ে আসে কালি। নজোলের সংখ্যা কয়েক ডজেন থেকে হাজার হাজার পর্যন্ত হতে পারে- যা নির্ভর করবে আপনার প্রিন্টার মডেলটির উপর। খুব ছোট্ট **'ইঙ্ক চেম্বার'** [ink chamber -চিত্রে সংখ্যা ৯] থেকে কালি নজোলের মাধ্যমে বেরিয়ে এসে কাগজে পতিত হয়। এসব ক্ষুদ্রকায় চেম্বারে কালি সরবরাহ হয় ক্যাট্রিজের সংরক্ষিত জায়গা থেকে। সেখানে কালি জমা থাকে। একে ৎবংবৎড়রৎ বলে। খুব ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রকায় কালির ফোটা [microscopic droplets -চিত্রে সংখ্যা ১০] যাদের আয়তন এক লিটারের কোটি কোটি অংশের একাংশ মাত্র উক্ত নজোলের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে। কিন্তু কিভাবে? পাম্প দ্বারা এরূপ কাজ সম্ভব নয়।

একমাত্র **'এপসন'** [Epson] প্রিন্টার তৈরীর কোম্পানী ছাড়া অধিকাংশ প্রিন্টার প্রস্তুতকারক যে প্রযুক্তির মাধ্যমে উপর্যুক্ত কাজটি সারেন তাকে বলে **'থারমেল টেকনোলজি'** [thermal technology]। এ প্রযুক্তির মূলে আছে কালির চেম্বারে স্থাপিত একটি ছোট্ট ইলেকট্রিকেল **'রেজিস্টার'** [register -চিত্রে সংখ্যা ১১]। প্রয়োজনে কারেন্ট দ্বারা এতে সৃষ্টি করা হয় পাল্‌স [স্পন্দন]। এর ফলে উচ্চ তাপে কালি ভীষণভাবে গরম হয়ে ওঠে। কালির ফোটার একাংশ বাষ্পে পরিণত হয়। এতে সৃষ্টি হয় চাপ, যার ফলে কালি বাধ্য হয়ে বেরিয়ে এসে আপনার কাগজে পতিত হয়। একই কাজ আঞ্জাম দিতে এপসন কোম্পানী ভিন্ন একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। এই প্রযুক্তির নাম **'পিজোইলেকট্রিক এফেক্ট'** [piezoelectric effect]। কালির চেম্বারে রাখা থাকে একটি ক্রিস্টেল। প্রয়োজনে এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত করা হয়। এতে শুরু হয় কম্পন, যার পরিণতিতে কালি নজোল দিয়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। এভাবে কাগজে কম্পিউটারের লেখা, ছবি, গ্রাফিক্স ইত্যাদি সঠিকভাবে রঙ্গিন [বা সাদা-কালো] কালিতে অঙ্কিত হয়। কোথায় কোন্ স্থানে কতটুকু কোন্ রঙের কালি অঙ্কিত হবে তা ড্রাইভার সফ্‌টওয়্যার, প্রিন্টারের প্রিন্টহেড ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক সার্কেট নিয়ন্ত্রণ করে।

লেইজার প্রিন্টার: এই অত্যাধুনিক দ্রুত গতিশীল প্রিন্টার সম্পর্কে আলোচনাকালে শিক্ষার্থীরা নীচের ড্রইংটির দিকে দৃষ্টি রাখবেন- এটুকু অনুরোধ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনার কম্পিউটার লেইজার প্রিন্টারের **'কন্ট্রোলার সার্কেট'** [controller circuit -চিত্রে সংখ্যা ১ দ্বারা চিহ্নিত] এর সঙ্গে কথা বলে থাকে। কম্পিউটারের **'প্রিন্টার ড্রাইভার'** [printer driver] থেকে প্রাপ্ত ছবি, চিত্র ও লেখা তথ্যাদি **'রাস্টার ইমেজ প্রসেসর- আরআইপি'** [raster image processor - RIP] চীপ পরিবর্তন করে খুব ক্ষুদ্রকায় বিন্দুতে পরিণত করে। ঠিক কোথায় কতটুকু কি পরিমাণ কালি কাগজে ছাপতে হবে সে তথ্যও আরআইপি সরবরাহ করে থাকে। তবে যন্ত্রাংশ দ্বারা ছবি অঙ্কিত হবে সেটা হলো **'ফটো কন্ডাক্টিং ড্রাম'** [photo conducting drum -চিত্রে সংখ্যা ২]। এটা একটি বিশেষভাবে লেপা সিলিন্ডার। একটি **'চার্জিং রোলার'** [charging roller -চিত্রে সংখ্যা ৩ দ্বারা চিহ্নিত] থেকে ফটোকন্ডাক্টিং ড্রামে ধণাত্মক কিংবা ঋণাত্মক [positive or negative] চার্জ আসে। এদিকে একটি **'লেইজার অংশুজাল'** [laser beam -চিত্রে সংখ্যা ৪] এক টুকরো ঘূর্ণনরত আয়না [spinning mirror -চিত্রে সংখ্যা ৫] থেকে প্রতিবিম্ব হয়ে খুব দ্রুত অন/অফ হতে থাকে। এর দ্বারা ড্রামের চার্জগুলো **'স্কান'** [scan] হয়। যখন অংশুজাল অন হয় তখন ড্রামের চার্জকৃত ক্ষুদ্র বিন্দুকে বিপরীত [negative] করে দেয়। এতে এটাই বুঝাচ্ছে, এই বিন্দুটি কালো হবে। আর অফ থাকলে সে বিন্দুটি হবে সাদা। এভাবে পুরো একটি লাইন লেইজার দ্বারা দ্রুত স্ক্যান হওয়ার পর একটি **'স্টেপার মটর'** [stepper roller] ড্রামকে এগিয়ে নেয়। লেইজার এবার পুরো ক্রিয়া পুনরায় শুরু করে। এভাবে সম্পূর্ণ ইমেজ স্ক্যান হয়ে যায়- আর তা হবে খুব দ্রুত।



এবার ড্রামের লেইজার-চুমুক অংশটুকু **'ডেভোলাপার রোলার'** [developer roller -চিত্রে সংখ্যা ৬ দ্বারা চিহ্নিত] এর সঙ্গে একত্রিত হয়। এই রোলারে লেপা থাকে ক্যাট্রিজের **'টৌনার হপার'** [toner hopper -চিত্রে সংখ্যা ৭] নামক অংশ থেকে প্রাপ্ত চার্জহওয়া কণা [কালি]। ড্রামের অ-চার্জসম্পন্ন এলাকায় এসব চার্জহওয়া টৌনার

কণাগুলো **'আটকে'** থাকে। এর দ্বারাই সৃষ্টি হয় আপনার লেখা, চিত্র বা ছবি।

অপরদিকে, একই সময় একটি **'বেল্ট'** বা **'রোলার এসেম্বলী'** [roller assembly -চিত্রে সংখ্যা ৮ দ্বারা চিহ্নিত] এক টুকরো কাগজ **'পেপার ট্রে'** [paper tray -চিত্রে সংখ্যা ৯] থেকে তুলে নিয়ে আসে। কাগজ টুকরো ওঠে আসার সময় **'ট্রান্সফার রোলার'** [transfer roller] বা **'চার্জিং ওয়ের'** [charging wire -চিত্রে সংখ্যা ১০] হয়ে আসে। এই রোলার বা ওয়েরের কাজ হলো টৌনারের বিপরীতধর্মী চার্জ দ্বারা কাগজকে চার্জসম্পন্ন করা। এখন কাগজটি ড্রামের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সময়। ড্রামের টৌনার এবার কাগজে চিত্র, লেখা ও ছবি হিসাবে প্রতিস্থাপন হবে। এরপর একটি **'ক্লিনিং ব্লেড'** [cleaning blade -চিত্রে সংখ্যা ১১ দ্বারা চিহ্নিত] সক্রিয় হয়ে ড্রামকে পরিষ্কার করে নেয়। সুতরাং পরবর্তী ইমেজ প্রিন্টিং পুনরায় শুরু হতে পারে। পুরো প্রসেসটি একটি সুষ্ঠু চক্রাকার উপায়ে সংঘটিত হয়। এভাবেই লেইজার প্রিন্টার তার কাজ সারে। রঙিন লেইজার প্রিন্টারও অনুরূপ কাজ করে। সে ক্ষেত্রে কাগজ টুকরো চারটি ভিন্ন ড্রাম থেকে ইমেজ সংগ্রহ করতে হবে। চার রঙ মিলেই পূর্ণ রঙিন প্রিন্ট হয়ে থাকে। নীচে একটি রঙিন লেইজার প্রিন্টারের ছবি তুলে ধরেছি।

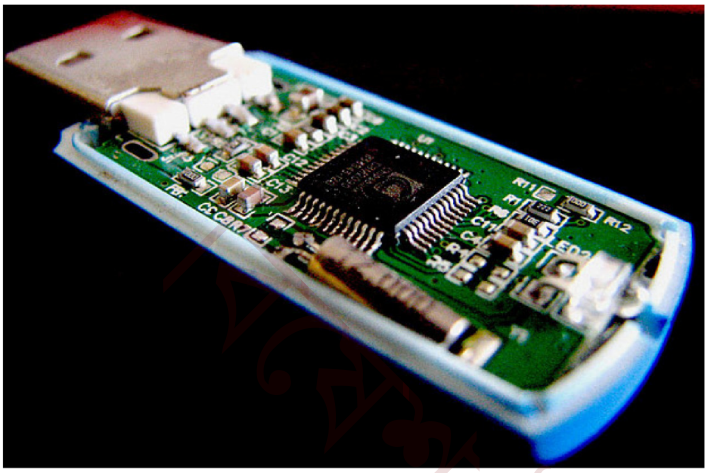


৭. ফ্ল্যাস ড্রাইভ

আজকের লেকচারের ইতি এখানে টানতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু এখনও আরো ৫টি পেরিফেরল নিয়ে আলোচনার দরকার। এগুলো হলো ফ্ল্যাস ড্রাইভ, সিডি রম, মডেম, স্কানার ও লাইট পেন। আজকের লেকচারে এর প্রথমটি নিয়ে যাকিছু প্রয়োজন তথ্যাদি তুলে ধরা জরুরী মনে করছি। আগামী লেকচারে বাকীগুলোর উপর বলবো ইনশাআল্লাহ।

আজকাল ফ্ল্যাস মেমোরী যন্ত্র সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছেঃ ভিডিও গেইম থেকে ডিজিটেল ক্যামেরায়। উচ্চ গতি, ক্ষুদ্র আয়তন ও স্থির শক্ত যন্ত্রাংশ এবং সেসাথে মূল্যের স্বল্পতা হেতু ফ্ল্যাস মেমোরী হয়ে ওঠছে বেশি থেকে বেশি জনপ্রিয়। ফ্ল্যাস টেকনোলজির এই অভূতপূর্ব সফলতা এক যোগে জনপ্রিয় ফ্লপি ড্রাইভকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। এখন এ যন্ত্রটি আর কেউ ব্যবহার করেন না। আর চলন্ত কোন অংশ না থাকায় ফ্ল্যাস মেমোরী যন্ত্র **'ইউএসবি ড্রাইভ'** [USB drive] কম্পিউটার বিজ্ঞানের ভাষায় একটি **'সলিড-স্টেট স্টোরেজ মিডিয়াম'** [solid-state storage device] হিসাবে স্বীকৃত। অর্থাৎ কঠিন অবস্থাসম্পন্ন সংরক্ষণ মাধ্যম।





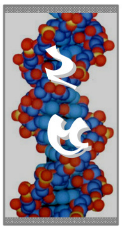
বায়ের চিত্রে ইউসএসবি ড্রাইভের অভ্যন্তর দেখা যাচ্ছে। এসব ড্রাইভের মধ্যে চারটি মৌলিক অংশ আছে। এগুলো হলো: ১ **‘ইউএসবি কানেক্টার’** [USB connector] - ইউনিভার্সাল সেরিয়েল বাস সংযুক্তি। এই যন্ত্রাংশের মাধ্যমে ড্রাইভটি সরাসরি কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ২. **‘ইউএসবি ম্যাস স্টোরেজ কন্ট্রোলার’** [USB mass storage controller] - তথ্য নিয়ন্ত্রক। এতে আছে রম ও র‍্যাম [ROM and RAM] চীপ। ৩. তথ্য সংরক্ষণের জন্য **‘এনএএনডি ফ্ল্যাস মেমোরী চীপ’** [NAND Flash memory chip] - কম্পিউটারের লজিকেল অপারেটর যার বৈশিষ্ট্য হলো শুধুমাত্র আউটপুট সিগনাল সৃষ্টি করা এরূপ একটি চীপ। NAND অর্থ ‘not+and’। কম্পিউটার বিজ্ঞানের লজিকেল অপারেটরের গুরুত্ব অপরিসীম। পরবর্তীতে আমরা সফ্টওয়্যার নিয়ে আলোচনাকালে এ সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য তুলে ধরবো। ৪. একটি **‘ক্রিস্টেল অসিলেটর’** [crystal oscillator]। এর কাজ হলো ড্রাইভ থেকে বেরিয়ে আসা [আউটপুট] তথ্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা।

ফ্ল্যাস মেমোরীর মূলে আছে গ্রিড [কলাম ও সারি] ডিজাইন। যেমনটি আপনি দেখতে পান, আর্টওয়ার্ক ডিজাইন প্রোগ্রামে। প্রত্যেক গ্রিডের মিলনস্থলে [ইন্টারসেকশনে] আছে দু’টি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ট্রানজিস্টার। এগুলো মূলত ইলেকট্রনিক সূইচ। এ দু’টোকে যথাক্রমে **‘ফ্লোটিং গেইট’** [floating gate] এবং **‘কন্ট্রোল গেইট’** [control gate] বলে। এসব কম্পিউটার বিজ্ঞানের শব্দের অর্থ এ মুহূর্তে আপনার আমার জানার দরকার নেই। কথা প্রসঙ্গে বললাম মাত্র। তবে এই উভয় ট্রানজিস্টারের মধ্যখানে আছে একটি পাতলা **‘অক্সাইড লেয়ার’** [oxide layer]। সূইচিংয়ে যাতে সর্ট-সর্কেট না ঘটে তা-ই এ ব্যবস্থা।

ফ্ল্যাস ড্রাইভে থাকে ইইপিআরঅএম [Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory - EEPROM] চীপ। এটাতেই উপরোক্ত গ্রিড ডিজাইন ব্যবহৃত হয়। উউচজঙগ-এ সংরক্ষিত তথ্য ব্লকে ব্লকে মুছে ফেলা যায় এবং নতুনভাবে সংরক্ষণও সম্ভব। ফ্ল্যাস ড্রাইভ থেকে যে কোন ফাইল সরাসরি পরিচালনাও সম্ভব- ঠিক যেভাবে আপনার কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভ থেকে হয়ে থাকে। ফাইলে সংরক্ষিত **‘সিগনেচার’** [signature] বা স্বাক্ষরিত তথ্য থেকে কম্পিউটারে সংরক্ষিত ফাইলের সঙ্গে সম্পৃক্ত **‘সফ্টওয়্যার প্রোগ্রাম’** এমনিতেই খুলে যায় ও তা পরিচালনা করে। মোটকথা, ইউএসবি ফ্ল্যাস ড্রাইভ- যার অপর নাম পেন ড্রাইভ একটি সুযোগসম্পন্ন সংরক্ষণ যন্ত্র। তবে প্রাথমিক যুগে এই যন্ত্রের মাধ্যমে **‘কম্পিউটার ভাইরাস’** [computer virus] অতি সহজে ট্রান্সফার হতো। আজকাল অবশ্য উন্নতমানের যন্ত্র বেরিয়েছে। আর এ্যান্টি-ভাইরাস সফ্টওয়্যার দ্বারা কম্পিউটার নিরাপদ রাখারও ব্যবস্থা সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। সুতরাং ফ্ল্যাস ড্রাইভ সহজে বাজার থেকে নিশ্চিহ্ন হবার নয়। প্রাথমিক যুগে এক, দুই গিগাবাইট পর্যন্ত মেমোরী এগুলোতে সংরক্ষণ করা যেতো। আজকাল ১২০ গিগাবাইট সংরক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন ড্রাইভ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বেশী থেকে বেশী মেমোরী সংরক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন ফ্ল্যাস ড্রাইভ বাজারে আসবে- এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আগামী লেকচারে সবার সাথে আবার দেখা হবে- এটুকু আশা রেখে আজকের এই দীর্ঘ আলোচনার ইতি টানছি। আল্লাহ হাফিজ।





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বক্তৃতা ২৫ : আধুনিক প্রযুক্তি

১০. ব্যক্তিগত কম্পিউটার [পিসি]

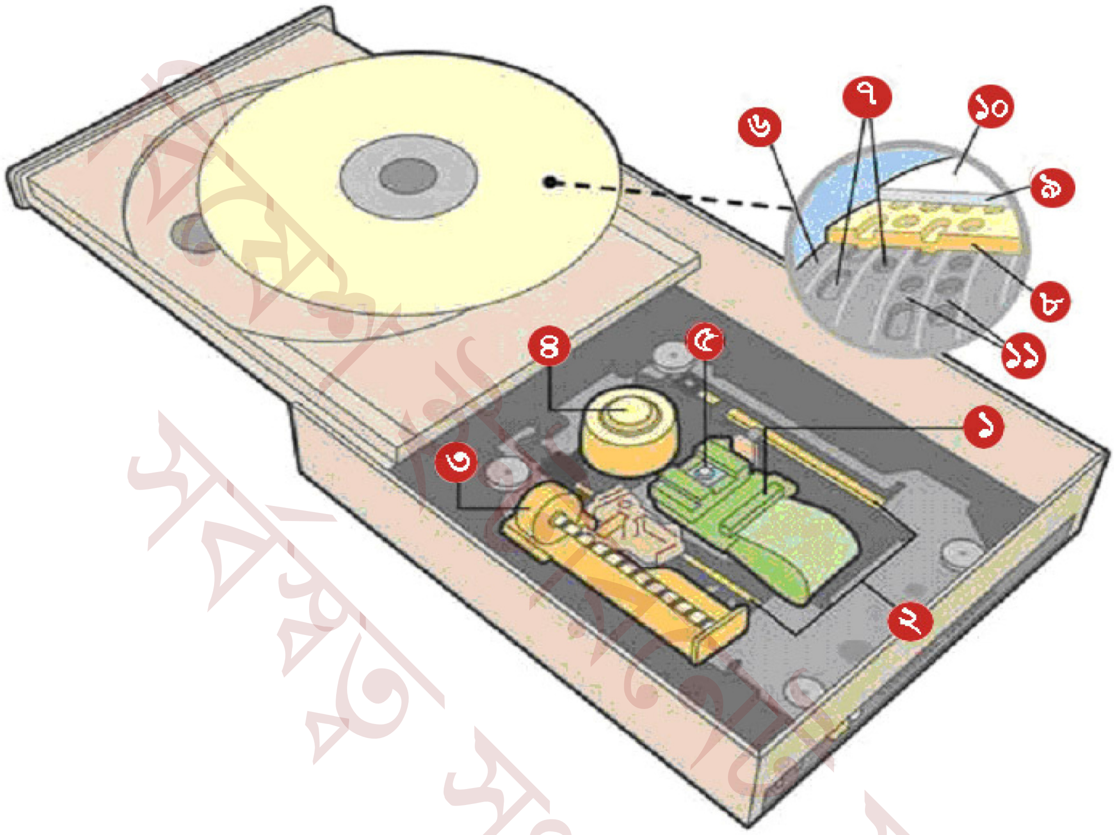
১০.খ. কঠিন যন্ত্রাংশ [hardware] : পেরিফেরলস্

বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান শীর্ষক বক্তৃতামালার এই ২৫তম সংযোজনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ইতোমধ্যে আমরা বেশ ক'টি লেকচার আধুনিক যুগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র কম্পিউটারের উপর প্রদান করে আসছি। আজো করবো। আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বপ্রধান যন্ত্র এটি, তাই আমরা এ সম্পর্কে যেটুকু সম্ভব জ্ঞানার্জন করার চেষ্টা চালাচ্ছি। আশারাখি এ পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে তা থেকে সকলেই কিছুটা হলেও উপকৃত হয়েছেন। তবে কম্পিউটার বিজ্ঞান একটি বিরাট বিষয়। আজকাল শুধু এই বিষয়ের উপর উচ্চতর ডিগ্রী ক্লাস হচ্ছে পৃথিবীর অসংখ্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে। যাক, কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের অংশ হিসাবে ১১টি যন্ত্র নিয়ে আলোচনা করছি। এগুলোকে বলে পেরিফেরল। ইতোমধ্যে ৭টি যন্ত্রের উপর বক্তৃতা শেষ হয়েছে। আজকের লেকচারে বাকী ৪টি সম্পর্কে আলোচনা করে শেষ করার আশা রাখি।

৮. সিডি রম

'সিডি রম' [compact disk read only memory -CD ROM] সিস্টেম মূলত তথ্য সংরক্ষণের একটি উপায়। যে ড্রাইভের দ্বারা সিডি পরিচালিত হয় তার নাম **'সিডি রম ড্রাইভ'** [CD ROM Drive]। ঠিক

কিভাবে এই ড্রাইভটি কাজ করে তা জানা দরকার। শিক্ষার্থীরা নীচের চিত্রের প্রতি খিয়াল রাখবেন। বিভিন্ন যন্ত্রাংশকে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করেছি সহজে বুঝার উদ্দেশ্যে।



প্রতিটি একবার মাত্র লেখা যায় এমন সিডি [writable CD] কিংবা বার বার লেখা যায় সে ধরনের সিডি [rewritable CD] জ্বালাতে [burn] হয়। এখানে জ্বালানো মানে পুড়ে ফেলা নয় অবশ্যই! তথ্যকে সিডিতে সংরক্ষণের প্রসেসকে বলে জ্বালানো। এ কাজটি আঞ্জাম দিতে ব্যবহৃত হয় একটি **‘লেইজার স্লেড’** [laser sled -চিত্রে সংখ্যা ১], যা চলন্ত থাকে **‘স্লাইডিং রেল’** [sliding rails -চিত্রে সংখ্যা ২] এর উপর। এটাকে চলন্ত করা হয় অবশ্য একটি **‘মটর’** [motor -চিত্রে সংখ্যা ৩] দ্বারা। **‘ডিস্ক হাব’** [disk hub -চিত্রে সংখ্যা ৪ দ্বারা চিহ্নিত] এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এটা চলন্ত থাকে। অপর আরেক পরিবর্তনশীল গতিসম্পন্ন একটি মটর থাকে হাবের নীচে। সেই মটর ডিস্ককে ঘুরানোর কাজটি সারে। লেইজার সূত্রে একটি লাইট প্রদানকারী ডাইওড [LED] আছে। এর কাজ হলো, একটি সূক্ষ্ম লেইজার অংশুজাল সৃষ্টি করা। এই অংশুজালকে একটি **‘লেন্স’** [lens -চিত্রে সংখ্যা ৫] দ্বারা ফোকাস করা হয়। লেইজারের ক্ষমতাকে বিভিন্ন লেবেলে নিয়ে ড্রাইভ দ্বারা তথ্যাদি **‘পড়া’** [যার জন্য প্রয়োজন নিম্ন লেবেলের পাওয়ার সেটিং] এবং **‘লেখা’** [যার জন্য দরকার উচ্চ পাওয়ার সেটিং] সম্ভব হয়।

এখন, ডিস্ক তো আপনারা সবাই দেখেছেন। এটি কিসের তৈরী? প্রথমত **‘পলিকার্বোনেট’** [polycarbonate -চিত্রে সংখ্যা ৬ দ্বারা চিহ্নিত] নামক শক্ত প্লাস্টিক দ্বারা এটি তৈরী করা হয়। ডিস্কের যেদিকে তথ্য সংরক্ষণ হবে তা আমাদের চোখে খুব মসৃণ মনে হলেও, আসলে তাতে আছে অতি ক্ষুদ্রকায় অসংখ্য **‘পিট’** [pits -চিত্রে সংখ্যা ৭]। এসব গর্তই তথ্য। ঠিক আগের যুগের লং প্লে রেকর্ডের মতো এগুলো খোদাই করা থাকে চক্রাকারে। এখানে উল্লেখ্য

যে, একই উপায়ে **'ডিভিডি রম'** [DVD ROM] তৈরী হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের গর্ত অনেকটা বেশী জড়ানো তাই তাতে সংরক্ষণ হয় অনেক বেশী পরিমাণ তথ্য। পলিকার্বোনেট সারফেসের উপর অতি পাতলা আরেকটি লেপ আছে। এ লেপ হতে হবে প্রতিবিম্ব গুণসম্পন্ন- তাই একে বলে **'রিফ্লেক্টিব মেটেরিয়েল'** [reflective material - চিত্রে সংখ্যা ৮ দ্বারা চিহ্নিত]। সাধারণত এটি এলুমিনিয়াম, রূপা কিংবা স্বর্ণের তৈরী হয়ে থাকে। এর উপরে আরেকটি **'প্রটেক্টিভ কোটিং'** [protective coating -চিত্রে সংখ্যা ৯] ও **'লেবেল সারফেস'** [label surface - চিত্রে সংখ্যা ১০] দেওয়া হয়।

ডিস্ক থেকে তথ্য **'পড়া'** [read]- এর অর্থ হলো লেইজার বীম ডিস্কের উপরিভাগে পতিত হয়ে ফিরে আসা। কিন্তু যদি এই আলোকরশ্মি মসৃণ অংশ তথা **'ল্যান্ড'** [land -চিত্রে সংখ্যা **১১** দ্বারা চিহ্নিত] এর মধ্য থেকে ফিরে আসে তাহলে তা থাকবে সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও অপরিবর্তিত। অপরদিকে তা যদি কোন **'পিট'** [pit] বা গর্তে পড়ে তাহলে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং এভাবেই ড্রাইভের ইলেকট্রনিক্স এই **'পিট-বনাম-ল্যাংড'** তথ্যকে বাইনারি কোডে [০ ও ১ হলো বাইনারি কোড - কম্পিউটার এ দু'টি সংখ্যা বুঝে যথাক্রমে সূইচ 'অন' বা 'অফ' হিসাবে] রূপান্তর করে দেয়।

শিক্ষার্থীরা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, তথ্য **'লেখা'** মানে ঐ গর্তগুলো লেইজার আলোকরশ্মি দ্বারা তৈরীর নামান্তর। যে মুহূর্তে আপনি একটি ডিস্ক ড্রাইভে ঢুকাবেন, সাথে সাথে ড্রাইভের সফ্টওয়্যার ডিস্কের ধরন সনাক্ত করবে। যদি এটা তথ্যশূন্য লেখার যোগ্য ডিস্ক হয় তাহলে লেইজার দ্বারা লেখার জন্য তা প্রস্তুত হবে। অপরদিকে যদি ডিস্কটিতে লেখা তথ্যাদি থাকে তাহলে তা ব্যবহারের জন্য আপনি কপি করে কম্পিউটারে নিয়ে আসতে পারেন কিংবা সরাসরি তা **'চালনা'** [run] করতেও পারবেন।

৯. মডেম

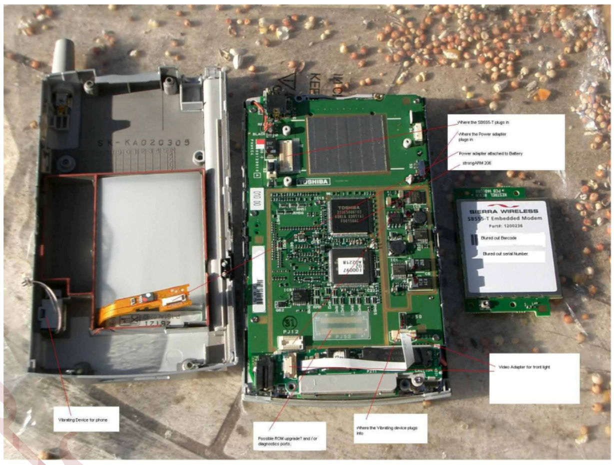
আপনারা সবাই নিশ্চয়ই **'মডেম'** [modem] কী তা জানেন। ইংরেজী 'modem' শব্দটি মূলত দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিতঃ modulate এবং demodulate। মডেমের কাজ ইন্টারনেটের সঙ্গে আপনার কম্পিউটারকে যুক্ত করা। ইন্টারনেটে যে তথ্য-সিগনাল থাকে তা আপনার **'ডিজিটেল'** কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে না। অপরদিকে আপনার পাঠানো কোনো **'ডিজিটেল'** সিগনাল ইন্টারনেটে যেয়ে পৌঁছবে না যদি না তা প্রথমে Analog সিগনালে পরিবর্তন করা না হয়। সুতরাং ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত সিগনালকে ধরে তা **'ডিজিটেল'** [digital] সিগনালে পরিবর্তন করা এবং কম্পিউটার থেকে ডিজিটেল সিগনালকে **'এ্যানালগ'** [analog] সিগনালে পরিবর্তন করে তা পাঠানো হলো মডেমের কাজ।



প্রত্যেক কম্পিউটারে হয় অভ্যন্তরীণ না হয় বহিঃস্থ একটি মডেম থাকতে হবে ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য। আজকাল প্রায় সব কম্পিউটারের অভ্যন্তরে মডেম যুক্ত থাকে। তবে কোনো টাওয়ার সিস্টেমে এখনও বহিঃস্থ মডেম যুক্ত থাকতে দেখা যায়। যাক, মডেম সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলার নেই। শুধু এটুকু পুনর্বার ব্যক্ত করবো, মডেম হলো ইন্টারনেটের সঙ্গে যে কোনো কম্পিউটার যুক্ত করার মাধ্যম। ল্যান্ড টেলিফোন বা মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যেসব তথ্য ইন্টারনেট থেকে

আসা-যাওয়া করে তা ডিজিটেল ও এ্যানালগ সিগনালে পরিবর্তন করাই এর কাজ। আমরা এখন আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কম্পিউটার পেরিফেরল নিয়ে আলোচনা করবো। এ যন্ত্রের নাম স্কানার।





১০. স্কানার

স্কানার [scanner] হলো ওসব হার্ডওয়্যার পেরিফেরল যার মাধ্যমে কাগজে ছাপাকৃত ছবি, লেখা ইত্যাদি চিত্র হিসাবে কম্পিউটারে নিয়ে যাওয়া হয়। কম্পিউটারে যে স্কানার ব্যবহৃত হয় তার নাম **'ফ্ল্যাটবেড স্কানার'** [flatbed scanner]। নিম্নে এরূপ একটি স্কানারের ছবি দিয়েছি।



ফ্ল্যাটবেড স্কানারের কয়েকটি অংশ আছে: **১. গ্লাস [glass], ২. আলোকসূত্র [light-source], ৩. সেন্সর [sensor]** ও **৪. ক্যারিয়ার [carrier]**। আমরা একে একে এগুলো উপর আলোচনা করবো।

১. গ্লাস [glass]: ফ্ল্যাটবেড স্কানারের প্রথম উপাদান এটি। স্কানার খুলে এই কাচের উপর উপুড় করে ডকুমেন্ট রাখতে হবে। স্কানার ভেতর থেকে আলোকরশ্মি দ্বারা কাগজের চিত্র-লেখার ছবি প্রতিবিম্ব করে নিয়ে যায়। সুতরাং কাচের মান যতো ভালো হবে স্কানকরা ডকুমেন্টের ছবিও ততো উন্নত হবে।

২. আলোকসূত্র [light-source]: লাইট-এমিটিং ডাইওড বা এলইডি [LED] সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। অধিকাংশ স্কানারের আলোকসূত্র মূলত এলইডি। তবে কিছু স্কানারে ফ্লুরোসেন্ট [fluorescent] বাল্বও ব্যবহৃত হয়। আমরা এরূপ আলোক সম্পর্কেও ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। স্কানারের ভেতরে **'ভল্টেজ রেগুলেটর'** [voltage regulator] বা ভল্টেজ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা আছে। ফলে স্কানের সময় আলোকরশ্মির সামঞ্জস্যতা ও মাত্রা সঠিক থাকে।

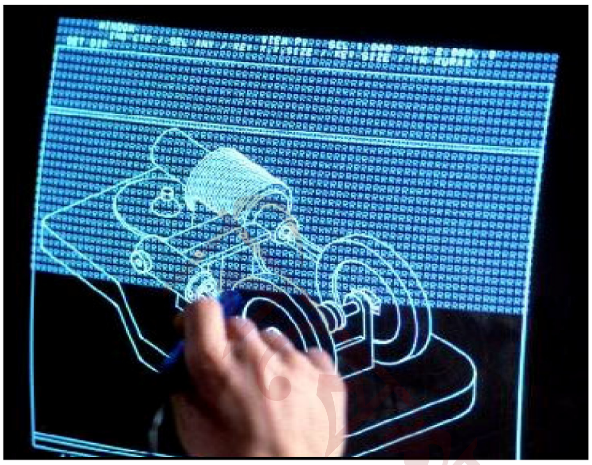
৩. সেন্সর [sensor]: আলোক রশ্মি দ্বারা ছবি প্রতিবিম্ব হয় ডকুমেন্ট থেকে। এই প্রতিবিম্বিত ছবি **'পড়তে'** হবে। অন্য কথায় আলো-আঁধারকে সনাক্ত করে কম্পিউটারে প্রেরণের দরকার। যে যন্ত্রের মাধ্যমে এই কাজটি আঞ্জাম দেওয়া হয় তার নাম **'চার্জ কাপ্ল্ড ডিভাইস'** [charge coupled device -CCD]। এ যন্ত্রটির উপরও আমরা ইতোমধ্যে অন্যত্র আলোচনা করেছি। এ যন্ত্রের মূল কাজ হলো প্রাপ্ত **'এ্যানালগ'** [analog] আলোক সিগনালকে **'ডিজিটেল'** [digital] সিগনালে রূপান্তর করা। রঙিন স্কানারে থাকে তিন সারিসর্বস্ব সিসিডি। একটি লাল, আরেকটি নীল ও অপরটি সবুজ রঙকে ডিজিটেল সিগনালে পরিণত করে। এ পর্যন্ত যা বললাম তাহলো, কাচের উপর রেখে আলোকরশ্মি দ্বারা ছবির প্রতিবিম্ব সিসিডিতে নিয়ে তা কম্পিউটারে বুঝে এরূপ সিগনালে তথা **'ডিজিটেল'** তথ্যে রূপান্তর। এবার এই তথ্য কম্পিউটারে যেতে হবে।

৪. ক্যারিয়ার [carrier]: একটি মটর দ্বারা সেন্সর ও লাইটসূত্র ক্যারি করতে হবে। এই ক্যারিয়ারের কাজ হলো স্কানারের পুরো দৈর্ঘ্য পর্যন্ত উভয় বস্তুকে [অর্থাৎ সেন্সর ও লাইটসূত্রকে] ধীরে ধীরে চলন্ত রাখা।

স্কান ছবি কম্পিউটারে প্রেরণ: উপরোক্ত উপায়ে ডকুমেন্ট স্কান হওয়ার পর সিসিডি যন্ত্র তা ডিজিটেল সিগনালে পরিবর্তন করে পাঠিয়ে দেবে কম্পিউটারে। আজকাল ইউএসবি [USB] তারের সংযুক্তির মাধ্যমে এ কাজটি হয়ে থাকে। স্কানকৃত ছবি [বা ডকুমেন্ট] সাধারণত স্কানারের সাথে যে **'সফ্টওয়্যার'** [software] আসে তার দ্বারা প্রসেস শেষে কম্পিউটারের স্ক্রীনে প্রদর্শন করা হয়। এরপর একে আপনি সেইভ করে রাখতে পারেন। অধিকাংশ স্কানারের সাথে **'অপটিকেল ক্যারাক্টার রিকোগনিশন -অসিআর'** [optical character recognition] সফ্টওয়্যার আসে। এই সফ্টওয়্যারের কাজ হলো, ডকুমেন্টে [ইংরেজী] লেখাটুকু ফন্টে পরিণত করা। অর্থাৎ ছবিকে ফন্টে পরিণত করা যাতে করে তা কোনো ওয়ার্ড প্রসেসরে নিয়ে এডিট বা সম্পাদন করা সম্ভব হয়। গুরুত্বপূর্ণ এই সফ্টওয়্যার উদ্ভাবনের ফলে ইংরেজী ও বাংলা ছাড়া আরো বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বই-পুস্তক ইত্যাদির লেখা টাইপ করার প্রয়োজন পড়ে না। এখনো বাংলা ভাষায় অসিআর সফ্টওয়্যার হয়েছে বলে আমার জানা নাই। যারা সফ্টওয়্যার তৈরি করের তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এ ব্যাপারে রিসার্চ করার জন্য। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষায় অসিআর টেকনোলজি আছে। বাংলায়ও তা করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

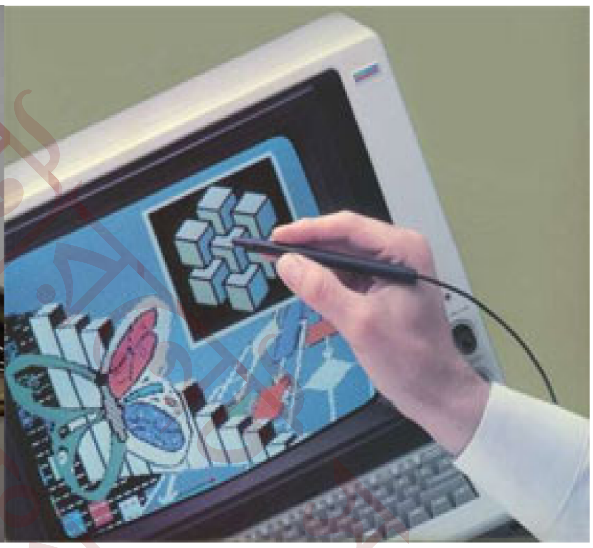
১১. লাইট পেন

লাইট পেন [light pen] একটি কম্পিউটার ইনপুট [input] যন্ত্র। অর্থাৎ এই পেরিফেরল দ্বারা কম্পিউটারে তথ্য প্রেরণ করা হয়। আমরা ইতোমধ্যে বেশ ক'টি ইনপুট যন্ত্রের উপর আলোচনা করেছি। এগুলো প্রায় সকলেই ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু লাইট পেনের ব্যবহার সচরাচর দেখা যায় না। এরপরও এই যন্ত্রটির গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে **'কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন'** [computer aided design - CAD] এর ক্ষেত্রে লাইট পেন দ্বারা সরাসরি স্ক্রীনের মধ্যে চিত্রাঙ্কন একান্ত উপকারী। এটি দ্বারা আপনি স্ক্রীনের যে কেনো বস্তুকে **'ধরা'** কিংবা অঙ্কন করতেও পারেন। নীচের চিত্রটি দেখুন। যন্ত্রটি **'টাচ্ স্ক্রীন'** [touch screen] প্রযুক্তির মতো কাজ করে। তবে এটা কোনো বস্তুকে নির্দিষ্ট করে ধরা বা ছবি আঁকার ক্ষেত্রে অনেক বেশী সঠিক।

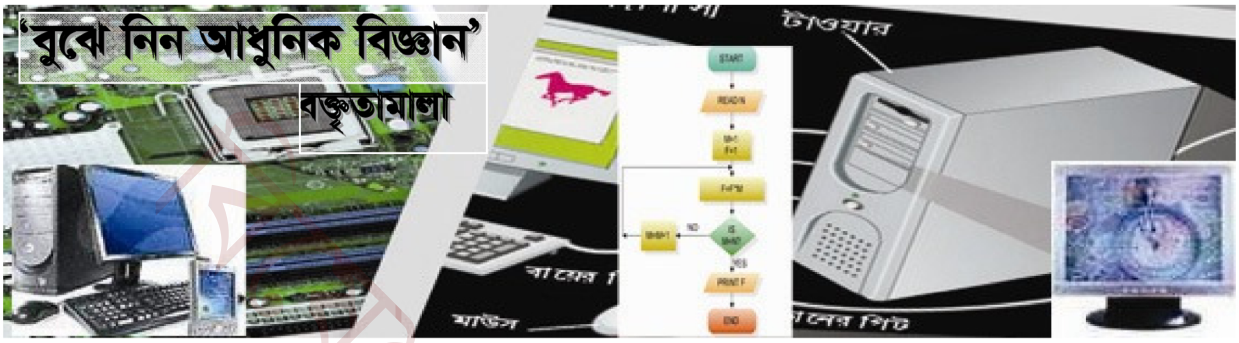


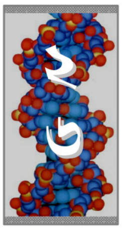
লাইট পেন স্ক্রীনের আলোকরশ্মি রদবদলকে সনাক্তকরণের মাধ্যমে কাজ করে। স্ক্রীনের আলোকরশ্মির মধ্যে সর্বদাই দ্রুত গতিতে ঔজ্জ্বল্যতার পরিবর্তন ঘটে থাকে- যা আমাদের চোখে ধরা দেয় না। বাস্তবে এরূপ রদবদলের মাধ্যমেই স্ক্রীনে বিভিন্ন বস্তু দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। লাইট পেন এই রদবদল থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করে তা-ই নির্ধারণ করে স্ক্রীনের কোন পয়েন্টে এটা যে কোনো মুহূর্তে অবস্থান করছে। নীচে আমরা লাইট পেনের ব্যবহারের আরেকটি চিত্র তুলে ধরলাম।





আলহামদুলিল্লাহ! শিক্ষার্থী ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা! কম্পিউটার প্রযুক্তির উপর দু'টি অংশের প্রথমটি তথা **'হার্ডওয়্যার'** [hardware] এর উপর আলোচনা শেষ করে নিয়েছি। কিন্তু একটি কম্পিউটার শুধু হার্ডওয়্যার নিয়ে কার্যকর নয়। কম্পিউটারের তরল যন্ত্রাংশ বা **'সফ্টওয়্যার'** [software] ছাড়া ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাদিসর্বস্ব যাবতীয় হার্ডওয়্যার সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অকেজো। আমরা আজকের লেকচারের ইতি টানছি এক্ষুণি। তবে আগামী একাধিক লেকচারের ফোকাস থাকবে কম্পিউটারের এই তরল যন্ত্রাংশ নিয়ে।





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বক্তৃতা ২৬ : আধুনিক প্রযুক্তি

১০. ব্যক্তিগত কম্পিউটার [পিসি]

১০.গ. কম্পিউটারের তরল যন্ত্রাংশ: সফ্‌টওয়্যার [software]

'বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান' শীর্ষক বক্তৃতামালার ২৬তম সংযোজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। গেল বেশ ক'টি লেকচার হয়েছে আধুনিক যুগের সর্বাপেক্ষা অত্যাশ্চর্য ও গুরুত্বহ প্রযৌক্তিক মার্বেল **'কম্পিউটার'** নিয়ে। আজকের লেকচারও এই যন্ত্রের উপর। ইতোমধ্যে আমরা কম্পিউটারের কঠিন যন্ত্রাংশ বা হার্ডওয়্যার [hardware] সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এবার তথ্য তুলে ধরছি দ্বিতীয় অংশ সফ্‌টওয়্যার সম্পর্কে।

১. কম্পিউটারের ভাষা

আমরা সবাই একে অন্যের সঙ্গে মনের খিয়াল বা ভাবকে সেয়ার করি ভাষার মাধ্যমে। অনুরূপ কম্পিউটারের সঙ্গে ইন্টারেকশন বা যোগাযোগ সৃষ্টির উপায় হিসাবে বিজ্ঞানীরা একাধিক **'সফ্‌টওয়্যার ল্যাঙ্গুয়েজ'** [software language] উদ্ভাবন করেছেন। তবে কম্পিউটার একটি মাত্র ভাষা বুঝে- তাহলো **'মেশিন ল্যাংগুয়েজ'** [machine language]। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, কম্পিউটার একটি **'ইলেকট্রনিক মেশিন'** [electronic machine] মাত্র। সত্যিকার অর্থে এর ভেতরের মূল যন্ত্রাংশ **'সেন্ট্রেল প্রসেসিং ইউনিট'** [central processing unit -CPU] তৈরি হয়েছে লক্ষ লক্ষ **'ট্রানজিস্টার'** [transistor] দ্বারা। এগুলো আসলে এককেটি ইলেকট্রিক সুইচ। এসব সুইচ

হয় **'অন'** না হয় **'অফ'** থাকবে। অন অবস্থাকে সংখ্যা **'১'** এবং অফ অবস্থাকে সংখ্যা **'০'** দ্বারা সম্বোধন করা হয়। এই দু'টি মাত্র সংখ্যাকে ছোট্ট থেকে অতি দীর্ঘ মিশ্রণ [combination] দ্বারা যে কোন লেখা, গ্রাফিক্স, ট্যাক্স, সংখ্যা ইত্যাদি সবকিছু **'রেপ্রেজেন্ট'** [represent] করা যেতে পারে। সিপিইউ এর **'এ্যারিথমেটিক এন্ড লজিক ইউনিট'** [arithmetic and logic unit -ALU] প্রোগ্রাম দ্বারা প্রেরিত **'ইন্সট্রাকশন'** [instruction] বা নির্দেশনা মুতাবিক **'বুলিয়ান আলজেবরা'** [Boolean algebra] নামক একটি **'লজিক্যাল মেথেমেটিক্স'** [logical mathematics] ব্যবহার করে ফলাফল সে-ই বাইনারি সংখ্যায় দিয়ে থাকে। সুতরাং আমরা সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে কাজ সারার জন্য নির্দেশনা দিলাম একভাবে এবং তা প্রসেস হয়ে বেরিয়ে আসলো অন্যভাবে। এই উভয় **'ভাব'** কিন্তু বাইনারি কোডে ভেতরে যাবে ও ফিরে আসবে। কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা বাইনারি কোডে রূপান্তরের জন্য সফ্টওয়্যার তৈরি করেছেন। আমাদের বোধগম্য এসব সফ্টওয়্যারের মূলে একটি **'ইন্টারপ্রিটার'** [interpreter] কিংবা **'কম্পাইলার'** [compiler] থাকে। এদের কাজ হলো বোধগম্য প্রোগ্রামকে বাইনারি বা মেশিন কোডে রূপান্তর করা যাতেকরে তা কম্পিউটারের জন্য বোধগম্য হয়ে ওঠে।

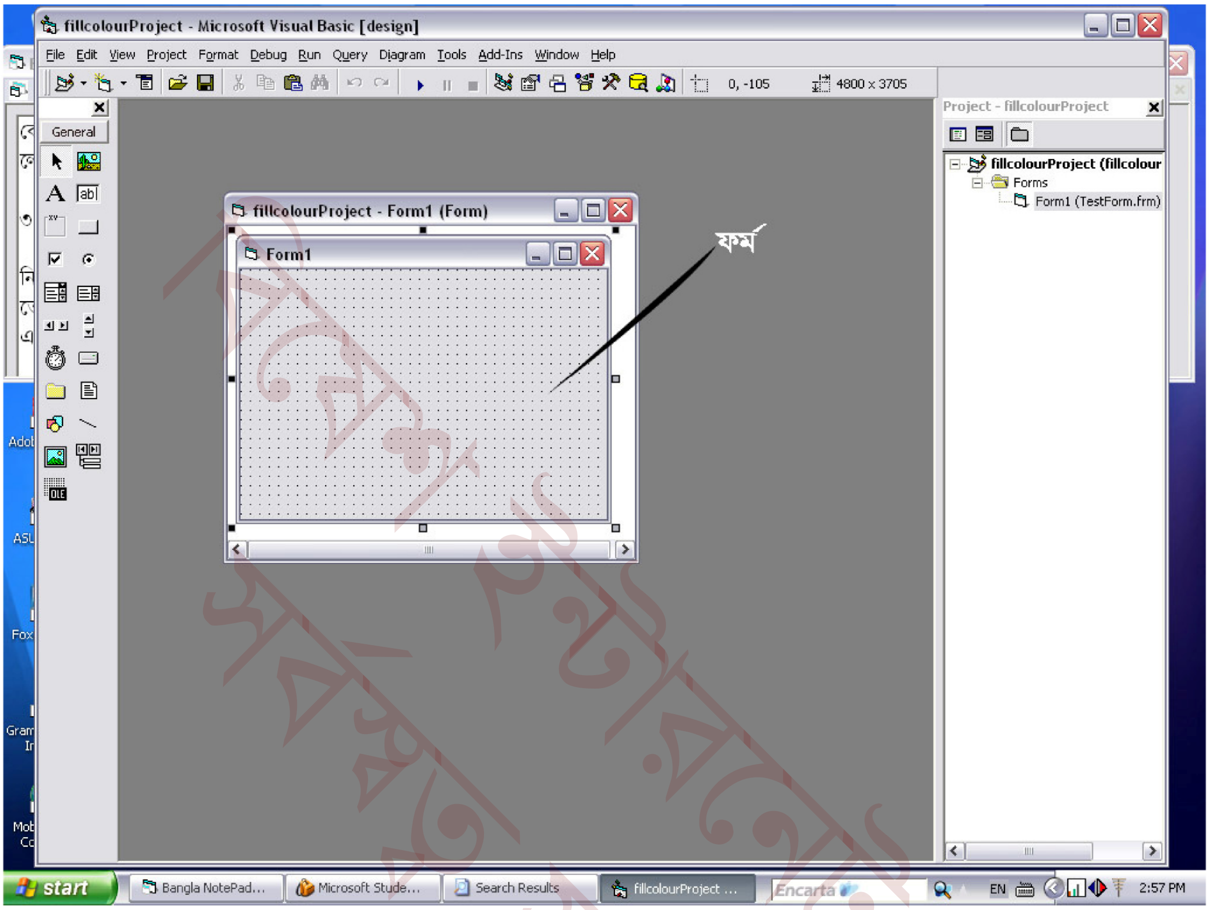
কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা বেশ কয়েকটি **'প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ'** [programming language] সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে **'বেসিক'** [BASIC], **'সি'** [C] এবং **'পাসকাল'** [PASCAL] ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রোগ্রামিং ভাষা হতে পারে **'লো লেবেল'** [low-level] কিংবা **'হাই লেবেল'** [high-level]। নিম্ন লেবেলের ভাষাকে বলে **'মেশিন ল্যাংগুয়েজ'** [machine language]। এ ভাষায় সবাই লিখতে পারেন না- এটা কঠিন। তবে উচ্চ স্তরের ভাষা শিখা ও লেখা অনেকটা সহজ। অবশ্য কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রিটার ছাড়া উচ্চ স্তরের ভাষা কম্পিউটার বুঝবে না। কম্পিউটারের সফ্টওয়্যার সম্পর্কে এসব প্রাথমিক সংজ্ঞা প্রদানের পর এবার আমরা বিভিন্ন ভাষা নিয়ে আলোচনায় যেতে পারি।

২. মেশিন ল্যাংগুয়েজ [machine language]

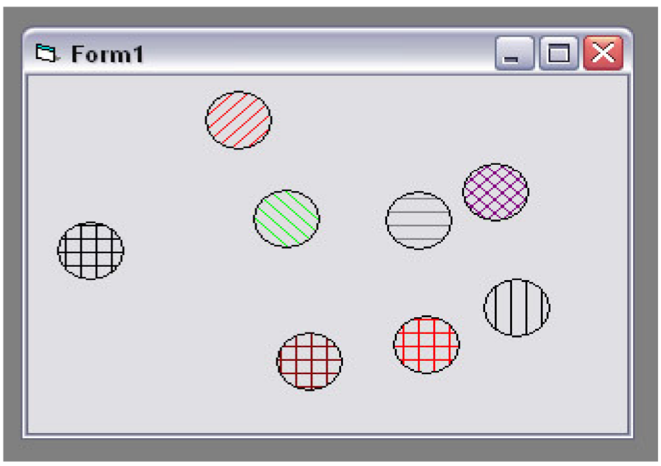
মেশিন ভাষায় নির্দেশনা লেখা হয় ১ কিংবা ০ সংখ্যা দ্বারা। এগুলোকে **'বিট'** [bit] বলে। আগেই বলেছি এরূপ বাইনারি সংখ্যা কম্পিউটার যথাক্রমে **'অন'** ও **'অফ'** হিসাবে সরাসরি বুঝতে সক্ষম হয়। মেশিন ভাষায় নির্দেশনার মধ্যে মৌলিক চারটি বিষয় আছে: ক. কম্পিউটারের **'র‍্যাম'** [RAM]-এ সংরক্ষিত তথ্য ঠিক কোথায় আছে তা নির্দিষ্ট করা। খ. এই তথ্যের উপর অঙ্ক কষা যেমন, যোগ, বিয়োগ ইত্যাদি। গ. ফলাফল মূল সংরক্ষণ অংশের কোথায় রাখা হবে। ঘ. পরবর্তী নির্দেশ কোথায় পাওয়া যাবে তা জানা। মেশিন কোডে আজকাল খুব অল্পই সফ্টওয়্যার লেখা হয়ে থাকে। এর মূল কারণ হলো, কাঠিন্যতা। যেমন এই কোডটি দেখুন: ১০০১০ ১১০০ ১০১১ - এর অর্থ রেজিস্টার **'A'** ও **'B'**-তে সংরক্ষিত তথ্য যোগ করো।

৩. উচ্চ লেবেল ভাষা [high-level language]

আমাদের বোধগম্য এসব ভাষায় অধিকাংশ সফ্টওয়্যার তৈরি হয়। মাইক্রসফটের **'ভিজ্যুয়েল বেসিক'** [Visual Basic] একটি উচ্চ লেবেল জনপ্রিয় ভাষা। নিম্নে [আমার নিজের লিখিত] এ ভাষার একটি অতি সাধারণ **'সফ্টওয়্যার প্রোগ্রাম'** এর একাংশ নিয়ে কিছুটা তথ্য তুলে ধরছি। আশাকরি এ থেকে শিক্ষার্থীরা বুঝতে সক্ষম হবেন **'সফ্টওয়্যার'** বলতে কি বুঝায় এবং কিভাবে তা উদ্ভাবন হয়।



উপরের ছবিতে মাইক্রসফটের ভিজ্যুয়েল বেসিক আইডিই [Integrated development environment - IDE] দেখাচ্ছে। সেখানে একটি **'ফর্ম'** [form] আছে। এই ফর্ম যখন **'রান'** [run] করা হবে তখন আমরা স্ক্রীনে যা দেখবো তার একটি ছবি নীচে দিয়েছি। এতে আছে কয়েকটি ভিন্ন রঙের বৃত্ত। ফর্মের যে কোনো স্থানে মাউস দ্বারা ক্লিক করলেই এসব বৃত্ত অঙ্কিত হবে। এই প্রোগ্রামের কাজই এটা- ভিন্ন রঙের ছোট ছোট বৃত্ত আঁকা প্রতিটি মাউস ক্লিকের সঙ্গে।



ঠিক কিভাবে এই প্রোগ্রামটা করলাম? নিম্নে মূল প্রোগ্রামটি তুলে ধরেছি। চলন্ত থাকাবস্থায় ফর্মের উপর মাউস দ্বারা ক্লিকের অপেক্ষায় থাকে প্রোগ্রামটি। যে মুহূর্তে ক্লিক পড়বে ফর্মের যে কোন স্থানে সাথে সাথে সেখানে একটি বৃত্ত অঙ্কিত হবে। এবার প্রোগ্রামের প্রতিটি লাইন বুঝিয়ে বলছি। আশা করি এ থেকে সকলেই প্রোগ্রামের কার্যকারিতা সম্পর্কে অনেকটা ওয়াকিফহাল হবেন।

```
Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
  FillColor = QBColor(Int(Rnd * 15))   ' Choose random FillColor.
  FillStyle = Int(Rnd * 8)   ' Choose random FillStyle.
  Circle (X, Y), 250   ' Draw a circle.
End Sub
```

উপরের প্রোগ্রাম কোডটি ফর্মের **'মাউসডাউন ইভেন্ট'** [mouseDown Event] অংশে লেখা থাকতে হবে। মাউসডাউন অর্থ ফর্মের কোথাও মাউসকে ক্লিক করার মুহূর্ত। অপারেটিং সিস্টেম সেই মুহূর্তে একটি **'মাউসডাউন'** [MouseDown] ঘটনা [event] প্রেরণ করে কম্পিউটারের অভ্যন্তরে। এই ঘটনাকে আমরা প্রোগ্রামের মাধ্যমে **'ধরে'** নিজেদের ইচ্ছে-মাফিক কাজ করাতে পারি। সুতরাং প্রথম লাইন: Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) - এর অর্থ হলো মাউসডাউন ইভেন্টকে ধরা। এবার আমরা কাজ করতে পারি।

আমরা প্রথমেই বলছি: FillColor = QBColor(Int(Rnd * 15))- এর অর্থ বৃত্তের অভ্যন্তরে কোন্ রঙ হবে তা অনির্দিষ্টভাবে [randomly] নির্ধারণ করা। সমীকরণ চিহ্নের বায়ের দিকের কথাটি [FillColor] মূলত ভিজ্যুয়েল বেসিক ভাষার একটি মৌলিক নির্দেশ। এর দ্বারা এটাই বলা হচ্ছে বৃত্তের রঙ এতে সংরক্ষিত তথ্য দ্বারা পরিপূর্ণ করা হবে। সমীকরণ সাইনের ডান দিকের অংশ এই রঙের তথ্য দেবে।

পরবর্তী লাইনে লিখা আছে: FillStyle = Int(Rnd * 8) - এর অর্থও প্রথম লাইনের অনুরূপ। এখানে সমীকরণের বায়ের কথাটি [FillStyle] দ্বারা বুঝানো হচ্ছে কোন্ স্টাইলে রঙটি অঙ্কিত হবে। এ শব্দটিও ভিজ্যুয়েল বেসিকের মৌলিক ভাষার মধ্যে একটি।

তৃতীয় লাইনে লিখা আছে: Circle (X, Y), 350। এর প্রথম শব্দ [Circle] দ্বারা বলা হচ্ছে একটি বৃত্ত আঁকতে যার আয়তন হবে ৩৫০ পিক্সেল। এখানে লক্ষ্য করুন (X,Y) দ্বারা বুঝানো হচ্ছে বৃত্তের স্থান। যে জায়গায় ক্লিক করা হবে সেটাই এই স্থান। এটাকে ইংরেজীতে **'কো-অরডিনেট সিস্টেম'** [co-ordinate system] বলে। **'X'** অর্থ স্ক্রীনের [বা জানালার] সর্বশেষ পয়েন্ট বা শূন্য থেকে কতটি পিক্সেল ডানে ঐ পয়েন্টটি আছে তা-ই বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ ক্লিক যে স্থানে করা হচ্ছে তার **'X'**-পজিশন নির্দিষ্টকরণ। অনুরূপ স্ক্রীনের [বা জানালার] উপর থেকে কত পিক্সেল দূরে ক্লিকের স্থানটি আছে তা-ই হলো **Y**-পজিশন। সুতরাং ক্লিক করলেই কম্পিউটার উক্ত কোডের মাধ্যমে ঠিক যে স্থানে বৃত্তের কেন্দ্র হবে তা জেনে নেবে ও সাথে সাথে **'Circle'** অঙ্কন করবে। এভাবে যতোবারই ক্লিক করা হবে জানালার ভেতর ততোবারই ঐ স্থানে বৃত্ত অঙ্কিত হবে।

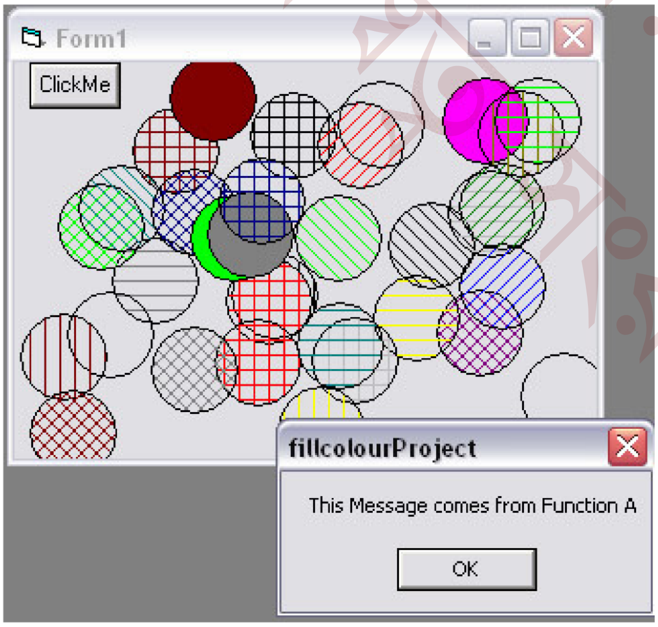
প্রোগ্রামটি অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলতে থাকবে। অবশ্যই প্রতিটি ক্লিক ইভেন্টের কাজ শেষ হয়েছে বলে নির্দেশ দিতে হবে। এটা করা হয় শেষের লাইন: End Sub - দ্বারা। লক্ষ্য করুন আমরা শুরু করেছি: Private Sub- লিখে। এখানে **'Sub'** শব্দটির অর্থ **'Subroutine'**। এটা হলো প্রত্যেক প্রোগ্রামের আলাদা একেক অংশের নাম। অন্য আরেক নামেও অংশ আছে। একে বলে **'ফাংশন'** [function]। সাবরুটিন দ্বারা কিছু বিশেষ কাজ আঞ্জাম দেওয়া হয়- যেমনটি আমরা উপরে দেখেছি। অপরদিকে ফাংশন কোন একটা ভেল্যু [ফলাফল] দেয় মাত্র। সাবরুটিন থেকে ফাংশনকে **'কল'** [call] করতে হয়। যেমন, আমরা **'ক্লিকমি'** [ClickMe] নামক একটি ছোট্ট বোতাম ফর্মের মধ্যে যোগ করলাম ও এর **'ক্লিক ইভেন্ট'** [click event] কোডটিতে লিখলাম:

```
Private Sub Command1_Click()
    A 'call the Function Named A
End Sub
```

উপরোক্ত সাবরুটিন দ্বারা এটাই বুঝাচ্ছে যে, বোতামে ক্লিক করলেই ‘A’ নামক একটি **‘ফাংশন’** [function] আছে সেখানে লাফ মারো। এই ফাংশনটি কোড লেখার ট্যাক্স এডিটরে যে কোন স্থানে লিখা যায়। কোডটি এই [অবশ্য ইচ্ছে মাফিক যে কোন কোড লিখা যাবে]:

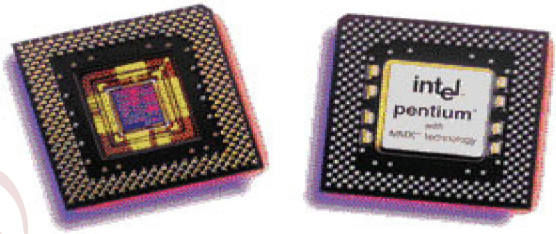
```
Function A()
    MsgBox ("This Message comes from Function A")
End Function
```

লক্ষ্য করুন, ক্লিক ইভেন্টের কোড থেকে এখানে লাফ মেরে মেসেজ বক্স প্রদর্শন করা হবে। কারণ আমরা এই ফাংশন কল দ্বারা তা-ই প্রদর্শনের কোড লিখেছি। এরপর ‘End Function’ লাইন ফাংশনের কাজ শেষ করে ফিরে যাবে ক্লিক ইভেন্ট সাবরুটিনে। এদিকে ম্যাসেজ বাক্সে ‘OK’ বোতামে চাপ না দেওয়া পর্যন্ত তা বন্ধ হবে না। বন্ধ করে দিলেই কিন্তু ক্লিক ইভেন্ট সাবরুটিনের কাজ শেষ হয়ে যাবে। এরপর আমরা যদি আরেকটি ফাংশন বা সাবরুটিন তৈরি করে মূল কোডের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চাই তা-ও পারবো। আসলে ঠিক এভাবেই বড় বড় কম্পিউটার সফ্টওয়্যার গড়ে ওঠে। এরূপ কোড করা অনেকটা সহজ। পরবর্তীতে কোড ম্যানেজ করাও বেশ সুবিধাজনক হয়। লক্ষ্য করুন সবুজ ফন্টে লেখাটুকু প্রোগ্রামের অংশ নয়। এগুলো হলো বুঝার জন্য মন্তব্য মাত্র।



যাক, উচ্চ লেবেলের কম্পিউটার প্রোগ্রাম কী তার একটু ধারণা দিলাম মাত্র। শিক্ষার্থীদের যারা ভিজ্যুয়েল বেসিক নামক জনপ্রিয় সফ্টওয়্যার তৈরির ভাষা শিখতে আগ্রহী তারা যোগাযোগ করবেন! কম্পিউটার সফ্টওয়্যার সম্পর্কে এ প্রসঙ্গে আর বেশী কিছু বলার আদৌ প্রয়োজন নেই। বিষয়টি আসলে বেশ কঠিন। সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা দীর্ঘদিন পড়ালেখা করে বিষয়ের উপর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। আমি নিজেও আসলে সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার নয়। তবে সে-যুগে আমাদেরকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর অধ্যয়নকালে কম্পিউটার বিজ্ঞানের উপর গবেষণা করতে হয়েছিল। ফলে এ যুগে এসেও ভিজ্যুয়েল বেসিক দ্বারা বানান পরীক্ষকসহ একটি বাংলা লেখার ওয়ার্ড প্রসেসর প্রোগ্রাম তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি। আপনাদের সামনের এই লেকচার নোট সম্পূর্ণটাই সেই **‘বাংলা নোট্স’** নামক প্রোগ্রাম দ্বারা লিখেছি ও বানান পরীক্ষা করেছি। এছাড়া বাংলা কালক্যুলেটার, আযান ঘড়ি ইত্যাদি আরো এক দু'টো সফ্টওয়্যারও উদ্ভাবন করেছি।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! কম্পিউটার প্রযুক্তির ওপর আলোচনার ইতি টানবো শীঘ্রই। কম্পিউটারের মেমোরী সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য তুলে ধরা জরুরী মনে করছি। আপনারা নিশ্চয় মেগাবাইট, গিগাবাইট ইত্যাদি শুনেছেন। এগুলো আসলে কী? নিম্নের টেবিলে মেমোরী সংক্রান্ত এসব ব্যাপারে কয়েকটি টেবিল তুলে ধরলাম। এছাড়া শেষের টেবিলে পৃথিবী বিখ্যাত **‘পেন্টিয়াম প্রসেসর’** সম্পর্কিত কিছু তথ্য দিয়েছি।



Term/Byte [পদ/বাইট]	Abbreviation [শব্দসংক্ষেপ]	Value [মাত্রা]
Bit [বিট]	none [কিছুই নয়]	0 or 1 [০ বা ১]
Byte [বাইট]	B	8 [৮]
Kilo [কিলোবাইট]	K, KB	1,024 bytes [১,০২৪ বাইট]
Mega [মেগাবাইট]	M, MB, Meg	1,048,576 bytes (Million) [১০,৪৮,৫৭৬ বাইট]
Giga [গাইগা / গিগাবাইট]	G, GB, Giga	1,073,741,824 bytes (Billion) [দশ কোটি বাইট]
Tera [টেরাবাইট]	T, TB, Tera	1,099,511,628,000 bytes (Trillion) [দশ হাজার কোটি]

টেবিল -১ : যেভাবে মেমোরী মাপা হয়

উপরোক্ত টেবিলকে আরো সংক্ষেপ করে এবার লেখা যায়:

8 bits = 1 byte [৪ বিটে হয় ১ বাইট]
1000 bytes = 1 kilobyte [হাজার বাইটে হয় ১ কিলোবাইট]
1000 kilobytes = 1 megabyte [হাজার কিলোবাইটে হয় ১ মেগাবাইট]
1000 megabytes = 1 gigabyte [হাজার মেগাবাইটে হয় ১ গিগাবাইট/গাইগাবাইট]
1000 gigabytes = 1 terabyte [হাজার গিগাবাইট/গাইগাবাইটে হয় ১ টেরাবাইট]

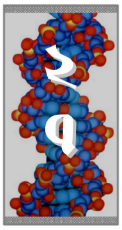
Processor [প্রসেসর]	No. of Transistors [ট্রানজিস্টার সংখ্যা]	Bus Width [বাসের ব্যাস]
80286	134,000	16 bit
80386	275,000	32 bit
80486	1,600,000	32 bit
Pentium	3,300,000	64 bit external/32 bit internal
Pentium Pro	5,500,000	64 bit
Pentium w/ MMX	4,500,000	64 bit external/32 bit internal
Pentium II	7,500,000	64 bit

টেবিল -২ : পেন্টিয়ামের বিভিন্ন প্রসেসর

প্রযুক্তির উপর আলোচনার অংশ হিসাবে কম্পিউটার বিজ্ঞানের উপর তথ্যানুসন্ধানের এখানেই শেষ। আগামী লেকচারে আমরা অন্য আরেকটি বিষয়ের উপর আলোচনা করবো। আশারাখি সকলে পরবর্তী লেকচারে উপস্থিত হবেন। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বক্তৃতা ২৭ : আধুনিক প্রযুক্তি

১১. ইন্টারনেট [internet]

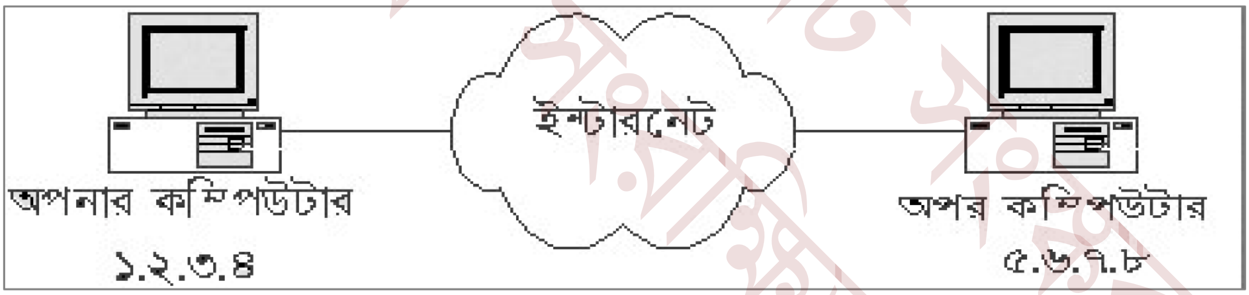
প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! বিজ্ঞানের নির্যাস বলে খ্যাত প্রযুক্তির উপর আলোচনা করতে যেয়ে কম্পিউটার সম্পর্কে বেশ ক'টি লেকচার উপস্থাপন করেছি। আজকের প্রযুক্তির এই অত্যাশ্চর্য যন্ত্রটির উপর আলোচনা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে শেষ হয় নি! তথ্য প্রযুক্তির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এ যুগের মহাবিপ্লব **'ইন্টারনেট'**। আর এই তথ্যবিপ্লবের মূল যন্ত্রটি হলো কম্পিউটার যার মাধ্যমে ঘরে ঘরে খুব দ্রুত সমগ্র বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তথ্যাদি এসে আমাদের অনুসন্ধিৎসার খোরাক দিচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। এছাড়া উন্নত থেকে উন্নতমানের মোবাইল সেটও আজকাল হয়ে ওঠেছে ইন্টারনেটের মাধ্যম। বস্তুত ঐ উন্নতমানের এ সেটও কিন্তু একটি কম্পিউটার। আজকের লেকচারে আমরা ইন্টারনেট সম্পর্কে আলোচনা করবো। আমরা জেনে নেবো কোন্ উপায়ে এটি কাজ করে।

ইন্টারনেট একটি গ্লোবাল নেটওয়ার্কের নাম [global network]। আপনার কম্পিউটার ও পৃথিবীব্যাপী কোটি কোটি অন্যান্য কম্পিউটার ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে। এই সংযুক্তির ফলে আপনার কম্পিউটারের ফাইল অপরের সঙ্গে সেয়ার করতে পারেন। পাঁচ মহাদেশের যে কোনো স্থানে সংরক্ষিত তথ্য মুহূর্তে চলে আসতে পারে আপনার কম্পিউটারের স্ক্রীনে সঙ্গীত, লেখা, ভিডিও, ছবি ইত্যাদি হিসাবে। আপনি যে কোনো ফাইল কয়েক মিনিটের মধ্যে **'ডাউনলোড'** [download] করে নিয়ে আসতে পারেন আপনার কম্পিউটারে সংরক্ষণের জন্য। পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নিউজ নেটওয়ার্ক থেকে পেতে পারেন সংবাদ যা ঘটে গেছে মাত্র মিনিট খানেক

পূর্বে। এমনকি লাইভ [সরাসরি] দেখতে পারেন আপনার ফেভারিট খেলা, টিভি রিপোর্ট, প্রোগ্রাম, সংবাদ ইত্যাদি। বিভিন্ন সর্ভারে পড়ে আছে অসংখ্য গ্রন্থাদি, অডিও-ভিডিও, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদি। আপনি কয়েক মিনিটের মধ্যে পছন্দেরটি ডাউনলোড করতে পারেন নিজের কম্পিউটারে পরবর্তীতে পাঠের বা দেখার জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। মোট কথা ইন্টারনেট হলো, **'সব ধরনের মাধ্যমের এক বিশ্ব-পাঠাগার ও সংবাদ মাধ্যম'** যেখানে সংরক্ষিত আছে আপনার পছন্দসই যে কোন তথ্য। আজকের বিশ্বে ইন্টারনেটের মতো এতো শক্তিশালী মিডিয়া আর কিছু নেই। ইন্টারনেটের পাওয়ার অপরিসীম। ঠিক কিভাবে এটা কাজ করে?

১১.ক. ইন্টারনেট ঠিকানা

কম্পিউটারের পেরিফেরল নিয়ে আলোচনাকালে বলেছি, ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্তির উপায় হলো মডেম। তবে শুধু মডেম যথেষ্ট নয়। আপনি যে কোন **'ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার'** [internet service provider] থেকে নির্দিষ্টকালের জন্য ইন্টারনেট এক্সেস [internet access] প্যাকেজ কিনে নিতে হবে। আজকাল অবশ্য কোনো কোনো প্রোভাইডার যেমন মোবাইল কোম্পানি বিনামূল্যেও সার্ভিস দিয়ে থাকে। তবে মোবাইল যোগাযোগ সৃষ্টির জন্য প্রতি মিনিট কিছু টাকা কেটে নেবেই। যাক, এবার আমাদেরকে বুঝতে হবে নেটওয়ার্কে আপনার কম্পিউটারের পরিচিতি কিভাবে নিশ্চিত হয়। বাস্তবে পুরো নেটওয়ার্কে যতো কম্পিউটারই যে কোন মুহূর্তে সংযুক্ত থাক না কেনো [আর তা কোটি কোটি হতে পারে], প্রত্যেকটির একক **'ঠিকানা'** থাকা জরুরী। কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা এই ঠিকানাকে চারটি সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট করেছেন যার প্রত্যেকটিতে আছে তিনটি পর্যন্ত ডিজিট [সংখ্যা]: এএএ.এএএ.এএএ.এএএ। প্রতিটি এএএ হতে হবে ০ থেকে ২৫৫। সুতরাং ১২৩.১৬৩.২০১.২৫৫ একটি ইন্টারনেট ঠিকানা। এই ঠিকানাকে বলে **'আইপি এডরেস'** [IP address] -এখানে আইপি অর্থ **'ইন্টারনেট প্রটোকল'** [Internet Protocol]।



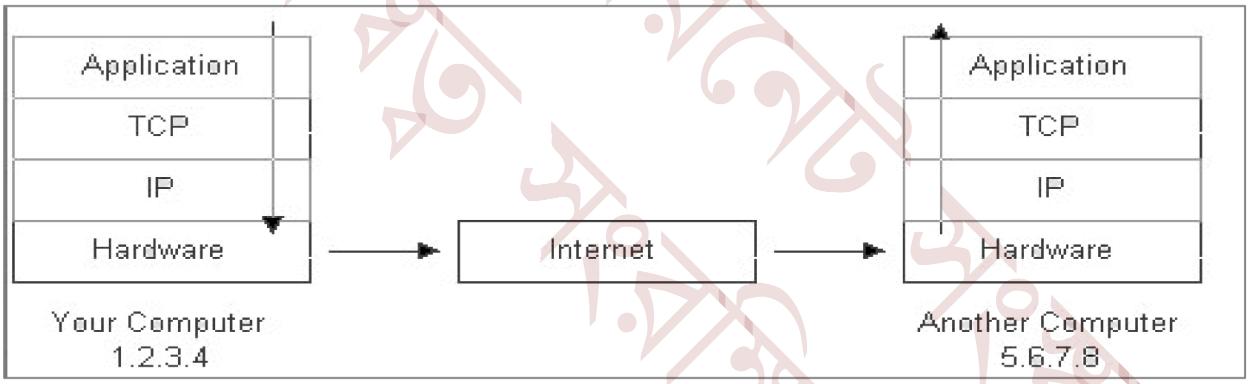
উপরের চিত্রে আপনার কম্পিউটার যার ঠিকানা ১.২.৩.৪ ইন্টারনেটের মাধ্যমে অপর কম্পিউটার যার ঠিকানা ৫.৬.৭.৮ সংযুক্ত আছে দেখিয়েছি। এখানে **'ইন্টারনেট'** অংশটি মূলত মূর্ত ধারণা মাত্র। অবশ্য পরবর্তীতে এই মূর্ত ধারণার উপর বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরবো। সাধারণত আপনি ইতোমধ্যে উল্লেখিত ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের [ISP] মাধ্যমে ইন্টারনেটে যোগ দেবেন। প্রত্যেক-বারই আপনার কম্পিউটারকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি অস্থায়ী ঠিকানা দেওয়া হবে। এই ঠিকানা বিলুপ্ত হবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবার পরই।

১১.খ. প্রটোকল [protocol]

এ শব্দটি উল্লেখ করেছি ইতোমধ্যে। মনে করুন, আপনার কম্পিউটার একক ঠিকানাসহ ইন্টারনেটে সংযুক্ত আছে। এখন ঠিক কিভাবে আপনার কম্পিউটার ইন্টারনেটে সংযুক্ত অন্যান্যগুলোর সঙ্গে **'কথা বলবে'**? মনে করুন, আপনার আইপি ঠিকানা হলো, ১.২.৩.৪। আপনার ইচ্ছা হলো যে কম্পিউটারের ঠিকানা ৫.৬.৭.৮ তাতে একটি

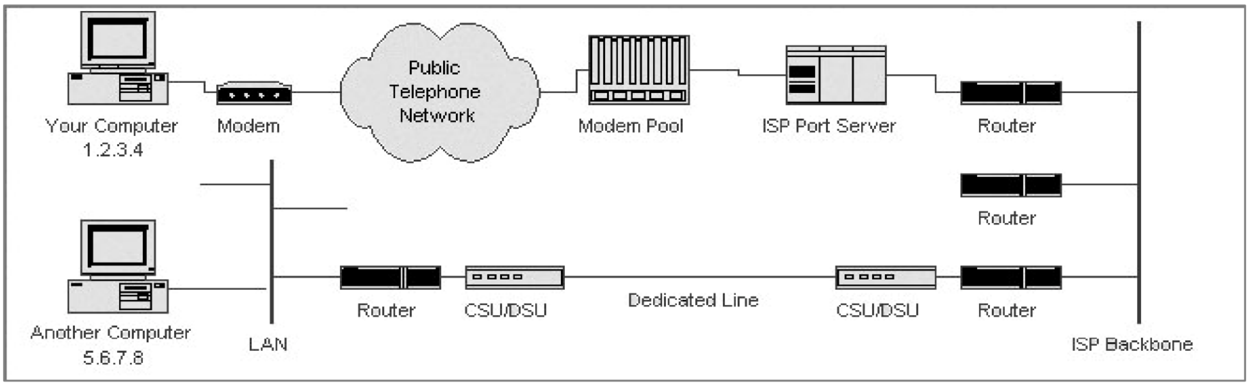
মেসেজ পাঠাবেন। আপনি বলবেন, **"হ্যালো কম্পিউটার ৫.৬.৭.৮!"** এই মেসেজটি মোবাইল কিংবা ল্যান্ড ফোনের [মডেমের] মাধ্যমে যেতে হবে। প্রথমে মেসেজকে ডিজিটেল থেকে ইলেকট্রনিক্স সিগনালে [এ্যানালগে] পরিবর্তন করা দরকার। অন্যথায় মোবাইল বা ল্যান্ড ফোনের মাধ্যমে প্রেরণ সম্ভব নয়। অপর কম্পিউটারে পৌঁছার পর তা আবার ডিজিটেল সিগনালে পরিবর্তন করতে হবে। ঠিক কিভাবে এই কাজগুলো সম্পাদন হয়? এখানেই আসে **প্রটোকল** [Protocol -চুক্তি]। প্রত্যেক কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেমে এই প্রটোকল সংরক্ষিত আছে। আপনার উইন্ডোজ সিস্টেমে এই প্রটোকল **টিসিপি/আইপি** [TCP/IP] নামে পরিচিত। এগুলো মূলত সফ্টওয়্যার। আপনার ই-মেইল, FTP, www যোগাযোগের জন্য আছে **'এপ্লিকেশন প্রটোকল'** [application protocol -AP]। পোর্ট নাম্বারের মাধ্যমে যে সফ্টওয়্যার তথ্য প্যাকেট প্রেরণ করে অপর কম্পিউটারে, তার নাম **'ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রটোকল'** [transmission control protocol -TCP]। কোনো বিশেষ কম্পিউটারে তথ্য প্রেরণ করার আরেক সফ্টওয়্যার হলো **'ইন্টারনেট প্রটোকল'** [internet protocol - IP]। সবশেষে আরেকটি হার্ডওয়্যার আছে যার কাজ বাইনারি তথ্যকে [যা আপনি কম্পিউটারের স্ক্রীনে দেখেন] মোবাইল বা ল্যান্ড টেলিফোনের মাধ্যমে প্রেরণের জন্য প্রস্তুত করা। অর্থাৎ তথ্যকে এ্যানালগ সিগনালে পরিবর্তন করে পাঠানো। এ কাজটি আঞ্জাম দেয় অবশ্য **মডেম** [Modem] নামক একটি পেরিফেরল যার উপর বিস্তারিত আলোচনা ইতোমধ্যে হয়েছে।

এখন, **'হ্যালো কম্পিউটার ৫.৬.৭.৮!'** -এ মেসেজটি ৫.৬.৭.৮ আইপি ঠিকানাসম্পন্ন কম্পিউটারে পাঠানো হবে ঠিক কিভাবে? নীচের চিত্রে এ ক্রিয়াটি তুলে ধরেছি।



১১.গ. নেটওয়ার্ক অবকাঠামো [network infrastructure]

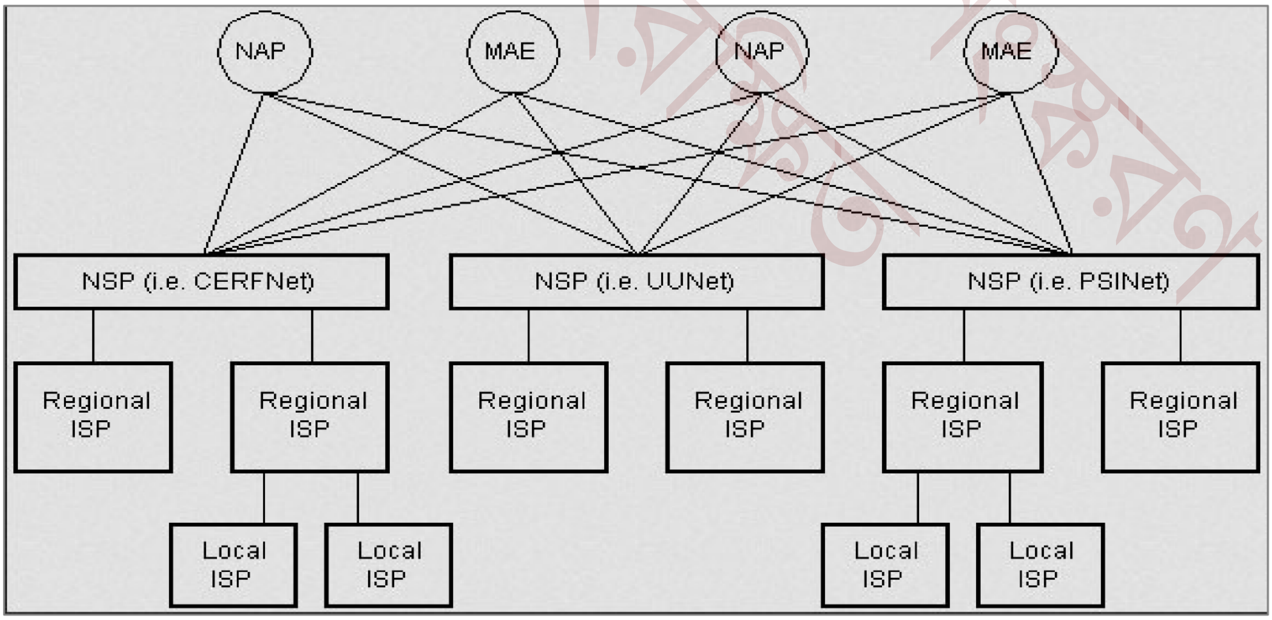
ইন্টারনেটের **'সারফার'** [surfer] আমার শ্রোতাবন্ধুরা! এখন আপনারা অবগত হলেন, তথ্য প্যাকেট কিভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অপর কম্পিউটারে যেয়ে পৌঁছে। কিন্তু মাধ্যম **'ইন্টারনেট'** আসলে কি? এখানে কী আছে? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে যেয়ে আমরা আরেকটি চিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারি:



লক্ষ্য করুণ আপনার কম্পিউটার থেকে মেসেজটি প্রথমে আপনার নিজের মডেমে যাবে। সেখান থেকে [এ্যানালগ সিগনাল হিসাবে] তা [টেলিফোন কোম্পানির মাধ্যমে] চলে যাবে আপনার সার্ভিস প্রোভাইডারের সার্ভারে [ISP port server]। আইএসপি সার্ভার অবশ্য শুধুমাত্র আপনার সিগনাল প্রসেস করবে না। একই সময় বহু সিগনাল আসবে তাই সেই সার্ভারে থাকতে হবে একাধিক মডেম [modem pool]। আইএসপি সার্ভারের আছে একটি মেরুদণ্ড [ISP backbone]। এতে অনেক পথনির্দেশক [router] আছে। এদের কাজ হলো সঠিক রাস্তায় মেসেজ পাঠানো। সঠিক রুটার আপনার মেসেজ চিহ্নিত করে অন্যান্য সার্ভার, রুটার ইত্যাদির মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবে কাঙ্ক্ষিত [অর্থাৎ ৫.৬.৭.৮ ঠিকানাসম্পন্ন] কম্পিউটারে। এখানে খুব সহজে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। বাস্তবে ইন্টারনেট আরো জটিল ব্যাপার- তাতো সবাই বুঝতেই পারছেন! ওহ, উপরোক্ত চিত্র 'LAN' একটি শব্দ আছে। এর অর্থ 'Local Area Network'। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমেও ইন্টারনেটে সংযুক্ত হওয়া যায়।

১১.ঘ. ইন্টারনেট অবকাঠামো [internet infrastructure]

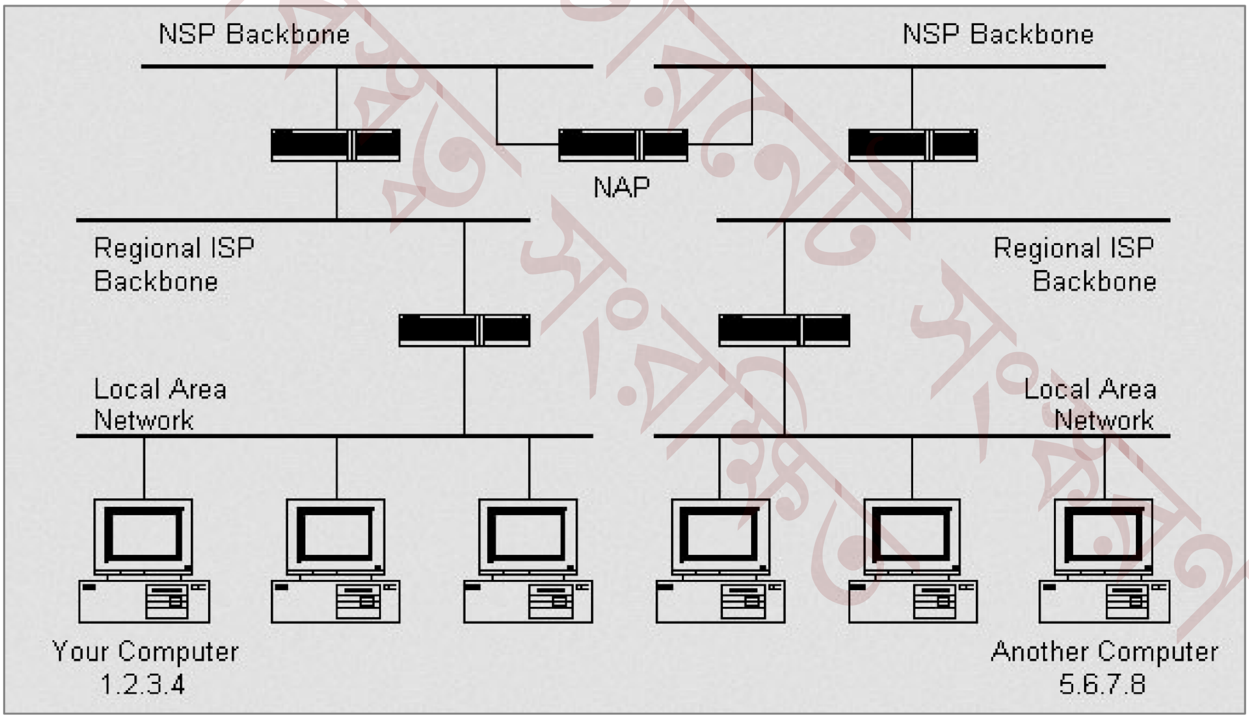
অনেক বড়ো বড়ো নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে ইন্টারনেটের মেরুদণ্ড। এসব বড়ো নেটওয়ার্ক সিস্টেমকেই বলে **'নেটওয়ার্ক সার্ভিস প্রোভাইডার্স'** [Network Service Providers]। এদের মধ্যে বড়ো ক'টি হলো ইউইউনেট [UUNET], সার্ফনেট [SERFNET], আইবিএম [IBM], বিবিএন প্লানেট [BBN Planet], স্প্রিংনেট [SPRINGNET], পিএসআইনেট [PSINET] ইত্যাদি। এগুলো একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত আছে। তারা প্রতি মুহূর্তে তথ্য-প্যাকেট সেয়ার করছে। প্রত্যেক নেটওয়ার্ক সার্ভিস প্রোভাইডারকে [ISP-কে] সর্বনিম্ন ৩টি **'নেটওয়ার্ক এক্সেস পয়েন্ট'** [Network Access Point] -এর সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। এনএসপি আরো একটি সার্ভারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। এই সার্ভারকে বলে **'মেট্রোপলিটান এরিয়া এক্সেঞ্জ'** [Metropolitan Area Exchange]। এগুলো ঠিক এনএসপি এর মতোই কাজ করে, কিন্তু তা ব্যক্তি মালিকানাধীন। এভাবেই পুরো ইন্টারনেট অবকাঠামো তৈরি হয়েছে। নীচের চিত্রে বিষয়টি সহজভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।



১১.ঙ. ইন্টারনেট পথনির্দেশ ঊর্ধ্ব-পরম্পরা [internet routing hierarchy]

আমরা এ পর্যন্ত যা বলেছি তা থেকে ইন্টারনেটের নেটওয়ার্কটি ঠিক কিভাবে গঠিত তার ইঙ্গিত পেলাম মাত্র। আরো কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। আমাদের প্রশ্ন, ঠিক কিভাবে তথ্যের প্যাকেট ইন্টারনেটে তার রাস্তা খুঁজে পায়? আমি বার বার প্যাকেট শব্দটি ব্যবহার করছি। এর কারণ হলো, যোগাযোগের সুবিধার্থে বেশ কিছু তথ্য একত্রে **'প্যাকেট'** [packet] করে পাঠানো হয়। আরো প্রশ্ন, ইন্টারনেটে সংযুক্ত প্রতিটি কম্পিউটার কি জানে অপর প্রতিটি কম্পিউটার কোথায় আছে [বা তাদের ঠিকানা কি]? শেষ প্রশ্ন, প্রতিটি প্যাকেট কি টিভি'র সিগনালের মতো ইন্টারনেটে **'সম্প্রচার'** হয়? শেষোক্ত দু'টি প্রশ্নের উত্তর হলো **'না'**! কোনো কম্পিউটারই জানে না অপর কোনো এক বা একাধিক কম্পিউটার কোথায় আছে। আর কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রেরিত তথ্য-প্যাকেট মোটেই সম্প্রচার হয় না টিভি'র সিগনালের মতো। যে গন্তব্যস্থলে প্যাকেট যাবে তার তথ্য সংরক্ষিত থাকে রুটিং টেবিলে। ইন্টারনেটে সংযুক্ত প্রত্যেক রুটারে এরূপ টেবিল আছে।

রুটার [router] প্যাকেট সুইচ ছাড়া আর কিছু নয়। তার কাজ হলো নেটওয়ার্কের তথ্যাদি বিভিন্ন রাস্তায় প্রেরণ করা। প্রত্যেক রুটার তার সাব-নেটওয়ার্ক ও তাদের দ্বারা ব্যবহৃত আইপি ঠিকানা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। নীচের চিত্রে রুটারের কাজ তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়েছি।



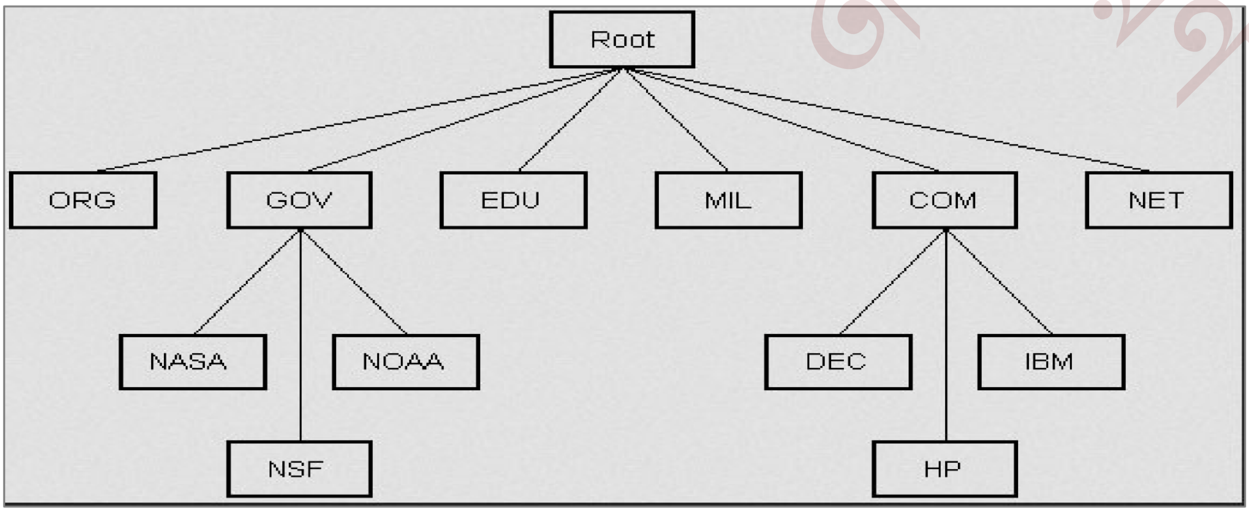
লক্ষ্য করুন উপরের চিত্রে কালো বাক্সগুলো হলো রুটার। এগুলো বিভিন্ন মেরুদণ্ডে সংযুক্ত। যেমন: নেটওয়ার্ক সার্ভিস প্রোভাইডার [NSP], নেটওয়ার্ক এক্সেস পয়েন্ট [NAP], রিজিওনেল ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার [RISP] মেরুদণ্ড, লকেল এরিয়া নেটওয়ার্ক [LAN] ইত্যাদি। উচ্চ পর্যায়ের এনএসপি মেরুদণ্ড থেকে নিম্নে দু'টি লকেল এরিয়া নেটওয়ার্ক পর্যন্ত রুটারের ক্রিয়া বিস্তৃত। নিম্নে আছে আপনার ও অপরের কম্পিউটার।

যে মুহূর্তে একটি প্যাকেট আসবে, প্রথমেই রুটার তার ঠিকানা পরীক্ষা করবে, যা সংরক্ষিত আছে তার আইপি প্রটোকল স্তরে। রুটার তার পথনির্দেশক টেবিলটি পরীক্ষা করবে। আইপি ঠিকানাসম্বলিত নেটওয়ার্ক পাওয়া গেলে প্যাকেটটি সেই নেটওয়ার্কে প্রেরিত হবে। আর না পাওয়া গেলে পরবর্তী রুটারে পাঠাবে। এখানে পাওয়া গেলে ভালো কথা। প্যাকেট তার ঠিকানায় প্রেরিত হবে। কিন্তু পাওয়া না গেলে পরবর্তী রুটারে যাবে এবং সেখানে অনুসন্ধান চলবে। এভাবে পুরো নেটওয়ার্ক রুটারের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হবে। ঠিকানা পাওয়ার আগ পর্যন্ত এ কাজ চলবে। কিন্তু সব জায়গায় অনুসন্ধান পরেও ঠিকানা না পাওয়া গেলে বুঝতে হবে ঠিকানায় কোনো ভুল আছে। সাধারণত ভুল আছে বলে একটি নোটিশ দেওয়া হবে প্রেরণকারী কম্পিউটারের ব্রাউজার [browser] সফ্‌টওয়্যারের জানালায়।

১১.চ. ডমেন নাম ও ঠিকানা নির্দিষ্টকরণ [domain name and address resolution]

আমি ইতোমধ্যে ব্রাউজার সফ্‌টওয়্যারের কথা বলেছি। ব্রাউজার একটি বিশেষ সফ্‌টওয়্যার যার মাধ্যমে ইন্টারনেটের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। আমি এ সম্পর্কে নিশ্চিত, যাদের কম্পিউটার আছে তারা সকলেই ব্রাউজার কি জিনিষ তা জানেন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে অপর কম্পিউটারে মেসেজ প্রেরণ আদৌ সম্ভব নয় আপনি তার আইপি ঠিকানা না জানলে। এ ক্ষেত্রে একটি উপায় হলো ব্রাউজারে 'www.othercomputer.com' ঠিকানা লিখতে পারেন। অবশ্য কাঙ্ক্ষিত **'ওয়েবসাইট'** [website] এর ঠিকানা আপনি **'সার্চ ইঞ্জিন'** দ্বারাও বের করতে পারেন। যেমন: **গুগল [Google], ইয়াহু [Yahoo], বিং [BING]** ইত্যাদি। কিন্তু ঠিক কিভাবে এই ঠিকানা থেকে আপনার ওয়েভ ব্রাউজার অপর কম্পিউটার বা সার্ভারের ওয়েভ পৃষ্ঠাটি সনাক্ত করে?

উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব হলো **'ডমেন নেইম সর্ভিস'** [Domain Name Service -DNS] সিস্টেম। এটা একটি বিস্তৃত ও প্রচারিত **'ডাটাবেইজ'** [database]। এতে সংরক্ষিত আছে ইন্টারনেটে সংযুক্ত কম্পিউটারের নাম ও আইপি ঠিকানাসমূহ। ডিএনএস ডাটাবেইজসহ ইন্টারনেটে সংযুক্ত অনেক কম্পিউটার আছে। এগুলোকে বলে ডিএনএস সার্ভার [DNS Server]। তবে কোনো একটিতে যাবতীয় ডাটা সংরক্ষিত থাকে না। ঠিকানা নিজের ডাটাবেইজে না পাওয়া গেলে অপর ডিএনএস সার্ভারে [DNS Server] তা প্রেরিত হবে। এভাবে ঠিকানা সনাক্ত না হওয়া পর্যন্ত ডিএনএস সার্ভার থেকে সার্ভারে রিকুয়েস্ট প্রেরিত হতে থাকবে। নীচের চিত্রে এ বিষয়টি বুঝানোর চেষ্টা চালিয়েছি।



লক্ষ্য করুন, উপরের চিত্রে ORG, GOV, EDU, MIL, COM, NET এই পাঁচটি শব্দ দেওয়া আছে। আপনি হয়তো দেখেছেন, যে কোনো ইন্টারনেটের ঠিকানার শেষে একটি ডট বা বিন্দু [.] পরে উপরোক্ত তিন অক্ষরের যে কোনো একটি শব্দ থাকে। এই শব্দগুলো দ্বারাই ডিএনএস কোন্ সার্ভারে আছে তা নির্দিষ্ট হয়। চিত্রে অন্যান্য সংক্ষেপকরণ শব্দাবলী হলোঃ NASA [National Astronautics and Space Administration], NOAA [National Oceanic and Atmospheric Administration], NSF। এ তিনটি গভর্নমেন্ট সার্ভারের নিয়ন্ত্রণাধীন। অবশ্য আরো অনেক আছে- ওগুলো এখানে দেখানো হয় নি। DEC, IBM, HP ইত্যাদি **.কম** এর নিয়ন্ত্রণাধীন। এখানেও সবগুলো দেখানো হয় নি অবশ্যই।

১১.জ. কিভাবে ব্রাউজার উইন্ডোতে ওয়েভপেইজ আসে

আপনাদের যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন তারা জানেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ওয়েভপেইজ ভিজিট করতে হয় **'ওয়াল্ড ওয়াইড ওয়েভ'** [world wide web -www] সার্ভিসের মাধ্যমে। যে প্রটোকলের মাধ্যমে আপনার **'ব্রাউজার সফ্‌টওয়্যার'** [browser software] এ সার্ভিসটি কাজে লাগায় তার নাম **'হাইপারটেক্স ট্রান্সফার প্রটোকল'** [Hypertext Transfer Protocol - HTTP]। মনে রাখবেন, **'হাইপারটেক্স মার্কাপ ল্যাংগুয়েজ'** [Hypertext Markup Language -HTML] ভিন্ন জিনিস- এটা হলো ওয়েভ পৃষ্ঠা লেখার একটি ভাষা মাত্র। এইচটিটিপি প্রটোকলের মাধ্যমে ওয়েভ ব্রাউজার [যেমন ফায়ারফক্স [Firefox], সাফারি [Safari], এক্সপ্লোরার [Explorer] ইত্যাদি] ও সার্ভারের মধ্যে ইন্টারনেটে যোগাযোগ সৃষ্টি হয়। এটা সফ্‌টওয়্যার লেবেলে কাজ করে। এখন জেনে নেই আপনার অনুরোধকৃত ওয়েভ পেইজটি ঠিক কিভাবে কম্পিউটারের স্ক্রীনে ভেসে ওঠে।

১. আপনি ব্রাউজারের ঠিকানা লেখার স্থানে একটি ওয়েভ ঠিকানা লিখলেন। অবশ্য আপনার ফেভারেট লিস্ট বা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ঠিকানাও চয়েজ করতে পারেন। যে উপায়েই হোক এ ঠিকানা বা **'ইউনিফর্ম রিসোর্চ লকেটর'** [Uniform Resource Locator -URL] এর মধ্যে আছে ডমেন নেইম [domain name]। সার্ভার প্রথমেই ডিএনএস [DNS] সার্ভারের সাথে যোগাযোগ করে নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত আইপি ঠিকানা [IP Address] সংগ্রহ করবে ওয়েভ সার্ভারের জন্য।

২. এবার ব্রাউজার ওয়েভ সার্ভারের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করে একটি এইচটিটিপি অনুরোধ [HTTP Request] প্রেরণ করবে কাঙ্ক্ষিত ওয়েভ পেইজ খুঁজে বের করতে।

৩. ওয়েভ সার্ভার রিকুয়েস্ট প্রাপ্ত হয়ে কাঙ্ক্ষিত ওয়েভ পেইজ আছে কি না পরীক্ষা করে নেয়। যদি তা থেকে থাকে তাহলে ওয়েভ সার্ভার এটা প্রেরণ করবে ব্রাউজারের নিকট। আর না পাওয়া গেলে সার্ভার **'এইচটিটিপি ৪০৪ এরোর মেসেজ'** [HTTP 404 error message - 'Page Not Found'] প্রেরণ করবে।

৪. পেইজ প্রাপ্ত হওয়ার পরই যোগাযোগ ক্ষণকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

৫. পৃষ্ঠার মধ্যে যদি অন্য তথ্যাদি থাকে, সার্ভার থেকে তা লোড করার জন্য রিকুয়েস্ট প্রেরণ করবে ব্রাউজার। সাধারণত ওয়েভ পেইজে চিত্র, ছবি, আপলেট, লেখা ইত্যাদি থাকে।

৬. প্রত্যেক বস্তুর জন্য ব্রাউজার বার বার আলাদা করে রিকুয়েস্ট করবে। অর্থাৎ একটা লোড হওয়ার পর যোগাযোগ ক্ষণকালের জন্য বিচ্ছন্ন হবে। এরপর আরেকটার জন্য প্রেরণ করবে এইচটিটিপি রিকুয়েস্ট। এভাবে করার মূল কারণ হলো অন্যদের সুবিধা। একই সার্ভারের সঙ্গে হয়তো অন্য এক বা একাধিক ব্রাউজার অনুরূপ রিকুয়েস্ট প্রেরণ করতে পারে। আর আসলে এরূপই হয়ে থাকে। কারণ ইন্টারনেটে যে কোন মুহূর্তে কোটি কোটি মানুষ জড়িত আছে বিশ্বব্যাপী। এ সংখ্যা প্রতি মুহূর্তে বাড়ছেও।

৭. ওয়েভ পেইজের সব বস্তু লোড করা শেষ হয়ে গেলে সার্ভারের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এবার আপনার কম্পিউটারে পুরো পৃষ্ঠাটি দৃশ্যমান হবে। একই ওয়েভ সাইটের অপর কোনো পেইজে যেতে হলে ক্লিক করতে হবে প্রয়োজনীয় লিংকে। এবার ব্রাউজার আবার সার্ভারের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করে রিকুয়েস্ট প্রেরণ করবে। এভাবে বিভিন্ন পৃষ্ঠা আপনি দেখতে পারেন। আপনি যে কোন পৃষ্ঠা লোড হওয়ার পর নিজের কম্পিউটারে সংরক্ষণ করেও রাখতে পারেন।

১১.ঝ. সফ্টওয়্যার প্রটোকল : এসএমটিপি ও ইলেকট্রনিক মেইল [Application Protocol and Electronic Mail]

ইন্টারনেট সার্ভিসের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হলো **'ইলেকট্রনিক মেইল'** [electronic mail - E-Mail] বা ই-মেইল ব্যবস্থা। ই-মেইল একটি সফ্টওয়্যার লেবেল প্রটোকল ব্যবহার করে। এর নাম হলো **'সিম্পুল মেইল ট্রান্সফার প্রটোকল'** [Simple Mail Transfer Protocol - SMTP]। এটা মূলত লেখাসর্বস্ব প্রটোকল [text based]। এটা এইচটিটিপি থেকে বেশ জটিলও বটে। এবার জেনে নিন আপনি যখন ই-মেইল পড়া বা করার জন্য ইচ্ছে করেন তখন কী হয়।

১. মেইল ক্লায়েন্ট [যেমন, gmail, yahoomail, MS Outlook, Netscape Mail ইত্যাদি] তার নিজের মেইল সার্ভারের সঙ্গে প্রথমে যোগাযোগ সৃষ্টি করবে। সার্ভারের আইপি ঠিকানা বা ডমেন নাম মেইল ক্লায়েন্ট **'সফ্টওয়্যার সেটাপের'** [software setup] সাথে ইন্সস্টল হয়ে থাকে।

২. মেইল সার্ভার সর্বদাই প্রথম মেসেজ প্রেরণ করবে নিজেকে পরিচয় করার উদ্দেশ্যে।

৩. ক্লায়েন্ট একটি এসএমটিপি **'হ্যালো'** কমান্ড বা নির্দেশ পাঠাবে। সার্ভার এটা প্রাপ্ত হয়ে **'250 OK'** মেসেজ দ্বারা জাবাব দেবে।

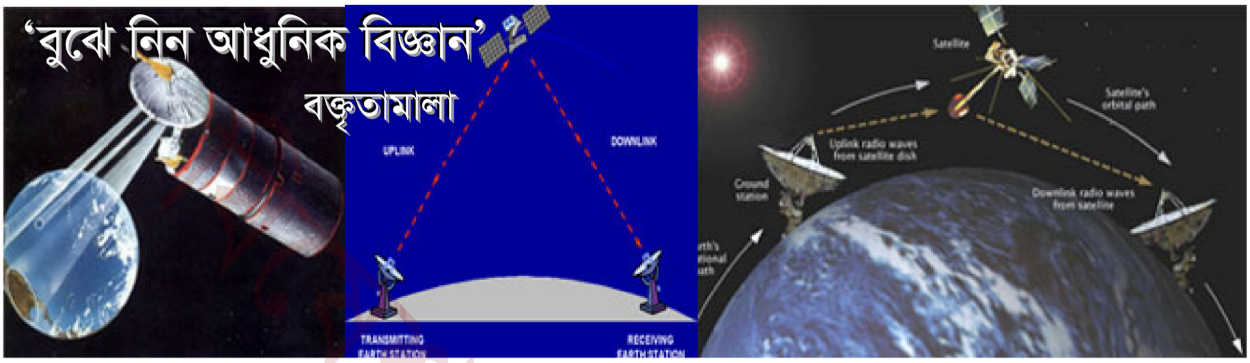
৪. ঠিক কোন্ কাজটি করছেন তার উপর নির্ভর করবে কোন্ এসএমটিপি কমান্ড সার্ভারে প্রেরিত হবে। আপনি হয়তো ডাক চেক করতে পারেন, ই-মেইল পাঠাতে পারেন বা অন্য কোন কাজ করতে পারেন। যেটাই করুন, সে মুতাবিক কমান্ড প্রেরিত হবে সার্ভারে। সার্ভার সঠিক জবাব দেবে।

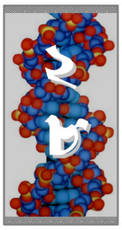
৫. এই রিকুয়েস্ট/রিসপন্স [request/response] বা অনুরোধ/সাড়া যোগাযোগ চলতে থাকবে যতক্ষণ না ক্লায়েন্ট থেকে **'এসএমটিপি কুইট'** [SMTP QUIT] কমান্ড প্রেরিত হবে। এই কমান্ডের অর্থ ই-মেইল যোগাযোগ বন্ধ করা। মোটকথা, এসএমটিপি ক্লায়েন্ট [SMTP client] ও এসএমটিপি সার্ভারের [SMTP server] মধ্যে **'কথাবার্তা'** হওয়ার নামই ই-মেইল করা ও পাওয়া।

প্রিয় ছাত্র-বন্ধুরা! এ পর্যায়ে ইন্টারনেট সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নেই। মাত্র কয়েক দশক পূর্বে ইন্টারনেট আত্মপ্রকাশ করে। ইতোমধ্যে অনেক দূর এগিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে আরো এগুবে সন্দেহ নেই। ইতোমধ্যে ইন্টারনেট ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। পৃথিবীব্যাপী বিরাট প্রভাব ফেলেছে এই জনপ্রিয় মিডিয়া। যদিও দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক বাজে জিনিসও প্রচার হচ্ছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিশ্বসমাজ। অত্যন্ত চরম পর্যায়ের ব্লু ছবি ও ফিল্ম ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। এছাড়া ধর্ম-দর্শন-ইতিহাস এবং অন্যান্য তত্ত্ব-তথ্যভিত্তিক ফাইল যে যেভাবে পারে আপলোড করে দিচ্ছে ইন্টারনেটে। এসব ফাইল সত্য থেকে ডাহা মিথ্যা ও আপত্তিকর থেকে বিভ্রান্তিকর পর্যন্ত আছে। সুতরাং সবাইকে সতর্ক থাকা চাই।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আজকের লেকচার দীর্ঘ হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। আমরা পরবর্তী লেকচারে আধুনিক প্রযুক্তির আরো একটি বিষয়ের উপর তথ্যানুসন্ধান চালাবো। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের আলোচনা শেষ করছি।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বক্তৃতা ২৮ : আধুনিক প্রযুক্তি

১২. আধুনিক যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহ [Modern Communication Satellite]

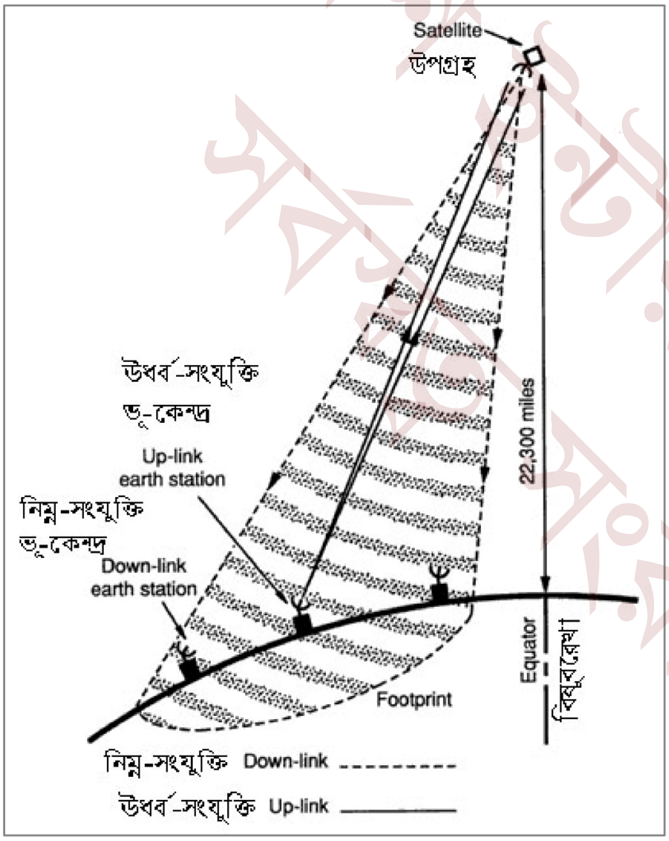
প্রিয় শিক্ষার্থী! গত লেকচারে আমরা ইন্টারনেটের উপর আলোচনা করেছি। জনপ্রিয় এ গণমাধ্যম সম্পর্কে আরো অনেককিছু বলার ছিলো। তবে আমাদেরকে এক স্থানে থামতে হবে। ইন্টারনেট মাত্র ক'টি বৎসরে এক বিরাট বিষয়ে রূপান্তর হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে এর সম্প্রসারণ ঘটছে। সুতরাং ইন্টারনেট সম্পর্কে বলে শেষ করার কোনো উপায় নেই। আসলে এই লেকচারের ব্যাপ্তির বাইরে যেতে ইচ্ছে নেই। সুতরাং আজকের লেকচারের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছি। আমরা এখন আলোচনা করবো এ যুগের গুরুত্বপূর্ণ আরেক টেকনোলজির উপর। এটা হলো আধুনিক **'যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহ'** [communication sattelite]।

যোগাযোগ উপগ্রহের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৫৮ সালে। ইতোমধ্যে পার হয়ে গেছে প্রায় ৬ দশক। আজকের পৃথিবী-গোলকের চতুর্দিকে দূর মহাকাশে ঘুর্ণনরত আছে অসংখ্য যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহ। এ সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহের কাজ হলো পৃথিবীকে একটা নির্দিষ্ট গতিতে প্রদক্ষিণরত অবস্থায় মহাকাশে থেকে পৃথিবীর সঙ্গে রেডিও, টিভি ও টেলিফোন সিগনাল আদান-প্রদান করা। পৃথিবীর জমিনে স্থাপিত **'আর্থ স্টেশন'** [Earth Station] বা ভূ-কেন্দ্র থেকে প্রেরিত সিগনাল উপগ্রহের মাধ্যমে অপর আর্থ স্টেশনে পাঠানো হয়। সিগনাল অবশ্য উচ্চতর গতি তথা আলোকের গতিতে চলে। ফলে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সরাসরি রেডিও, টিভি ও টেলিফোন যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে। নতুন এই যোগাযোগ ব্যবস্থা বাস্তবিকই সমগ্র পৃথিবীর জনগোষ্ঠিকে আজ **'গ্লোবেল ভিলেজ'**

[Global Village] এর অধিবাসী করেছে। আমরা অনুভব করছি আমেরিকা কিংবা অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী আমাদের পড়শী- খুব দূরের মানুষ নন। স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকায় প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি মানুষ সরাসরি যোগাযোগ অব্যাহত রাখছে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী। আজকের লেকচারে আমরা **'কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট'** [Communication Satellite] প্রযুক্তির উপর হৃদয়াকর্ষক আলোচনা করবো।

১২.ক. স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থার মৌলিক পদ্ধতি

প্রথমেই আমরা স্যাটেলাইট যোগাযোগের মৌলিক দিক নিয়ে আলোচনা করাবো। নীচের চিত্রে এটা বুঝানোর চেষ্টা করেছি। যোগাযোগ ক্রিয়া শুরু হয় **'ভূ-কেন্দ্রে'** [Earth Station]। ভূ-কেন্দ্রের মধ্যে থাকে পৃথিবীর কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে সিগনাল প্রেরণ ও প্রাপ্তির বিভিন্ন যন্ত্রাদি।



ভূ-কেন্দ্র থেকে উচ্চ এনার্জি ও ফ্রিকুয়েন্সিসম্পন্ন সিগনাল ছাড়া হয় যোগাযোগ স্যাটেলাইটে। পৃথিবীর ভূ-খণ্ডের একটি বিশেষ অংশ যে কোন স্যাটেলাইটের রেঞ্জের ভেতর থাকে। এই রেঞ্জের অভ্যন্তরে স্থাপিত হয়েছে আরো একাধিক ভূ-কেন্দ্র। সুতরাং যে কোন একটি ভূ-কেন্দ্র থেকে প্রেরিত সিগনাল পুনরায় অপর এক বা একাধিক ভূ-কেন্দ্রে স্যাটেলাইট ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে পারে। যে রেঞ্জের ভেতর স্যাটেলাইটের যোগাযোগ সম্ভব একে বলে ঐ স্যাটেলাইটের **'ফুটপ্রিন্ট'** [footprint]। ভূ-কেন্দ্র থেকে স্যাটেলাইটে সিগনাল পাঠানোর সিস্টেমকে বলে **'আপলিঙ্ক'** [uplink] বা উর্ধ্বগামী-সংযুক্তি। আর স্যাটেলাইট থেকে ভূ-কেন্দ্রে সিগনাল ফেরৎ পাঠানোর সিস্টেমকে বলে **'ডাউনলিংক'** [downlink] বা নিম্নগামী-সংযুক্তি। এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে সক্ষম হলাম যে, স্যাটেলাইট পৃথিবীর উর্ধ্বাকাশে একটি বিশেষ স্থানে প্রদক্ষিণরত থাকে। ভূ-কেন্দ্র থেকে উর্ধ্বগামী-সংযুক্তির মাধ্যমে সিগনাল প্রেরণ করা হয় আর অপর এক বা একাধিক ভূ-কেন্দ্রে সেই সিগনাল পুনরায় স্যাটেলাইট থেকে নিম্নগামী-সংযুক্তির মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেক স্যাটেলাইটের একটি রেঞ্জ আছে যাকে **'ফুটপ্রিন্ট'** বলে। ফুটপ্রিন্টের অভ্যন্তরে যতো ভূ-কেন্দ্র আছে ওগুলো ঐ স্যাটেলাইটের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

১২.খ. উপগ্রহ যোগাযোগ ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ড [satellite frequency band]

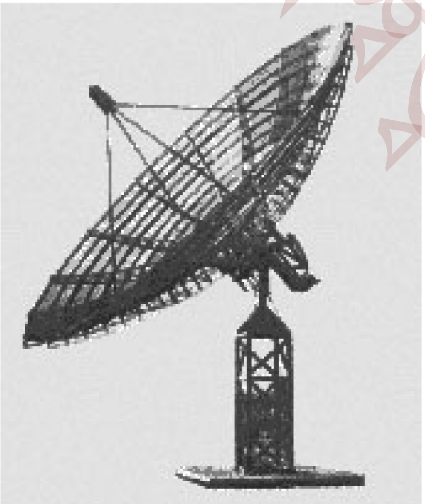
স্যাটেলাইট যোগাযোগের জন্য তিনটি নির্দিষ্ট ব্যান্ড ব্যবহৃত হয়। এগুলো হলো **'সি-ব্যান্ড'** [C-band], **'কেইউ-ব্যান্ড'** [Ku-Band] এবং **'কেএ-ব্যান্ড'** [Ka-Band]। এর মধ্যে প্রথমোক্ত দু'টি সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।

আমরা ফিজিক্সের উপর আলোচনাকালে **‘ফ্রিকুয়েন্সি’** [frequency] বা তরঙ্গসংখ্যা, **‘ওয়েভলেন্থ’** [wavelength] বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য ইত্যাদির উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে শুধুমাত্র উভয়টির অর্থ ও একটার সঙ্গে আরেকটির সম্পর্ক কী তা তুলে ধরছি।

একটি সিগনালে প্রতি সেকেন্ড ক’টি তরঙ্গ আছে সে-ই হিসাবের নামই হলো **ফ্রিকুয়েন্সি**। অপরদিকে একটি তরঙ্গের [কোন বিশেষ পয়েন্ট থেকে অপর একই পয়েন্ট পর্যন্ত] দৈর্ঘ্যকে বলে **ওয়েভলেন্থ**। এই উভয়টির মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। গাণিতিকভাবে এই সম্পর্ক লেখা হয় এভাবে:

$V = \lambda f$ [এখানে V হলো সিগনালের গতি বা ভেলোসিটি, λ (লামদা) হলো তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং f হলো ফ্রিকুয়েন্সি]

উপরের সমীকরণ থেকে স্পষ্ট, যদি **ফ্রিকুয়েন্সি** বাড়ে তাহলে **ওয়েভলেন্থ** কমবে। সুতরাং ওয়েভলেন্থ বাড়লে অধিক বড়ো **এ্যান্টেনা** [Antenna -অর্থাৎ স্যাটেলাইটের ডিশ-এ্যান্টেনা] দরকার। এ কারণেই আমরা স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের জন্য খুব বড় বড় এ্যান্টেনা দেখতে পাই। সি-ব্যান্ড স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশনের ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ হলো ৪ থেকে ৮ **গিগাহার্টজ** [GHz]। এটা অপেক্ষাকৃত নিম্ন ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ। এতে যে ওয়েভলেন্থ সৃষ্টি হয় তা কেইউ-ব্যান্ড ও কেএ-ব্যান্ডের তুলনায় বেশী। সুতরাং সি-ব্যান্ডের এসব দীর্ঘ ওয়েভলেন্থকে গ্রহণযোগ্যভাবে রিসিভ করতে প্রয়োজন দাঁড়ায় বেশ বড় বড় এ্যান্টেনার। অঙ্ক কষে দেখা গেছে সি-ব্যান্ডের যোগ্য এ্যান্টেনার ব্যাস হতে হবে ২ থেকে ৩ মিটার। নীচে সি-ব্যান্ডের এ্যান্টেনার একটি ছবি তুলে ধরেছি।



কেইউ-ব্যান্ড স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশনের ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ হলো **১১** থেকে **১৭ মেগাহার্টজ** [MHz]। উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সির অর্থ তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেকটা কম। সুতরাং ছোট্ট সাইজের এ্যান্টেনা দ্বারা এসব সিগনাল রিসিভ করা সম্ভব। সর্বনিম্ন মাত্র ১৮ ইঞ্চি ব্যাসের এ্যান্টেনাই এই সিগনাল ধারণের জন্য যথেষ্ট। এরূপ সিগনালের মাধ্যমেই ঘরে ঘরে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সম্ভব হয়েছে। নীচে কেইউ-ব্যান্ডের একটি এ্যান্টেনা ও রিসিভার দেখানো হলো।

কেএ-ব্যান্ডের স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশনের ফ্রিকুয়েন্সি ২০ থেকে ৩০ মেগাহার্টজ পর্যন্ত হয়ে থাকে। উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সির ফলে ওয়েভলেন্থও হয় কম। ফলে অতি ছোট্ট এ্যান্টেনাই যোগাযোগের জন্য যথেষ্ট। গড়িতে ব্যবহৃত স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং সিস্টেমে এই ব্যান্ডের সিগনাল কাজে লাগানো হয়।

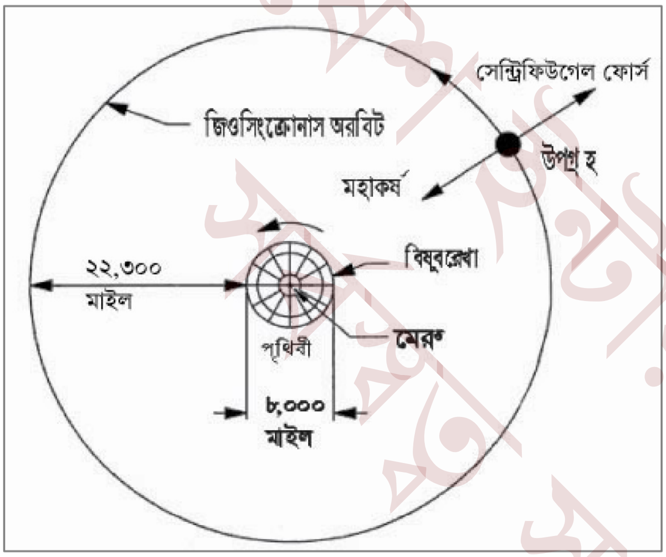


১২.গ. ভূ-গতিসঙ্গত পৃথিবী কক্ষপথ উপগ্রহ [Geosynchronous Earth Orbit - GEO Satellite]

আমরা ইতোমধ্যে কোনো এক লেকচারে এই কক্ষপথের উপর তথ্য তুলে ধরেছি। এই বিশেষ কক্ষপথকে বুঝানোর উদ্দেশ্যে

একটি চিত্রও আমার অঙ্কন করে দেখিয়েছিলাম। নীচে [পরবর্তী পৃষ্ঠায়] সেই চিত্রটি পুনরায় তুলে ধরছি।

আজকাল অধিকাংশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট উপরোক্ত GEO অরবিটে স্থাপন করা হয়। এর মূল কারণ হলো পৃথিবীর এক বিশেষ ভূ-খণ্ড জুড়ে স্যাটেলাইটের ফুটপ্রিন্ট স্থায়ী রাখা। কারণ জিইও কক্ষপথে স্থাপিত স্যাটেলাইট পৃথিবীর দৈনিক গতির সমপরিমাণ গতিতে একই দিকে তথা পূর্বদিকে প্রদক্ষিণ করে। ফলে যে কোন মুহূর্তে স্যাটেলাইট ভূ-খণ্ডের একই স্থানে ২২,৩০০ মাইল উর্ধ্বে পৃথিবীর তুলনায় স্থির থাকতে সক্ষম হয়। অন্য কোন কক্ষপথে স্যাটেলাইটকে এভাবে স্থির রাখা সম্ভব নয়। এই বিশেষ কক্ষপথের অপর নাম **'জিওস্টেশনারী আর্থ অরবিট'** [Geostationary Earth orbit] বা ভূ-স্থিত পৃথিবী কক্ষপথ।



১২. ঘ. মধ্যম পৃথিবী কক্ষপথ উপগ্রহ [Medium Earth Orbit - MEO Satellite]

মধ্যম পৃথিবী কক্ষপথে স্যাটেলাইট স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে গত ক'বৎসর পূর্বে। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি, ভূ-স্থিত কক্ষপথ পৃথিবী থেকে অন্তত ২২,৩০০ মাইল উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যোগাযোগ স্যাটেলাইটে সিগনাল আদান-প্রদান হয় ইলেকট্রমেগনেটিক তরঙ্গে। এই সিগনালের নির্দিষ্ট গতি আছে। আলোকের অতি কাছাকাছি গতিতে চলেও ভূ-কেন্দ্র থেকে সিগনাল আপলোড ও অপর ভূ-কেন্দ্রে বা স্যাটেলাইট ডিশে ডাউনলোড হতে মোট সময় লাগে প্রায় ০.২৫ সেকেন্ড। এটা এক সেকেন্ডের চার ভাগের একভাগ হলেও **'লাইভ ট্রান্সমিশন'** [live transmission] এর জন্য কিছুটা সমস্যা সৃষ্টি করে। মোটকথা, পৃথিবী থেকে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট যতো কাছে হবে সময় অপচয় বা **'টাইম ডিলে'** [time delay] কম হবে। এ লক্ষ্যর্জনে বিজ্ঞানীরা **মধ্যম আর্থ অরবিট স্যাটেলাইট** স্থাপনের পথ উদ্ভাবন করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে একটি মাত্র স্যাটেলাইট ভূ-পৃষ্ঠের বড়ো অংশে **ফুটপ্রিন্ট** তৈরী করতে পারবে না। তাই একাধিক স্যাটেলাইট MEO কক্ষপথে স্থাপন করে যোগাযোগের জন্য একটি **'নেটওয়ার্ক'** [network] তৈরী করে পুরো বিশ্বব্যাপী সম্প্রচার নিশ্চিত করেছেন একই সঙ্গে।

১২. ঙ. নিম্ন পৃথিবী কক্ষপথ উপগ্রহ [Low Earth Orbit -LEO Satellite]

এই সিস্টেমে থাকবে বেশ ক'টি স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক। এগুলো ৫০০ থেকে ১০০০ মাইল উর্ধ্বে অবস্থান করে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে। এলইও কক্ষপথে চলন্ত থাকলে **'স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন ডিলে'** [Satellite Transmission Delay] অনেকটা কমে আসবে। ধারণা করা হচ্ছে এর মাত্রা হবে মাত্র ০.০৫ সেকেন্ড। তিন ধরনের এলইও স্যাটেলাইট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব এসেছেঃ ছোট্ট, বড়ো ও অনেক বড়ো এলইও। ছোট্ট এলইও স্যাটেলাইট ৮০০ মেগাহার্টজ [MHz] ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করবে। বড়োটি কাজ করবে ২ গিগাহার্টজ [GHz] রেঞ্জে ও অনেক বড়োগুলোর রেঞ্জ হবে ২০ থেকে ৩০ গিগাহার্টজে। উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সির স্যাটেলোইটগুলো অধিক তথ্য একই সঙ্গে ক্যারি করার ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। এছাড়া **'রিয়েল-টাইম ট্রান্সমিশন'** [real-time transmission] সম্ভব হবে এগুলো

দ্বারা। এর অর্থ হলো সিগনাল প্রেরণ ও প্রাপ্তিতে সময় নষ্ট হবে না। পৃথিবীবিখ্যাত 'মাইক্রসফ্‌ট কর্পোরেশন' এবং 'মেক-কো সেল্যুলার' কোম্পানি মিলে একটি নতুন স্যাটেলাইট যোগাযোগ সিস্টেম স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিস্টেমের নাম 'AT&T Wireless Services'। এতে থাকবে ৮৪০টি অধিক বড়ো এলইও স্যাটেলাইট। এগুলো সৃষ্টি করবে এক বিরাট নেটওয়ার্ক যার নাম **'টেলিডিসিক'** [Teledesic]। ভিডিও-অডিও ট্রান্সমিশনের জন্য এই সিস্টেম হবে যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহের ইতিহাসে বৈপ্লবিক উন্নয়ন।

১২. চ. অধিক উচ্চতাসম্পন্ন দীর্ঘমেয়াদী প্লাটফর্ম [High Altitude Long Endurance - HALE Platform]

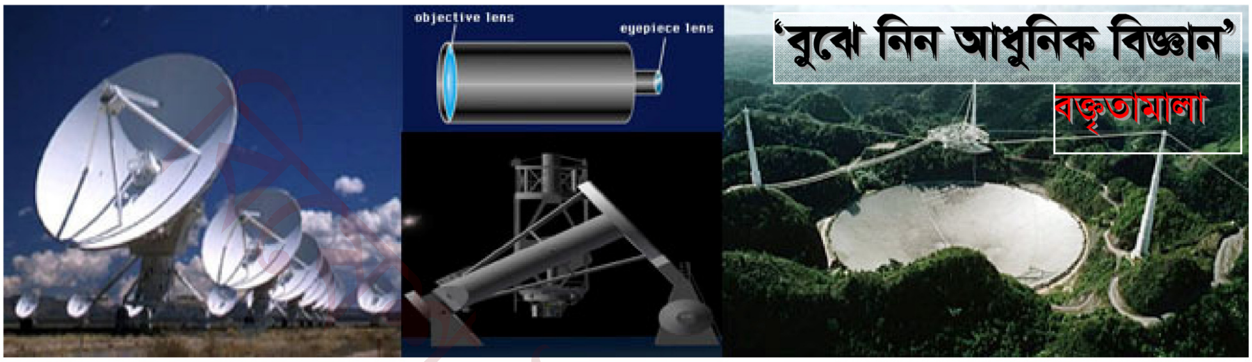
যোগাযোগ স্যাটেলাইট সিস্টেমের সর্বাধুনিক এই প্রযুক্তি এখন পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে। এসব স্যাটেলাইট মূলত উচ্চগুণসম্পন্ন অল্প ওজনের বিমান। এগুলো যোগাযোগ যন্ত্রাদিসহ স্থাপিত হবে জিওসিংক্রোনাস স্যাটেলাইট কক্ষপথে। পৃথিবী থেকে এগুলো খুব অল্প উচ্চতায় অবস্থান করবে। এসব বিমান পরিচালিত হবে উচ্চমানের টারবাইন ইঞ্জিন দ্বারা। সেসাথে ব্যাটারী ও সৌরবিদ্যুৎ থাকবে। পৃথিবী থেকে মাত্র ৭০ হাজার ফুট উপরে এই প্লাটফর্ম স্থাপিত হবে। সুতরাং ট্রান্সমিশন ডিলে কমে ০.০০১ সেকেন্ডে নেমে আসবে। বিজ্ঞানীরা এই সিস্টেম স্থাপন করছেন মুটোফোন জাতীয় যন্ত্রের জন্য। সুতরাং ভবিষ্যতে স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন আপনার আমার মোবাইলেও থাকবে।

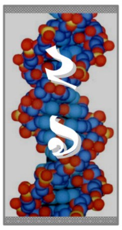
১২. জ. কক্ষপথের ফাঁক [Orbital Slots]

ইতোমধ্যে উর্ধ্বাকাশে ৩ শতাধিক স্যাটেলাইট স্থাপিত হয়ে গেছে ভূ-স্থিত কক্ষপথে [Geosynchronous Orbit]। এ সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সুতরাং একটা আরেকটার উপর পতিত হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা এড়াতে একাধিক আন্তর্জাতিক ও গভর্নমেন্ট সংস্থা কাজ করে যাচ্ছেন। আপনার স্যাটেলাইট [প্রাইভেট কোম্পানীর বা কোন সরকারের হউক] ঠিক কোন্ ফাঁকে বা স্লটে স্থাপন করবেন সেজন্য ওসব সংস্থার নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ করে নিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংস্থাটির নাম **'ইন্টারনেশনাল কমিউনিকেশন্স ইউনিয়ন'** [International Communications Union - ICU]। আমেরিকার সরকার আরেক সংস্থা সৃষ্টি করেছেন, যার নাম **'ফেডারেল কমিউনিকেশন্স কমিশন'** [Federal Communication Commission]। ডিগ্রী হিসাবে দ্রাঘিমাংশ [altitude] দ্বারা এসব স্লট বরাদ্দ করা হয়। আজকাল সি-ব্যান্ড ও কেইউ-ব্যান্ড স্যাটেলাইটের জন্য অরবিটেল স্লটের চাহিদা এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে ICU এবং FCC বাধ্য হয়ে স্লটের প্রয়োজনীয় ব্যাপ্তি কমিয়ে মাত্র ২ ডিগ্রীতে নামিয়েছেন।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আধুনিক যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহের উপর আমাদের তথ্যানুসন্ধানের ইতি এক্ষুণি টানছি। এ সম্পর্কে আর বেশী বলার প্রয়োজন নেই। আমি আশা করছি যা আলোচিত হলো তা থেকেই আপনারা কৃত্রিম উপগ্রহের কার্যকারিতা সম্পর্কে অনেকটা বেশী জেনে নিয়েছেন। আর এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। আগামী লেকচারে উচ্চ প্রযুক্তির আরেক গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র অপটিকেল ও রেডিও টেলিস্কোপ নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ! সবাই ভালো থাকুন। আগামী লেকচারে আবার দেখা হবে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

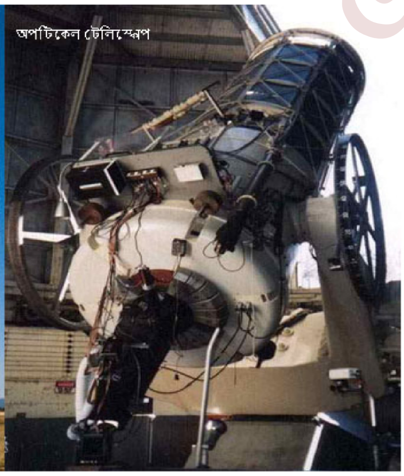
ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বক্তৃতা ২৯ : আধুনিক প্রযুক্তি

১৩. অপটিক্যাল ও রেডিও টেলিস্কোপ [Optical and Radio Telescope]

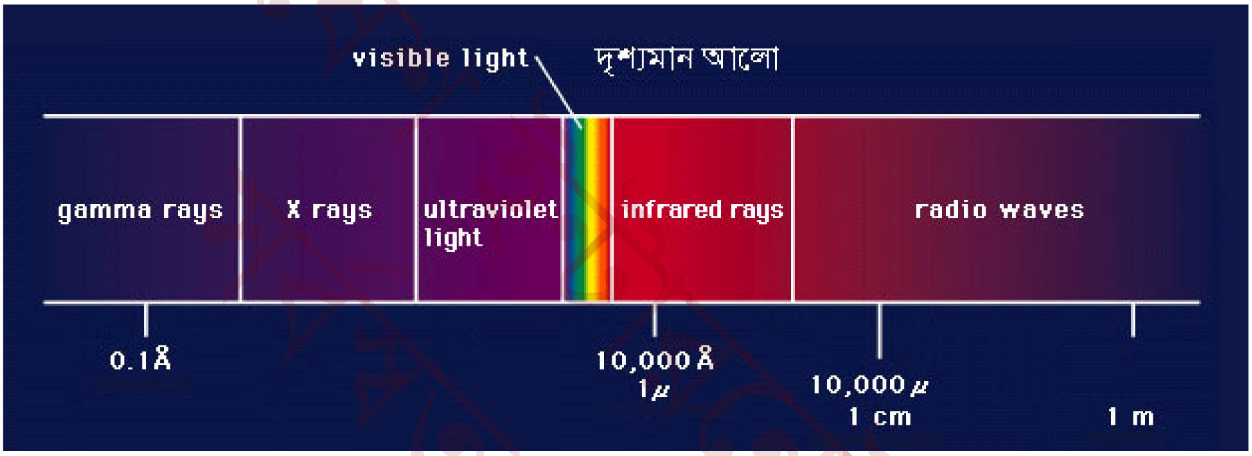
প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান শীর্ষক বক্তৃতামালার উনত্রিশতম সংযোজন এটি। সবাইকে জানাচ্ছি সাদর সম্ভাষণ। আজকের লেকচার টেলিস্কোপ নিয়ে। বাংলায় একে দূরবীক্ষণযন্ত্র বলে। এর দ্বারা কী হয় তা সকলেই জানেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। তাই আধুনিক প্রযুক্তির উপর তথ্যানুসন্ধানের অংশ হিসাবে ১৩তম যন্ত্র হিসাবে টেলিস্কোপকে বেছে নিয়েছি। আমরা ইতোমধ্যে এ যন্ত্রটির কথা উল্লেখ করেছি অপর আরেক বক্তৃতায়। আজ অবশ্য এই যন্ত্রের টেকনিকেল দিকের উপর আলোচনা হবে। তাই আসুন, জেনে নিই দূরবীক্ষণযন্ত্র ঠিক কিভাবে কাজ করে।





১৩. ক. দূরবীক্ষণযন্ত্র ব্যবহারের ব্যাপ্তি

দূরবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা শুধুমাত্র দৃশ্যমান জগতের এক বা একাধিক বস্তু বড়ো করে দেখা হয়- তা কিন্তু নয়। পুরো ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রাম [electromagnetic spectrum] বা বর্ণচ্ছটা বৃহৎ করে দেখা ও পরীক্ষার যন্ত্র এটি। আধুনিক যুগে এ কারণেই মহাকাশ বিজ্ঞানে টেলিস্কোপের গুরুত্ব এতোই বেশী। ইলেকট্রমেগনেটিক বর্ণচ্ছটার উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে ফিজিক্সের উপর তথ্যানুসন্ধানের সময়। এখানে স্পেকট্রামের একটি চিত্র তুল ধরলাম সকলের মাইন্ড ফ্রেস করতে যেয়ে।



লক্ষ্য করুণ, উপরোক্ত চিত্রে বায়ের দিকে আছে গামা-রে [নীলের দিক], এরপর এক্স-রে, আলট্রাভাইলট, দৃশ্যমান আলো, [লালের দিকে] ইনফ্রারেড ও রেডিও তরঙ্গ। আজকাল এই সবক'টি তরঙ্গে ব্যবহারযোগ্য টেলিস্কোপ তৈরী হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা জরুরী, আমরা যে তরঙ্গে **'দেখি'** তা-ই হলো দৃশ্যমান আলো। বাকী সবকিছু আমাদের দৃষ্টির অগোচরে এক বিরাট জগৎ।

১৩. খ. অপটিকেল টেলিস্কোপ [Optical Telescope]

বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বর্ণচ্ছটার দৃশ্যমান আলো এরূপ দূরবীক্ষণযন্ত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। পৃথিবীকেন্দ্রিক অপটিকেল টেলিস্কোপ দ্বারা চন্দ্র, সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ, নিকটস্থ তারা যেমন বাইনারি তারা সিস্টেম ইত্যাদি বড়ো করে দেখা ও পরীক্ষা করা হয়। অপটিকেল টেলিস্কোপ দুই ধরনের: **১. রিফ্রেকটিং [refracting]** ও **২. রিফ্লেকটিং [reflecting]**। আমরা এখন উভয়টির উপর আরো বিস্তারিত আলোচনা করবো।

১. রিফ্রেকটিং টেলিস্কোপ [Refracting Telescope]

আলোকরশ্মি এক মাধ্যম থেকে অপর মাধ্যমে প্রবেশ করলে বাঁকা হয়। এই বাঁকা হওয়াকেই বলে 'refraction'। সুতরাং বাতাস থেকে কাচের মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি চললে তা বাঁকা হবে। আর বিশেষ কাচ যেমন লেন্স দ্বারা এই বক্রতাকে একটি বিন্দুতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। কাচের কেন্দ্র থেকে এই বিন্দুর দূরত্বকে বলে **'ফোকাল দৈর্ঘ্য'** [focal length]। নীচের চিত্রটি দেখুন। ফোকাল বিন্দুকে ঐ লেন্সের ফোকাসও বলে।

রিফ্রেকটিং টেলিস্কোপের মধ্যে কোন দূরের বস্তুর আলোকরশ্মি প্রবেশ করে যে লেন্সের মাধ্যমে তার নাম **'অবজেক্টিভ লেন্স'** [objective lens]। লক্ষণীয়, আলোকরশ্মি ফোকাল পয়েন্টে এসে উল্টে যায়- ফলে বস্তুর চিত্রও উল্টো অবস্থায় দেখা যাবে। নীচের চিত্রে রিফ্রেকটিং টেলিস্কোপের ডিজাইন প্রিন্সিপাল দেখানো হয়েছে।



দ্বিতীয় লেন্সকে বলে **'আইপিস লেন্স'** [eyepiece lens]। এই লেন্সের মাধ্যমেই পর্যবেক্ষক বস্তুটি দেখতে পারেন। ফোকেল পয়েন্ট পরে এটি স্থাপিত থাকে। দূরের বস্তুটি এই আইপিস দ্বারা বড়ো দেখাবে। কতটুকু বড়ো তা নির্ভর করবে অবজেক্টিভ লেন্সের ব্যাসের উপর। অবজেক্টিভ লেন্সের ব্যাসকে **'এপারচার'** [aperture] বলে। এপারচারের ব্যাস মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার থেকে এক মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। অবশ্য বস্তুর চিত্রকে উল্টো অবস্থা থেকে সঠিক অবস্থায় দেখার জন্য অভ্যন্তরে আয়না থাকতে পারে।

১৩. গ. ম্যাগনিফিকেশন [magnification]

অপটিকেল টেলিস্কোপ ব্যবহারের মূল লক্ষ্য হলো দূরের বস্তুকে বড়ো করে দেখা। এই বড় করে দেখাকেই বলে **'ম্যাগনিফিকেশন'** [magnification] যার বাংলা প্রতিশব্দ হলো **'বিবর্ধন'**। আগেই বলেছি বিবর্ধনের মাত্রা লেন্সের উপর নির্ভরশীল। ঠিক কিভাবে এই মাত্রাটি মাপা যায়? এটা মাপার উপায় হলো অবজেক্টিভ লেন্সের ফোকেল দৈর্ঘ্যকে আইপিস লেন্সের ফোকাল দৈর্ঘ্য দ্বারা ভাগ করা। সুতরাং যে কোন রিফ্রেকটিভ টেলিস্কোপের পাওয়ার [power] তথা ম্যাগনিফিকেশন শক্তি হলো: P = Fo / Fe। এখানে Fo অর্থ অবজেক্টিভ লেন্সের ফোকাল দৈর্ঘ্য এবং Fe হলো আইপিসের ফোকাল দৈর্ঘ্য। উভয় একক অবশ্য একই হতে হবে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

মনে করুন, আপনার টেলিস্কোপের অবজেক্টিভ লেন্সের ফোকাল দৈর্ঘ্য ২৫৪ সেন্টিমিটার (১০০ ইঞ্চি)। আপনার আইপিসের ফোকাল লেন্থ যদি ২.৫৪ সেন্টিমিটার (১ ইঞ্চি) হয় তাহলে উপরের সমীকরণ থেকে: চ = ২৫৪/২.৫৪ = ১০০। সুতরাং চন্দ্রের দিকে এই টেলিস্কোপ দিয়ে তাকালে তাকে একশত গুণ বড় দেখাবে।

১৩. ঘ. রিফ্লেকটিং টেলিস্কোপ [Reflecting Telescope]

এরূপ টেলিস্কোপ দ্বারা দৃশ্যমান আলো ছাড়াও বর্ণচ্ছটার আলট্রাভাইলোট এবং ইনফ্রারেড ক্ষেত্রও পরীক্ষা করা যায়। রিফ্রেকটিং টেলিস্কোপ আলোকরশ্মি বক্র করে। কিন্তু এটা আলোকরশ্মি প্রতিবিম্ব করে একটি ফোকাল পয়েন্টে নিয়ে আসে। অন্য কথায় লেন্সের বদলে ব্যবহৃত হয় আয়না। এই আয়নাকে বলে **'প্রাইমারী মিরর'** [primary mirror]। এটা সাধারণত খোদাই করা থাকে। একে বলে **'কনকেভ'** [concave] আকার। নীচের চিত্রটি দেখুন।



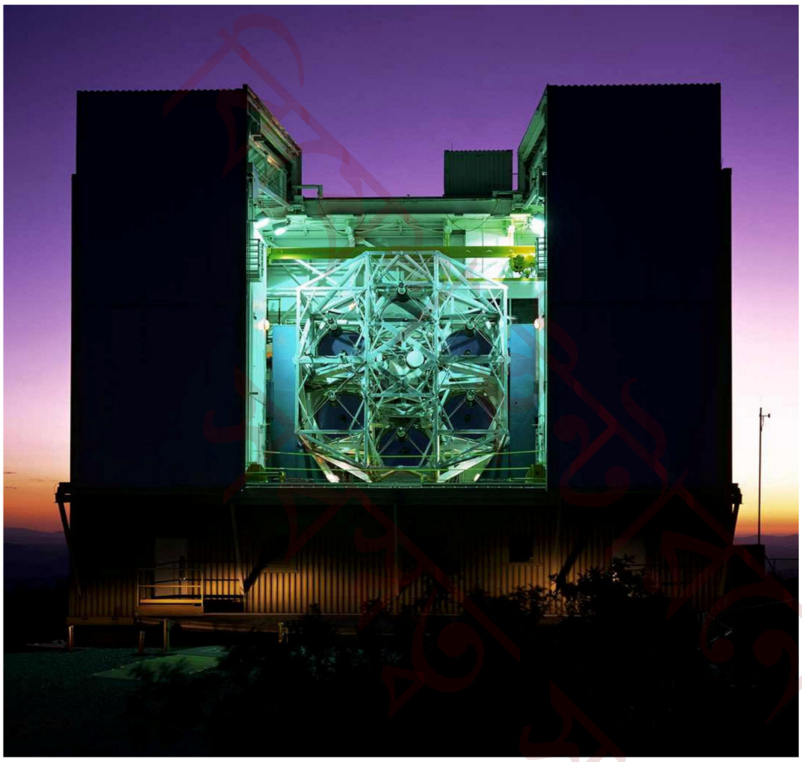
উপরে উল্লেখিত একই সমীকরণ দ্বারা রিফ্লেকটিং টেলিস্কোপের পাওয়ার নির্ণয় করা হয়। আজকের যুগে খুব বড় ব্যাসসম্পন্ন রিফ্লেকটিং টেলিস্কোপ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার জানা মতে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রিফ্লেকটিং টেলিস্কোপ রাশিয়ায় স্থাপিত আছে। জেলেনকুক্সকায়া [Zelenchukskaya] নামক স্থানে স্পেশাল আস্ট্রফিকিজ্যাল অবজারভেটরীর প্রধান টেলিস্কোপ এটি। পাশে এর একটি চিত্র তুলে ধরেছি।



১৪. ঙ. একাধিক আয়নার টেলিস্কোপ

বিশ্বের দূর-দূরান্তের গভীর থেকে আগত আলোকরশ্মিতে লুকিয়ে থাকে অসংখ্য রহস্যজনক বস্তু: গ্যালাক্সি, নেব্যুলা, বাইনারি তারা, তারা ক্লাস্টার ইত্যাদি। এগুলো স্পষ্টভাবে দেখা ও তাদের ছবি তোলার লক্ষ্যে টেলিস্কোপের শক্তি যতো বেশী হবে ততোই ভালো। আস্ট্রনোমাররা তাই বড়ো আয়তনের আয়না দিয়ে টেলিস্কোপ নির্মাণ করেন। কিন্তু আয়নার ব্যাস কী পরিমাণ করা যাবে? প্রথমত আয়না বড় হলে নির্মাণ ব্যয়ও বেড়ে যায় বহুগুণ। দ্বিতীয়ত অতিবেশী বড়ো আয়না তৈরী করে টেলিস্কোপে ব্যবহারও কঠিন- এমনকি অসম্ভব। এসব সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানীরা একাধিক আয়নার সমন্বয়ে টেলিস্কোপ তৈরির পথ উদ্ভাবন করেছেন। **'মাল্টিপল মিরর টেলিস্কোপ'** [Multiple Mirror

Telescope -MMT] নামক এসব রিফ্লেকটিং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের একটি স্থাপিত হয়েছে আমেরিকার আরিজনায় **'উইপল অবজারভেটরী'** [Whipple Observatory] নামক মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে। নীচে এর একটি ছবি তুলে ধরেছি।



উপরোক্ত এমএমটি টেলিস্কোপের মধ্যে মোট ৬টি আয়না আছে। প্রতিটির ব্যাস ১.৮ মিটার। প্রত্যেক আয়না থেকে প্রতিবিম্বিত আলো একটি মাত্র ফোকাসে নিয়ে আসা হয়। পর্যবেক্ষণের সময় প্রয়োজনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে এক বা একাধিক আয়নার অবস্থান পরিবর্তন করা হয়। আরো বেশিসংখ্যক আয়নার সমন্বয়ে টেলিস্কোপ নির্মাণের কাজ চলছে।

১৫. চ. মহাকাশে স্থাপিত টেলিস্কোপ

পৃথিবীর জমিনে যতো বড় অপটিকেল টেলিস্কোপই স্থাপন হোক না কেনো, বায়ুমণ্ডলের কারণে প্রাপ্ত ছবি অনেকটা বিকৃত হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিকৃত ছবি ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়। আধুনিক যুগে মহাকাশ অনুসন্ধান [space exploration] দ্রুত উন্নততর হওয়ায় বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে কৃত্রিম উপগ্রহ হিসাবে টেলিস্কোপ স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ নিয়েছেন। ইতোমধ্যে বেশ ক'টি অপটিকেল টেলিস্কোপ মহাকাশে প্রেরিতও হয়েছে। তবে এ যুগের সর্বাপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রজেক্টের নাম **'হাব্‌ল স্পেইস টেলিস্কোপ'** [Hubble Space Telescope - HST]। নীচে মহাকাশে ভাসমান এই টেলিস্কোপের একটি [বাস্তব] ছবি তুলে ধরেছি। হাব্‌ল পৃথিবী থেকে ৫৭০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে প্রদক্ষিণরত আছে।



১৯৯০ সালে এইচএসটি মহাকাশে প্রেরিত হয়। এটা একটি অপটিকেল-আলট্রাভাইলট [Optical-Ultraviolet] টেলিস্কোপ। তার প্রাইমারী আয়নার ব্যাস ২.৪ মিটার। অন্য সিস্টেম থেকে এই টেলিস্কোপ দ্বারা ৩-৪ শতগুণ বেশী পরিমাণ মহাকাশ অঞ্চল দেখা যায়। ইতোমধ্যে

হাব্‌ল টেলিস্কোপ মহাবিশ্বের অতি ক্ষুদ্র দূরতম অংশের একাধিক ছবি প্রেরণ করে পুরো বিজ্ঞানজগতে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। দেখা গেছে অতি ক্ষুদ্র এসব অঞ্চলেও হাজার হাজার গ্যালাক্সি বিদ্যমান যাদের একেকটিতে আছে কোটি কোটি তারা। নিম্নে সর্বশেষ **'হাব্‌ল ডীপ স্পেইস'** [Hubble Deep Space] ছবিটি তুলে ধরলাম।



১৩. জ. রেডিও টেলিস্কোপ [Radio Telescope]

১৯৩১ সালে আমেরিকার বেল টেলিফোন ল্যাবেরোটরিজ ইঞ্জিনিয়ার কার্ল জান্সকি [১৯০৫-১৯৫০] সাধারণ এ্যান্টেনা [এরিয়েল] ব্যবহার করাকালে একান্ত অজান্তেই **'রেডিও আস্ট্রনোমি'** [radio astronomy] আবিষ্কার করেন। তিনি বুঝতে পারলেন, একটি অস্বস্তিকর রেডিও সিগনাল হাজার হাজার আলোক-বৎসর দূরে অবস্থিত আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে আসছে। এতে এটাই প্রমাণিত হলো, বস্তু থেকে শুধুমাত্র দৃশ্যমান আলো [বা ছবি] বেরিয়ে আসে না- বরং বর্ণচ্ছটার বিভিন্ন তরঙ্গে অনেক গোপন তথ্য প্রত্যেক বস্তু চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। আলোকের গতিতে এসব তথ্য সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয়ে আছে। বিজ্ঞানীরা আজকের যুগে বর্ণিত গোপন তথ্যাদি **'জব্দ'** করে গবেষণা চালিয়ে জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। যে যন্ত্রের মাধ্যমে তথ্যাদি আটকা পড়ে তা-ই হলো রেডিও টেলিস্কোপ।



বুঝতেই পারছেন, রেডিও টেলিস্কোপ মূলত বিরাট আয়তনের এ্যান্টেনা ডিশ। ইলেকট্রমেগনেটিক রেডিয়েশনের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ব্যাপ্তি বিরাট। তাই টেলিস্কোপ যতো বড় হবে তথ্য সংগ্রহ ততো বেশী সম্ভব। রেডিও তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১ মিটার থেকে ১ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। অপরদিকে দৃশ্যমান আলোক-তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য মাত্র ০.০০১ মিলিমিটার। সুতরাং অপটিকেল টেলিস্কোপ খুব মসৃণ হওয়া চাই- অন্যথায় সংগ্রহিত ছবি হবে বিকৃত। এ ক্ষেত্রে রেডিও টেলিস্কোপ ওয়েভলেন্থ দীর্ঘ হওয়ায় অপেক্ষাকৃত অমসৃণ হলেও সমস্যা নেই। অন্যদিকে দূর-মহাকাশ থেকে আগত তরঙ্গের শক্তি অতি দূর্বল। আকাশ থেকে পড়ন্ত একটুকু তুষার যে অল্প পরিমাণ এনার্জিসহ পৃথিবীর জমিনে পতিত হয় ঠিক ততোটুকু মাত্র শক্তি নিয়ে রেডিও তরঙ্গ আসে। সুতরাং কৃত্রিম রেডিও তরঙ্গ যাতে বেজাল সৃষ্টি না করতে

পারে সেদিকে খিয়াল রাখা চাই। এ কারণেই রেডিও টেলিস্কোপ স্থাপিত হয়েছে শহর থেকে দূরে, নিভৃত অঞ্চলে। এমনকি পাহাড়ের উপরও। নিম্নের চিত্রটি দেখুন।
এখানে টেলিস্কোপ ছবি: ক্যাপশন- আরেসিবো রেডিও টেলিস্কোপ, পর্টোরিকো: এটা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ একক স্থির রেডিও টেলিস্কোপ। পৃথিবীর দৈনিক গতি ব্যবহৃত হয় আকাশের বিভিন্ন স্থান পরীক্ষার জন্য। মূল বউল থেকে প্রতিবিম্বিত সিগনাল সংগ্রহ হয় উপরে স্থাপিত ডিটেক্টরে। বিরাট এই টেলিস্কোপের বউল বা ডিশের ব্যাস ৩০৫ মিটার।

১৩. ঝ. রেডিও ইন্টারফেরোমিটার [Radio Interferometer]

আরেসিবো টেলিস্কোপ কিন্তু দূরতম বস্তু থেকে আগত রেডিও তরঙ্গের জন্য যথেষ্ট নয়। বিজ্ঞানীরা অঙ্ক কষে দেখেছেন, দূরের গ্যালাক্সি থেকে আগত সিগনালকে সত্যিকার অর্থে সূক্ষ্মভাবে গবেষণার জন্য প্রয়োজন আরেসিবো টেলিস্কোপ থেকে অন্তত ৫০ গুণ বেশী ব্যাসবিশিষ্ট রেডিও ডিশের। কিন্তু এরূপ বিরাট ব্যাসসম্পন্ন ডিশ তৈরী আদৌ সম্ভব নয়। তাহলে কি করা? একটি পথ আছে, যার নাম রেডিও ইন্টারফেরোমেট্রি [radio interferometry]। আস্ট্রনোমার একাধিক টেলিস্কোপ বিশেষ দূরত্বে স্থাপন করেন। ফলে একই বস্তুর রেডিও সিগনাল একত্রে গবেষণা করা যায়, যা ঐ ৫০ গুণসম্পন্ন টেলিস্কোপের নামান্তর হবে। পৃথিবীর একটি বৃহৎ ইন্টারফেরোমিটার স্থাপিত হয়েছে আমেরিকার নতুন মেক্সিকোর সকোরো শহরের নিকট। সঙ্গত কারণে এর নামকরণ হয়েছে, **'ভেরি লার্জ আরে'** [Very Large Array - VLA]। ইংরেজী অক্ষর 'Y' এর মতো সৃষ্ট এই টেলিস্কোপ আরেতে আছে ২৫ মিটার ব্যাসসম্পন্ন মোট ২৭টি ডিশ-এ্যান্টেনা। আরের তিনটি হাতের একেকটির দূরত্ব ২১ কিলোমিটার। নীচের চিত্রটি দেখুন।


Very Large Araay - VLA

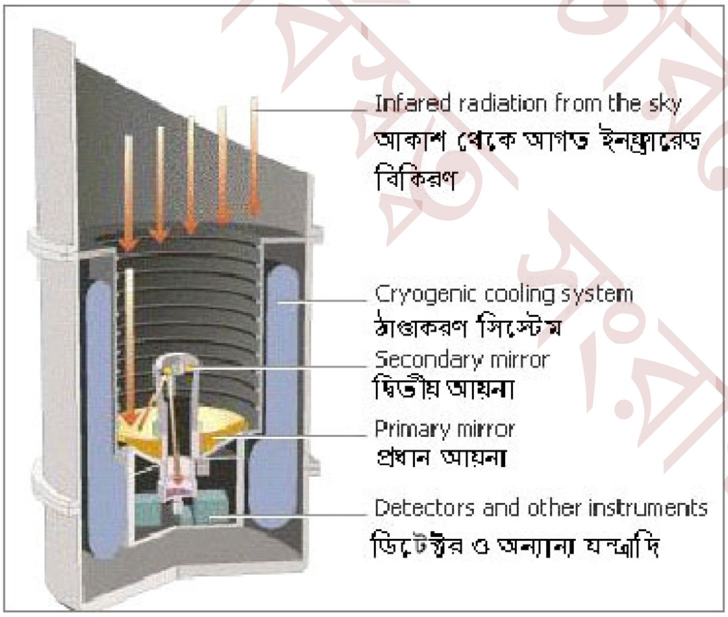
উপরোক্ত ভিএলএ রেডিও সিগনাল নির্গতকারী বস্তু অপটিকেল টেলিস্কোপের তুলনায় হাজার গুণ পরিষ্কারভাবে দেখতে সক্ষম। তবে পৃথিবীর জমিনে স্থাপিত সব ধরনের রেডিও টেলিস্কোপ আজকাল বেশী থেকে বেশী সমস্যায় ভুগছে আধুনিক রেডিও-ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির ফলে। পুরো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে কৃত্রিম রেডিও সিগনাল। আজকের মোবাইল, টিভি সম্প্রচার, বিমান-ট্রাফিক কন্ট্রোল ইত্যাদি সবই রেডিও তরঙ্গে কাজ করে।

সুতরাং এ সমস্যার সমাধানে স্থাপিত হয়েছে মহাকাশে অপটিকেল ও রেডিও টেলিস্কোপ, যার বর্ণনা আমরা ইতোমধ্যে তুলে ধরেছি।

১৩. ঞ. অন্যান্য তরঙ্গের টেলিস্কোপ

অপটিকেল তথা আলোক এবং রেডিও টেলিস্কোপ ছাড়াও আরো বেশ ক'টি টেলিস্কোপ উদ্ভাবন করা হয়েছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য। আমরা এগুলোর উপর সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করে আজকের লেকচারের ইতি টানবো।

১. ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ [infrared telescope]: আমাদের নিজস্ব মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি [Milky Way Galaxy] এবং বাইরের অন্যান্য গ্যালাক্সিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন কণায় পরিপূর্ণ অনেক অঞ্চল বিদ্যমান। এসব এলাকা গবেষণার জন্য বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করেছেন বর্ণচ্ছটার ইনফ্রারেড রিজিওনের টেলিস্কোপ। কারণ এসব অন্ধকার এলাকা থেকে রেডিও কিংবা আলোক তরঙ্গে তেমন শক্তিশালী কিছু আমাদের পৃথিবীর ধারেকাছে না আসলেও, ইনফ্রারেড তরঙ্গে কিছুটা আসে। তারার জন্ম, প্লানেটারি সিস্টেমের উৎপত্তি, প্লানেটারি বায়ুমণ্ডল ও ধূমকেতুর স্বরূপ ইত্যাদি গবেষণায়ও ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ বিশেষ প্রয়োজনীয়। নীচে ইনফ্রারেড টেলিস্কোপের প্রিন্সিপাল তুলে ধরলাম।

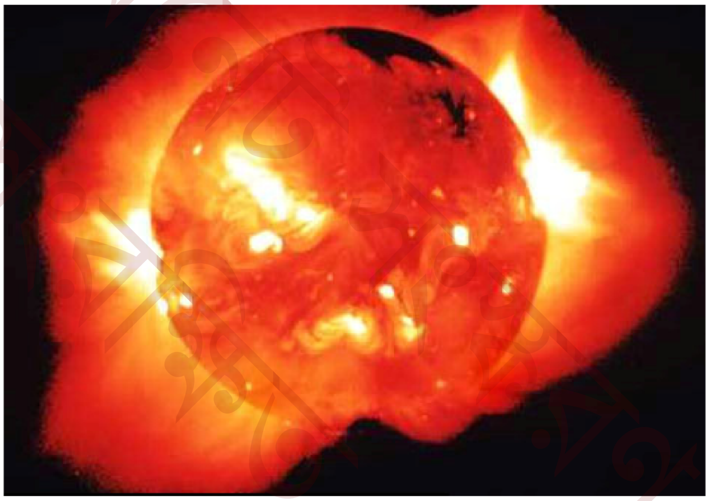


২. আলট্রাভাইলোট টেলিস্কোপ [ultraviolet telescope]: জগতজুড়ে অসংখ্য বস্তুর কেন্দ্র যেমন তারা, গ্যালাক্সি, নেব্যুলা, ক্লাস্টার ইত্যাদি অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রা ও এনার্জিসম্পন্ন। এসব কেন্দ্র থেকে নির্গত হচ্ছে বর্ণচ্ছটার আলট্রাভাইলোট তরঙ্গ যা আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আটকে রাখে। সুতরাং এই তরঙ্গে কোনো বস্তু গবেষণা পৃথিবীর জমিনে থেকে তেমন একটা সুবিধাজনক নয়। বিজ্ঞানীরা তাই মহাকাশে প্রদক্ষিণরত অবস্থায় একাধিক আলট্রাভাইলোট টেলিস্কোপ স্থাপন করেছেন। ইতোমধ্যে উল্লেখিত **'হাব্‌ল স্পেইস টেলিস্কোপ'** [Hubble Space Telescope] এবং অনুরূপ আরো কিছু প্রদক্ষিণরত টেলিস্কোপে আলট্রাভাইলোট রেঞ্জে বস্তু পরীক্ষার যন্ত্রপাতি যুক্ত করা হয়েছে। নীচে **'ইন্টারনেশনাল আলট্রাভাইলোট এক্সপ্লোরার'** [international ultraviolet explorer] টেলিস্কোপের ছবি তুলে ধরেছি।

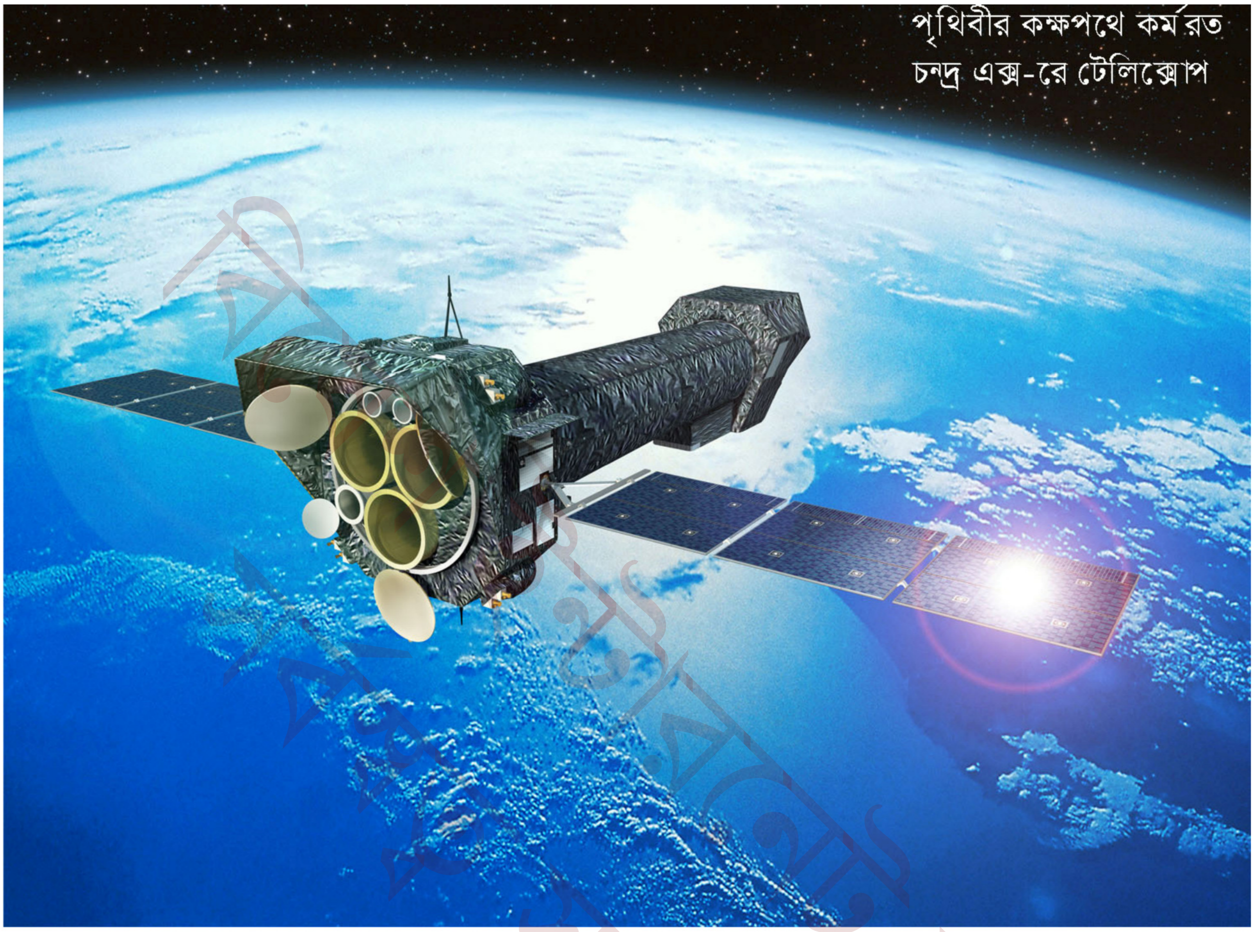


ঠিক অপটিকেল প্রতিবিম্ব টেলিস্কোপের মতোই এটি ডিজাইন করা হয়েছে। তবে মূল আয়নার মধ্যে বিশেষ লেপ আছে যা আলট্রাভাইলোট তরঙ্গকে সঠিকভাবে প্রতিবিম্ব করে।

৩. এক্স-রে টেলিস্কোপ [x-ray telescope]: নীচের চিত্রটি দেখুন। এটা কী বলে মনে হয়? মানবদেহের অভ্যন্তরের চিত্র তুলতে ব্যবহৃত হয় এক্স-রে। অবশ্য আমাদের দেহ এক্স-রে তৈরী করে না। কৃত্রিম উপায়ে এক্স-রে দেহের মধ্যদিয়ে চালনা করে ছবি তুলতে হয়। জগতের অনেক বস্তু যেমন আমাদের সূর্য এই এক্স-রে তরঙ্গ নিজেরাই সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিচ্ছে চতুর্দিকের মহাকাশে। বিশেষ এক্স-রে টেলিস্কোপ দ্বারা এই তরঙ্গ ধরা সম্ভব। এবার আশাকরি সকলেই বুঝতে পেরেছেন নীচের ছবিটি কিসের- এটা আমাদের সূর্যের এক্স-রে।

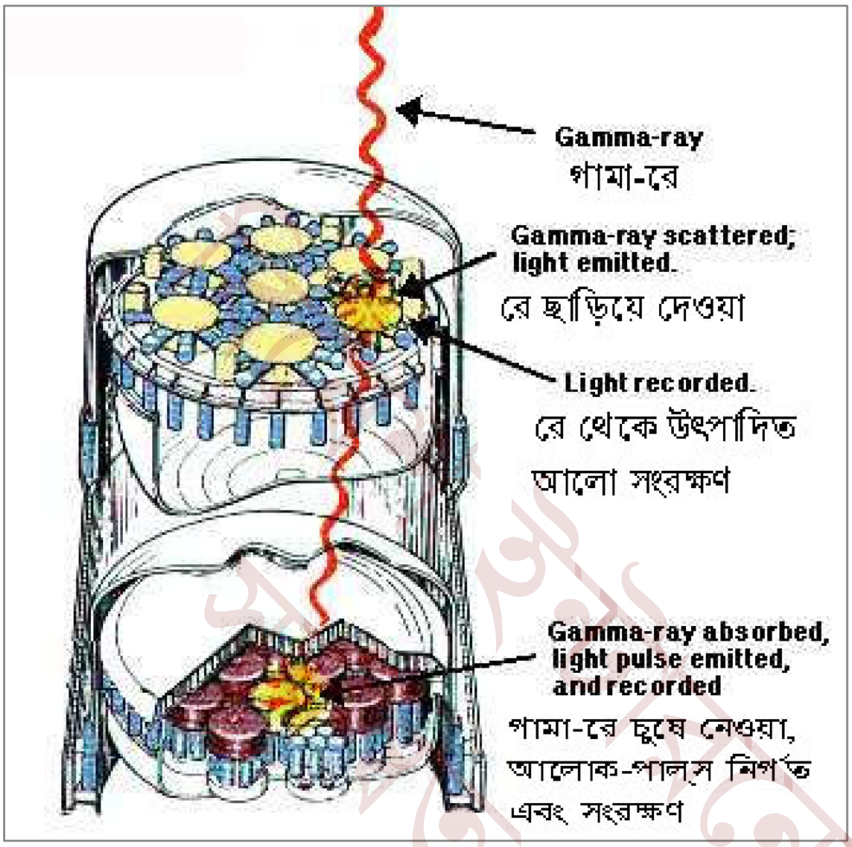


আবিষ্কারটা কিন্তু বিজ্ঞানীদেরকে অবাক করেছিল সে-ই ১৯৬০ দশকে। তখন কেউ ভাবতেই পারে নি, মহাকাশের তারারা এক্স-রে সৃষ্টি করতে পারে। উর্ধ্বাকাশে উড়ন্ত রকেটে এক্স-রে যন্ত্রাদি দ্বারা সূর্যের ছবি তুলে নিশ্চিত হওয়া গেলো এ সত্যটি। আজকাল এক্স-রে টেলিস্কোপ মহাকাশে স্থাপিত হয়েছে। এরূপ একটির নামকরণ হয়েছে পাকিস্তানের লাহোরে জন্মগ্রহণকারী আমেরিকান নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত পদার্থবিদ সুবরামানিয়ান চন্দ্রশেখরের [১৯১০-১৯৯৫] নামানুসারে, **'চন্দ্র এক্স-রে অবজারভেটরী'** [Chandra X-Ray Observatory]। নীচে এই টেলিস্কোপের একটি [বাস্তব] ছবি তুলে ধরেছি।



৪. গামা-রে টেলিস্কোপ [gamma-ray telescope]: আমরা ইতোমধ্যে ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রামের প্রায় সবগুলো তরঙ্গের টেলিস্কোপের কথা বলেছি। যেমনঃ অপটিকেল [আলোক], রেডিও, ইনফ্রারেড, আলট্রাভাইলোট এবং এক্স-রে টেলিস্কোপ। বাকী থাকলো গামা-রে। হ্যাঁ, এক্স-রে থেকেও ক্ষুদ্র এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে জগতের অনেক বস্তু বিকিরণ করছে এনার্জি। এর মূল কারণ হলো বস্তুতে বস্তুতে সংঘর্ষ। বিজ্ঞানীরা থেমে নেই- এই তরঙ্গের এনার্জি পরীক্ষার জন্যও উদ্ভাবন করেছেন গামা-রে টেলিস্কোপ। নিম্নে পরের পৃষ্ঠায় এর মূল ডিজাইন প্রিন্সিপাল তুলে ধরলাম।

জগতের বড় বড় সাংঘর্ষিক বস্তু যেমন নিউট্রন তারা, ব্ল্যাক হোল, সুপারনোভা ইত্যাদি থেকে গামা-রে নির্গত হয়। তবে এসব তরঙ্গ আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে ভূ-মণ্ডলে পৌঁছতে পারে না। বিজ্ঞানীরা তাই গামা-রে টেলিস্কোপ মহাকাশে স্থাপন করেছেন। এরূপ একটি হলো **'কম্পটন গামা-রে অবজারভেটোরী'** [Compton Gamma Ray Observatory - GRO]। নিম্নে পরের পৃষ্ঠায় এর একটি ছবি তুলে ধরেছি।

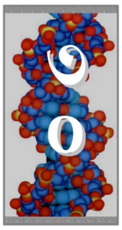


প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! আজকের লেকচারের সমাপ্তি এক্ষুণি হবে। আধুনিক যুগে মহাকাশ বিজ্ঞান গবেষণায় টেলিস্কোপের গুরুত্ব যে কতো অপরিসীম তা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে অবশ্যই সকলে উপলব্ধি করেছেন, আশারাখি। বাস্তবে আধুনিক জ্যোতিবির্জ্ঞানের মেরুদণ্ড হলো উপরে আলোচিত টেলিস্কোপগুলো। আপনারা হয়তো জানেন, মহাকাশে স্থাপিত **'হাবল স্পেইস টেলিস্কোপ'** থেকে প্রাপ্ত ছবি জগতের বড়ত্ব ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে আমাদের ধারণা পাল্টে দিচ্ছে। এ সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমেও একাধিকবার তথ্য সম্প্রচার করা হয়েছে। যাক, আগামী লেকচারে আমরা আরেকটি **'স্কোপ'** নিয়ে আলোচনা করবো। টেলিস্কোপ দ্বারা দূরতম বস্তু বিভিন্ন তরঙ্গে দেখা ও পরীক্ষা করা হয়। তাহলে স্বভাবের ক্ষুদ্রতম বস্তু অণু-পরমাণু জগৎ দেখা ও গবেষণা কি দিয়ে হবে? বিপরীতমুখী এই জগতের প্রতি দৃষ্টিপাতের যন্ত্রটির নাম অণুবিক্ষণ যন্ত্র বা মাইক্রস্কোপ। আর তা-ই হবে আগামী লেকচারে আমাদের আলোচনার বিষয়।



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বক্তৃতা ৩০ : আধুনিক প্রযুক্তি

১৪. মাইক্রস্কোপ [microscope]

বাংলায় বলে অণুবিক্ষণযন্ত্র। টেলিস্কোপ দ্বারা দেখা হয় দূরের বস্তু বড় করে আর মাইক্রস্কোপ দ্বারা পরীক্ষা করা হয় ক্ষুদ্র বস্তু যা সহজে খালিচোখে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না। এখানেও ছোট্ট বস্তুকে বড় করে দেখার চেষ্টা। প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! হয়তো ভাবছেন, মাইক্রস্কোপ সম্পর্কে কী আর বলার আছে? আছে, আছে বৈকি। এ লেকচার শেষে হয়তো আপনাদের এরূপ ধারণা পাল্টে যাবে। মাইক্রস্কোপ তার আবিষ্কারের পর থেকে বহুদূর এগিয়েছে। অনেক ধরনের মাইক্রস্কোপ এখন উদ্ভাবন করেছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে টেলিস্কোপের মতো মাইক্রস্কোপের গুরুত্ব কোনো ক্রমেই কম নয়। আসুন, আজকের লেকচারে আধুনিক যুগে ব্যবহৃত মাইক্রস্কোপ পরিচিতি ও কার্যকারিতার উপর বিস্তারিত আলোচনা করা যাক, কেমন?



১৪. ক. বিভিন্ন ধরনের মাইক্রস্কোপ

সচরাচর ব্যবহৃত মাইক্রস্কোপকে **'আলোক মাইক্রস্কোপ'** বা **'অপটিকেল মাইক্রস্কোপ'** [optical microscope] বলে। এতে থাকে বিভিন্ন কাচের তৈরী লেন্স। এক-লেন্সবিশিষ্ট মাইক্রস্কোপ অতি সাধারণ। অপরদিকে কম্পাউন্ড [যুক্ত] মাইক্রস্কোপে থাকে একাধিক বিভিন্ন সাইজের লেন্স। সাধারণ মাইক্রস্কোপের বিবর্ধন ক্ষমতা ১ থেকে ১০ গুণ পর্যন্ত হতে পারে। এর রিজোলুশন [resolution] বা পরিচ্ছন্নতা ০.০১

মিলিমিটারের অধিক হয় না। অপরদিকে কম্পাউন্ড মাইক্রস্কোপের ক্ষমতা ২.৫ থেকে ২,০০০ গুণ পর্যন্ত হতে পারে। তাদের রিজেলুশনও উচ্চ- ০.০০০২ মিলিমিটার বলে অনেকে বলেছেন।

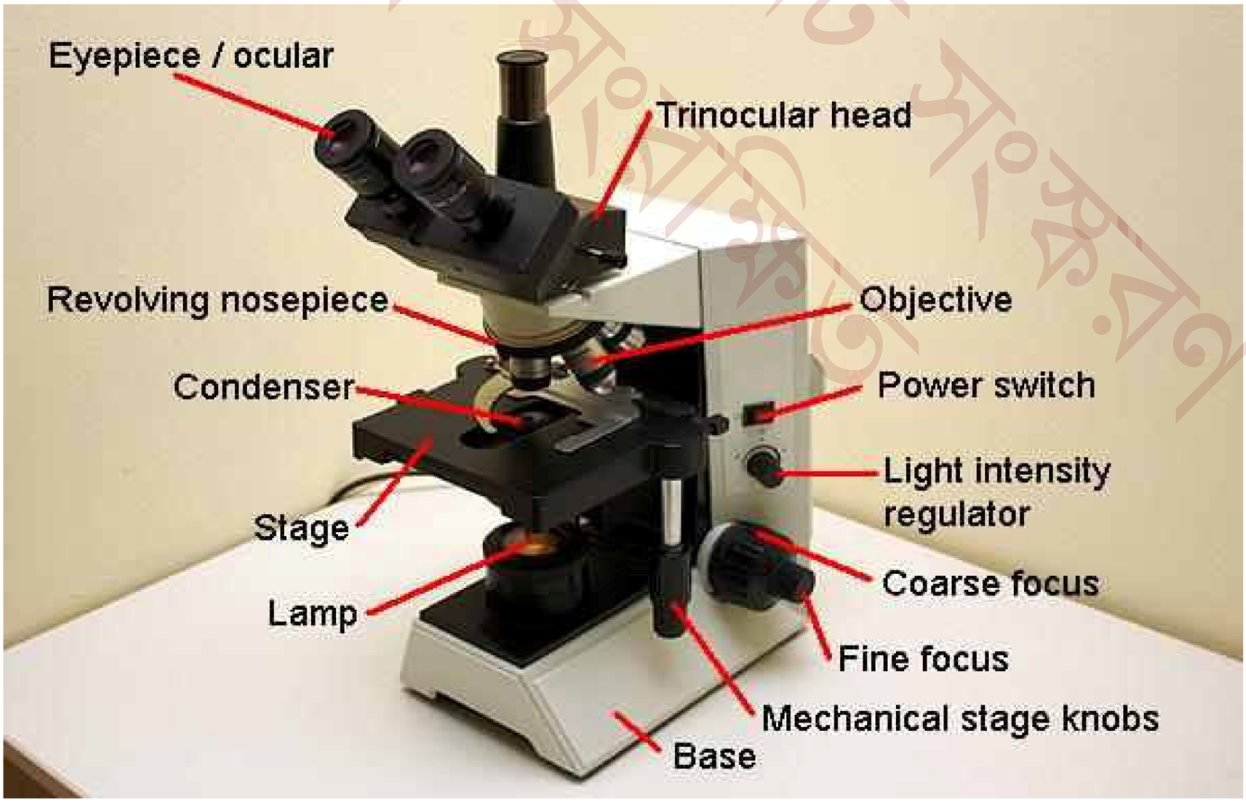
দ্বিতীয় আরেক ধরনের মাইক্রস্কোপ আছে যাদের উপরও আমাদের তথ্যানুসন্ধান চলবে। এক বলে **'ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ'** [electron microscope]। এটা ইলেকট্রন বীম দ্বারা **'ছবি'** সৃষ্টি করে। ইতোমধ্যে বর্ণিত লাইট মাইক্রস্কোপ একই কাজে ব্যবহার করে আলোকরশ্মি। ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের বিবর্ধন ক্ষমতা বিরাট। তা ১ হাজার থেকে ১০ লক্ষাধিক পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়া এদের রিজেলুশনও বেশী। ০.০০১ থেকে নীচে ০.০০০০০০০১ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে বলে কোনো কোনো নির্মাতা দাবী করেন।

উপরে আলোচিত দু'টি ছাড়াও আরো কিছু মাইক্রস্কোপ আছে যেমন: শব্দতরঙ্গের মাইক্রস্কোপ- একে **'স্কানিং টানেলিং মাইক্রস্কোপ'** [scanning tunneling microscope] নামেও অভিহিত করা হয়েছে। এগুলো সত্যিই ক্ষমতাশীল! এসব মাইক্রস্কোপ দ্বারা বিজ্ঞানীরা একক মলিকিউল ও অণু পর্যন্ত দেখতে পারেন। আমরা এখন এসব বিশেষ মাইক্রস্কোপের ও সাধারণ মাইক্রস্কোপের উপর বিস্তারিত আলোচনা করবো একাধিক ছবিসহ।

১৪. খ. সাধারণ আলোক মাইক্রস্কোপ [simple optical microscope]

এদের আছে একটি কিংবা কম্পাউন্ড [যুক্ত] লেন্স- যার নাম **'মেগনিফাইয়ার'** [magnifier]। এসব লেন্স সাধারণত খোলা অবস্থায় থাকে। সুতরাং আপনি যে বস্তু পরীক্ষা করবেন, সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ক্ষমতাসম্পন্ন লেন্স মূল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন। সাধারণ অপটিকেল মাইক্রস্কোপে থাকে ডবল কনভেক্স লেন্স [convex]। এ ধরনের লেন্স দ্বারা পর্যবেক্ষিত বস্তুর বিবর্ধন ১৫ গুণ পর্যন্ত হতে পারে।

কম্পাউন্ড মাইক্রস্কোপে থাকে দু'টি লেন্স। প্রথমটি অবজেক্ট ও দ্বিতীয়টি চোখের লেন্স। বন্ধ টিউবের বিপরীত



শেষাংশে এগুলো রাখা থাকে। এরূপ উপায়ে রাখার মূল উদ্দেশ্য হলো অধিক বিবর্ধন ক্ষমতা নিশ্চিত করা।

১৪. গ. বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহৃত মাইক্রস্কোপ

বিশেষ প্রয়োজনে বিজ্ঞানীরা কিছু মাইক্রস্কোপের উদ্ভাবন করেছেন। এর মধ্যে একটি হলো **'স্টেরেওস্কোপিক মাইক্রস্কোপ'** [stereoscopic microscope]। একটি মাত্র স্পেসিমেনের জন্য দু'টি কম ক্ষমতাসম্পন্ন মাইক্রস্কোপ ব্যবহৃত হয় যাতে বস্তুর ছবিটি ত্রিমাত্রিক দেখা যায়। আরো এক ধরনের মাইক্রস্কোপ আছে যার নাম **'পেট্রোগ্রাফি মাইক্রস্কোপ'** [petrography microscope]। ফ্যাশনেবুল এই নামের অর্থ হলো, এরূপ মাইক্রস্কোপ দ্বারা বিজ্ঞানীরা **'আগ্নেয় শিলা'** [igneous rock] ও **'রূপান্তরিত শিলা'** [metamorphic rock] গবেষণা করেন। আরেকটির নাম **'ডার্ক ফিল্ড মাইক্রস্কোপ'** [dark field microscope]। এরূপ যন্ত্র জীববিজ্ঞান বিষয়ক স্পেসিমেনের জন্য উপকারী। আরেক অণুবীক্ষণযন্ত্রের নাম **'ফেইজ মাইক্রস্কোপ'** [phase microscope]। এগুলো কাজে আসে যখন বিজ্ঞানীরা জ্যান্ত টিস্যু নিয়ে গবেষণা করেন।

টেলিস্কোপের আলোচনাকালে আমরা **'আলট্রাভাইলোট টেলিস্কোপের'** [ltraviolet telescope] কথা বলেছি। এই তরঙ্গে মাইক্রস্কোপও আছে যার নাম **'আলট্রাভাইলোট মাইক্রস্কোপ'** [ultraviolet microscope]। আলট্রাভাইলোট আলোকরশ্মি মানুষের চোখে ধরা দেয় না। তাই মাইক্রস্কোপের দৃশ্যকে ছবি হিসাবে সংরক্ষণ করতে হয়।

'স্কানিং ইন্টারফোরোমেট্রিক আপারচারলেস মাইক্রস্কোপ' [scanning interferometric aperture-less microscope - SIAM] একটি উন্নতমানের আলোক মাইক্রস্কোপ। সাধারণ আলোক মাইক্রস্কোপের বিবর্ধন ক্ষমতা দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যে সীমিত। সুতরাং এই ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে ক্ষুদ্র কোন অংশের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দৃশ্য পরিষ্কারভাবে দেখা সম্ভব নয় ওসব মাইক্রস্কোপ দ্বারা। বিজ্ঞানীরা এ সমস্যার সমাধানে উদ্ভাবন করেছেন উপরোক্ত **'সিয়াম'** মাইক্রস্কোপটি। মাত্র **১** নানোমিটার [এক মিটারের এক বিলিয়ন অংশের এক অংশ] প্রশস্ত অতিক্ষুদ্র মাথাসম্পন্ন সিলিকনের তৈরী একটি অংশ হলো এই মাইক্রস্কোপের প্রধান যন্ত্রাংশ। পর্যবেক্ষণ করা হবে এমন কোনো সাম্পুলে এই যন্ত্রাংশ ২ লক্ষাধিকবার কম্পনের মাধ্যমে আলোকরশ্মি ছিটিয়ে দেয়। এই ছিটিয়ে যাওয়া আলোকরশ্মি ও স্থির আলোকরশ্মির মধ্যে পার্থক্য-নির্ণয়ের মাধ্যমে সাম্পুলের একটি পরিষ্কার চিত্র ফুটে ওঠে। সিয়াম দ্বারা সাধারণ মাইক্রস্কোপের তুলনায় ৬,৫০০ গুণ ছোট্ট ছবিও পরিষ্কার দেখা যায়।
এখানে সিয়াম

১৪. ঘ. ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ [electron microscope]

ধারণাটা অতি সহজ- ইলেকট্রন দ্বারা কোনো বস্তু **'আলোকিত করা'**। যে যন্ত্রের মাধ্যমে তা সম্ভব তাকেই বলে **'ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ'** [electron microscope]। বুঝতেই পারছেন, অণুর ক্ষুদ্রতম অংশ ইলেকট্রনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য [মনে আছে, ইলেকট্রন তরঙ্গ পথে চলে?] দৃশ্যমান আলোকরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে অনেক কম। সুতরাং এগুলো অনেক ছোট্ট বস্তুকে দৃশ্যমান করতে পারে। কিন্তু দেখবো কিভাবে? নীচের [পরবর্তী পৃষ্ঠার] চিত্র দু'টো দেখুন। একটি ক্ষুদ্র ভাইরাসের ও বস্তুর এটমগুলোর চিত্র কী পরিষ্কারভাবে দেখাচ্ছে। এটা **'ইলেকট্রন মাইক্রগ্রাফ'** [electron micrograph] দ্বারা সম্ভব হয়েছে।



দৃশ্যমান আলোর সর্বনিম্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য হলো ৪,০০০ আংস্ট্রম [এটা এক মিটারের ৪০ মিলিয়ন ভাগের এক ভাগ]। ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপে ব্যবহৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্য মাত্র ০.৫ আংস্ট্রম! [এটা এক মিটারের ৫০ ট্রিলিয়ন অংশের এক অংশ মাত্র]। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, কী অল্প পরিমাণ অংশে ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ তার ক্রিয় করতে পারে।

প্রযুক্তি: কৌশলটা অতি সহজ। মাইক্রস্কোপে থাকে একটি **'ইলেকট্রন গান'** [electron microscope]। এই বন্দুক থেকে বেরিয়ে আসে ইলেকট্রন। এগুলো **'স্পেসিমেন'** [specimen] বস্তুর উপর পতিত হয়। ফোকস সৃষ্টির জন্য আমরা ইতোমধ্যে বলেছি লেন্স ব্যবহৃত হয়। এটা সম্ভব আলোক-মাইক্রস্কোপে। ইলেকট্রনকে ফোকাসে আনতে প্রয়োজন **'মেগনেটিক ফিল্ডে'**র [magnetic field]। বাতাস একটি সমস্যা। খুব সহজে ইলেকট্রনের সঙ্গে বাতাসের ইলেকট্রন মিথস্ক্রিয়া করে। এ সমস্যা দূর করার একমাত্র উপায় হলো অভ্যন্তরের সকল বাতাস সরিয়ে দিতে হবে! আর তা-ই করা হয়। স্পেসিমেনের ছবি যাতে সংরক্ষণ হয় সে ব্যবস্থাও মাইক্রস্কোপের ভেতর থাকে। দু' ধরনের ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ খুব বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে। নীচে এ দু'টির উপর আরো কিছু আলোচনা।



ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ [transmission electron microscope - TEM]: উপরে উল্লেখিত উপায়ে ইলেকট্রন বীম বস্তুর উপর পতিত হওয়ার পর কিছু ইলেকট্রন বস্তুটি চুষে নেবে, কিছুটা চতুর্দিকে ছিটকে যাবে প্রতিবিম্ব হয়ে এবং কিছুটা চলে যাবে অপর দিকে। শেষোক্ত ইলেকট্রনগুলোই তৈরী করে বস্তুর ছবি। বস্তুর পেছনে **'ফটোগ্রাফিক প্লেট'** [photographic plate] বা **'ফ্লুরেসেন্ট স্ক্রীন'** [fluorescent screen] থাকে যাতে উচ্চ বিবর্ধনসম্পন্ন চিত্র সংরক্ষণ করা হয়। এ ধরনের ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ দ্বারা স্পেসিমেনকে ১০ লক্ষাধিক গুণ বড় করে দেখা সম্ভব।

স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ [scanning electron microscope]: এদের বৈশিষ্ট্য হলো স্পেসিমেনকে স্ক্যান করে একটি বিবর্ধন চিত্র গড়ে তোলা। খুব টাইট-ফিট একটি ইলেকট্রন বীমকে ফোকাস করে বস্তুর উপরে নিয়ে স্ক্যান করা হয়। টিভির স্ক্রীনের মতো ইলেকট্রনিক মনিটরে স্ক্যানকরা বস্তুর বিবর্ধন চিত্র দেখতে পারেন একজন গবেষক। এরপর এই চিত্রকে সংরক্ষণ করা যবে পরবর্তীতে প্রিন্টার দ্বারা ছবি বের করতে। স্ক্যানিং

ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের বিবর্ধন ক্ষমতা অনেকটা কম- লক্ষাধিক পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে এগুলো দ্বারা ত্রিমাত্রিক সুস্পষ্ট ছবি তৈরী করা যায়। অপরদিকে ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ দ্বারা শুধুমাত্র দ্বিমাত্রিক ছবি তৈরী সম্ভব।

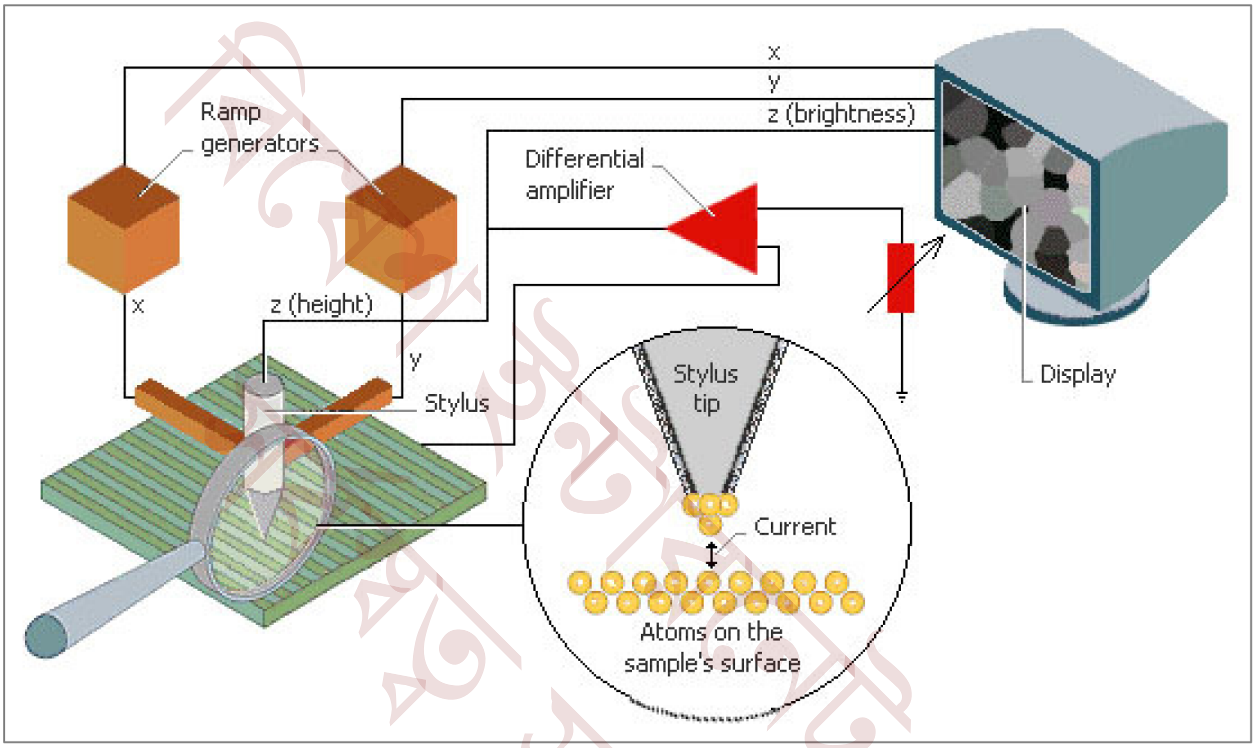


অপর আরেক মাইক্রস্কোপ ইদানিং উদ্ভাবন হয়েছে। এটা মূলত উপরে আলোচিত উভয়টির সমন্বিত রূপ। এর নামকরণ হয়েছে **'স্ক্যানিং ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ'** [scanning transmission electron microscope -STEM]। এটাই একক অণুর ছবি ওঠাতে সক্ষম। আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইক্রস্কোপ উদ্ভাবন হয়েছে। আমরা এগুলোর নামও কার্যকারিতা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করবো মাত্র।

'ইলেকট্রন প্রোব মাইক্রএ্যানালাইজার' [electron probe microanalyzer]: এরূপ মাইক্রস্কোপের সঙ্গে লাগানো থাকে এক্স-রে বর্ণচ্ছটা গবেষকযন্ত্র। স্পেসিমেন থেকে এক্স-রে নির্গত হলে এই যন্ত্র দ্বারা গবেষণা করা যায়। বিবর্ধন চিত্র ছাড়াও এই মাইক্রস্কোপ দিয়ে বস্তুর রসায়নিক তথ্যাদি জানা সম্ভব।

স্ক্যানিং প্রোব মাইক্রস্কোপ [scanning probe microscope]: এটা উপরে বর্ণিত ইলেকট্রন প্রোব মাইক্রএ্যানালাইজারের মতোই কাজ করে। তবে এতে কোনো এক্স-রে যন্ত্র সংযুক্ত থাকে না। সাম্পুলের উপরিভাগ প্রোব দ্বারা স্ক্যান করে ত্রিমাত্রিক বিবর্ধন চিত্র তৈরী করাই এর কাজ। প্রোবের মাথা এতোই সরু যে, একটিমাত্র অণু এর ভেতরে ফিট হবে মাত্র। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে, এরূপ মাইক্রস্কোপের বিবর্ধন ক্ষমতা কতো বেশী হতে পারে।

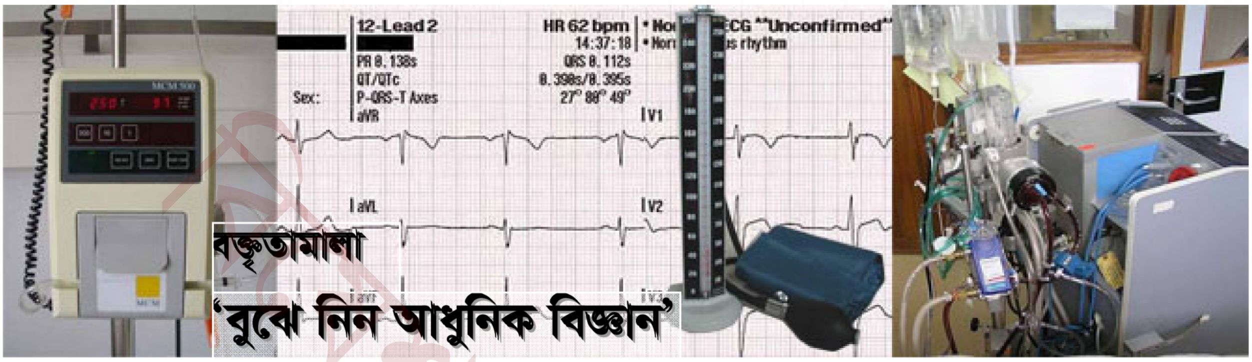
উপরে বর্ণিত মাইক্রস্কোপের একটি নাম **'স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রস্কোপ'** [scanning tunneling microscope -STM]। নীচের চিত্রে এর প্রিন্সিপাল ডিজাইন তুলে ধরেছি। এই যন্ত্রে ক্যুয়ান্টাম ফিজিক্সের একটি সত্যকে কাজে লাগায়। এ যন্ত্রের মাধ্যমেও বস্তুর বিবর্ধনসম্পন্ন একটি ত্রিমাত্রিক চিত্র তৈরী করে।

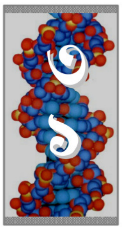


এটমিক ফোর্স মাইক্রস্কোপ [atomic force microscope -AFM]: অত্যাধুনিক এই টানেলিং প্রযুক্তির মাইক্রস্কোপের বৈশিষ্ট্য হলো সাম্পুলের উপর স্ক্যানের সময় এটমিক শক্তি দ্বারা প্রোবটির উপর-নীচে চলন্ত হওয়া। আর এ থেকেই বস্তুর বিবর্ধনসম্পন্ন চিত্র তৈরী করা।

প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! বিজ্ঞানের নির্যাস **'প্রযুক্তি'**র উপর চৌদ্দটি অত্যাধুনিক গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রের উপর আমরা আলোচনা শেষ করেছি। একটি বিষয় বাকী আছে। মেডিকেল বিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি যন্ত্রের উপর কিছুটা তথ্য তুলে ধরা জরুরী মনে করছি। আমরা তাই পরবর্তী দু'একটি লেকচারে সেদিকেই মনোনিবেশ করার ইচ্ছা রাখি।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঘ. বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বক্তৃতা ৩১ : আধুনিক প্রযুক্তি

১৫. মেডিকেল যন্ত্রপাতি

আমরা আশা করছি শীঘ্রই **'মেডিকেল বিজ্ঞানের'** উপর মৌলিক কিছু আলোচনা করবো। আজকের লেকচারে আধুনিক প্রযুক্তির গুরুত্ববহ কয়েকটি মেডিকেল যন্ত্রের উপর তথ্যানুসন্ধান চালাবো। আপনারা অবগত আছেন, আজকের মেডিকেল সাইন্স [medical science] মূলত উন্নতমানের যন্ত্রাদির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। টেস্ট ছাড়া সাধারণ কোনো রোগেরও চিকিৎসা আজকাল হয় না। যেসব যন্ত্র জনপ্রিয় বা বলতে হবে ডাক্তার-প্রিয় হয়ে ওঠেছে এ যুগে, ওগুলো আসলে কিভাবে কাজ করে? আজকের লেকচারে সব উন্মোচন হবে।

১৫. ক. মেডিকেল যন্ত্রাদির ধরন

মেডিকেল যন্ত্রাদি মূলত কয়েক ধরনের হয়ে থাকে, যেমন: **১. ডায়াগনস্টিক [Diagnostic], ২. থেরাপিউটিক [Therapeutic], ৩. লাইফ সাপোর্ট [Life support], ৪. মনিটর [Monitor] ও ৫. ল্যাবেরোটরি যন্ত্রাদি [Laboratory]**। আমরা এগুলোর উপর আরো কিছু তথ্য তুলে ধরবো।

১. ডায়াগনস্টিক যন্ত্রাদি

এসব যন্ত্রের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ক'টি হলো আলট্রাসাউন্ড [ultrasound], এমআরই [magnetic resonance imaging- MRI], ক্যাট [computerized axial tomography -CAT], পিইটি [positron emission

tomography -PET], এবং এক্স-রে [X-Ray]। রোগ সনাক্তকরণে আজকাল এ যন্ত্রগুলো খুব বেশী কাজে লাগছে। আমরা এবার একে একে এগুলোর উপর তথ্যাদি তুলে ধরবো।

১. ক. আলট্রাসাউন্ড [ultrasound]: চিকিৎসা শাস্ত্রে **'আলট্রাসনোগ্রাফি'** [ultrasonography] একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আলট্রাসাউন্ড বা অতিশব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে দেহের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন দেহযন্ত্রের **'ছবি'** স্ক্রীনে অঙ্কিত করা হয়। এই উপায়ে প্রাপ্ত চিত্র গবেষণা করে রোগ সনাক্তকরণ হয়ে থাকে।



পদার্থবিজ্ঞানে **'আলট্রাসাউন্ড'** [ultrasound] মানে কানে শোনা যায় না এমন উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সিসম্পন্ন শব্দ তরঙ্গকে বুঝায়। সাধারণ এই ফ্রিকুয়েন্সিটি হলো প্রায় ২০ কিলোহার্টজ। আলট্রাসাউন্ডে যে ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহৃত হয় তার মাত্রা ২ থেকে ১৮ মেগাহার্টজ পর্যন্ত হয়ে থাকে। তিনটি পদক্ষেপে শব্দতরঙ্গ থেকে ছবি ভেসে আসে স্ক্রীনে। প্রথমত মেশিন দ্বারা উপযুক্ত শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করতে হবে। দ্বিতীয়ত দেহের অভ্যন্তরস্থ অরগ্যান থেকে ফিরে আসা শব্দতরঙ্গ আটকে রাখা জরুরী। সবশেষে প্রতিবিম্বিত এই শব্দতরঙ্গ থেকে তৈরী করতে হবে ছবি, গবেষণার জন্য।

শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি: সিরামিকের তৈরী **'পিযোইলেকট্রিক ট্রান্সডিউসার'** [piezoelectric transducer] দ্বারা শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়। এই তরঙ্গ দেহের ভেতর প্রবেশ করে ফিরে আসে। ফেরৎ আসা শব্দতরঙ্গ মেশিনে চলে যায়।

প্রতিবিম্ব শব্দতরঙ্গ আটকে রাখা: ট্রান্সডিউসারে যেভাবে শব্দতরঙ্গ দেহের ভেতর পাঠিয়েছিল ঠিক অনুরূপ উল্টোদিকে ট্রান্সডিউসারে শব্দতরঙ্গ প্রতিবিম্ব হয়ে ফিরে আসে। এই ফিরে আসা তরঙ্গেই তথ্য নিহিত থাকে। এসব তরঙ্গ আটকে রাখতে হবে। ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদি এই তরঙ্গকে সিগনালে পরিণত করে পাঠিয়ে দেয় স্ক্যানারের মূল যন্ত্রে যেখানে এটা প্রসেস করে ছবি তৈরী হয়। নিম্নে একটি ট্রান্সডিউসার দেখানো হয়েছে।



ছবি সৃষ্টি: প্রতিটি প্রতিবিম্বিত শব্দতরঙ্গকে সনোগ্রাফিক স্ক্যানার প্রসেস করে ছবিতে রূপান্তর করে। যে বিজ্ঞান এই প্রক্রিয়ায় কাজে লাগানো হয় তার নাম **'ডপলার এফেক্ট'**। পদার্থবিজ্ঞানের উপর আলোচনাকালে এ সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মনে আছে আশা করি। সনোগ্রাফিক স্ক্যানার দ্বারা সৃষ্ট ছবি প্রদর্শন করার জন্য একটি ডিসপ্লে ইউনিট থাকে। এরপর তা প্রিন্টার দ্বারা বের করে নিয়ে আসা যায়।

বিভিন্ন রোগের কারণ খোঁজা ছাড়াও মায়ের উদরে শিশু কিভাবে বেড়ে ওঠে তা পরীক্ষার জন্য আলট্রাসনোগ্রাফি আজকাল সকলেই ব্যবহার করে থাকেন। এই উপায়ে মাত্র মাস তিনেক পরই শিশু ছেলে না মেয়ে তা-ও সনাক্ত করা হতে পারে।

১. খ. এমআরআই [MRI]: চিকিৎসা শাস্ত্রে 'মেগনেটিক রেজোনেন্স টমোগ্রাফি' [Magnetic Resonance Imaging- MRI] একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। কম্পিউটার প্রযুক্তি, রেডিও তরঙ্গ ও শক্তিশালী মেগনেটিক ফিল্ড ব্যবহারের মাধ্যমে দেহের ছবি তৈরী করে রোগ সনাক্তকরণে এই যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দেহের নির্দিষ্ট **'পাতলা কাটা অংশ'** কম্পিউটারের মাধ্যমে চিত্র বানানোই এর কাজ। হৃদযন্ত্র, শিরা-উপশিরা, মস্তিষ্ক ইত্যাদির ছবি যে কোন কোণ থেকে এই যন্ত্র ছবি তুলতে পারে। ফলে এসব দেহযন্ত্রে রোগ-ব্যাধি কি থাকতে পারে তা সহজে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। অন্যথায় একই লক্ষ্যর্জনে অস্ত্রোপচার কিংবা কোন উপায়ে ক্যামেরা ঢুকাতে হবে। শেষোক্ত একটি প্রযুক্তি অবশ্য ইতোমধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর নাম **'এন্ডোস্কোপি'** [endoscopy]।


MRI মেশিন

আমাদের দেহের অভ্যন্তরে অসংখ্য প্রটন আছে যা হাইড্রোজেন এটমের নিউক্লিয়াসে থাকে। এমআরআই সম্ভব এ কারণেই যে, মানবদেহের ওসব প্রটনে আছে অতি ক্ষুদ্র **'বায়োলজিকেল মেগনেট'** [biological magnet]। এমআরআই প্রযুক্তির মূলই হলো ওসব মেগনেট বা চুম্বক। একজন রোগিকে যখন মেশিনের পাইপের মতো মেগনেটের ভেতরে ঢুকানো হয়, তখন মোট তিনটি পদক্ষেপে রোগ সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু হবে। ১. এমআরআই দেহে সৃষ্টি করে খুব শক্তিশালী স্থির মেগনেটিক ফিল্ড যা পৃথিবীর ফিল্ডের তুলনায় ৩০ হাজার গুণ বেশী। ২. এবার এমআরআই থেকে রেডিও সিগনালের মাধ্যমে দেহের প্রটনগুলোর স্থিত অবস্থায় পরিবর্তন ঘটায়। ৩. রেডিও সিগনাল বন্ধ করে এমআরআই দেহের মধ্য থেকে **'ইলেকট্রমেগনেটিক ট্রান্সমিশন'** [electromagnetic transmission] কিভাবে বেরিয়ে আসছে তা শ্রবণ করে। এই তথ্যাদি থেকেই শেষ পর্যন্ত দেহের অভ্যন্তরের চিত্র গড়ে তুলে।


MRI ছবি

এমআরআই স্ক্যান বেশ ব্যয়বহুল। তবে মস্তিষ্ক, কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেম ইত্যাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত রোগ-ব্যাধিতে এমআরআই স্ক্যান বিশেষ ফলপ্রসু হতে পারে। এমআরআই স্ক্যান আজকাল বাংলাদেশেও হচ্ছে, উপকৃত হচ্ছেন অসংখ্য রোগী।

১. গ. ক্যাট [CAT]: 'কম্পিউটেড এক্সিয়েল টমোগ্রাফি' [computed axial tomography -CAT] একটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ-সনাক্তকরণ টেকনিক। এই প্রযুক্তির অপর নাম সিটি [Computed Tomography -CT] স্ক্যান। সিটি স্ক্যান অনেকটা এক্স-রে এর মতোই। তবে কম্পিউটারের মাধ্যমে ত্রিমাত্রিক ছবি সৃষ্টিও এতে সন্বিবেশিত আছে। নীচে একটি সিটি স্ক্যানার দেখাচ্ছে।



সিটি স্ক্যানারের মতো অনুরূপ রোগ-সনাক্তকরণ কাজ উন্নতমানের এমআরআই [MRI] স্ক্যানারের মাধ্যমে সম্ভব। ইতোমধ্যে আমরা এমআরআই সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করেছি। সিটি স্ক্যান ওটার তুলনায় বেশ সুবিধাজনক। এটা অনেকটা কম ব্যয়বহুল, পরীক্ষার জন্য সময় লাগে অল্প, বক্ষস্থল ও পেটের চিত্র অধিক পরিষ্কার হয় এবং শক্তিশালী মেগনেটিক ফিল্ড ছাড়াই ছবি সংগ্রহ করার সুযোগ এতে আছে। এসব কারণে ডাক্তাররা সিটি স্ক্যান ব্যবহার ছেড়ে দিচ্ছেন না- যা অনেকে ভেবেছিলেন তা-ই হবে এমআরআই প্রযুক্তির ফলে।

১. ঘ. পিইটি [Positron Emission Tomography -PET]: অভ্যন্তরীণ দেহ-টিস্যুর ছবি তোলার জন্য এই টেকনিক ব্যবহৃত হয়। মস্তিষ্ক টিউমার সনাক্তকরণ ও মস্তিষ্কে স্ট্রোকের ক্রিয়া পরীক্ষার জন্য পিইটি স্ক্যান খুব কার্যকরী। নীচে একটি পিইটি সিস্টেমের ছবি তুলে ধরেছি।



১. ঙ. আধুনিক এক্স-রে [X-Ray]: এক্স-রে মূলত আলোক-রশ্মি থেকে স্বল্প দৈর্ঘ্যসম্পন্ন তেজস্ক্রিয়া। এদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১০০ থেকে ০.০১ আংস্ট্রম মাত্র। এক্স-রে শিল্প ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এক্স-রে রেডিওগ্রাফ থেকে রোগ সনাক্তকরণ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। নিশ্চয় আপনাদের কেউ না কেউ এক্স-রে করেছেন বিভিন্ন কারণে। ইতোমধ্যে আলোচিত ক্যাট সিস্টেম মূলত এক্স-রে ও কম্পিউটারের সমন্বয়ে গঠিত। ডানে উন্নতমানের একটি এক্স-রে মেশিনের ছবি তুলে ধরলাম।



২. থেরাপিউটিক যন্ত্রাদি [Therapeutic instruments]

এ ক্যাটাগরির মেডিকেল যন্ত্রাদির মধ্যে **'ইনফিউশন পাম্প'** [infusion pump], লেইজার [LASER] ও লাসিক [LASIC] নামক যন্ত্রাদির উপর আমরা আলোচনা করবো।

২. ক. 'ইনফিউশন পাম্প' [infusion pump]: এ যন্ত্রের কাজ হলো পানীয়, ঔষধ কিংবা জৈবিক পদার্থ রোগির রক্তের মধ্যে পাম্প করে ঢুকানো। নার্সিং স্টাফ দ্বারা সঠিক পরিমাণ ও মাত্রায় জরু রী তরল পদার্থ রোগিদের শিরায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। নীচে একটি ইনফিউশন পাম্প দেখানো হলো।



২. খ. লেইজার [LASER]: ফিজিক্সের উপর আলোচনাকালে লেইজার সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। আশারাখি সবার মনে আছে। লেইজার আজকাল ভারী শিল্প থেকে মেডিসিনে ব্যবহৃত হচ্ছে। থেরাপির ক্ষেত্রে লেইজার আলোক মানবদেহে সার্জারিতে ব্যবহৃত হয়- যেমন, কাটা, পুড়ানো, টিস্যু ধ্বংস ইত্যাদি। অতি ক্ষুদ্র, শক্তিশালী ও যথার্থ হওয়ায় লেইজার মেডিকেল প্রয়োজনে খুব প্রশস্ত ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে আজকাল। নিম্নোক্ত কয়েকটি কাজে লেইজার কাজে লাগিয়ে থাকেন ডাক্তাররা। লিস্টের পরে একটি লেইজার যন্ত্রের ছবি দিয়েছি।

ক. ফুলেওঠা রক্ত-পূর্ণ মোচড়ে যাওয়া শিরা-উপশিরা চিকিৎসা।
খ. দৃষ্টিশক্তি উন্নতকরণে কর্ণিয়াতে সার্জারি।
গ. চোখের রেটিনা খুলে গেলে তা সঠিককরণ।
ঘ. প্রসস্টেট গ্ল ্যান্ড কেটে ফেলা।
ঙ. কিডনি থেকে পাথর তুলে ফেলা।
চ. চামড়ায় লেইজার সার্জারি।

২. গ. লাসিক [LASIC]: এটাও মূলত লেইজার প্রযুক্তির একটি যন্ত্র। এটা দ্বারা চোখের সার্জারি করা হয়। লাসিক সার্জারি একজন **'অপথালমোলজিস্ট'** [ophthalmologist] দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে। চোখের কর্ণিয়ায় এই অপারেশন করা হয় দৃষ্টিশক্তি উন্নতিকরণে। নীচে [পরের পৃষ্ঠায়] আমরা একটি লাসিক লেইজার মেশিনের ছবি তুলে ধরলাম।



৩. লাইফ সাপোর্ট [Life support] সিস্টেম

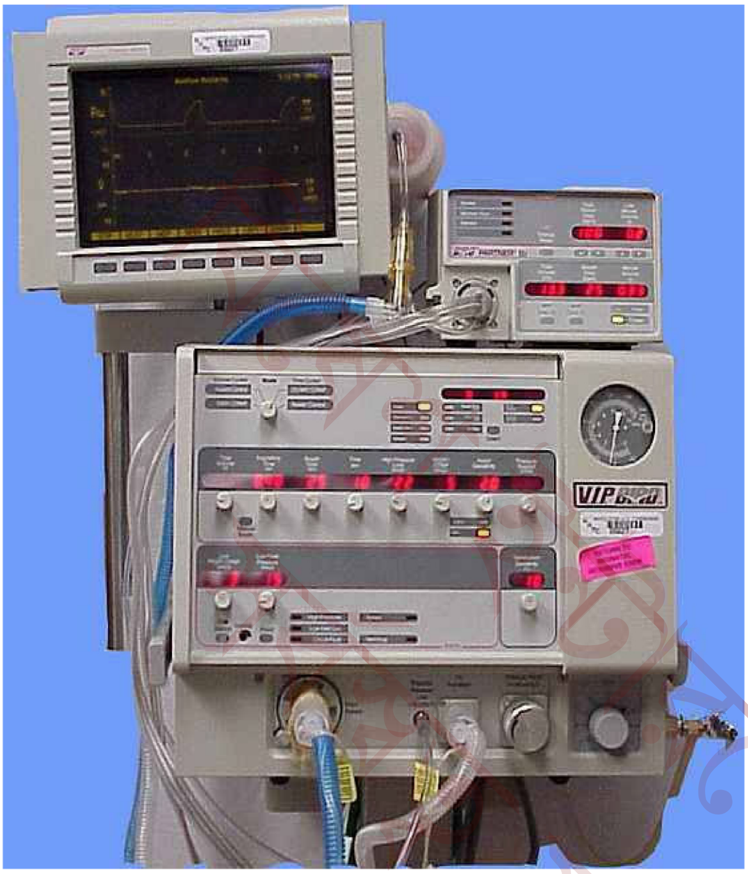


যদি কেউ রোগ-ব্যাধি বা অন্য কোনো মেডিকেল কারণে নিজে নিজে বাঁচার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তাহলে কৃত্রিম উপায়ে তাকে বাঁচানোর জন্য আজকাল প্রায় সবদেশে তৈরী করা হয়েছে **'লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম'**। হাসপাতালে এই সিস্টেম যেখানে স্থাপন করা হয় তার নাম **'ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট'** [Intensive Care Unit -ICU]। আইসিইউ-তে কাউকে রাখার অর্থ হলো জীবিত রেখে চিকিৎসা অব্যাহত রাখার চেষ্টা। এতে থাকে সর্বাধুনিক মেডিকেল যন্ত্রপাতি, যেমন ইলেকট্রনিক মনিটরিং, কৃত্রিম ভেন্টিলেশন এবং অন্যান্য জীবন-বাঁচানোর যন্ত্রাদি। এছাড়া সর্বোন্নত ঔষধপত্র, অভিজ্ঞ ডাক্তার ও নার্সিং স্টাফ এই সিস্টেমের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখা হয়। লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেম মূলত জীবনকে দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা মাত্র। এই সিস্টেমে কাউকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য রাখা আদৌ যৌক্তিক বা সম্ভব নয়। তাই এতে রাখার অর্থ, জীবন দীর্ঘায়িত করে চিকিৎসা প্রদান। কিন্তু তাতেও যদি রোগির অবস্থার উন্নতি না হয় তাহলে এক পর্যায়ে লাইফ-সাপোর্ট থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। নীচে একটি লাইফ-সাপোর্ট ইউনিট দেখানো হয়েছে।



লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেমে যে ক'টি যন্ত্র থাকা আবশ্যক ওগুলো হলো: ক. **'মেডিকেল ভেন্টিলেটর'** [medical ventilators], খ. **'এ্যানায়েস্তেটিক মেশিন'** [anesthetic machines], গ. **'হার্ট-লাং মেশিন'** [heart-lung machines], ঘ. **'ইসিএমও'** [extracorporeal membrane oxygenation -ECMO] এবং ঙ. **'ডায়ালিসিস মেশিন'** [dialysis machines]। আমরা এবার একে একে এগুলোর উপর আরো কিছু তথ্য ছবিসহ তুলে ধরছি।

৩. ক. 'মেডিকেল ভেন্টিলেটর' [medical ventilators]: যদি কোনো রোগি স্বেচ্ছায় শ্বাস-প্রশ্বাস অব্যাহত রাখতে অপারগ হন তখন কৃত্রিম উপায়ে ফুসফুসে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন যোগান ও সেখান থেকে ক্ষতিকর গ্যাস কার্বন ডাইওক্সাইড বের করতে হবে। অন্যথায় রোগি মারা যেতে পারেন। যে যন্ত্রের মাধ্যমে এ কাজটি করা হয় তা-ই হলো মেডিকেল ভেন্টিলেটর। নীচে এরূপ একটি যন্ত্রের ছবি তুলে ধরেছি।



ভেন্টিলেটর ব্যবহৃত হয় ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট, বাড়িস্থ কেয়ার ও জরুরী বিভাগে। এছাড়া এ্যানাস্তেসিয়া সিস্টেমের একটি ইউনিট হিসাবে এটি কাজে লাগানো হয়। আজকাল ভেন্টিলেটর কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কেউ কেউ মেডিকেল ভেন্টিলেটরকে **'রেসপিরেটর'** [respirator] বলে সম্বোধন করেন। ভেন্টিলেটরকে অনেকে **'লাইফ-ক্রিটিকেল সিস্টেম'** [life-critical system] বলেন। অর্থাৎ জীবন-মরণ অবস্থা। এর কারণ হলো, ভেন্টিলেটর অকেজো হয়ে পড়লে রোগির মৃত্যু অনিবার্য হবে। সুতরাং সিস্টেমটা যাতে **'ফুলপ্রুফ'** হয় সেদিকে খিয়াল রাখতে হবে। এসব যন্ত্রাদির ডিজাইন ইঞ্জিনিয়াররা পাওয়ার সাপ্লাই বেকআপ এবং অটোমেটিক সিস্টেম অকেজো হলে নার্সদের নিয়ন্ত্রণে পরিচলন সিস্টেম সংযুক্ত রাখেন। কম্পিউটারের সফটওয়্যার সমস্যা হলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে এলার্ম সিস্টেমও এসব যন্ত্রে সম্পৃক্ত থাকে।

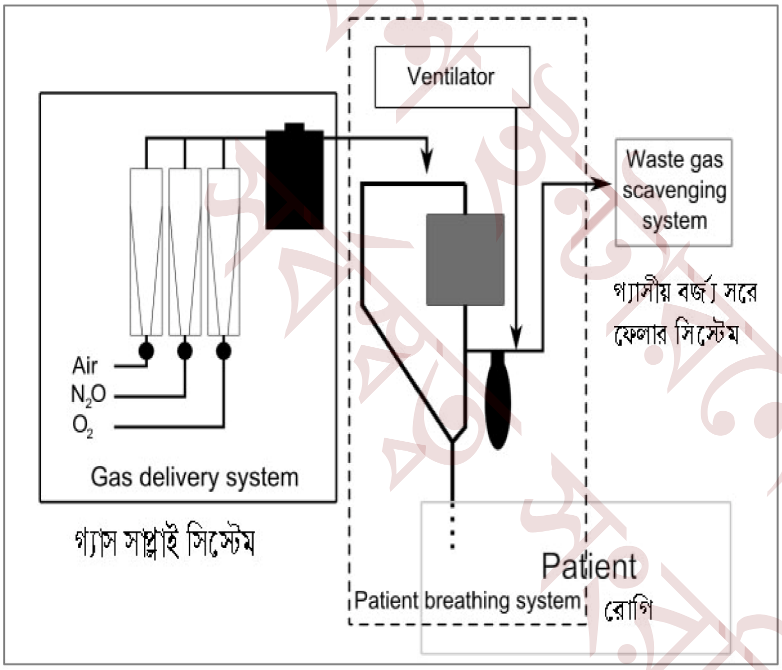
৩. খ. 'এ্যানায়েস্তেটিক মেশিন' [anesthetic machines]: ব্রিটিশ ইংরেজীতে একে **'anaesthetic machinees'** এবং আমেরিকার ইংরেজীতে **'anesthesia machine'** বলে। এর কাজ হলো অস্ত্রোপচারের সময় রোগির দেহে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, নাইট্রাস অক্সাইড, এ্যানাস্তেটিক বাষ্প যেমন আইসোফ্লোরেইন ইত্যাদি সঠিক মাত্রায় যোগান দেওয়া নিশ্চিত রাখা। আধুনিক বিশ্বের হাসপাতালে এই মেশিনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে। নীচে এরূপ একটি মেশিনের ছবি তুলে ধরেছি।



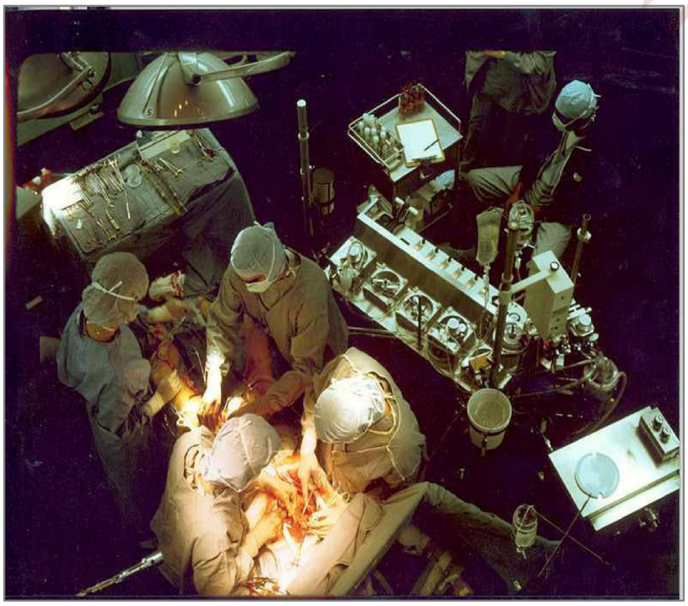
আধুনিক এ্যানায়েস্তেটিক মেশিনে এসব গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে: ১. হাসপাতালের অক্সিজেন, মেডিকেল বাতাস ও নাইট্রাস অক্সাইড সাপ্লাইয়ের সঙ্গে পাইপ দ্বারা সংযুক্তি। ২. সিলিন্ডার ভর্তি রিজার্ভ অক্সিজেন, বাতাস ও নাইট্রাস অক্সাইজ গ্যাস। ৩. উচ্চ গতিসম্পন্ন অক্সিজেন ফ্ল্যাস যার মাধ্যমে ৩০ থেকে ৭৫ লিটার প্রতি মিনিট গ্যাস সাপ্লাই হতে পারে। ৪. গ্যাস সাপ্লাই নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রেসার গেজ ও বাল্ব। ৫. রোগির দেহে গ্যাস প্রবেশ ও বেরকরণ ক্রিয়া মনিটরের ব্যবস্থা। ৬. রোগির হৃদ-

স্পন্দন, ইসিজি, রক্তচাপ এবং অক্সিজেন গলনাঙ্ক মনিটরের জন্য বিশেষ যন্ত্রাদি। এছাড়া দেহ-তাপমাত্রাও মনিটরের প্রয়োজন পড়তে পারে। ৭. শ্বাস-নিঃশ্বাস সার্কেট সিস্টেম। ৮. সার্জারির সময় বর্জ্য সরানোর চোষণ ব্যবস্থা। নীচের চিত্রটি দেখুন।

যে কোন সিস্টেম যেখানে মানুষের জীবন-মরণ সমস্যা সম্পৃক্ত, সেখানে অবশ্যই **'নিরাপত্তা'** [safety] সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রোগির দেহে অস্ত্রোপচারের সময় ব্যবহৃত ভেন্টিলেটর যাতে ফেইল না করে তা নিশ্চিত করা চাই। সুতরাং ভেন্টিলেটর ডিজাইন ইঞ্জিনিয়াররা সর্বাধিক সতর্কতার সঙ্গে নিরাপত্তার দিকটি বিবেচনা করেন। যেমন অক্সিজেন সাপ্লাই অকেজো হলে সাথে সাথে ডাক্তাররা যাতে জানতে পারেন তার জন্য এলার্ম। এজন্য মেশিনে সংযুক্ত থাকে **'অক্সিজেন ফোইলার ওয়ার্নিং ডিভাইস'** [OFWD]। প্রেসার এলার্ম। ইত্যাদি। অবশ্য প্রত্যেকবার ব্যবহারের পূর্বে পুরো মেশিনটির ফাংশন ভালোভাবে চেক করতে হবে কার্যকারিতার নিশ্চিতকরণের জন্য।



৩. গ. 'হার্ট-লাং মেশিন' [heart-lung machines]: সার্জারির সময় হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের অবস্থা ও ফাংশন সার্বক্ষণিক মনিটর জরুরী। এ কাজে আজকাল একটি মেশিন ব্যবহৃত হচ্ছে। এটার নাম **'কার্ডিওপালমোনারি বাইপাস'** [Cardiopulmonary bypass - CPB]। সার্জারির সময় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রোগির দেহে পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন সাপ্লাই ও রক্ত চলাচল নিশ্চিত রাখতে হবে। **'ঈচই'** এ কাজটিই স্বয়ংক্রিয়ভাবে করে থাকে। এটি মূলত একটি পাম্প। একে কেউ কেউ **'হার্ট-লাং মেশিন'** বলেন। নীচে এরূপ একটি আধুনিক মেশিনের ছবি তুলে ধরেছি।



হার্ট-লাং মেশিন যেসব অস্ত্রোপচারে কাজে লাগে তাহলো, ১. আর্টারি বাইপাস, ২. হৃদযন্ত্রের বাল্ব মেরামত বা প্রতিস্থাপন, ৩. হৃদযন্ত্রের আর্টারি মেরামত, ৪. হৃদযন্ত্র বদলানো [**হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট**], ৫. রক্ত শিরা থেকে বড় ধরনের বস্তু সরানো, ৬. আর্টারি [**শিরা**] থেকে রক্ত-ক্লট সরানো এবং অন্যান্য হৃদযন্ত্র সম্পৃক্ত অস্ত্রোপচারে এই মেশিন কাজে লাগে।

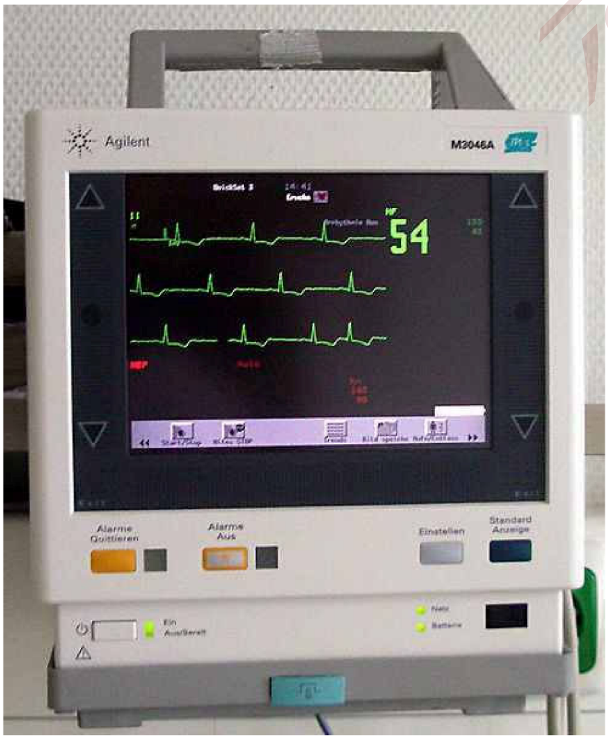
৪. ঘ. **‘ইসিএমও’ [extracorporeal membrane oxygenation -ECMO]:** রোগির হৃদযন্ত্র ও ফুসফুস যখন কৃত্রিম সাহায্য ছাড়া কাজ করতে ব্যর্থ হয়ে পড়ে তখনই এই যন্ত্রটি কাজে লাগানো হয়। এটা সাধারণত ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে থাকে। এই যন্ত্রের মাধ্যমে হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসকে ফাংশন করতে সাহায্য করা হয়। মোটকথা, এটা কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র। নীচে একটি ইসিএমও মেশিন দেখানো হয়েছে।



৫. ঙ. **‘ডায়ালিসিস মেশিন’ [dialysis machines]:** রক্তের মধ্যে অতিরিক্ত পানি ও বর্জ্য থাকে যা সময় সময় সরাতে হয়। সাধারণত এই কাজটি আঞ্জাম দেয় আমাদের কিডনিদ্বয়। কিন্তু এগুলো যদি সঠিকভাবে কাজ করে না তাহলে কৃত্রিম উপায়ে বর্জ্য ও পানি সরানোর ব্যবস্থা বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করেছেন। আর একেই বলে **‘ডায়ালিসিস’** [dialysis]।

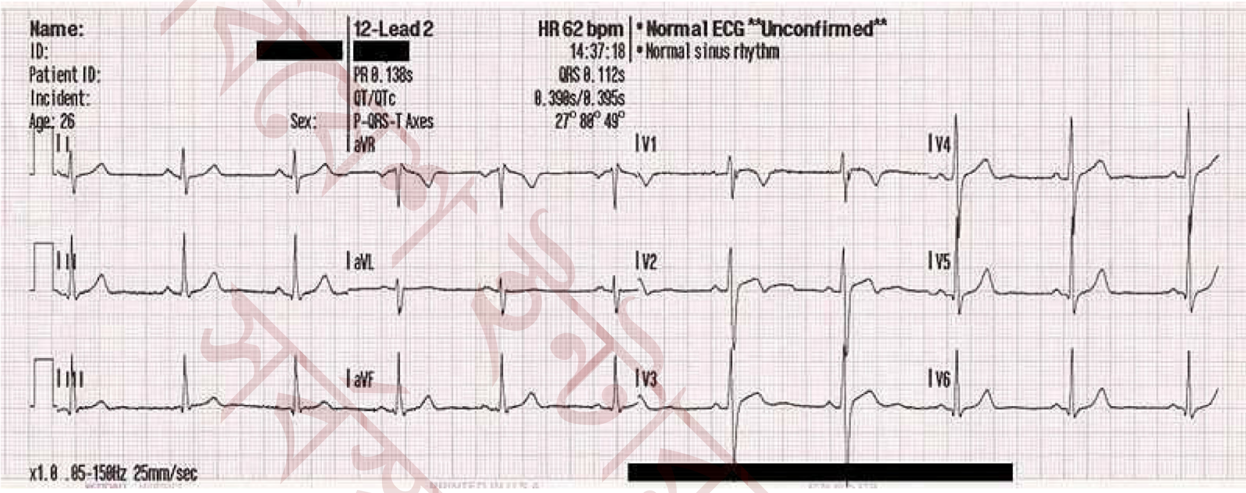
৪. মনিটর [Monitor] সিস্টেম

চিকিৎসা শাস্ত্রে রোগির অবস্থা সর্বক্ষণ জানা একান্ত জরুরী। ইঞ্জিনিয়াররা তাই বেশ কিছু যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন যার মাধ্যমে এক কাজটি সম্পন্ন হয়ে থাকে। মনিটর যন্ত্র দ্বারা রোগির রক্তচাপ, দেহ তাপমাত্রা, হৃদযন্ত্রের স্পন্দন ইত্যাদি জানা যেতে পারে। আমরা এ প্রসঙ্গে ইসিজি [ECG], ইইজি [EEG], রক্তচাপ [Blood Pressure] ও রক্তে গলিত গ্যাস [dissolved gases in blood] মনিটরের যন্ত্রাদির উপর আলোচনা করবো।



৪. ক. **ইসিজি [ECG]: ‘ইলেকট্রকার্ডিওগ্রাফ’** [electrocardiograph] বলতে কি বুঝায় তা আপনাদের অনেকেরই জানা আছে। হয়তো অনেকে তা করিয়েছেনও। অন্তত ইসিজি’র মাধ্যমে যে **‘গ্রাফ’** বেরিয়ে আসে তা-ও হয়তো দেখেছেন। কিন্তু আসলে এটি কী? আমাদের হৃদযন্ত্রের মধ্যে নেচারেল ইলেকট্রিকেল ক্রিয়া চলছে প্রতি মুহূর্তে। এই ক্রিয়াটি কতটুকু সঠিক তা জানার জন্য ইসিজি টেস্ট। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হৃদযন্ত্রের ইলেকট্রিকেল ক্রিয়া রেকর্ড করা হয় ইসিজি মেশিন দ্বারা। নীচে ইসিজি’র একটি গ্রাফ দেখানো হয়েছে।

সাধারণত রোগির হৃদযন্ত্রের নিকটে ৬টি, উভয় হাতে ২টি এবং উভয় পায়ে ২টি- মোট এই ১০ **'ইলেকট্রোড'** [electrode] লাগানো হয়। এগুলো মূলত সেন্সর। ইলেকট্রিক তারের মাধ্যমে এসব সেন্সরের সঙ্গে যুক্ত থাকে রেকর্ডার মেশিন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হৃদযন্ত্রের স্পন্দন ঠিক কিভাবে হচ্ছে তা-ই রেকর্ড করা হয় ইসিজি মেশিন দ্বারা। ডাক্তাররা এটা পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন রোগির হৃদযন্ত্র স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক।

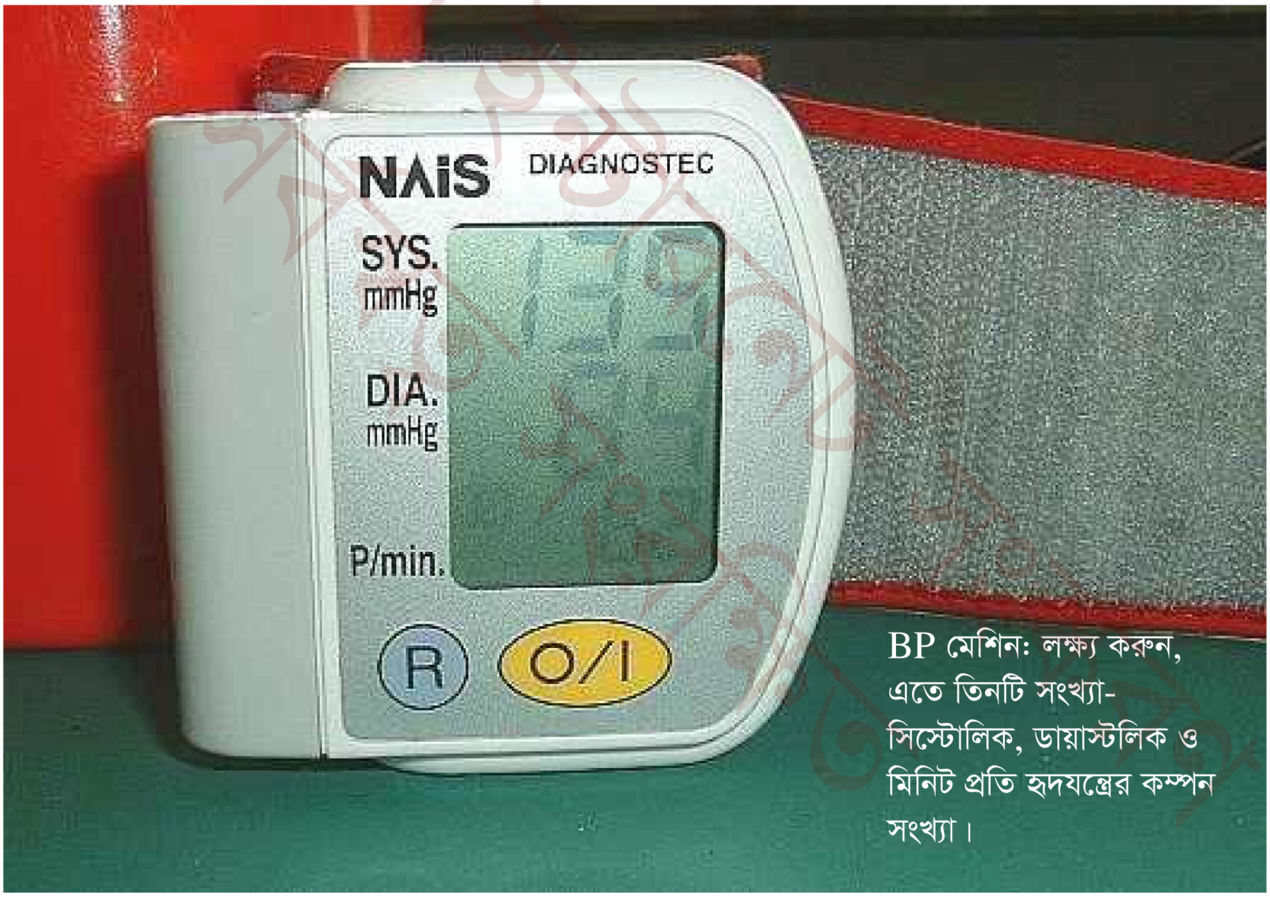


৪. খ. ইইজি [EEG] যন্ত্র: 'ইলেকট্রএনসেফালোগ্রাফি' [Electroencephalography -EEG] হলো মস্তিষ্কের নিউরনে কিভাবে ইলেকট্রিক ভলটেজ চলাচল করে তা নির্ণয় করা। ইসিজি'র মতো একটি গ্রাফ কাগজে রেজাল্ট অঙ্কিত হয়ে থাকে। বিশ থেকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে ব্রেনের ইলেকট্রিকেল ক্রিয়া মাপা হয় এই মেশিন দ্বারা। নীচের গ্রাফটি দেখুন।

এখানে ইইজি

মাথার খুলির সর্বত্র অসংখ্য সেন্সর লাগানো হয় ইইজি টেস্টের জন্য। এরগুলো তারের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে রেকর্ডারের সঙ্গে। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ব্রেনের ক্রিয়া গ্রাফ আকারে অঙ্কিত হয় কাগজে। ডাক্তাররা এই গ্রাফ গবেষণা করে রোগির ব্রেন সম্পর্কে অনেক ব্যাপার জানতে সক্ষম হন।

৪. গ. **রক্তচাপ [Blood Pressure]**: রক্তচাপ সাধারণ না থাকলে বেশ সমস্যা হয়। একাধিক যন্ত্রের মাধ্যমে আজকাল রক্তচাপ মাপা হয়ে থাকে। রক্তের শিরা-উপশিরা বা ব্লাড ভেসেলে'র দেওয়ালে রক্ত চলাচল থেকে চাপ সৃষ্টি হয়। হৃদযন্ত্র একটি রক্ত-পাম্প। প্রতিটি হৃদ-স্পন্দনের সময় রক্তচাপ সর্বোচ্চ বা **'সিসটোলিক'** [systolic] থেকে সর্বনিম্ন বা **'ডায়াস্টলিক'** [diastolic] পর্যন্ত ওঠানামা করে। আমাদের হাতের উপরিভাগে **'ব্রাকিয়েল আরটারি'** [brachial artery] নামক একটি শিরা আছে। এটা হৃদযন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত একটি বড় শিরা। এই শিরায় কি পরিমাণ সিস্টোলিক ও ডায়াস্টলিক চাপ আছে তা মাপা হয়ে থাকে। সাধারণ রক্তচাপ হলো সিস্টোলিক ৯০ থেকে ১১৯ এবং ডায়াস্টলিক ৬০ থেকে ৭৯ পর্যন্ত। লো রক্তচাপ হলো সিস্টোলিক ৯০ কিংবা এর নীচে এবং ডায়াস্টলিক ৬০ কিংবা এর নীচে। অপরদিকে উচ্চ রক্তচাপ মানে সিস্টোলিক অন্তত ১২০ থেকে ১৮০ পর্যন্ত এবং ডায়াস্টলিক ৮০ থেকে ১১০ পর্যন্ত। আজকাল ইলেকট্রনিক মেশিন দ্বারা রক্তচাপ অতি সহজে মাপা যায়। নিম্নে একটি অত্যাধুনিক মেশিনের ছবি তুলে ধরলাম। এটির নাম **'স্পিগমোমানোমিটার'** [sphygmomanometer]!



BP মেশিন: লক্ষ্য করুন, এতে তিনটি সংখ্যা- সিস্টোলিক, ডায়াস্টলিক ও মিনিট প্রতি হৃদযন্ত্রের কম্পন সংখ্যা।

নীচের টেবিলে বিভিন্ন বয়সে স্বাভাবিক রক্তচাপের একটি মাত্রা-টেবিল দেওয়া হলো।

Stage	Approximate age	Systolic	Diastolic
Infants	1 to 12 months	75–100	50–70
Toddlers	1 to 4 years	80–110	50–80
Preschoolers	3 to 5 years	80–110	50–80

School age	6 to 13 years	85–120	50–80
Adolescents	13 to 18 years	95–140	60–90
Adult	18 and older	90–119	60–79

নম্নে আরো আগের যুগে ব্যবহৃত [আর অনেকে এখনও ব্যবহার করেন] এমন দু'টি রক্তচাপ মাপার উপায় উপকরণের ছবি তুলে ধরেছি। প্রথম যন্ত্রটিতে আছে **'স্পিগমোম্যানোমিটার'** [sphygmomanometer] ও **'স্ট্রেথোস্কোপ'** [stethoscope] আর দ্বিতীয়টির নাম **'মার্কারি ম্যানোমিটার'** [mercury manometer]।



৫. রক্তে গলিত গ্যাস [dissolved gases in blood] মনিটর যন্ত্রাদি

আমাদের রক্তে **'হিমোগ্লোবিন'** [hemoglobin] বা লাল রক্তকোষ নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ কোষ [cell] আছে। এটার কাজ হলো অক্সিজেন ক্যারী করে দেহের সকল কোষে নিয়ে যাওয়া। সাপ্লাই দেওয়ার পর দেহ কোষ হিমোগ্লোবিনে ছেড়ে দেয় নিজের বর্জ্য কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস। এটা লাল রক্তকোষ বয়ে নিয়ে এসে ছেড়ে দেয় আমাদের ফুসফুসে। এরপর আমরা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে এই ক্ষতিকারক গ্যাসটি বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেই। যখন হিমোগ্লোবিন ফুসফুস থেকে [শ্বাসের মাধ্যমে জমাকৃত] অক্সিজেন সংগ্রহ করে নেয় তখন একে বলে **'অক্সিজেনেটেড'** [oxygenated] রক্তকোষ। আর যখন অক্সিজেনমুক্ত হয়ে পড়ে তখন একে বলে **'ডিঅক্সিজেনেটেড'** [deoxygenated] রক্তকোষ। হিমোগ্লোবিনে অক্সিজেন কতটুকু সেটারেট [গলে] যায় তা জানা অনেক সময় প্রয়োজন পড়ে। এ প্রয়োজনেই উদ্ভাবন হয়েছে বিভিন্ন মনিটরিং যন্ত্রাদি। এসব যন্ত্রের নাম **'অক্সিমিটার'** [oximeter]। নীচে (পরের পৃষ্ঠায়) এরূপ কয়েকটির ছবি তুলে ধরেছি।

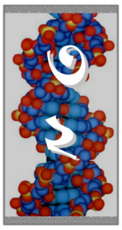


বিভিন্ন ধরনের অক্সিমিটার

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আধুনিক মেডিকেল যন্ত্রাদির উপর আমাদের তথ্যানুসন্ধান এখানে শেষ। ইতোমধ্যে লেকচারটি বেশ বড় হয়ে গেছে। ধৈর্যসহ এটি শ্রবণ করেছেন আপনারা, আমি এতে কৃতজ্ঞ। আশা করছি মেডিকেল যন্ত্রাদি সম্পর্কে কিছুটা হলে সবার জ্ঞান অনেকটা বর্ধিত হয়েছে। আগামী লেকচার থেকে শুরু হবে মানবদেহ সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান। আশাকরি সকলে এতে উপস্থিত হবেন। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঙ. জীববিদ্যা: পরিচিতি ও কার্যকারিতা

বক্তৃতা ৩২ : প্রাণীজগৎ

১. পরিচিতি

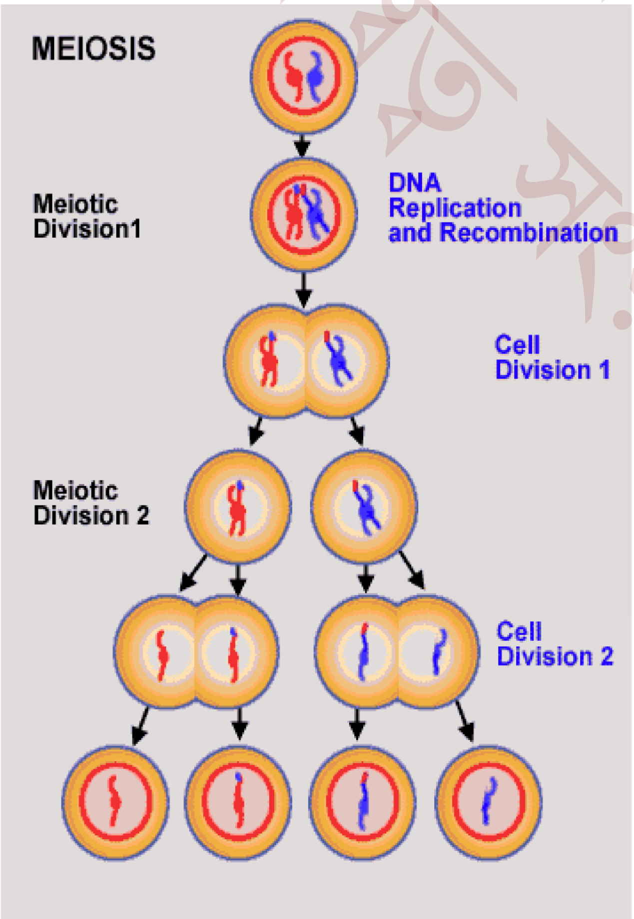
ইংরেজীতে বলে **'বায়োলজি'** [Biology]। বাংলায় জীববিদ্যা। বিজ্ঞানের এই শাখাটি ব্যাপক। জগতের প্রাণীসমূহ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এর কাজ। অতি ক্ষুদ্রকায় জীবাণু [bacteria] থেকে মানবদেহের পরিচিতি ও কার্যকারিতা হলো বায়োলজির অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি। আধুনিক বিজ্ঞানের উপর অত্র লেকচার অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি আমরা প্রাণীজগৎ নিয়ে আলোচনা উপেক্ষা করি। সুতরাং আসুন, অন্তত সংক্ষেপে জীববিজ্ঞানের উপর পরিচিতিমূলক তথ্যাদির বর্ণনা তুলে ধরি।

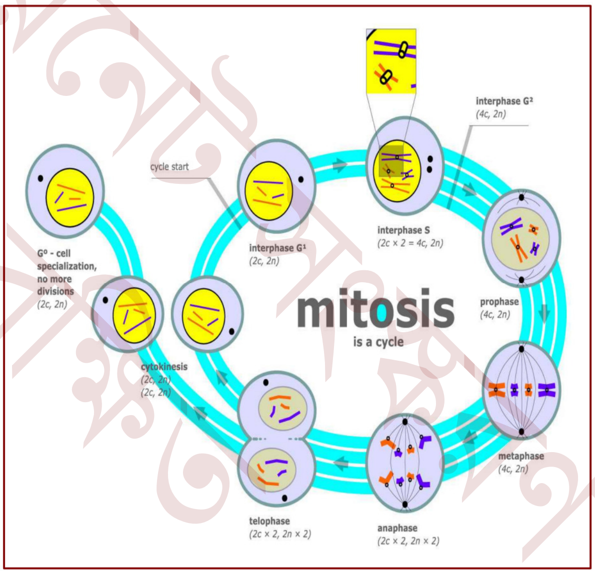
২. প্রাণের সংজ্ঞা

আমরা প্রাণী। সকল জীব-জন্তু কীট-পতঙ্গ ও জীবাণুরাও প্রাণী। কিন্তু **'প্রাণ'** [life] বলতে কী বুঝায়? এর সংজ্ঞা কী? খুব একটা বলার দরকার নেই- কারণ, আমরা সবাই জীবন্ত! আমাদের সংজ্ঞা তো আমরাই। এরপরও দেখা যাক বিজ্ঞান কী বলে?

পৃথিবীর জমিনে বহু ধরনের **'প্রাণী'** বসবাস করে। তাদেরকে জীবন্ত বলতে হলে কয়েকটি মৌলিক গুণাবলীর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এগুলো হলো: তারা ছোট থেকে বড় হয়, তারা পুনর্জননের ক্ষমতা রাখে এবং তারা খাদ্যগ্রহণ করে। আরো গভীরে যেয়ে গবেষণা করলে দেখা যায় সকল প্রাণীই মূলত **'জীবন্ত'** কোষের তৈরী। এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহাংশ একেকটি এনার্জি সৃষ্টির ইউনিট। এগুলোও এনার্জি গ্রহণ করে জীবন্ত থাকতে। পরবর্তীতে আমরা কোষ বিজ্ঞানের উপর আলোচনাকালে এগুলোর উপর বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরবো।

প্রতিটি কোষের কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসে আছে ডিএনএ [deoxyribonucleic acid] নামক একটি বড় মলিকিউল। এটাই পুনর্জননের জন্য দায়ী। সে নিজে নিজেকে কপি করতে জানে। এই প্রক্রিয়াকে বলে **'টেমপ্লেট রেপ্লিকেশন'** [template replication]। এর অর্থ ডিএনএ বিভক্ত হয়ে যাওয়া। কোষ এভাবেই বিভক্ত হয়ে এক থেকে দু'টো এবং দু'টো থেকে চারটিতে- বাড়তে থাকে। যে দু'টি প্রক্রিয়ায় কোষ বিভক্ত হয় তার নাম হলো: ১. মাইওসিস [meiosis] ও ২. মাইটোসিস [mitosis]। প্রথম প্রক্রিয়ায় কোষের নিউক্লিয়াস চার ভাগে বিভক্ত হয়। দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় কোষ বিভক্ত হয়ে দু'টি কন্যা কোষে পরিণত হয় যারা সবদিক থেকে মূল মা-কেষোর কপি। প্রথমটি হলো **'সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন'** [sexual reproduction] এবং দ্বিতীয়টি হলো **'এসেক্সুয়েল রিপ্রোডাকশন'** [asexual reproduction]। প্রথমোক্ত প্রক্রিয়া ডিম্বকোষ ও শুক্রকোষের সঙ্গে সম্পৃক্ত। শেষোক্তটি জড়িত বেড়েওঠা ও কোষ প্রতিস্থাপন, মেরামত ইত্যাদির সঙ্গে। আমাদের দেহে প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য কোষ মারা যাচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে এবং মেরামতও হচ্ছে। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় এ কাজগুলো ঘটছে। নীচে উভয় ক্রিয়ার দু'টি চিত্র তুলে ধরেছি। একটু দেখে নিন।





প্রাণীদের অপর মূল ক্রিয়ার নাম খাদ্যগ্রহণ ও বিপাকক্রিয়া। একে বিজ্ঞানীরা **'মেটাবলিজম'** [metabolism] বলেন। খাদ্যগ্রহণ ও বিপাকক্রিয়া মূলত প্রয়োজনীয় এনার্জি আহরণের উপায় মাত্র। এনার্জিসূত্র হতে পারে সূর্যালোক, অক্সিজেন ও অন্যান্য গ্যাস কিংবা সুস্বাদু খাদ্য। এনার্জির দরকার হয় পুনর্জনন, বড়-হওয়া, কোষ জীবন্ত, সৃষ্টি ও মেরামতে

এবং চলন্ত থাকা ইত্যাদিতে। সবুজ পত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদরা ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে সূর্যের আলো ব্যবহার করে খাদ্য তৈরীতে। মানুষসহ সকল জীব-জন্তু কেমিকেল এনার্জি সংগ্রহ করে খাদ্য থেকে। **'প্রাণ'** এর সংজ্ঞাদান সহজ নয়। তবে যে কোনো প্রাণীকে মেটাবলিজম ও পুনর্জনন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় থাকা চাই। এ উভয় প্রক্রিয়ার একটিও যদি না থাকে তাহলে জীবন্ত প্রাণী বলা যাবে না।

মেটাবলিজম ও রিপ্রোডাকশন ক্রিয়া কিন্তু প্রাণীদের কোষের মধ্যে সংঘটিত হয়। নিউক্লিয়াসসর্বস্ব কোষকে বলে **'ইউক্যারিওট সেল'** [eukaryote cell]। নিউক্লিয়াসহীন কোষকে বলে **'প্রক্যারিওট সেল'** [prokaryote cell]। প্রথম প্রকারের কোষ দ্বারা মানবদেহসহ যাবতীয় জীবজন্তু ও উদ্ভিদ সৃষ্ট। দ্বিতীয় প্রকার কোষ পাওয়া যায় বেকটেরিয়া বা জীবাণুদের দেহে। ইউক্যারিওট কোষের নিউক্লিয়াসে ডিএনএ মলিকিউল থাকে। কেন্দ্রের বাইরে **'সাইটোপ্লাজম'** [cytoplasm] নামক এলাকায় **ডিএনএ সিনথেসিস [কপি]** সংঘটিত হয়। মেটাবলিজমের জন্য যাবতীয় বস্তু সেখানেই বিদ্যমান। সুতরাং বলা যায়, কোষের অভ্যন্তরেই প্রাণীদের মূল দু'টি প্রক্রিয়া- তথা পুনর্জনন ও বিপাকক্রিয়া সংঘটিত হয়।

ভাইরাস সম্পর্কে আপনারা সবাই অবগত। এসব রোগ-জীবাণু **'আংশিক জীবন্ত'**। তারা নিজেদেরকে কপি করতে জানলেও এনার্জি রূপান্তর প্রক্রিয়া জানে না। অথচ নিজেদেরকে কপি করতে প্রয়োজন হয় এনার্জির। সুতরাং তারা **'পরজীবী'** [parasite] হিসাবে দেহের মধ্যে বাস করে। এ উপায়েই পুনর্জনন নিশ্চিত রাখতে সক্ষম হয় রোগ জীবাণু। যে মেজবান-কোষে সে বসে থাকে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করে নেয়। সে যেভাবে নির্দেশ দেয় সে মুতাবিক কাজ করতে বাধ্য থাকে মেজবান কোষটি। ফলে দেহের মেজবান কোষটি আর সাধারণ প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হতে পারে না। এক কথায়, জীবাণুরা তাদের মেজবান কোষকে এভাবে ধ্বংস করে নিজেরা বেঁচে থাকে। আর এটার নামই জীবাণু দ্বারা রোগাক্রান্ত হওয়া।

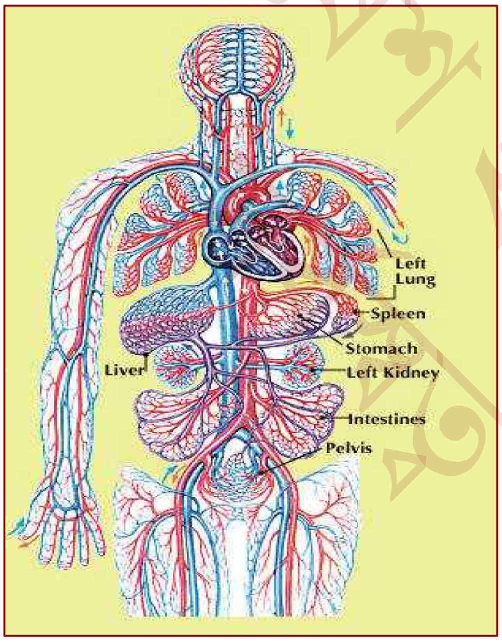
৩. মানব দেহকাঠামো

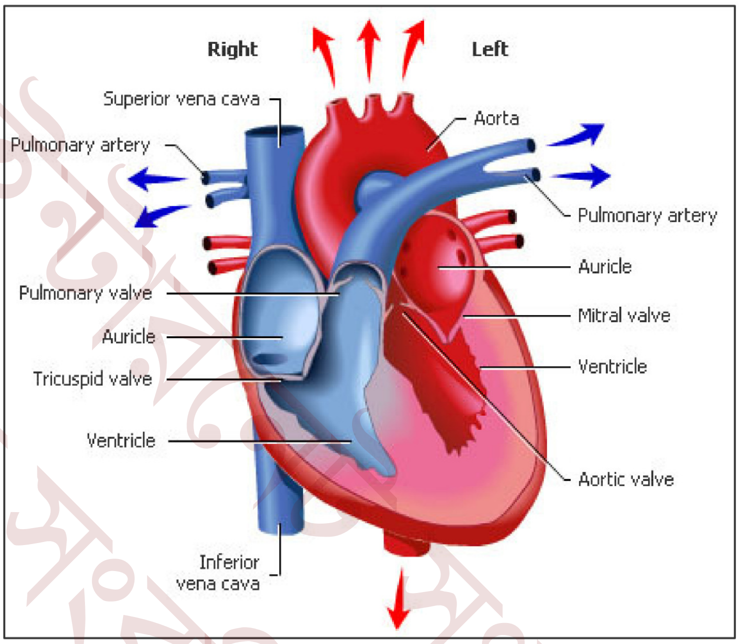
এই লেকচারে আমরা জীব-জন্তুর উপর আলোচনা করবো না। মানবদেহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনই উদ্দেশ্য। আমাদের দেহ নিয়ে গবেষণার নাম **'এ্যানাটমি'** [anatomy]। একে বংলায় অঙ্গব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা বলে। শিক্ষার্থীদের বলে রাখি, এ্যানাটমি বিরাট বিষয়। এটার উপরই দীর্ঘ ৬ বৎসর পর্যন্ত অধ্যয়ন শেষে ডাক্তার হতে হয়। সুতরাং এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মাত্র জ্ঞানদান ছাড়া আর বেশী কিছু সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানীরা মানব এ্যানাটমিকে মোট **১২টি** শাখায় বিভক্ত করেছেন। এগুলো হলোঃ **১.** সার্কুলেটরী [circulatory], ২. এনডোক্রিন [endocrine], ৩. ইউরিনারি [urinary], ৪. স্কেলেটেল [skeleton], ৫. নার্ভাস [nervous], ৬. সামন মাসকুলার [front muscular], ৭. পেছন মাসকুলার [back muscular], ৮. রেসপিরেটরি [respiratory], ৯. ডাইজেস্টিভ [digestive], **১০.** ইমিউন [immune], **১১.** পুরুষ রিপ্রোডাক্টিভ [male reproductive] এবং **১২.** মহিলা রিপ্রোডাক্টিভ [female reproductive]। আমরা আশা করছি এই **১২টি** সিস্টেমের উপর একে একে আলোচনা করার। তবে আজকের লেকচারে শুধুমাত্র প্রথমটির উপর আলোচনা হবে। বাকীগুলো নিয়ে পরবর্তী লেকচারসমূহে বর্ণনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

৩. ১. সার্কুলেটরী সিস্টেম [circulatory system]

আমাদের হৃদযন্ত্র বা হার্ট এই সিস্টেমের কেন্দ্র। মায়ের গর্ভে শিশুর আগমন ও জন্ম থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অনবরত হৃদযন্ত্র রক্ত পাম্প করে যায়। যে উপায়ে হার্ট রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পাদন করে তার নামই হলো সার্কুলেটরী সিস্টেম বা রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া।



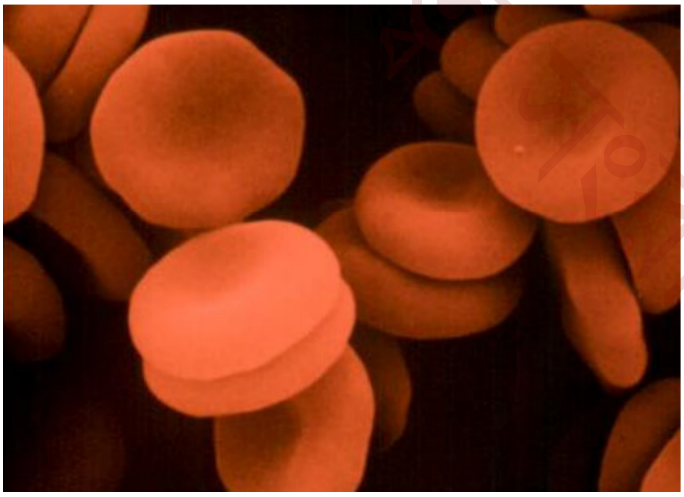


'র্কুলেটরী সিস্টেমের বিভিন্ন অংশ: তিনটি মৌলিক অংশ একত্রে কাজ করে যাচ্ছে রক্ত সঞ্চালন নিশ্চিত রাখতে। এগুলো হলো হার্ট [নেতা], রক্ত, শিরা-উপশিরা নেটওয়ার্ক। হার্ট একটি পেশী পাম্প। এটা পুরো সিস্টেমের ইঞ্জিন। এতে আছে চারটি আলাদা চেম্বার বা কক্ষ। এগুলো হলো: ১. **'রাইট এট্রিয়াম'** [right atrium], ২. **'রাইট ভেনট্রিকল'** [right ventricle], ৩. **'লেফ্ট এট্রিয়াম'** [left atrium] ও ৪. **'লেফ্ট ভেনট্রিকল'** [left ventricle]। **'মাইওকার্ডিয়াম'** [myocardium] নামক একজাতীয় বিশেষ পেশীর তৈরী এসব চেম্বারের দেওয়াল। রক্ত পাম্প করতে যেয়ে এ দেওয়ালগুলো ছন্দে ছন্দে সংকোচন হয়। দু'টি স্টেজে হার্টের পাম্প ক্রিয়া সংঘটিত হয়। উপরের চিত্রটি দেখুন।

ডাইয়াস্টলি: এই স্টেজে হার্টের পেশীগুলো স্বাভাবিক থাকে। এসময় আরটিওভেনট্রিকুলার ভাল্ব [artioventicular valve] খুলে যায়। শিরা থেকে রক্ত হার্টের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। আট্রিয়া হয়ে ভেনট্রিকলে রক্ত জমা হয়। রক্তে পরিপূর্ণ হলেই শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়।

সিস্টলি: এই পর্যায়ের শুরু হয় যখন ভেনট্রিকলে রক্ত পরিপূর্ণ হওয়ার ফলে আরটিয়া সংকোচন হয়। এরপরই ভেনট্রিকল সংকোচন হয়ে রক্তকে ভাল্বের মাধ্যমে পৌঁছে দেয় আরটারিতে। এভাবে ডাইয়াস্টলি পর্যায়ে রক্ত দেহ থেকে হার্টে পৌঁছে ও তা পাঠিয়ে দেয় ফুসফুসে অক্সিজেন সংগ্রহের জন্য। সিস্টলি পর্যায়ে হার্ট থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত চলে যায় শিরা-উপশিরা হয়ে দেহের সর্বত্র। মোটকথা, আমাদের হৃদযন্ত্রের কাজ হলো সমগ্র দেহব্যাপী রক্ত সঞ্চালন করা। এমনকি যখন ক্লান্তি হেতু দেহের মধ্যে অতিরিক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের মাত্রা বেড়ে যায়। এসময় আমরা ব্যায়াম বা অন্য কোন ফিজিকেল কাজের দরুন হয়রান হয়ে পড়ি। অতিরিক্ত অক্সিজেন ফুসফুসে আসার পর রক্তকোষ [হিমোগ্লোবিন] অক্সিজেন দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। এদিকে হার্টের স্পন্দন মাত্রা [হার্ট বিট রেট] বৃদ্ধি পায় একটু তাড়াহুড়ো করে দেহের সর্বত্র অক্সিজেন-পূর্ণ রক্তকোষ দ্রুত পৌঁছে দিতে। সুতরাং এখন আমরা বুঝলাম, অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে কেনো আমরা হয়রান হই- না হলে তো দেহের মধ্যে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অক্সিজেন সাপ্লাই নিশ্চিত হবে না। এছাড়া ব্যায়াম দ্বারা হয়রান হলে হার্টের বিট মাত্রা বাড়ার মধ্যে অনেক ফায়দা আছে। রক্ত দ্রুত শিরা-উপশিরায় চলাচল হলে দেহের উপকার হয়। শরীরের মেদ বা চর্বি কমে যায়। শিক্ষার্থীদের প্রতি উপদেশ, যেটুকু সম্ভব ব্যায়াম করবেন নিয়মিত। এতে হার্ট, দেহ ও স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

রক্ত: সার্কুলেটরী সিস্টেমের কেন্দ্রীয় যন্ত্রটি হলো হার্ট। আমরা ইতোমধ্যে এ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করেছি। হার্ট একটি পাম্প। সে কী পাম্প করবে? হ্যাঁ, সেটা হলো রক্ত। রক্ত এক জায়গায় স্থির থাকে না। পুরো দেহব্যাপী শিরা-উপশিরার একটি বিরাট নেটওয়ার্ক বা জাল আছে। রক্ত এসব শিরা-উপশিরার মাধ্যমে চলাচল করে। হৃদযন্ত্র জোর করে রক্ত চলাচল রাখে। এই রক্তে কী আছে?



রক্তকে **'জীবনের নদ'** [river of life] বলে। একজন পরিণত বয়স্ক মানুষের দেহে ৫ থেকে ৬ লিটার পরিমাণ রক্ত থাকে। এটা দেহের মোট ওজনের ৭ থেকে ৮ শতাংশ। রক্তের মূল কাজ হলো দেহের সর্বত্র অক্সিজেন নিয়ে যাওয়া। এরপর ফিরে আসার সময় কোষের বর্জ্য বহন করা। এই বর্জ্যের অধিকাংশ হলো কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস। বর্জ্য রক্তের মাধ্যমে চলে আসে আমাদের ফুসফুসে। নিঃশ্বাসের মাধ্যমে এসব বর্জ্য বের করে ফেলা হয় বায়ুমণ্ডলে। দেহের মধ্যে অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট বেঁচে থাকার জন্য জরুরী। মাত্র কয়েক মিনিট এই অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম অকেজো হয়ে পড়লে মৃত্যু এসে যাবে। রক্ত শুধুমাত্র অক্সিজেন বহন করে না। খাদ্যে যেসব উপকারী বস্তু যেমন মেদ, প্রোটিন এবং কার্বহাইড্রেট রক্তের মাধ্যমেই দেহ-টিস্যুতে চলে যায়। দেহের জন্য এসব গুরুত্বপূর্ণ বস্তু অবশ্য ডাইজেস্টিভ সিস্টেম দ্বারা প্রসেস হয়ে থাকে।

আরো দু'টি বর্জ্য ইউরিয়া ও ইউরিক এসিড দেহ থেকে বের করতে হবে। রক্ত এগুলো নিয়ে যায় আমাদের কিডনিতে। সেখানে রক্ত থেকে আলাদা হওয়ার পর মূত্র হিসাবে বেরিয়ে আসে দেহ থেকে। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু রক্ত বহন করে। একে বলে **'হরমোন'** [hormone]। এগুলো মূলত কেমিকেল বস্তু। দেহের কিছু বিশেষ ফাংশন

এসব হরমোন দ্বারা সংঘটিত হয়। হরমোনের মাধ্যমে এক দেহযন্ত্র দূরে থেকেও অপর দেহযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সুতরাং রক্ত শুধুমাত্র ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম নয়, কমিউনিকেশন সিস্টেমও পরিচালনা করে।

মানবদেহে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রক্তের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মানবদেহের তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড [৯৮.৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট] অথবা এর অতি কাছাকাছি। দেহের বিভিন্ন অংশে তাপমাত্রার তারতম্য রক্ত চলাচল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। চামড়ার শিরা-উপশিরার ব্যাস প্রয়োজনে কমে ও বাড়ে। আমরা যখন অতিরিক্ত গরম হয়ে যাই, শিরা-উপশিরার ব্যাস বৃদ্ধি হয়। ফলে অতিরিক্ত রক্ত চলাচল করে চামড়ার মধ্যে। চামড়া ঘর্মাক্ত হয়ে পড়ে এবং দেহের তাপ বেরিয়ে যায়। চামড়ায় অতিরিক্ত রক্ত থাকায় এর রং বদলে যায়। লালচে বা গোলাপী হয়ে ওঠে। অপরদিকে কারো দেহ বেশী ঠাণ্ডা হয়ে গেলে চামড়ায় রক্তের মাত্রা কমে যায়- এর রং অনেকটা বাদামী ও মরা-মরা লাগে।

আমরা এই অংশ শুরু করেছিলাম, **'কি আছে রক্তের মধ্যে'** এ প্রশ্ন করে। এখন জবাব দেবো। প্রথমত রক্তের মধ্যে একটি তরল পদার্থ আছে যার নাম **'প্লাজমা'** [plasma]। এর মাত্রা প্রায় ৫৫ শতাংশ। বাকী রক্ত তিনটি বিশেষ কোষের তৈরী। এগুলো হলো: ১. লাল রক্তকোষ [erythrocyte], সাদা রক্তকোষ [leukocyte] এবং প্লেটলেট [thrombocyte]।

প্লাজমা: হলদে রঙের প্লাজমা মূলত পানি এবং লবণের তৈরী। পানির পরিমাণ প্রায় ৯৫%। এতে আরো আছে গ্লুকোজ, মেদ, প্রোটিন, আমিনো এসিড, ভিটামিন এবং মিনারেল ইত্যাদি। সাগরজলের সমপরিমাণ লবণ আছে প্লাজমায়। বর্ণিত প্রতিটি বস্তুর পরিমাণ সতর্কতাসহ নিয়ন্ত্রণ রাখা জরুরী। আমাদের কিডনি ও লিভার এ কাজে নিয়োজিত আছে।

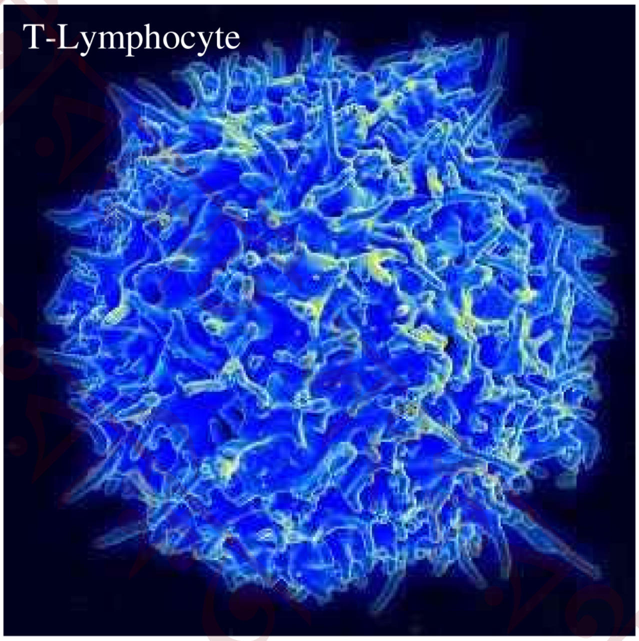
লাল রক্তকোষ [erythrocyte]: রক্তে এদের মাত্রা প্রায় ৪৫%। আগেই বলেছি লাল রক্তকোষের মূল কাজ হলো ফুসফুস থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে দেহের সকল টিস্যুতে নিয়ে যাওয়া। মোটকথা দেহের প্রতিটি কোষে [যার দ্বারা সবকিছু সৃষ্ট] অক্সিজেন সাপ্লাই নিশ্চিত করতে প্রতি মুহূর্তে কাজ করে যাচ্ছে লাল রক্তকোষ। লাল রক্ত কোষের মূল উপাদান হলো প্রোটিন ও লৌহের তৈরী বস্তু যার নাম **'হিমোগ্লোবিন'** [hemoglobin]। এ বস্তুটিই ফুসফুসের মধ্যে চলন্ত অবস্থায় অক্সিজেন মলিকিউল **'গ্রেফতার'** করে। রক্তের লাল রঙের কারণও এই হিমোগ্লোবিন। যখন রক্ত দেহের টিস্যু দিয়ে চলন্ত থাকে তখন হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন প্রতিটি কোষে ছেড়ে দেয়। লাল রক্তকোষে হিমোগ্লোবিন এতো বেশী যে, অন্যান্য কোষের তুলনায় এগুলোতে কিছু বস্তু অনুপস্থিত- যেমন নিউক্লিয়াস [কেন্দ্র]। হিমোগ্লোবিন নাইট্রিক এসিডও ক্যারী করে। এই বস্তুটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগে।

হিমোগ্লোবিনের অপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো দেহকোষের বর্জ্য কার্বন ডাইওক্সাইড ফুসফুসে নিয়ে আসা। এরপর আমরা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে এই গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দিই। হিমোগ্লোবিনে অক্সিজেন থাকলে একে বলে **'অক্সিহিমোগ্লোবিন'** [oxyhemoglobin]। এতে যখন কার্বন ডাইওক্সাইড থাকে তখন একে বলে **'কার্বোক্সিহিমোগ্লোবিন'** [carboxyhemoglobin]।

লাল রক্তকোষের হায়াত বেশীদিন নয়: মাত্র ১২০ দিন পরে এগুলো সার্কুলেশন অবস্থায় কিংবা প্লীহা নামক দেহযন্ত্রে ধ্বংস হয়ে যায়। এদিকে হাড্ডির মজ্জায় সৃষ্টি হয় নতুন রক্তকোষ।

রক্তের ধরন [Blood Type]: বেশ কয়েক জাতের রক্তকোষ আছে। তবে যে কোন ব্যক্তির রক্তকোষ মাত্র এক ধরনের। কোষের বাইরে কোন্ প্রকারের বস্তু আছে তা-ই নির্ধারণ করে এর ধরন। দেহে কৃত্রিম উপায়ে সাপ্লাই দিতে হলে একই ধরনের রক্ত হতে হবে। রক্ত মোট চার ধরনের: A, B, AB এবং O। অপর যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তাহলো Rh ফেক্টর। এর দ্বারা রক্তের ধরন নেগিটিভ না পজিটিভ তা নির্ধারিত হয়। অধিকাংশ মানুষের রক্তের ধরন হলো A+ [এ-পজিটিভ]।

সাদা রক্তকোষ [lymphocyte]: রক্তের মধ্যে মাত্র ১ শতাংশ কোষ হলো সাদা রক্তকোষ। সংখ্যায় ছোট্ট হলেও তাদের ফাংশন বা গুরুত্ব বিশাল। কারণ দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতায় [immune system] এগুলো কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালন করে। আমাদের দেহের ইমিউন সিস্টেম রোগ-প্রতিরোধে প্রাথমিক ডিফেন্স হিসাবে সক্রিয় আছে। এই সিস্টেমে কমতি থাকলে বিরাট সমস্যা হবে। ঔষধ-পত্র তো **'এইড'** [Aid] বা সাহায্য ছাড়া কিছু নয়। দেহের ইমিউন সিস্টেমকে কার্যকর ও শক্তিশালী করার কাজে ঔষধ সাহায্য করে মাত্র। ইমিউন সিস্টেম নষ্ট হয়ে গেলে ঔষধে কাজ হবে না। ইমিউন সিস্টেম নষ্ট হওয়া রোগের নামই হলো এইডস্ [Acquired Immune Deficiency Syndrome]। যাক, সাদা রক্তকোষের পরিচিতি ও কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা দরকার।

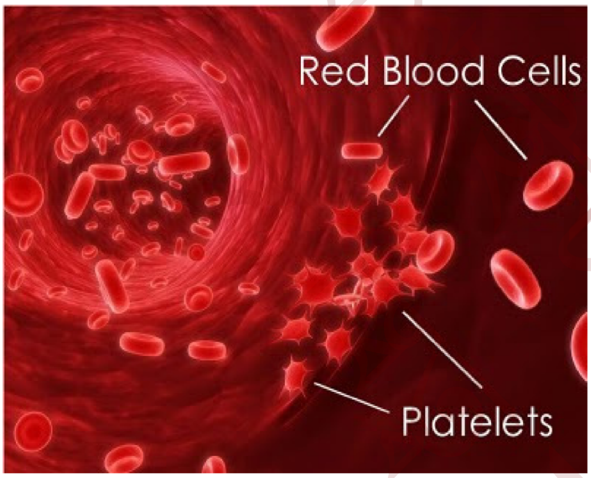


দেহের মধ্যে **'ফরেন এজেন্ট'** [foreign agent] প্রবেশ বা আত্মপ্রকাশ করলেই এই রক্তকোষ একে সরাসরি আক্রমণ করে। এখানে ফরেন এজেন্ট বলতে দেহের জন্য ক্ষতিকর বস্তু: যেমন জীবাণু, ভাইরাস, ছত্রাক এবং পরজীবী। ফরেন এজেন্ট হিসাবে নিশ্চিত হলেই রক্তের মাধ্যমে সাদা রক্তকোষ সেথায় যেয়ে এজেন্টকে জড়িয়ে ধরে। এই আক্রমণ হলো **'সুইসাইড হামলা'**। কারণ এজেন্টকে ধ্বংস করতে যেয়ে সাদা রক্তকোষ নিজেই ধ্বংস হয়ে যায়। সেকেন্ডারী হামলার জন্য সাদা রক্তকোষ কিছু বস্তু তৈরী করে যার নাম **'এ্যন্টিবডি'** [antibody]। সার্কুলেটরী সিস্টেমে এগুলো ছেড়ে দেওয়ার পর এজেন্টের উপর যেয়ে হামলা চালায়। এ্যন্টিবডিও ফরেন বস্তুকে জড়িয়ে ধরে। ফলে হয় হামলাকারী বস্তু অকেজো হবে না হয় এ্যন্টিবডি অন্য রোগ-প্রতিরোধ কোষের সাহায্য নেবে। এভাবে সে ক্ষতিকর কোষকে ধ্বংস করে ছাড়বে। তবে সাহায্য যদি দেহ থেকে না মিলে তখনই রক্তে বাইর থেকে ঔষধ হিসাবে সাহায্য দেওয়া যেতে পারে। ডাক্তারী বিজ্ঞানের কাজই এটা- রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাকে কার্যকর কিংবা দ্রুততর করা। লিমফোসাইট ছাড়াও **'নিউট্রোফিল'** [neutrophil]. **'মনোসাইট'** [monocyte] এবং অন্যান্য সাদা রক্তকোষ আছে। তারা সবে মিলে আমাদের রোগ-প্রতিরোধ সিস্টেমকে সক্রিয় রেখেছে। সুতরাং আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে এসব কোষ যে কী পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে তা সহজেই অনুমেয়।

প্লেটলেট [platelet]: আপনার শরীরের কোনো অঙ্গ [আল্লাহ না করুন] দুর্ঘটনাবশতঃ কেটে গেলো। রক্ত ঝরছে। দেহের মধ্যে যে পরিমাণ রক্ত আছে তার অধিকাংশ বের হয়ে গেলে বিরাট সমস্যা দাঁড়াবে। এটা বন্ধ করার

উপায় হলো বেন্ডেজ বাঁধা। কিন্তু এরপরও দেহের একটি কাজ আছে যার উপর নির্ভর করে রক্ত বন্ধ হওয়া। রক্তের মধ্যেই একটি কোষ আছে যার কাজ হলো রক্তের মধ্যে জমাট বাঁধানো। রক্তঝরা বন্ধ করা। এই কোষটির নামই প্লেটলেট [platelet]। নীচের পরের পৃষ্ঠার চিত্রটি দেখুন।

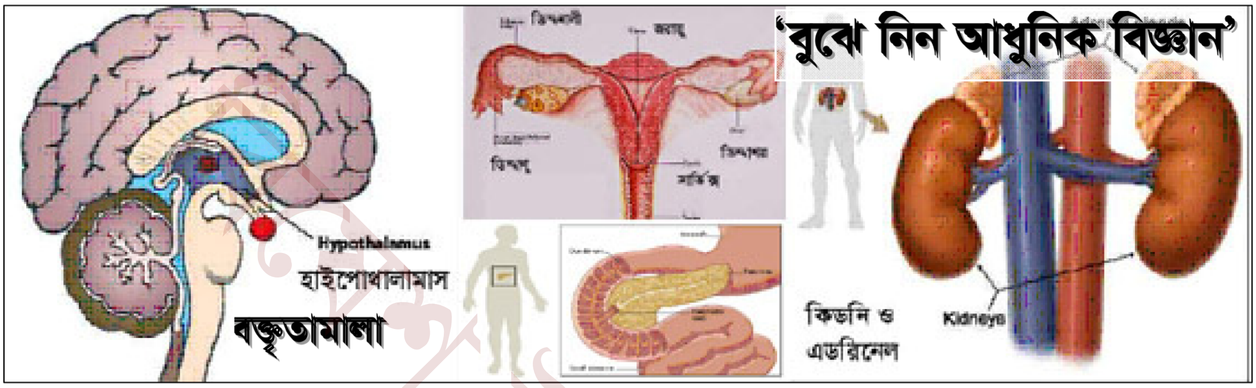
রক্তের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র কোষ হলো প্লেটলেট। কোনো রক্ত-শিরা ছিড়ে বা কেটে গেলে এসব কোষ এসে সেখানে **'ক্লট'** [জমাট] বাঁধে। কেটে যাওয়ার পরই রক্তে চলন্ত আশপাশের সকল প্লেটলেট এসে ক্ষতস্থানে জমাট বাঁধা শুরু করে। এলাকার প্লেটলেট সংখ্যা কাজের জন্য যথেষ্ট না হলে এটা **'মেসেঞ্জার'** [বার্তাবাহক] প্রেরণ করে দেহের অন্যান্য অংশে আরো প্লেটলেট ক্ষতস্থানে প্রেরণের জন্য। সুতরাং ক্ষতস্থান জোড়া লাগার ক্ষেত্রে প্লেটলেটের অবদান একান্ত জরুরী। রক্তে প্লেটলেট যথেষ্ট না থাকলে উপায় নেই।

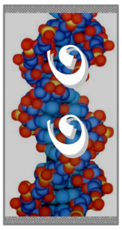


প্লেটলেট কোষের অপর নাম **'থ্রম্বোসাইট'** [thrombocyte]। প্রতি কিউবিক মিলিমিটার পরিমাণ রক্তে ২ লক্ষ ৫০ হাজার পর্যন্ত প্লেটলেট কোষ থাকে। এটা রক্তের সঙ্গে পুরো দেহব্যাপী নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ঘুরতে আছে। রক্ত বহনকারী রগ-শিরা-উপশিরায় কোথাও কোনো ধরনের ক্ষত দেখা দিলেই তারা এ্যাকশনে যায়। অবশ্য সময় সময় 'ভুল' হয়ে থাকে। বেদরকারী রক্ত জমাট হওয়া থেকে ক্ষতির সম্মুখীনও হতে হয় সময় সময়।

প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! আজকের লেকচারের এক্ষুণি সমাপ্তি ঘটবে। আগামী লেকচারে আমার এনডোক্রিন [endocrine] সিস্টেমের উপর আলোচনার আশারাখি। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঙ. জীববিদ্যা: পরিচিতি ও কার্যকারিতা

বক্তৃতা ৩৩ : প্রাণীজগৎ

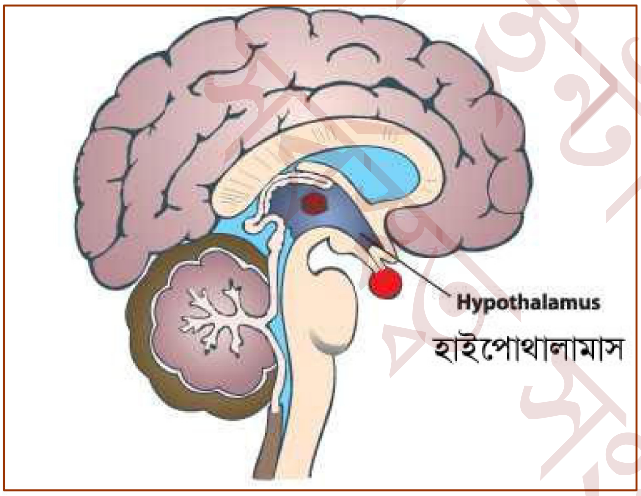
৩. ২. এনডোক্রিন সিস্টেম [Endocrine System]

এই সিস্টেমের কাজ হলো দেহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু **'সংবাদবাহক'** [messenger] কেমিকেল তৈরী করা। এসব কেমিকেল বস্তুকে বলে **'হরমোন'** [hormone]। সংবাদবাহক হিসাবে হরমোন একদল কোষের তথ্য ও নির্দেশনা অপরদল কোষে পৌঁছে দেয়। হেদের কার্যকারিতা সঠিক থাকতে এই ক্রিয়াটি জরুরী। কিছু বিশেষ দেহযন্ত্র আছে যাদের কাজ হলো এসব হরমোন তৈরী করা। হরমোন নিয়ন্ত্রণ করে বেড়েওঠা, টিস্যুর কার্যকারিতা, গর্ভকালীন বিভিন্ন কাজ নিশ্চিত রাখা, রক্তের মধ্যে সঠিক পরিমাণ চিনি, গ্লুকোজ ইত্যাদি সঠিক মাত্রায় রাখা। তাছাড়া মেটাবলিজম বা বিপাকতন্ত্র নিয়ন্ত্রণেও হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে ক'টি মৌলিক গ্রন্থি বা **'গ্ল্যান্ড'** [gland] দ্বারা এনডোক্রিন সিস্টেম গঠিত সেগুলো হলো: ১. হাইপোথালামাস [hypothalamus], ২. পিটুইটারি [pituitary], ৩. থাইরোইড [thyroid], ৪. প্যারাথাইরোইড [parathyroid], ৫. এড্রিনেল [adrenal], ৬. পিনিয়েল বডি [pineal body], ৭. ওভারি [ovary], ৮. প্যানক্রিস [pancreas] এবং ৯. টেস্টিজ [testis]। মেডিকেল বিজ্ঞানীরা বলেন, দেহের নন-এনডোক্রিন যন্ত্রাদি যেমন মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, কিডনি, লিভার,

থাইমাস, চামড়া এবং প্লাসেন্টা ইত্যাদিও প্রয়োজনে হরমোন তৈরী করতে পারে। আমরা এ লেকচারে উপরোক্ত ৯টি যন্ত্রের উপর আরো কিছু আলোচনার আশা রাখি।

১. হাইপোথালামাস [hypothalamus]

আমাদের ব্রেনের একটি ছোট্ট অংশ এটি। দেহের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে হাইপোথালামাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ব্রেনের এ অংশ মাত্র ১% জায়গা দখল করে রেখেছে। এর ওজন ৪ গ্রাম মাত্র। ছোট্ট হলেও তার কার্যকারিতা ব্যাপক। এটাই নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের যৌনসংক্রান্ত কার্যাদি, আবেগ, হরমোন সৃষ্টি এবং নার্ভাস সিস্টেমের দু'টি মূল শাখার একটি **'অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম'** [autonomic nervous system] নিয়ন্ত্রণেও তার ভূমিকা আছে। নীচের চিত্রে আমাদের মগজে হাইপোথালামাসের অবস্থায় দেখানো হয়েছে।



কার্যকারিতাঃ আগেই বলেছি হাইপোথালামাসের অনেক ফাংশন আছে। অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমের প্রতিক্রিয়া **'আক্রমণ'** কিংবা **'পলায়ন'**, **'ভয়'** অথবা **'চাঞ্চল্যতা'** ইত্যাদি সিগনাল প্রথমে হাইপোথালামাসে পৌঁছে। এখান থেকেই নির্দেশনা আসে হৃদযন্ত্রের কম্পন ও শ্বাস বৃদ্ধি এবং চোখের প্রশস্ততা ও অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চালন। এসব ক্রিয়া থেকেই বুঝা যায় আমাদের মানসিক অবস্থা। হাইপোথালামাস রক্তে কি পরিমাণ গ্লুকোজ ও পানি আছে তার হিসাব রাখে। এগুলোর তারতম্যই নির্ধারণ করে আমরা ক্ষুদার্ত এবং পিপাসিত কি না। এই গ্ল্যান্ড আমাদের নিদ্রা এবং যৌনক্রিয়াও নিয়ন্ত্রণ করে। দেহের **'থার্মোস্টেট'** তথা তাপনিয়ন্ত্রক হিসাবেও এর ফাংশন কম না। কারণ **'বডি টেম্পারেচার'** [body temperature] নিয়ন্ত্রণে না থাকলে বিরাট সমস্যা হবে। রক্ত-শিরায় এটাই সৃষ্টি করে কম্পন, সংকোচন ও প্রসারণ। ফলে আমরা প্রয়োজন বোধ করি ঠাণ্ডা হেতু কাপড় পরার, আর গরমের সময় ফেন ছাড়ার কিংবা রৌদ্র থেকে গাছের ছায়ায় আশ্রয়ের।

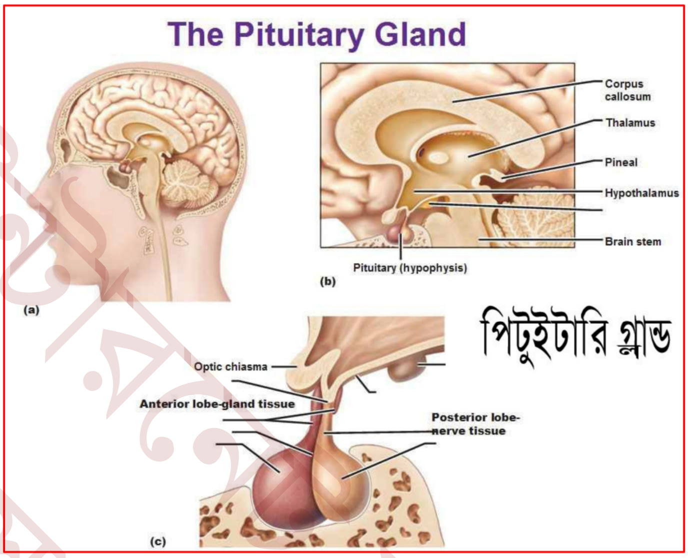
এনডোক্রিন সিস্টেমের সদস্য হিসাবে হাইপোথালামাস ব্রেনে স্থাপিত নিকটস্থ অপর গ্ল্যান্ড **'পিটুইটারি গ্ল্যান্ড'** [pituitary gland] দ্বারা নির্মিত হরমোন নিয়ন্ত্রণ করে। এসব হরমোনের দু'টি হলো **'অক্সিটোসিন'** [oxytocin] ও **'ভেইজোপ্রেসিন'** [vasopressin]। প্রথমটি শিশু জন্মের সময় মায়ের সর্ভাশয় সংকোচনসহ জন্মকালীন প্রসেস নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এছাড়া মায়ের বুকের দুগ্ধ তৈরীতেও অক্সিটোসিন হরমোন সক্রিয় থাকে। শিশুদের ক্রন্দন শ্রবণ থেকেও অক্সিটোক্সিন তৈরী হতে পারে। হরমোন ভাসোপ্রেসিন আমাদের কিডনিতে সক্রিয় থাকে। শরীরের পানির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে কিডনিকে এটা সাহায্য করে। রক্তে পানির মাত্রা বেড়ে গেলে হাইপোথালামাস অতিরিক্ত ভাসোপ্রেসিন তৈরীর নির্দেশ দেয় আর পানির মাত্রা কমে গেলে ভাসোপ্রেসিনের মাত্রাও কমানোর অর্ডার করে।

হাইপোথালামাসের একটি অংশ আছে যার কাজ হলো আমাদের দৈনন্দিন **'সার্কেডিয়ান রিদ্‌ম'** [circadian rhythm] নিয়ন্ত্রণ করা। দৈনিক ২৪ ঘণ্টার এই নিয়মতান্ত্রিকতা রক্তের মধ্যে হরমোনের মাত্রা থেকে সৃষ্টি হয়।

সাধারণত আলো ও আঁধার থেকে এই ক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। আমাদের নিদ্রা, ক্ষুদা ইত্যাদি সময়মতো অনুভবের কারণই হলো সার্কেডিয়ান রিদ্‌ম।

২. পিটুইটারি [pituitary]

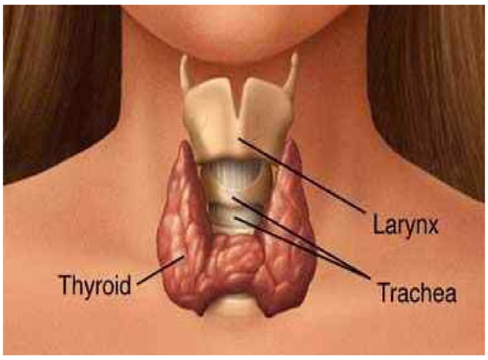
একে পুরো এনডোক্রিন সিস্টেমের মাস্টার গ্রন্থি বলা যায়। এখানে তৈরী হয় বিভিন্ন ধরনের হরমোন। দেহের অপর প্রায় সবগুলো এনডোক্রিন গ্রন্থি এসব হরমোনের সাহায্যে সক্রিয় ও কার্যকর থাকে। ইতোমধ্যে বলেছি, এই গ্লান্ডে তৈরী ভাসোপ্রেসিন হরমোন সমগ্র দেহের পানি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আমাদের ব্রেনের হাইপোথালামাসের নিকটেই **'শীম বিচিসদৃশ'** এই গ্লান্ডের অবস্থান। নীচের চিত্রটি দেখুন।



পিটুইটারি গ্লান্ড যেসব হরমোন তৈরী করে তার মধ্যে দেহবৃদ্ধি [যার কারণে হাড্ডি, উপাস্থি [cartilage] এবং অন্যান্য টিস্যুর মধ্যে কোষ-সংক্রান্ত ক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে], থাইরোইড উদ্বুদ্ধকরণ হরমোন [এর কারণে থাইরোড মেটাবলিজম নিয়ন্ত্রক হরমোন রক্তে ছেড়ে দেয়], এ্যন্টি-ডাইরোটিক [এই হরমোনের কাজ হলো কিনডি থেকে প্রস্রাবের মধ্যে পানির মাত্রা কমানো] এবং প্রোলাক্টিন [নারীদের স্তন ও এর মধ্যে দুগ্ধ তৈরীতে এই হরমোন বিশেষ কার্যকরী] এখানে উল্লেখযোগ্য। পিটুইটারি গ্রন্থিকে হাইপোথালামাস সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. থাইরোইড [thyroid]

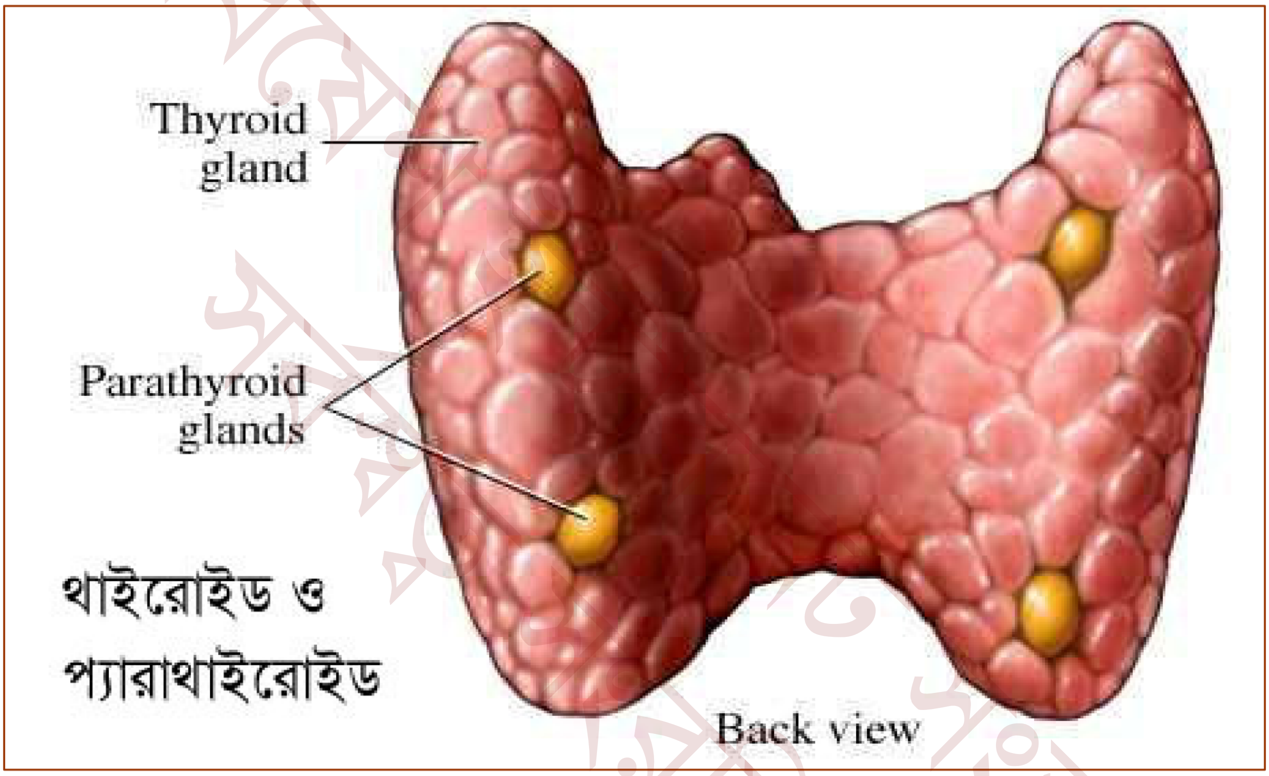
বাংলায় একে গলগ্রন্থি বলে। নীচের চিত্রটি দেখুন। বেড়েওঠা ও বিপাকতন্ত্রের জন্য জরুরী একটি হরমোন থাইরোইড গ্রন্থি থেকে উৎপাদন হয়। এই গ্রন্থির দু'টি অংশ আছে। উভয় অংশ একত্রে কাজ করে। মোট ওজন ২৮ গ্রাম।

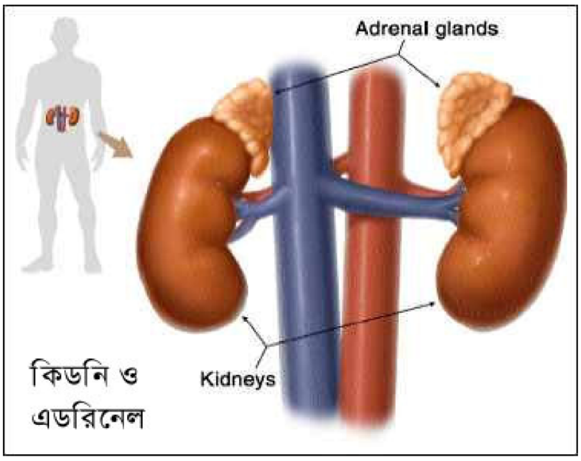


যে হরমোন এটি তৈরী করে তার নাম **'থাইরোক্সিন'** [thyroxin]। কি পরিমাণ হরমোন এই গ্লান্ড বানাবে তার নির্দেশনা আছে মগজে স্থাপিত পিটুইটারি গ্লান্ড থেকে। টিএসএইচ [TSH - Thyroid Stimulating Hormone] নামক একটি হরমোন এই থাইরোইডে এসে উক্ত নির্দেশনা দেয়। আর টিএসএইচ পিটুইটারি তৈরী করবে কি না তা-ও নির্দেশিত হয় আরেক হরমোন থেকে যা তৈরী হয় হাইপোথালামাস গ্রন্থিতে। যে হরমোন থাইরোইড তৈরী করে তা একটি প্রোটিন, যার নাম **'থাইরোগ্লোবুলিন'** [thyroglobulin]।

৪. প্যারাথাইরোইড [parathyroid]

থাইরোইড গ্রন্থির নীচে প্রায় ৪টি ছোট্ট [যাদের মোট ওজন ৫৬০ মিলিগ্রামের চেয়েও কম] হেদাংশ মিলে এই গ্রন্থিটি তৈরী হয়েছে। আমাদের রক্তের মধ্যে কি পরিমাণ কেলসিয়াম [কেলসিয়াম আয়োন] ও ফসফোরাস [ফসফেইট] আছে তা নিয়ন্ত্রণ করে এই গ্রন্থিগুলো মিলে। এগুলো **‘প্যারাথোরমন’** [rarathormone] নামক একটি হরমোন তৈরী করে। এই হরমোনই উক্ত দু’টি বস্তুর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের কাজটি সারে। নীচের চিত্রে প্যারাথাইরোইড গ্রন্থির অবস্থান দেখানো হয়েছে।





৫. এড্রিনেল [adrinal]

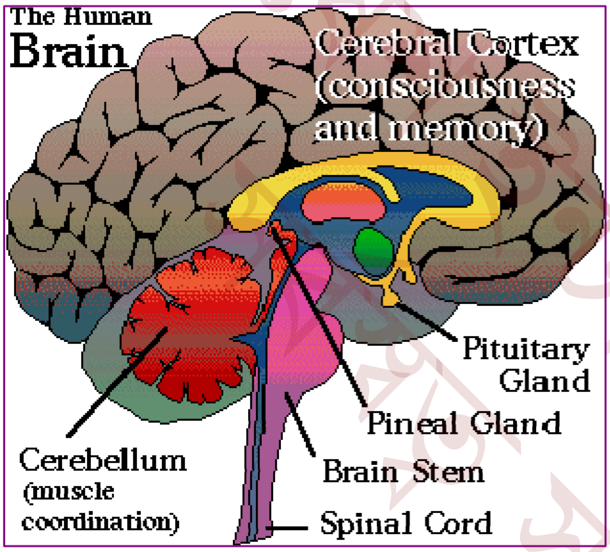
আমাদের উভয় কিডনির উপরে এই গ্রন্থিটির অবস্থান। এনডোক্রিন সিস্টেমে এই গ্রন্থির কার্যকারিতা গুরুত্ববহ। নীচের চিত্রে গ্রন্থির অবস্থান দেখানো হয়েছে।

এই গ্রন্থি থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ হরমোন রক্তে সংযুক্ত হয়। গ্রন্থির দু’টি আলাদা অংশ আছে। অভ্যন্তরীণ অংশের নাম **‘মেডুলা’** [medulla]। বাইরের অংশের নাম **‘করটেক্স’** [cortex]। প্রথমটি **‘এপিনেফ্রিন’** [epinephrine] নামক হরমোন তৈরী করে। কঠিন, চাপপূর্ণ অবস্থার সময় এই হরমোন সক্রিয় থাকে। এই অংশ **‘নরেপাইনফ্রাইন’** [norepinephrine] নামক আরেকটি হরমোন তৈরী করে। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখতে এটি সহায়তা করে।

বাইরের করটেক্স অংশ ৩০ ধরনের স্টেরোইড জাতীয় [ভিটামিনযুক্ত] হরমোন নিঃসরণ করে। কিন্তু বড় মাত্রায় অতি অল্পই তৈরী হয়। দেহে লবণ ও পানির সামঞ্জস্যতা রক্ষার্থে **'আলডোস্টেরোন'** [aldosterone] নামক একটি হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এড্রিনেল গ্রন্থি এটি নিঃসরণ করে।

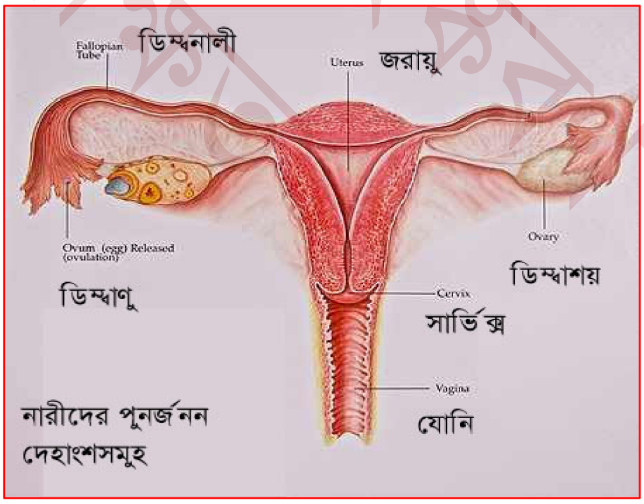
৬. পিনিয়েল বডি [pineal body]

আমাদের রক্তে **'মেলাটোনিন'** [melatonin] নামক হরমোন এই গ্রন্থি থেকেই আসে। এটি মস্তিষ্কের মধ্যে স্থাপিত। নীচের চিত্রটি দেখুন। এ গ্রন্থির অপর নাম **পিনিয়েল গ্লান্ড**। এই গ্রন্থির পূর্ণাঙ্গ কার্যকারিতা এখনো সম্পর্ণরূপে জানা যায় নি। তবে মেলাটোনিন হরমোনটির কাজ হলো চামড়ার রঙ রদবদল করা। বায়োরিদম [biorhythm] বা স্বাভাবিক মনস্তাত্তিক পরিবর্তন ঘটায় এই হরমোন। সুতরাং ঘুমানো, হাটা কিংবা পুনর্জনন ক্রিয়া ইত্যাদি এই হরমোন নিয়ন্ত্রণ করে।



৭. ওভারি [ovary]

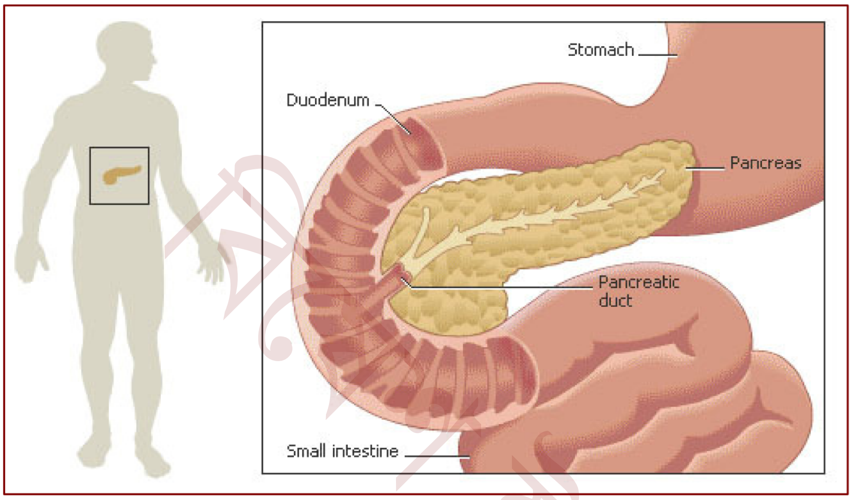
এই গ্রন্থিটি মহিলাদের দেহে বিদ্যমান। এটিই তৈরী করে পুনর্জনন **'ডিম্বকোষ'**। এগুলো দেখতে লম্বাটে, ৩.৮ সেন্টিমিটার দীর্ঘ। নারীদের জরায়ুর উভয়দিকে এদের অবস্থান। নীচের চিত্রটি দেখুন। তারা ফেলোপিয়ান টিউবের মাধ্যমে এতে সংযুক্ত থাকে। ওভারির একাংশে থাকে অসংখ্য বিভিন্ন আয়তনের থলে- যাদের প্রতিটির ভেতর রক্ষিত আছে ডিম্বকোষ। এসবই হলো নারীদের পুনর্জনন কোষ। যৌবনের শুরু থেকে পিরিওড বন্ধের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক মাসে ওভারি ডিম্বকোষ ছেড়ে দেয় পুরুষের শুক্রকোষ দ্বারা ফলনশীল হওয়ার জন্য। যদি না হয়, তাহলে জমাট বাধা রক্ত বেরিয়ে আসতে হবে দেহ থেকে। আর এটাই হলো নারীদের মাসিক পিরিওড।



ওভারি এনডোক্রিন সিস্টেমের একটি গ্রন্থিও বটে। অর্থাৎ সে-ও কিছু হরমোন তৈরী করে রক্তের মধ্যে যোগান দেয়। মাসিক পিরিওডকে নিয়মিত রাখতে এবং নারীদের যৌন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে এসব হরমোন বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

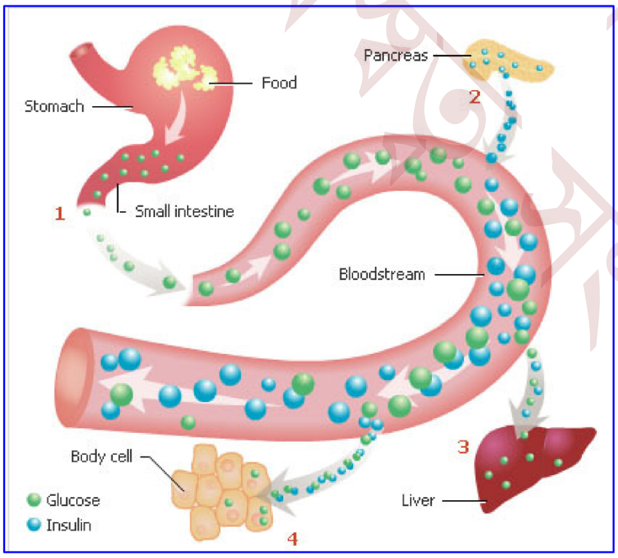
৮. প্যানক্রিস [pancreas]

এই গ্রন্থিটি সম্পর্কে জানা এখন সবার জন্যই জরুরী হয়ে ওঠেছে। আজকের যুগে ডায়াবেটিস নামক রোগটি মারাত্মকভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। গোটা পৃথিবীব্যাপী অসংখ্য মানুষ এ রোগে ভুগছেন। এ রোগটির মূল কারণ কিন্তু প্যানক্রিস নামক এই গ্রন্থিটি।



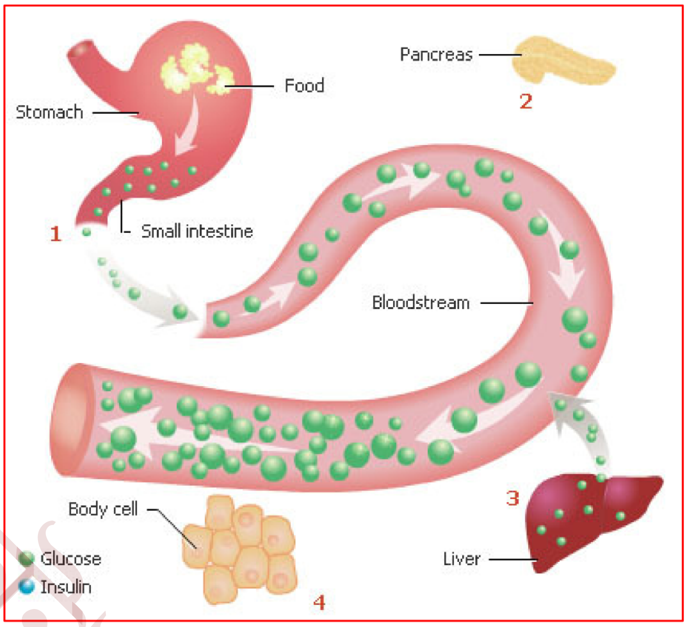
পাশের চিত্রে মানবদেহে প্যানক্রিসের অবস্থান ও তার আকার-নমুনা দেখানো হলো।

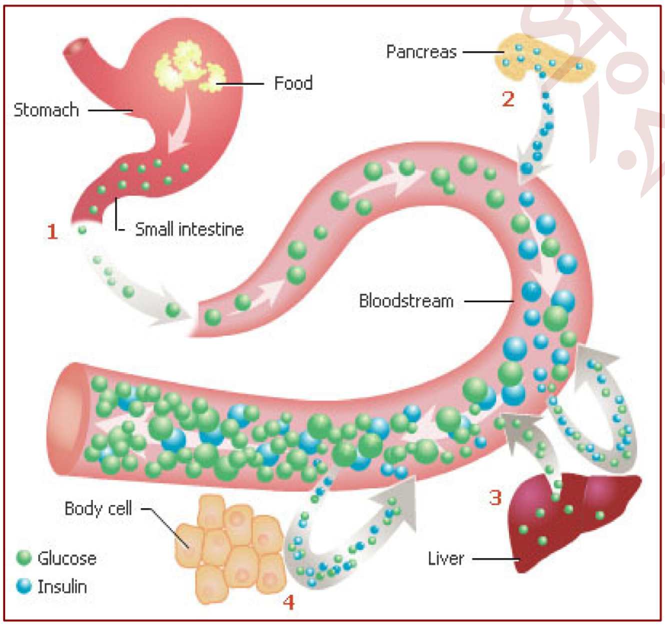
প্যানক্রিস ১৫ থেকে ২০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ। আর তার প্রস্থ ৩.৮ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এটা ১.৩ থেকে ২.৫ সেন্টিমিটার ঘন। ওজনে প্রায় ৮৫ গ্রাম। এক্সোক্রিন ও এনডোক্রিন সিস্টেমের একটি গ্রন্থি হলো এই প্যানক্রিস। খাদ্য হজমের জন্য জরুরী কিছু **এনজাইম** [enzyme] এটা আঁতের মধ্যে নিঃসরণ করে। এনডোক্রিস নিঃসরণ **'ইনসুলিন'** [insulin] হলো দেহের চিনি নিয়ন্ত্রণের জন্য একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্যানক্রিসে এই ইনসুলিন তৈরী হয়। সঠিক পরিমাণ ইনসুলিন তৈরীতে প্যানক্রিস ব্যর্থ হলেই ডায়াবিটিস রোগের সূত্রপাত ঘটে।



ডায়াবিটিস মেলাইটাস [diabetes mellitus]: এ রোগটির স্বরূপ আরো কিছু জানা আমাদের জন্য জরুরী মনে করে কিছু অতিরিক্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করছি। বায়ের চিত্রে একজন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইনসুলিনের সফল কার্যকারিতা দেখানো হয়েছে। চারটি বিষয় জেনে নেওয়া জরুরী। এগুলো ১, ২, ৩ ও ৪ সংখ্যা দ্বারা চিত্রে দেখানো হয়েছে। এগুলোর ব্যাখ্যা হলো: **১. গ্লুকোজ রক্তের মধ্যে প্রবেশ করা:** আপনি যে খাবার খাবেন তাতে আছে গ্লুকোজ [বা চিনি]। এই চিনির প্রয়োজন আছে দেহের জন্য। হজম হওয়ার সময় খাদ্যের চিনি পাকস্থলী আলাদা করে পাঠিয়ে দেয় ছোট্ট ইনটেস্টিন বা আঁতে। ছোট্ট আঁত থেকে গ্লুকোজ বেরিয়ে এসে রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে। **২. প্যানক্রিস ইনসুলিন তৈরী করে:** আমাদের প্যানক্রিস ইনসুলিন তৈরীর কারখানা। এটা একটি হরমোন যার কাজ চিনি নিয়ন্ত্রণ। দেহ যাতে সহজে গ্লুকোজ গ্রহণ করে নেয় সেটা নিশ্চিত করে ইনসুলিন। রক্তের মধ্যে ইনসুলিন যুক্ত হয় প্যানক্রিস থেকে। **৩. গ্লুকোজ লিভারে প্রবেশ করে:** লিভারের কোষে গ্লুকোজ প্রবেশ নিশ্চিত করতে ইনসুলিন সাহায্য করে। লিভার নিজের মধ্যে গ্লুকোজ গোদামজাত করে রাখে যাতে পরবর্তীতে অন্যান্য দেহকোষ এটা কাজে লাগাতে পারে। **৪. গ্লুকোজ দেহে প্রবেশ করে:** ইনসুলিন দেহের কোষসমূহে সহজে গ্লুকোজ প্রবেশ করতে সাহায্য করে। গ্লুকোজ কোষে ঢুকে এনার্জি সৃষ্টিতে কোষকে সাহায্য করে। এতো গেলো স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির কথা। এবার জেনে নিন ডায়াবিটিস রোগির অবস্থা।

ডানে আমরা একই ধরনের চিত্র দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এটা টাইপ-১ ডায়াবিটিস রোগির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখানেও চারটি সংখ্যা আছে। এগুলোর ব্যাখ্যা হলো: **১. গ্লুকোজ রক্তে প্রবেশ করে:** হজম হওয়ার সময় খাদ্যের চিনি পাকস্থলী আলাদা করে পাঠিয়ে দেয় ছোট্ট ইনটেস্টিন বা আঁতে। ছোট্ট আঁত থেকে গ্লুকোজ বেরিয়ে এসে রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে। **২. প্যানক্রিস ইনসুলিন তৈরীতে ব্যর্থ:** প্যানক্রিস ইনসুলিন তৈরীতে ব্যর্থ বা অতি অল্প তৈরী করে। আর ইনসুলিন ছাড়া রক্তের মাধ্যমে গ্লুকোজ দেহকোষে ঢুকতে পারে না। পরিণামে গ্লুকোজ রক্তের মধ্যেই থেকে যায়। পরীক্ষার সময় গ্লুকোজের মাত্রা অতিরিক্ত হিসাবে ধরা পড়ে। **৩. লিভার গ্লুকোজ গ্রহণ করতে পারে না:** রক্তে ইনসুলিন না থাকায় লিভার গ্লুকোজ চুষে নিতে পারে না। বরং লিভার কিছুটা গ্লুকোজ রক্তের মধ্যে ছেড়ে দেয়। **৪. ক্রমে রক্তের মধ্যে গ্লুকোজ বাড়তে থাকে:** রক্তে ইনসুলিন না থাকায় হেদকোষ গ্লুকোজ গ্রহণ করতে পারে না। রক্তে অতিরিক্ত গ্লুকোজ জমা হয়। পরিণামে ডায়াবিটিসের সাথে সংশ্লিষ্ট মেডিকেল সমস্যাবলী দেখা দেয়।





টাইপ ১ ডায়াবিটিস রোগের মূল কারণ হলো প্যানক্রিস ইনসুলিন যথেষ্ট পরিমাণ প্রস্তুত করে না। অর্থাৎ প্যানক্রিসের কার্যকারিতার ব্যর্থতা। তবে অপর আরেক ধরনের ডায়াবিটিস আছে যার মূল কারণ হলো হেদকোষ ইনসুলিন সঠিকভাবে কাজে লাগাতে না পারা। এ ক্ষেত্রেও রক্তে ইনসুলিনের মাত্রা অতিরিক্ত হয়ে পড়ে। বায়ের চিত্রে ব্যাপারটি বুঝানোর চেষ্টা হয়েছে। **১. রক্তে গ্লুকোজের প্রবেশ:** সাধারণভাবেই পাকস্থলী থেকে আঁত হয়ে গ্লুকোজ রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে। **২. প্যানক্রিস ইনসুলিন তৈরী করে:** প্যানক্রিস স্বাভাবিক মাত্রায় ইনসুলিন বানিয়ে রক্তে ছেড়ে দেয় ঠিকই। **৩. লিভার ইনসুলিন গ্রহণ করে না:** এটার কারণ অনেকটা হতে পারে। পরিণামে লিভার আরো কিছু মওজুদ থাকা ইনসুলিন রক্তের মধ্যে ছেড়ে দেয়। **৪. দেহের কোষগুলো ইনসুলিন নিতে চায় না:** দেহের কোষগুলো ইনসুলিন গ্রহণ করতে নারাজ। সুতরাং ইনসুলিন থাকাসত্ত্বেও রক্ত থেকে গ্লুকোজ কোষে ঢুকতে পারে না। ফলে অতিরিক্ত গ্লুকোজ ধীরে ধীরে রক্তের মধ্যে বেড়ে ওঠে। পরিণামে ডায়াবিটিস রোগের ফলে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয় তা দেখা দেয়।

প্রিয় শ্রোতা! আশাকরি উক্ত ব্যাখ্যা থেকে ডায়াবিটিস নামক ক্ষতিকর রোগের স্বরূপ আপনারা অনেকটা বেশী বুঝতে পেরেছেন। এ রোগের কারণ এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নি। বিজ্ঞানীদের ধারণা, জেনেটিক ও পারিপার্শ্বিক কারণে ডায়াবিটিস হতে পারে। শরীরে অতিরিক্ত মেদ থাকলেও ডায়াবিটিস রোগে আক্রান্ত হওয়ার চান্স আছে। সুতরাং নিয়মিত ব্যায়াম ও খাদ্য গ্রহণ নিয়ন্ত্রতে রাখলে মারাত্মক এই রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। আশারাখি শিক্ষার্থীরা বিষয়টি গুরুত্বসহ বিবেচনা করবেন নিজের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত রাখতে।

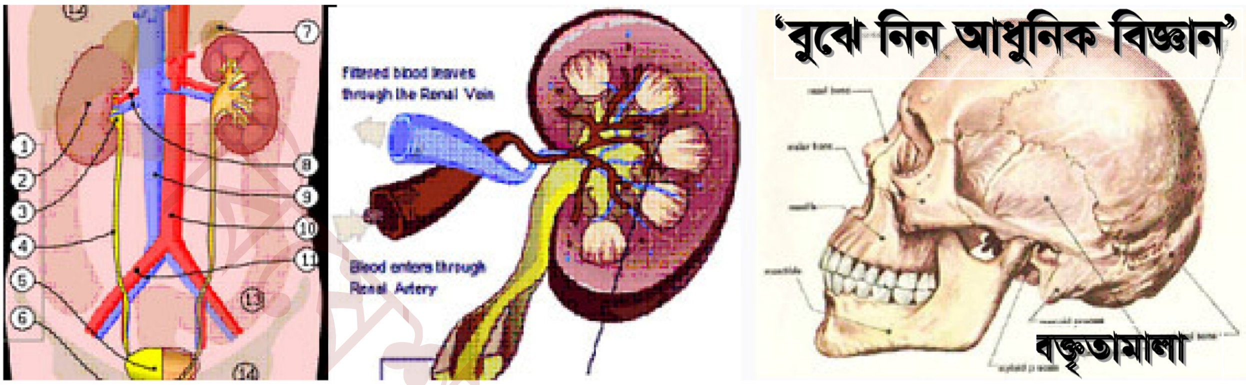
৯. টেস্টিজ [testis]

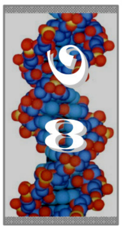
আজকের লেকচারের উদ্দেশ্য ছিলো পুরো এনডোক্রিন সিস্টেম সম্পর্কে যা বলার তা শেষ করা। এ পর্যন্ত সিস্টেমের ৭টি গ্রন্থির উপর সংক্ষিপ্ত আলেচনা হয়েছে। এখন আমরা সর্বশেষ গ্রন্থি টেস্টিজ নিয়ে এক দু'টো কথা বলবো। পুরুষাঙ্গের নিকটে ঝুলন্ত এই গ্রন্থিটির কোনো ছবি তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি না! আধুনিক মেডিকেল সাইন্স এ গ্রন্থি সম্পর্কে কী বলে তা-ই এখন সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করবো। ভেবেছিলাম, এ সম্পর্কে কিছু বলবো না- কিন্তু বিজ্ঞানের স্বার্থে মত পাল্টিয়েছি।

প্রত্যেক পুরুষের টেস্টিজ নামক দু'টি গ্রন্থি আছে। এগুলোকে বাংলায় পুরুষের অণ্ডকোষও বলে। অণ্ডকোষের মূল ফাংশন বা কাজ হলো শুক্রকোষ উৎপাদন। তবে এনডোক্রিম সিস্টেমের অংশ হিসাবে এসব গ্রন্থি **'এ্যানড্রোজেন'** [androgen] নামক যৌন হরমোনও নিঃসরণ করে। পুরুষের যৌন উদ্দীপক হরমোন **'টেস্টোস্টারোন'** [testosterone] এখানে উৎপাদন হয়। মুখে দাড়ি গজে ওঠা, কণ্ঠ গভীর হওয়া এবং দেহের পেশীর উন্নয়ন এই হরমোনই নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া পুরুষের যৌনসংক্রান্ত চরিত্রকে এটা প্রভাবান্বিত করে।

এনডোক্রিন সিস্টেমের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানেই শেষ। মানবদেহের কার্যকারিতা সঠিকভাবে নিশ্চিত রাখতে আরো কয়েকটি সিস্টেম কাজে নিয়োজিত আছে। আমরা একে একে সবগুলোর উপরই সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণ পরিচিতিমূলক আলোচনার আশার রাখি। আগামী লেকচারে মূত্রতন্ত্র বা **ইউরিনারি** [urinary] সিস্টেমের উপর আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। সবাই উপস্থিত হবেন এই আশা রেখে শেষ করছি আজকের লেকচার।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঙ. জীববিদ্যা: পরিচিতি ও কার্যকারিতা

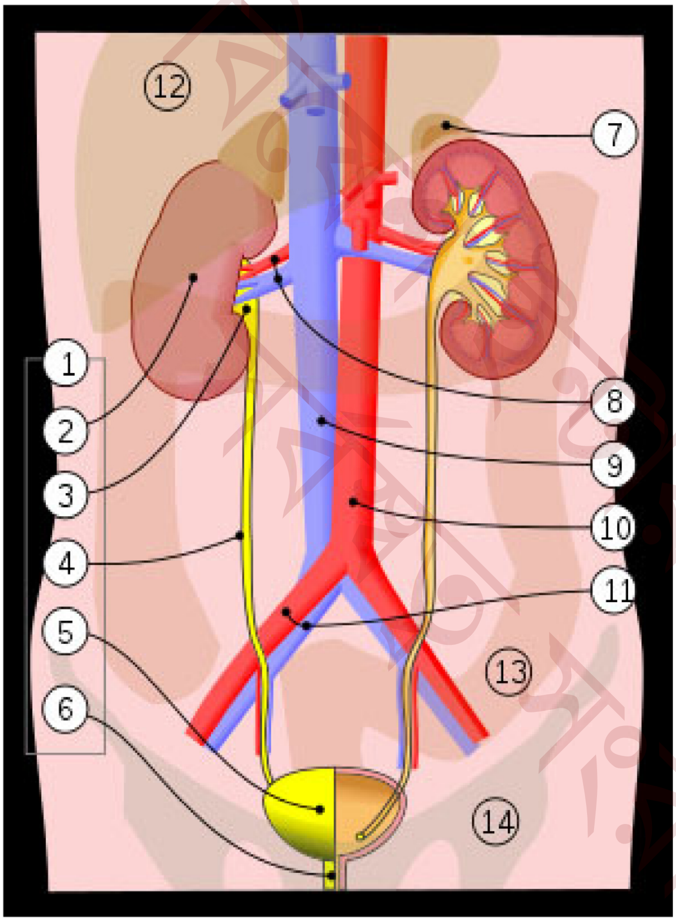
বক্তৃতা ৩৪ : প্রাণীজগৎ

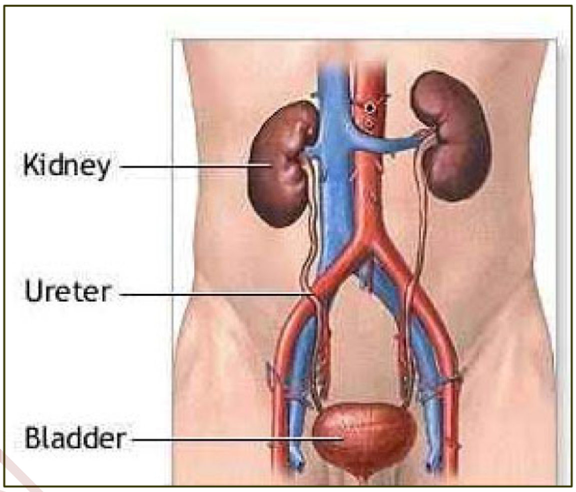
৩. ৩. ইউরিনারি সিস্টেম [urinary system]

মূত্রতন্ত্র একটি জটিল প্রক্রিয়া যা দেহ থেকে **'ইউরিন'** [urine] নিঃসরণ করে। ইউরিন বা মূত্র একটি হলদে রঙের তরল পদার্থ। এটি কিডনিতে উৎপাদন হয়। এতে থাকে গলে-যাওয়া দেহবর্জ্য এবং অতিরিক্ত পানি। মূত্র বা প্রস্রাবে আরো থাকে বিভিন্ন ধরনের কেমিকেল বস্তু। কিডনি যখন রক্তকে ছাঁকে তখনই এটা উৎপাদন হয়। প্রত্যহ অন্তত ১১০ লিটার পানিসর্বস্ব মূত্র কিডনি বের করে রক্ত ছেঁকে। ইউরিনারি সিস্টেমের প্রধান অরগ্যান বা দেহযন্ত্র হলো এই কিডনি। প্রিয় ছাত্র বন্ধুরা! আমাদের পেটের নীচের দিকে দু'টি কিডনি আছে। মূত্রতন্ত্র ঠিক কিভাবে কার্যকর আছে তা জানতে এই কিডনি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন জরুরী। সুতরাং আমরা এখন কিডনির উপর বিস্তারিত আলোচনা করবো। নীচের [পরের পৃষ্ঠার] চিত্রে পুরো সিস্টেমের একটি সংক্ষেপ ছবি ফুটে ওঠেছে। এর বিভিন্ন অংশের নাম নীচে উল্লেখ করছি।

মানব ইউরিনারি সিস্টেম: ১. সিস্টেম, ২. কিডনি [kidney], ৩. রিনেল পেলভিস [renal pelvis], ৪. ইউরিটার [uriter], ৫. ইউরিনারি ব্লাডার [urinary bladder], ৬. ইউরিথ্রা [urethra], ৭. আরডিনেল গ্লান্ড

[adrenal gland], ৮. রিনেল আরটারি এন্ড ভেইন, [renal artery and vein], ৯. ইনফেরিওর ভেনা কাভা [inferior vena caval], ১০. এবডোমিনেল এওরটা [abdominal aorta], ১১. কমন ইলিয়াক আরটারি এন্ড ভেইন [common iliac artery and vein], ১২. লিভার [liver], ১৩. লার্জ ইন্টেস্টিন [large intestine] এবং ১৪. পেলভিস [pelvis]।





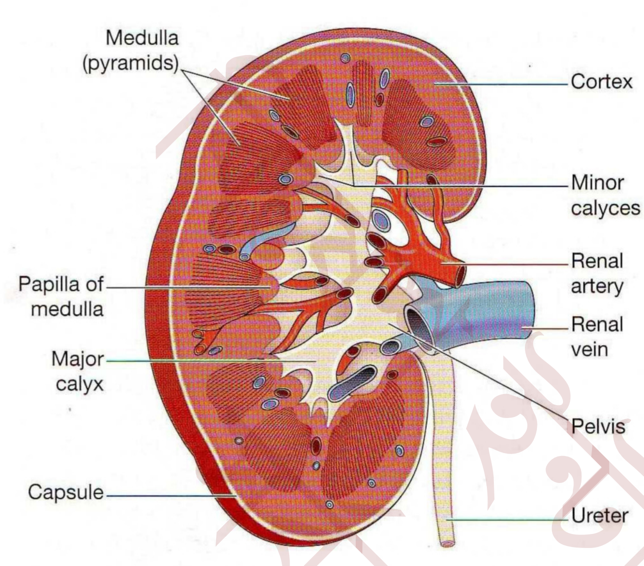
৩.৩.১. কিডনি বা বৃক্ক

কিডনির পরিচয় ও কার্যকারিতার উপর আলোচনাকালে বেশ ক'টি চিত্র তুলে ধরবো। শ্রোতারা নোট বইয়ের এসব চিত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন আশাকরি। প্রথমত আমাদের দেহে উভয় কিডনির অবস্থান উপরের চিত্রে তুলে ধরেছি। একে একটু স্টাডি করে নিলে ভালো হয়।

উপরের চিত্র থেকে স্পষ্ট, আমাদের কিডনিদ্বয় একটা আরেকটার সঙ্গে সংযুক্ত। ডানের কিডনি বায়েরটা থেকে একটু নীচে। উভয় কিডনি থেকে একটি টিউব বা পাইপ যুক্ত হয়েছে যৌনাঙ্গের কিছুটা উপরে স্থাপিত মূত্রথলে বা ব্লাডারে। সেখান হতে ইউরিন বেরিয়ে আসে দেহ থেকে। কিডনিদ্বয়ের অবস্থান জানার পর আমরা এবার মূল আলোচনা তথা কিডনির কার্যকারিতা সম্পর্কে ব্যাখ্যায় যেতে পারি।

প্রথমত কিডনির বিভিন্ন অংশের উপর কিছুটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন। কিডনি দেখতে অনেকটা সীমের বিচির মতো লাগে। নীচের [পরের পৃষ্ঠার] চিত্রে আমরা কাটা একটি কিডনির ছবি এঁকেছি। এতে [ইংরেজীতে] বিভিন্ন অংশের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি অংশের আলাদা ফাংশন আছে। যেমন: বাইরের অংশকে বলে করটেক্স [cortex]। এর নীচে আছে মেডালা [medulla]। এখানে ৮ থেকে ১৮টি পর্যন্ত মোচাকার অংশ আছে যাকে **'পিরামিড'** বলা হয়। এসব পিরামিডের সরুর দিকটি কিডনির কেন্দ্রের দিকে স্থাপিত। পিরামিডের ভেতর দিয়ে

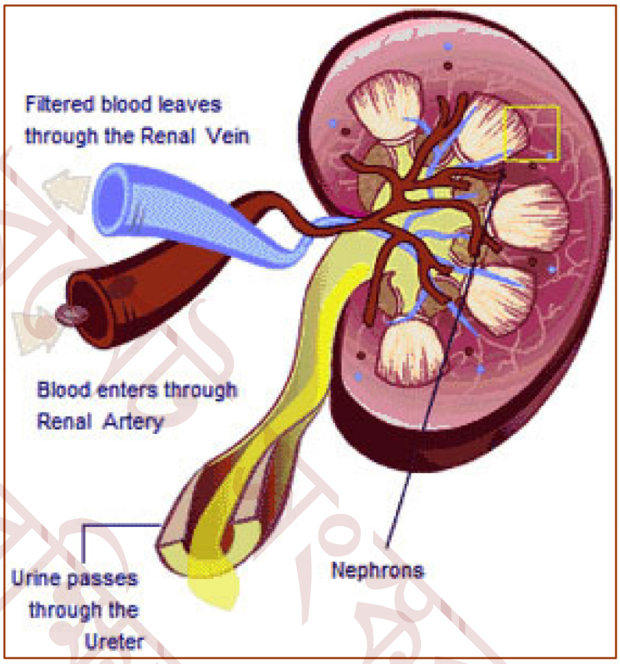
করটেক্স বেড়ে একটি কাঠামো তৈরী করেছে যার নাম **'রিনেল কলাম'** [renal column]। কিডনির কেন্দ্রে একটি ফাঁকা অংশ আছে যার নাম **'রিনেল পেলভিস'** [renal pelvis]।



A longitudinal section of the right kidney.

ফিল্টারিংয়ের কাজ যে অংশ করে তার নাম নেফ্রন [nephron]। সেখানে একটি ক্ষুদ্র অংশ আছে যার নাম গ্লমেরিউলাস [glomerulus]। দেহের মধ্যে কি পরিমাণ পটাসিয়াম [potassium], কেলসিয়াম [calcium] এবং হাইড্রোজেন দরকার তা এই অংশটি নিয়ন্ত্রণ করে। এটা বেদরকারী বস্তু যেমন ড্রাগ এবং খাদ্য সম্পূরক দ্রব্যাদি। নেফ্রনে ছাঁকা ইউরিন দীর্ঘ যে পাইপের মাধ্যমে মূত্রথলে চলে যায় তার নাম ইউরিটার।

বর্জ্যযুক্ত রক্ত দেহ থেকে রিনেল আর্টারি [renal artery] দিয়ে কিডনির ভেতর প্রবেশ করে। ছাঁকার পর ভালো রক্ত আবার রিনেল ভেইন [renal vein] দিয়ে বেরিয়ে এসে দেহের ভেতর চলে যায়। ছাঁকার সময় কিডনি রক্ত থেকে দূষিত পানি ও অন্যান্য রসায়নিক বর্জ্য ইউরিটার [ureter] পাইপের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয় মূত্রথলে। সেখান থেকে বর্জ্য প্রস্রাব হিসাবে বেরিয়ে যায়। নীচের চিত্রটি দেখুন।



অতি সংক্ষেপে কিডনির মূল ফাংশন নিম্নরূপ সংঘটিত হয়:

১. খাবার ও পানীয় আমাদের পাকস্থলীতে প্রবেশের পর তা হেদের জন্য উপকারী নিউট্রিয়েন বস্তুতে পরিণত হয়।

২. তবে সবই ব্যবহারযোগ্য নিউট্রিয়েন পরিণত হয় না- বর্জ্য হিসাবে তরল ও কঠিন পদার্থ থাকে। এগুলো সরিয়ে উপযোগী নিউট্রিয়েন রক্তে যোগান দিতে হবে।

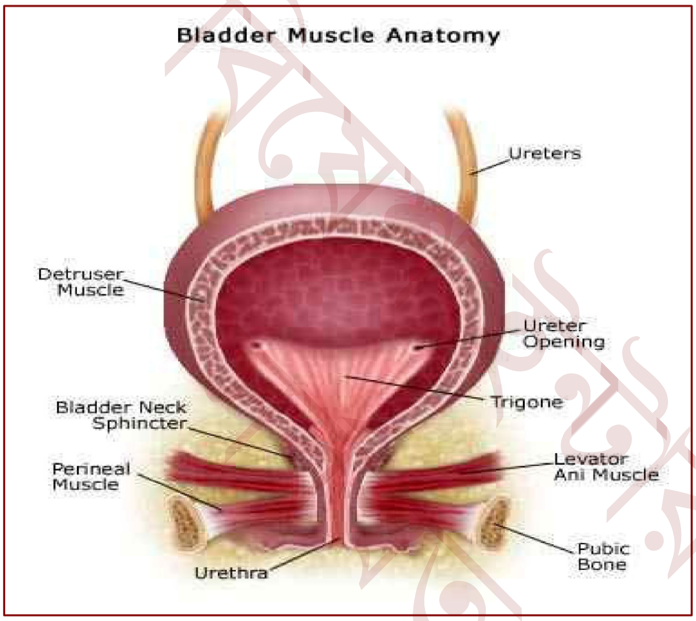
৩. কঠিন বর্জ্য পদার্থ বেরিয়ে যায় গুহ্যদ্বার হয়ে। অপরদিকে নিউট্রিয়েনসমূহ দেহ কাজে লাগায় এনার্জি, বৃদ্ধি, মেরামত এবং সার্বিক তত্ত্বাবধান নিশ্চিত রাখতে।

৫. নিউট্রিয়েনের মধ্যেও ইউরিনসহ বর্জ্য সৃষ্টি হয়। এগুলো প্রথমত রক্তের মধ্যে থাকে। কিডনিতে রক্ত প্রবেশ হওয়ার পর এগুলো ছেঁকে আলাদা করা হয়।

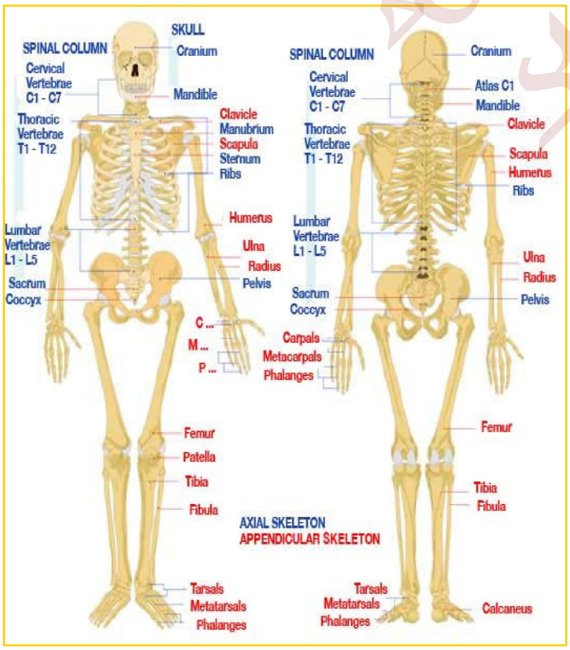
৬. বর্জ্য ও অতিরিক্ত পানি কিডনি থেকে চলে আসে ব্লাডারে। এখান থেকে চলে যায় প্রস্রাব হিসাবে বাইরে।

৩.৩.২. ব্লাডার [bladder] বা মূত্রথলে

মূত্রতন্ত্রের প্রধান দেহযন্ত্র হলো কিডনি। আমরা এতোক্ষণ কিডনি নিয়ে আলোচনা করেছি। ব্লাডার হলো পানীয় জমা রাখার একটি থলে। প্রতিনিয়ত কিডনি থেকে পানীয় এসে এই থলেতে জমা হয়। নীচে ব্লাডারের একটি চিত্র তুলে ধরেছি। একটু দেখে নিন।



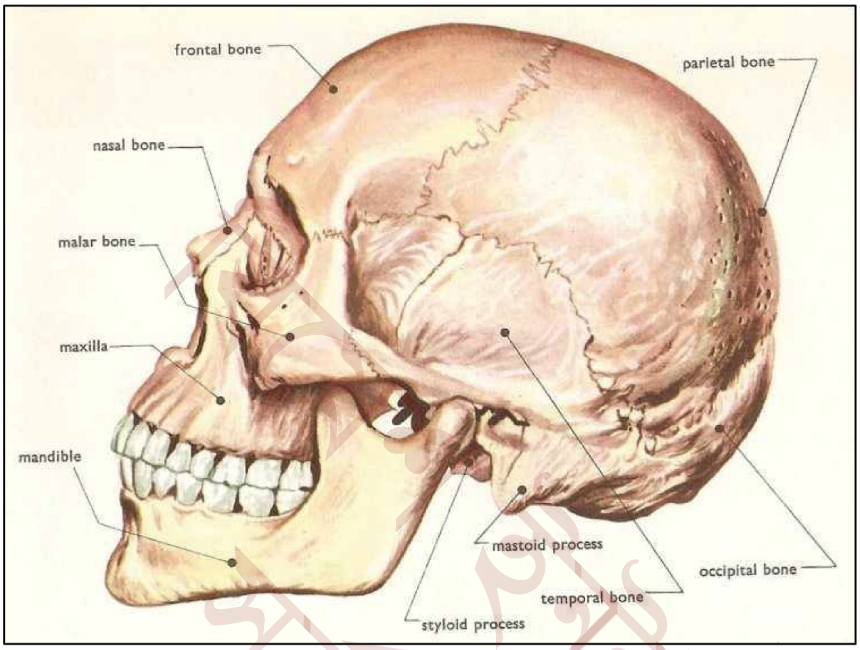
ইউরিটার পাইপের মাধ্যমে প্রস্রাব ব্লাডারে প্রবেশ করে। এরপর তা সময় সময় ইউরিথ্রা দ্বারা বেরিয়ে আসে। আমাদের ব্লাডার ৩০০ থেকে ৩৫০ লিটার মূত্র স্টোর করতে পারে। তবে এক সময় অতিরিক্ত প্রস্রাব জমা হয়ে যায় এবং তখন কিছুটা স্টোরেজ বের করার প্রয়োজন পড়ে। প্যারাসিমপাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম নামে একটি তন্দ্র কার্যকর আছে আমাদের দেহে। ব্লাডার পরিপূর্ণ হলে এই নার্ভাস সিস্টেম সাড়া দেয় ও ব্লাডার সংকোচন হতে থাকে। এভাবে ব্লাডার থেকে মূত্র বেরিয়ে আসে। অবশ্য শুধু নার্ভাস সিস্টেম যথেষ্ট নয়- ব্লাডার খোলার জন্য ব্যক্তির ইচ্ছাও জরুরী।



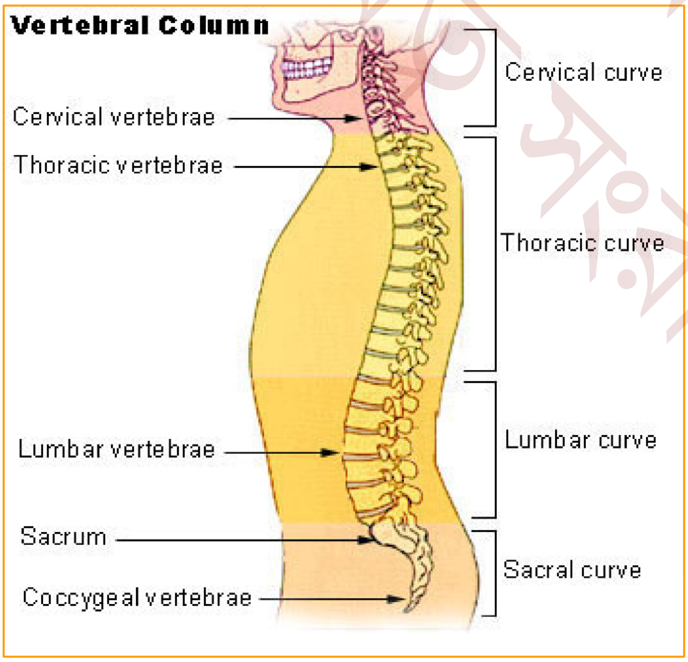
৩.৪. স্কেলেটেল সিস্টেম [skeletal system]

মানব কঙ্কালসার একটি শক্তিশালী তন্ত্র। পুরো কঙ্কালসারে মোট ২০৬ খানা হাড্ডি আছে। সবগুলো মিলেই মানবদেহের ভারসাম্য রক্ষা করে যাচ্ছে। বায়ের চিত্রে মানব কঙ্কালসারের সামন ও পেছনের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। কঙ্কালের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অংশ আছে। যেমন: মাথার খুলি, হাত-পা, পাঁজর, পেলভিস [শ্রোণী] এবং মেরুদণ্ড। আমরা এখন একে একে এসব কঙ্কালের উপর আলোচনা করবো।

মাথার খুলি: মানব মাথার খুলির কাজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। একে দু'টি আলাদা অংশে বিভক্ত করা যায়: ১. ক্রানিয়েল [cranial] ও ২. ফেসিয়েল [facial]। অর্থাৎ করোটি ও মুখের হাড্ডি। আমাদের মস্তিষ্ককে প্রথম অংশ ঘিরে রেখেছে। দ্বিতীয় অংশে আছে খুলির বাকী সকল হাড্ডি। নীচের (পরের পৃষ্ঠার) চিত্রে মাথার খুলির বিভিন্ন অংশ দেখানো হয়েছে।



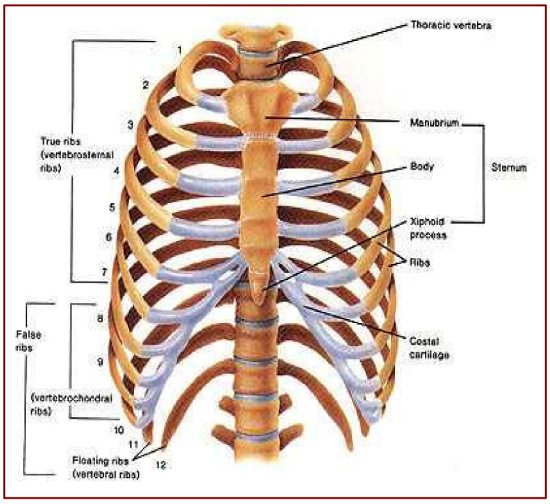
মানব খুলিতে মোট ২২টি হাড্ডি আছে। এদের নাম হলো: অক্সিপিটেল [Occipital], প্যারিটেল [Two Parietal] -দু'টি, ফ্রন্টেল [Frontal], টেম্পোরেল [Two temporal] -দু'টি, স্পেরোইড [Sphenoid], এথমোইড [Ethmoid], নেসেল [Two nasal] -দু'টি, সুপারিয়ার মেক্সিলারি [Two superior maxillary] -দু'টি, লাক্রিমল [Two lachrymal] -দু'টি, মেলার [Two malar], -দু'টি, পালেট [Two palate] -দু'টি, ইনফেরিয়াম রার্বিনেটেড [Two inferior turbinated] -দু'টি, ভমার [Vomer], এবং ইনফেরিয়ার মেক্সিলারি [Inferior maxillary]। খুলি আমাদের ব্রেন, চোখদ্বয়, মধ্যম ও অভ্যন্তরীণ কর্ণদ্বয়কে নিরাপত্তা দান করেছে।

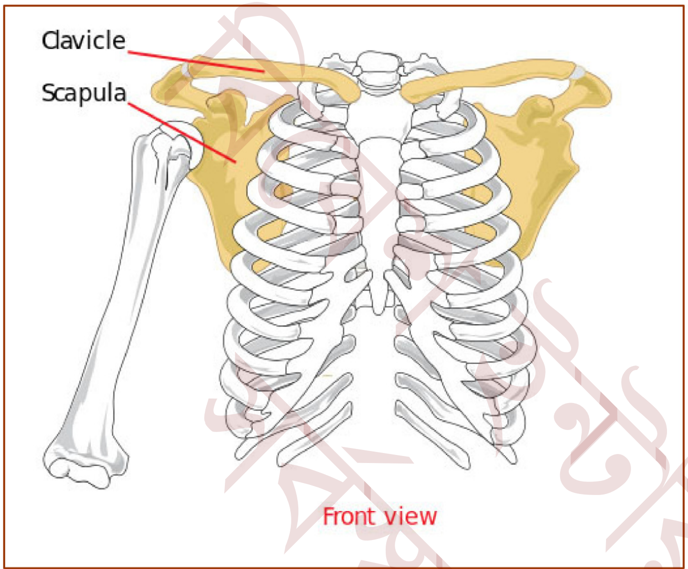


ভারটেব্রেল কলাম [Vertebral column]: এটাই আমাদের মেরুদণ্ড। এতে আছে মোট ৩৩টি হাড্ডি। নীচের চিত্রটি দেখুন। মেরুদণ্ডের মূল ফাংশন হলো স্পাইনেল কর্ড [spinal cord] বা মেরুরজ্জুকে নিরাপত্তা প্রদান।

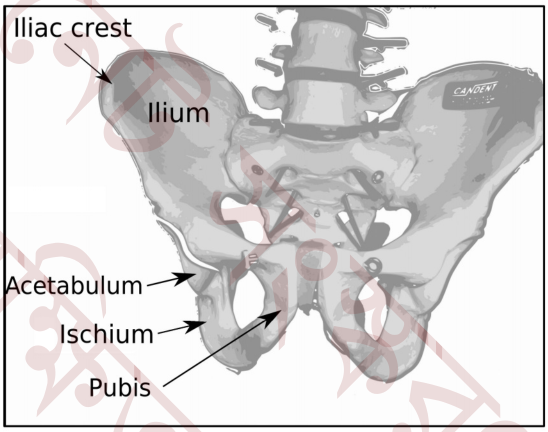
রিব কেইজ [rib cage] ও স্টেরনাম [sternum]: পাঁজর পিঞ্জর বা রিব কেইজে আছে ১২ জোড়া [২৪টি] হাড্ডি। থরেসিক কাভিটি [thoracic cavity] অঞ্চলের চতুর্দিকে পাঁজর অবস্থিত। থরেটিক কাভিটিতে যেসব দেহযন্ত্র আছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'টি হলো: ফুসফুস, হৃদযন্ত্র এবং বড় শিরাসমূহ। সুতরাং এগুলো নিরাপত্তা দানে সক্রিয় আছে আমাদের পাঁজর। নীচের [পরের পৃষ্ঠার] চিত্র দেখুন। অবশ্য বুকের দিকে স্টেরনাম [sternum] বা বক্ষাস্থি ও পেছনের দিকে মেরুদণ্ডের হাড্ডিগুলোও এসব দেহযন্ত্র নিরাপত্তায় সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

ক্লাভিকল [clavicle] ও স্কাপুলা [scapula]: ক্লাভিকল বা কণ্ঠাস্থি এবং স্কাপুলা বা অংসফলক [কাঁধের প্রশস্ত অস্থি] আমাদের কাঁধকে নিরাপত্তা প্রদান করে। নিম্নের চিত্রে এসব অস্থি দেখানো হয়েছে।





ইলিয়াম [ileum]: শ্রোণী বা পেলভিস অংশের মূল অস্থি এটি। নিম্নের চিত্রটি দেখুন। ইলিয়ামের কাজ হলো মানবদেহের উরু, পরিপাক ও মূত্রতন্ত্রকে নিরাপত্তা দান।

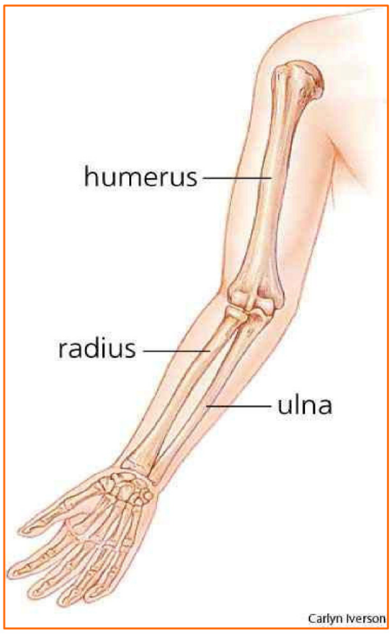


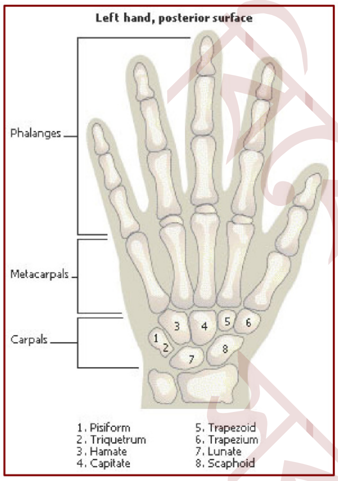
পাটেলা [patella], উলনা [ulna] ও রেডিয়াস [radius]: পাটেলাকে বাংলায় মালাইচাকি বলে। ইংরেজীতে নি ক্যাপ [knee cap] নামেও পরিচিত। এটাই আমাদের হাঁটুর বড় অস্থিখণ্ড। নীচের চিত্রে হাঁটুর এই হাড্ডিখণ্ড দেখানো হয়েছে।



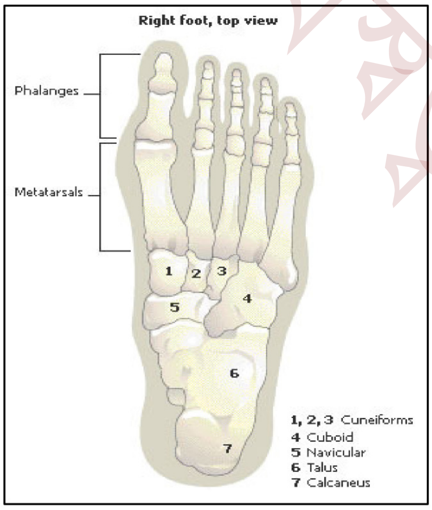
উলনাকে বাংলায় অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি বলে! এটা আসলে আমাদের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত অংশের হাড্ডি। সরল ভাষায় একে **'অভ্যন্তরীণ কনুই অস্থি'** বললেই চলবে। রেডিয়াসকে বাংলায় বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি বলে। একে সরল ভাষায় **'বাইরের কনুই অস্থি'** বললেই হয়। নিম্নে (পরের পৃষ্ঠায়) এই দু'টো হাড্ডির চিত্র তুলে ধরেছি। পাটেলা আমাদের হাঁটুকে ও উলনা এবং রেডিয়াস কনুইকে নিরাপত্তা প্রদান করে। এছাড়া কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত যে বড় হাড্ডি আছে তার ইংরেজী নাম হলো, হিউমারাস [humerus]। একে বংলায় বলে প্রগণ্ডাস্থি। আমরা বলতে পারি **'বাহুর অস্থি'**। নীচের (পরের পৃষ্ঠার) চিত্রে এটাও দেখানো হয়েছে।

কার্পাস [carpus]: হাতের কব্জিতে এই হাড্ডিগুলো আছে। হাতের কব্জির মধ্যে মোট ৮টি অস্থি বিদ্যমান। হাতের তালুতে আছে ৫টি এবং ১৪টি হাড্ডি আছে পাঁচটি আঙ্গুলের মধ্যে। এ নিয়ে হাতের মধ্যে মোট হাড্ডি সংখ্যা দাঁড়ালো ২৭টি। নীচের চিত্রে হাতের হাড্ডিসমূহ দেখানো হয়েছে।

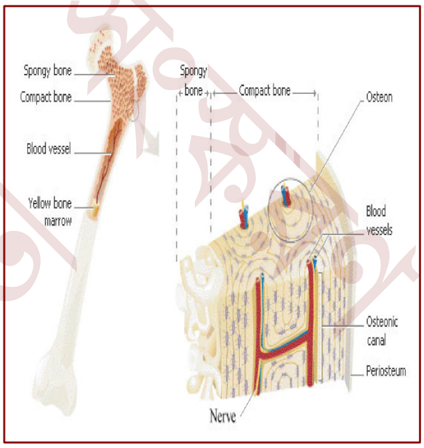




পায়ের পাতার কঙ্কালসার: পায়ের মধ্যে মোট ২৬টি হাড্ডি আছে। সর্বাপেক্ষা বড়ো দু'টি হাড্ডি পায়ের গোড়ালিতে অবস্থিত। প্রথমটিকে **'কালকেনিয়াস'** [calcaneus] বলে। আর দ্বিতীয়টির নাম **'টেইলাস'** [talus] বলে। নীচের চিত্রে যথাক্রমে সংখ্যা ৭ ও ৬ দ্বারা এ দু'টো চিহ্নিত করা হয়েছে।

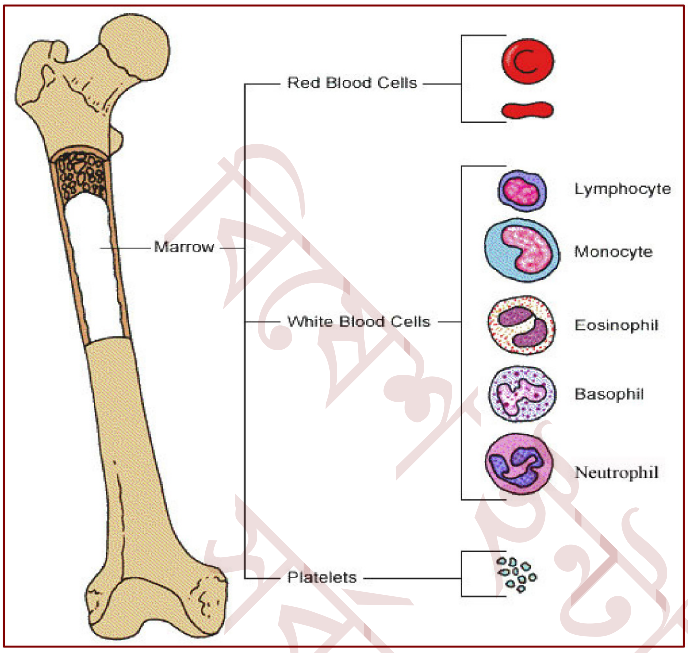


হাড্ডির মজ্জা: আমাদের হেদের হাড্ডিগুলোর মূল কাজ হলো বিভিন্ন দেহযন্ত্র ও পেশীর নিরাপত্তা দান এবং সামগ্রিকভাবে আমাদেরকে চলতে ফিরতে সাহায্য করা। কঙ্কালসার ছাড়া আমরা জেলির মতো হয়ে যেথাম! তবে হাড্ডির আরো কিছু কার্যকারিতা আছে। এর মধ্যে হাড্ডির মজ্জা এখানে সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লেখযোগ্য। নীচের চিত্রটি দেখুন।



আমরা রক্ত সঞ্চালন তন্ত্রের উপর আলোচনাকালে বলেছি, হাড্ডির মজ্জায়ই লাল রক্তকোষসহ আরো কিছু কোষ সৃষ্টি হয়। উপরের চিত্রে একটি হাড্ডির ক্রস-সেকশন [কর্তিত অংশ] দেখাচ্ছে। মজ্জা স্পঞ্জের মতো একটি বস্তু। এতে অনেক রক্তনালী আছে। বাচ্চাদের প্রায় সকল মজ্জায়ই রক্তের বিভিন্ন কোষ সৃষ্টি হয়। তবে পরিণত বয়স্ক লোকদের হাড্ডির অভ্যন্তরস্থ লাল মজ্জায় এসব কোষ তৈরী হয় বেশী। লাল মজ্জা থাকে বুক, কোমর, মাথার খুলি, উরু ও হাতের উপরিভাগের হাড্ডির ভেতরে।

হাড্ডির মজ্জা হলো রক্ত উৎপাদনের কারখানা। সুতরাং হাড্ডির মজ্জায় যাতে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। সাধারণ স্বাস্থ্যবান লোকের মজ্জায় সবাই থাকে। কিন্তু সময় সময় কোনো কোনো উপাদানের ঘাটতি হেতু সমস্যাও হতে পারে। নীচের চিত্রে দেখানো হয়েছে যেসব গুরুত্বপূর্ণ রক্তকোষ হাড্ডির মজ্জায় উৎপাদন হয়।



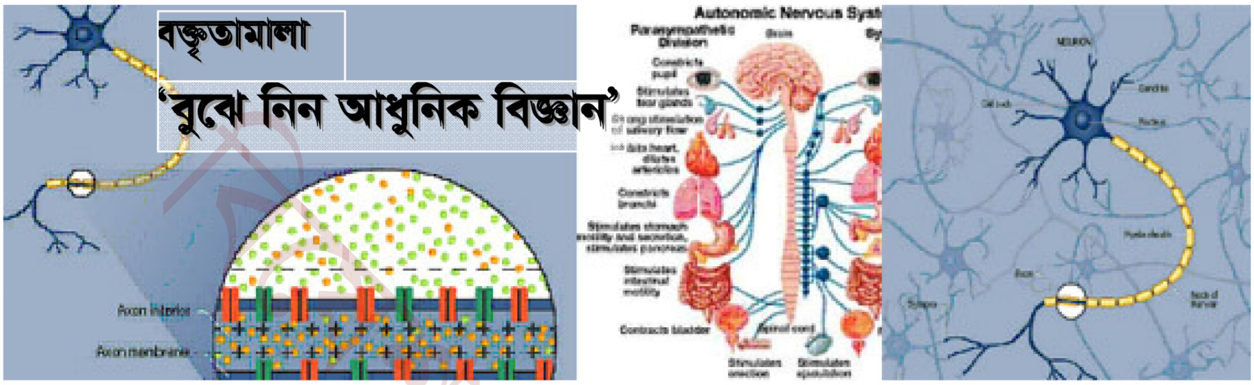
বায়ের চিত্রে দেখানো কোষগুলোর উপর আরো একটু ব্যাখ্যা তুলে ধরে আজকের লেকচারের ইতি টানবো। প্রথমেই জেনে নিই গুরুত্বপূর্ণ লাল রক্তকোষ সম্পর্কে।

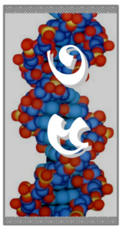
মজ্জায় তৈরী রক্তকোষসমূহ: ১. লাল রক্তকোষ: এটি সম্পর্কে ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। রক্তের তিন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কোষের মধ্যে এটি অন্যতম। এ কোষই বহন করে অক্সিজেন আমাদের ফুসফুস থেকে। নিয়ে যায় দেহের প্রতিটি টিস্যু ও কোষে। এটা আবার কোষের বর্জ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসও বহন করে নিয়ে আসে ফুসফুসে। আমরা তা বাইরে নিয়ে ছেড়ে দিই নিঃশ্বাসের মাধ্যমে।

২. সাদা রক্তকোষ: এই গ্রুপে আছে লিমফোসাইট [lymphocyte], মনোসাইট [monocyte], ইওসিনোফিল [eosinophil], বেসোফিল [basophil] এবং নিউট্রোফিল [neutrophil] কোষসমূহ। এগুলো মূলত দেহের রোগ-প্রতিরোধ তন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত। **'লিমফোসাইট'** ক্যান্সার কোষকে হামলা করে বিভিন্ন এ্যন্টিবডি তৈরী করে। এছাড়া এটাই ফরেন টিস্যু অগ্রাহ্যের জন্য দায়ী। **'মনোসাইট'** হাড্ডির মজ্জা ছাড়াও প্লীহায় তৈরী হয়। এর কাজ হলো মৃত কোষাংশ ও ফরেন বস্তু গিলে ধ্বংস করা। **'ইওসিনোফিল'** এলার্জিক প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী। এছাড়া পরজীবী জীবাণু ধ্বংসে এ কোষগুলো ভূমিকা রাখে। **'বোসোফিল'**- এই সাদা রক্তকোষ রক্তের মধ্যে দোষ-ত্রুটি থাকলে সক্রিয় হয়। রক্তের মধ্যে বেশী পরিমাণ কোষ **'নিউট্রোফিল'** দেহের রোগ-প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে ইনফেকশন থেকে রক্ষার্থে এটা বিশেষ কার্যকরী।

৩. প্লেটলেট [platelet]: আমরা ইতোমধ্যে রক্ত সঞ্চালন সিস্টেম নিয়ে আলোচনাকালে এই কোষটির উপর বেশ কিছু বলেছি। এর মূল কাজ হলো রক্তের মধ্যে জমাট সৃষ্টি করা। চামড়া বা টিস্যু কেটে গেলে জমাট বাঁধা একান্ত জরুরী। প্লেটলেট ছাড়া তা সম্ভব নয়।

প্রিয় ছাত্র বন্ধুরা! মানবদেহের উপর আমাদের এ তথ্যানুসন্ধানের অংশ হিসাবে তিনটি তন্ত্রের উপর এ পর্যন্ত কিছু আলোচনা করলাম। আশারাখি এ থেকে সকলেই উপকৃত হবেন। মানবদেহ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের শেষ কিন্তু এখনো হয় নি। আগামী লেকচারসমূহে আমরা অন্যান্য তন্ত্রের উপর বিস্তারিত আলোচনার আশা রাখি। এটুকু বলে আজকের লেকচার শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

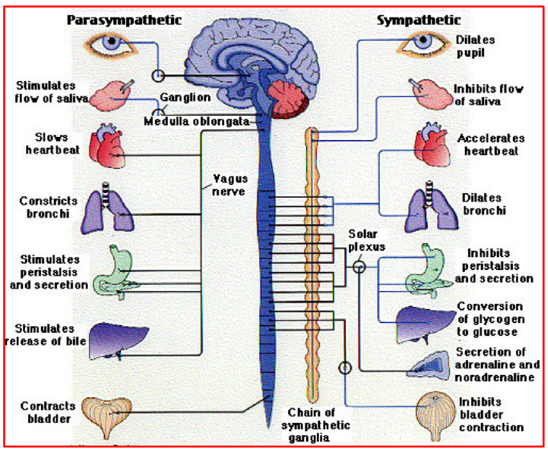
স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঙ. জীববিদ্যা: পরিচিতি ও কার্যকারিতা

বক্তৃতা ৩৫ : প্রাণীজগৎ

৫. নার্ভাস সিস্টেম [nervous system]

প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শীর্ষক বক্তৃতামালার ৩৫তম সংযোজনে সবাইকে জানাচ্ছি উষ্ণ স্বাগত। আমরা গত দু'টি লেকচারে মানবদেহের বিভিন্ন কাঠামোর উপর আলোচনা করেছি। আজকের লেকচারেও তা অব্যাহত থাকবে। আর সম্ভবত, আরো দু'একটি বক্তৃতা যুক্ত করতে হবে বিষয়টির উপর তথ্যানুসন্ধান সমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে।



যাক, শিক্ষার্থী বন্ধুরা! মানব দেহখানা খুব জটিল ও কৌশলে সৃষ্ট। এতে **'প্রাণ'** নামক চঞ্চল একটি উপাদান সংরক্ষিত থাকবে- সুতরাং দেহখানাও সেরূপ ডিজাইন হওয়া চাই, যাতে তা ঐ প্রাণ বা আত্মার জন্য বাসোপযোগী হয়। হিউম্যান বায়োলজিস্টরা পুরো মানবদেহের বিভিন্ন সিস্টেমকে

মোট ১২টি প্রধান তন্ত্রে বিভক্ত করে গবেষণা করেন। ইতোমধ্যে আমরা এদের চারটির উপর আলোচনা উপস্থাপন করেছি। আজকের লেকচারে পঞ্চম তন্ত্র যাকে বিজ্ঞানীরা **'নার্ভাস সিস্টেম'** [nervous system] বা স্নায়ুতন্ত্র বলেন- তাই হবে আলোচনার বিষয়।

৫.১. নার্ভাস সিস্টেম কি?

প্রথমেই আমরা মানবদেহ ও এর সফল কার্যকারিতার জন্য জরুরী সকল সিস্টেমের মতো নার্ভাস সিস্টেম কী তা জেনে নেবো। এরপর যেটুকু সম্ভব তথ্যভিত্তিক আলোচনা করবো বিষয়টির উপর আরো কিছুটা গভীর জ্ঞানার্জনের আশায়। মনে রাখা উচিৎ, **'বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান'** শীর্ষক এ লেকচারের মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিশাল জগতের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাতই শুধু উদ্দেশ্য। বাস্তবে এ বিরাট বিষয়ের উপর সুগভীর গবেষণা এ প্রসঙ্গে আদৌ সম্ভব নয়। যাক, এটুকু জানার পর এবার আমরা মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ এই পঞ্চম সিস্টেমের উপর আলোচনায় যেতে পারি।

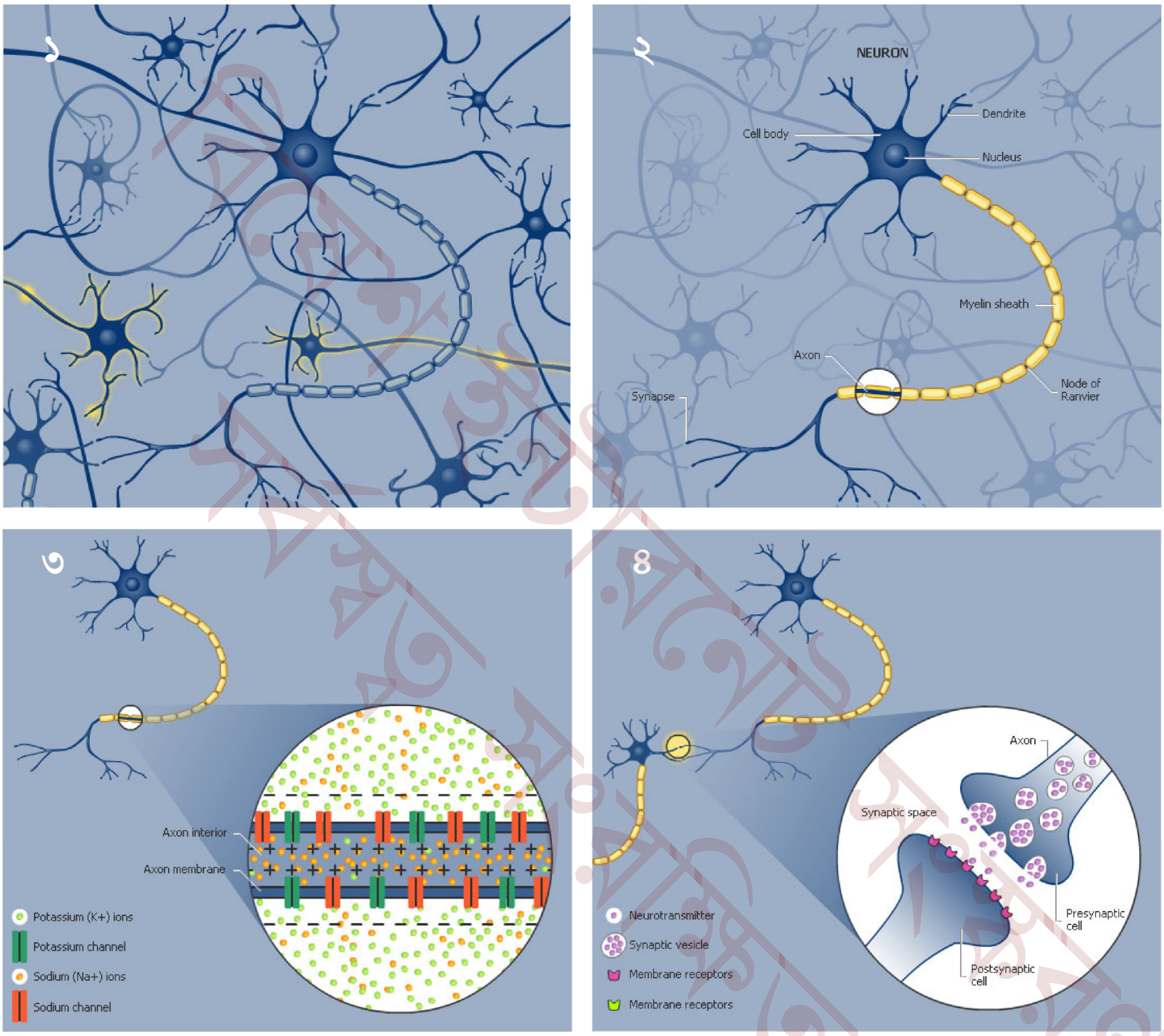
বাংলায় বলে স্নায়ুতন্ত্র। তবে ইংরেজী ও বাংলা এ উভয় শব্দ আলোচনার সময় প্রয়োগ করবো। আমাদের দেহের সকল ফাংশন সফলভাবে পরিচালনের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাংশের মধ্যে যোগাযোগ নিশ্চিত রাখতে হবে। আমরা যেভাবেই দেহকে বিভিন্ন অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় কাজে লাগাই না কোনো তা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য একটি তন্ত্র সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের মগজ বা ব্রেন হলো এই তন্ত্রের কেন্দ্র। সব ধরনের **'স্টিমুলাই'** [stimuli] বা উদ্দীপনার নিয়ন্ত্রণ ও কর্মবিধায়ক হলো ব্রেন। এর সঙ্গে যুক্ত আছে পুরো দেহব্যাপী ব্যাপ্ত একটি স্নায়ুকোষ নেটওয়ার্ক। আর এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে স্নায়বিক [নার্ভাস] যোগাযোগ নিশ্চিত হয়। স্টিমুলাই কিংবা **'মাসল মেকানিজম'** [muscle mechanism] বা পেশী কার্য-সাধন পদ্ধতি সফলভাবে এসব নার্ভকোষের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। পুরো স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালন করে আমাদের ব্রেন। এজন্য একে **'সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম'** [central nervous system] হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর অর্থ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র।

৫.২. গঠন-কাঠামো ও কার্যকারিতা

মানবদেহে বিশেষ কিছু **'সেন্সরী'** [sensory] বা সংবেদনশীল কোষ আছে যাদের কাজ হলো দেহের বিভিন্ন অংশ বা এমনকি বাইর জগত থেকে প্রাপ্ত উদ্দীপক তথ্যাদি সংগ্রহ করা। এই কোষগুলোর নাম **'নিউরোন'** [neuron] বা স্নায়ুকোষ। এগুলো শুধুমাত্র তথ্যের প্রাপক নয় বরং তথ্য মুতাবিক অন্যত্র **'নার্ভ ইম্পাল্স'** [nerve impulse] বা স্নায়বিক প্রণোদন প্রেরণ করতে পারে। অর্থাৎ অবস্থা ভেদে ব্যবস্থা নিশ্চিত রাখতে এই কোষগুলো সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। স্নায়ুকোষ থেকে প্রাপ্ত ইম্পাল্স দেহের সাধারণ কোষে পৌঁছে প্রতিক্রিয়া করে। আর এভাবেই পুরো নার্ভাস সিস্টেম দেহব্যাপী যোগাযোগ রক্ষা করে সকল পেশী ও অন্যান্য তন্ত্রকে পরিচালনা করে যাচ্ছে। ঠিক কিভাবে এ কাজগুলো সম্পাদিত হয় তাই হবে এখনকার আলোচনা।

নার্ভ সেল [nerve cell]: প্রতিটি নার্ভ সেল বা কোষে আছে একটি কেন্দ্রীয় অংশ যেখানে অবস্থান করে সেলের **'নিউক্লিয়াস'** [nucleus] বা **'সেল বডি'** [cell body]। সেলে আরো এক দু'টো কাঠামো আছে যাকে **'এক্সন'** [axon] ও **'ডেনড্রাইট'** [dendrite] বলা হয়। সেল বডি থেকে ডেনড্রাইট কিছুটা দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এদের কাজ, উদ্দীপনা গ্রহণ করা। অপরদিকে স্নায়ুকোষে এক্সন সাধারণত একটিই থাকে। এটা দীর্ঘ হতে পারে। এক্সনের কাজ হলো সেল বডি এলাকা থেকে নার্ভ ইম্পাল্স বা স্নায়বিক প্রণোদন কোষ থেকে কোষে ট্রান্সফার বা স্থানান্তর

করা। নার্ভ সেলের কাঠামো চিত্রে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। দেখুন নীচের চারটি ছবি। সেসাথে আলাদা আলাদা ব্যাখ্যাও পাঠ করুন।



নার্ভ সেল চিত্র-১: মানব নার্ভাস সিস্টেমের মূল হলো **'নিউরন'** [বা নার্ভ সেল]। আমাদের দেহের সর্বত্র বিলিয়ন বিলিয়ন নার্ভ সেল আছে। এক অপূর্ব নেটওয়ার্কে সাজানো নিউরনগুলো মূলত যোগাযোগ ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছে আন্তঃদেহব্যাপী। এই যোগাযোগ নেটওয়ার্কের কেন্দ্র হলো **'সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম'** [central nervous system]। আমাদের মস্তিষ্ক ও মেরুরুজ্জ মিলে এই নার্ভাস সিস্টেম গঠিত। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্যারিয়ার বা বহনকারী হলো **'ইলেকট্রিকেল ইম্পাল্স'** [electrical impulse] বা বৈদ্যুতিক প্রণোদন। দেহের ভেতর ও বাইরে কোনো ধরনের রদবদল হলেই নিউরন তা বুঝতে পারে। আমাদের চিন্তাশক্তি ও অনুভূতিকে নিউরন নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া দেহের পেশী ও গ্রন্থিগুলোর নিয়ন্ত্রকও এই নিউরন।

নার্ভ সেল চিত্র-২: এখানে আমরা নার্ভ কোষের বিভিন্ন অংশ দেখতে পাচ্ছি। আমরা ইতোমধ্যে **'নিউক্লিয়াস'** [nucleus], **'সেল বডি'** [cell body], **'এক্সন'** [axon] ও **'ডেনড্রাইট'** [dendrite] কি, তা উল্লেখ করেছি। এ চিত্রে আরো কয়েকটি জিনিস দেখানো হয়েছে। যেমন: **'মাইয়েলিন শীত'** [myelin sheath], **'নোড অব রানভিয়ে'** [node of Ranvier] ও **'সিনাপ্স'** [synapse]। মাইয়েলিন শীত হলো স্নায়ু অন্তরণী পট্টি, নোড অব রানভিয়ে মানে স্নায়ু অন্তরণী পট্টির মধ্যস্থ ফাঁক এবং নার্ভের শেষের ফাঁককে বলে সিনাপ্স।

ইলেকট্রিকেল ইম্পাল্‌স [বৈদ্যুতিক সিগনাল] আসে ডেনড্রাইটে। এই সিগনালকেই বলে স্টিমুলাই [stimuli] বা উদ্দীপক। এরপর ইম্পাল্‌স সেল বডি থেকে এক্সন হয়ে চলতে থাকে অপর স্নায়ুকোষে স্টিমুলাই সৃষ্টির জন্য। যেমন: দেহের অপর কেনো নিউরন, গ্রন্থি কোষ কিংবা পেশীকে সক্রিয় করতে পারে এই স্টিমুলাই। এক্সনের চতুর্দিকে মাইয়েলিন নামক স্নায়ু অন্তরণী পট্টি আছে। এতে অনেক ফাঁক বিদ্যমান এবং এসব ফাঁকের নামই হলো নোড অব রানভিয়ে। আর এক্সনের একেবারে শেষে জাংশন আছে যার নাম সিনাপ্স। এক স্নায়ুকোষ থেকে অপরটিতে তথ্য প্রতিস্থাপন হয় এই সিনাপ্সের মাধ্যমে।

নার্ভ সেল চিত্র-৩: আমরা জানি আয়োন বলতে কি বুঝায়। এটা হলো চার্জ-হওয়া অণু বা এটম। এই চিত্রে আমরা এক্সনের অভ্যন্তর দেখতে পাচ্ছি। নিউরন যখন স্থির অবস্থায় থাকে, এক্সন রসায়নিক ব্যালান্স বজায় রাখে। এটা করতে যেয়ে কোষের অভ্যন্তরে অতিরিক্ত ধনাত্মক **'পোটাসিয়াম আয়োন'** [potassium (K+) ions] থাকা চাই। অপরদিকে কোষের বাইরে থাকতে হবে অতিরিক্ত ধনাত্মক **'সোডিয়াম আয়োন'** [sodium (Na+) ions]। যে মুহূর্তে কোন সিগনাল আসে, **'নোড অব রানভিয়ে'**তে মাইয়েলিন শীত জাগ্রত হয়ে ওঠে। এতে আয়োনগুলো লিক হতে বাধা থাকে না। পটাসিয়াম ও সোডিয়াম আয়োন স্থান পরিবর্তন করে। ফলে সৃষ্টি হয় বৈদ্যুতিক সিগনাল যা চলতে থাকে এক্সনের উপর দিয়ে।

নার্ভ সেল চিত্র-৪: আমরা ইতোমধ্যে বলেছি দু'টি নিউরের মধ্যস্থ ফাঁককে বলে **'সিনাপ্স'** [synapse]। সিগনাল একটি নিউরন থেকে অপরটিতে ট্রান্সফার হয় এই সিনাপ্সের মাধ্যমে। চিত্রে আমরা সিনাপ্স অংশটি বড়ো করে দেখিয়েছি। দেখাই যাচ্ছে, এই অংশে আছে এক্সন, নিউরোট্রান্সমিটার [neurotransmitter], সিনাপ্টিক ভেসিকল [synaptic vesicle], মেমব্রেন রিসেপ্টার [membrane receptor] ইত্যাদি। টেকনিকেল এসব ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নেই। তবে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। নিউরোট্রান্সমিটার এর অর্থ হবে স্নায়ু-প্রেরক। ভেসিকল শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র গর্ত বা থলে কোষ। সুতরাং সিনাপ্টিক ভেসিকল এর অর্থ দাঁড়ায় **'সিগনাল ফাঁকের কোষ থলে'**। ছবিতে এটি বৃত্তের মতো দেখানো হয়েছে যেখানে আছে একাধিক কোষ। মেমব্রেন শব্দের অর্থ ঝিল্লি। আর রিসেপ্টার মানে গ্রাহক। সুতরাং মেমব্রেন রিসেপ্টার এর অর্থ হবে ঝিল্লি গ্রাহক। যাক, ঠিক কিভাবে এক্সন থেকে এক্সনে সিগনাল প্রতিস্থাপন হয় সেটা জানাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

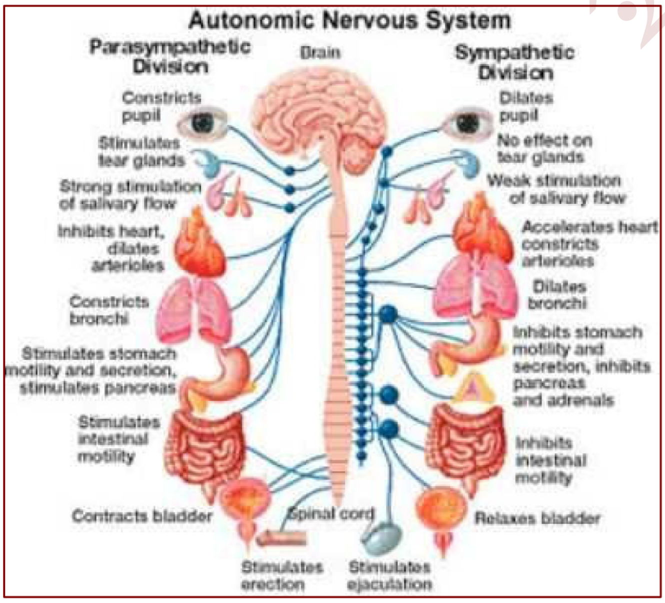
নিউরন সাইনাপ্সের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে। স্নায়ুকোষের কেন্দ্র থেকে সিগনাল বা ইম্পাল্‌স প্রথমে সাইনাপ্সে পৌঁছে। এবার অপর স্নায়ুকোষের এক্সনে তা ট্রান্সফার হতে হবে। সাধারণত নিউরোট্রান্সমিটার নামক রসায়নিক বস্তুর মাধ্যমে এ কাজটি সম্পন্ন হয়। যেদিক থেকে ইম্পাল্‌স ট্রান্সফার হবে তাকে বলে **'প্রিসাইনাপ্টিক**

সাইড' [pre-synaptic side]। এখানে অনেক কোষ আছে। আর যেখানে ইম্পাল্‌স ট্রান্সফার হবে তাকে বলে **'পোস্টসাইনাপ্টিক সাইড'** [post-synaptic side]। সেখানেও অনেক কোষ আছে। ইম্পাল্‌স সিনাপ্সে পৌঁছার পর রসায়নিক ট্রান্সমিটার কোষগুলো তা গ্রহণ করে ফেরি করে নিয়ে প্রিসিনাপ্টিক সাইড থেকে পোস্টসিনাপ্টিক সাইডে। এভাবে সিগনালটি পরবর্তী নিউরন বা স্নায়ুকোষে স্থানান্তরিত হয়। এবার প্রথম নিউরনটি স্থির অবস্থায় ফিরে যায়। অপরদিকে ইম্পাল্‌স চলতে থাকে একটার পর আরেকটি নিউরন পেরিয়ে।

প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! আমরা উপরের চারটি চিত্র দ্বারা বুঝতে সক্ষম হলাম কিভাবে নিউরন বা স্নায়ুকোষ থেকে স্নায়ুকোষে স্নায়বিক সিগনাল বা ইম্পাল্‌স ভ্রমণ করে। এটা জানা আমাদের জন্য জরুরীও ছিলো। আপনার হাতের অঙ্গুলিতে যেভাবেই হোক ব্যথা পেলেন- তা কিভাবে সাথে সাথে আপনি বুঝতে পারেন, সে প্রশ্নের জবাব এসেছে উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে। স্নায়ুকোষের মাধ্যমেই **'ব্যথার'** অনুভূতি আপনার ব্রেনে যেয়ে পৌঁছে। এরপর ব্রেন প্রয়োজনে জবাব দেয়। আপনার ব্যথার কারণ যদি আগুনের মধ্যে অঙ্গুলি স্পর্শ করা হয়, তাহলে সাথে সাথে ব্রেন থেকে সিগনাল আসবে হাত সরে নিতে। হ্যাঁ, হাত তো আপনি সরিয়ে নেবেনই- কিন্তু সরানোর একশন পেশির মাধ্যমে আঞ্জাম দিতে হবে। এই কাজটি সারার সিগনাল আসতে হবে ব্রেন থেকে।

বন্ধুরা! প্রথমেই বলেছি মানব নার্ভাস সিস্টেম একটি বিরাট বিষয়। এর উপর ভাসাভাসা কিছু জ্ঞানদান ছাড়া অত্র লেকচারে বেশী কিছু বলা সম্ভব নয়। আর স্বীকার করতেই হচ্ছে, আমি নিজেও এ বিষয়ে কোনো এক্সপার্ট নই! বিজ্ঞানের গবেষক হিসাবে মানবদেহের উপর যেটুকু জানতে পেরেছি বা জানার চেষ্টা করেছি তা-ই আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলেছি। তবে এখনই অত্র লেকচার শেষ করছি না! আমাদের দেহের মধ্যে স্নায়বিক সিগনাল বা ইম্পাল্‌স ঠিক কিভাবে ভ্রমণ করে তা আমরা জেনেছি। তবে অপর আরেক বিষয় আমাদেরকে জানতে হবে। সেটা হলো এই প্রশ্নের উত্তর: আমাদের অজান্তে কিভাবে দেহের ভেতর অসংখ্য কাজ সম্পাদিত হয়? আসুন, খুব সংক্ষেপে এ ব্যাপারে আলোচনা করি।

অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম [autonomic nervous system]



ব্যক্তির চেতনার নিয়ন্ত্রণহীন অনেক একশন দেহের ভেতর সংঘটিত হচ্ছে। এসব একশ যে সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় তাকেই বলে অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম। আপনি কি কখনো ভেবেছেন, কিভাবে ঘুমন্তাবস্থায়ও আপনি শ্বাস-নিঃশ্বাস নেন? আরোও ভেবেছেন কি, কিভাবে খাদ্য-গ্রহণের পর হজম হওয়ার কাজটি শুরু হয়? আপনার লিভার, কিডনি ইত্যাদি কিভাবে ফাংশন করে? এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করেছেন বিজ্ঞানীরা। পাশের চিত্রে অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমের ক্রিয়া-কলাপ ফুটে ওঠেছে।

লক্ষ্য করুন, পুরো সিস্টেমের দু'টি মূল শাখা আছে। প্রতিক্রিয়াশীল কাজ সারতে যে শাখাটি সক্রিয়, তাকে বলে **'সিম্পাথেটিক ডিভিশন'**

[sympathetic division]। অপরদিকে সর্বদা সক্রিয় শাখাকে বলে **'প্যারাসিম্পাথেটিক ডিভিশন'** [parasympathetic division]। ছবিতে দেহের বিভিন্ন যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ও কার্যকারিতা সম্পর্কে তথ্য দেওয়া আছে। আমরা সংক্ষেপে এগুলোর বর্ণনা দিচ্ছি।

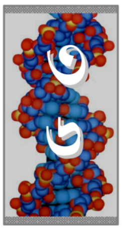
সিম্পাথেটিক ব্রাঞ্চঃ একে বাংলায় **'সংবেদনশীল শাখা'** বলা যায়। এই শাখার কাজের মধ্যে আছেঃ ১. চোখের মণি অশ্রুতে ভিজিয়ে দেওয়া [দুঃখ, বেদনা, ব্যাথা বা অতি-আনন্দের সময়]। ২. জিহ্বার মধ্যে লালা প্রবাহ বন্ধ করা [পিপাসা হেতু জিহ্বা শুকিয়ে যাওয়া]। ৩. ফুসফুসের মধ্যে বাতাস নেওয়া সহজ করা। ৪. হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বৃদ্ধিকরণ [ভয়, ক্লান্তি, ব্যায়াম ইত্যাদির প্রতিক্রিয়ায়]। ৫. [শেষ হয়ে গেলে] পরিপাকতন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধকরণ। ৬. লিভার থেকে গ্লুকোজ ছেড়ে দেওয়া সক্রিয় করা। ৭. রক্তচাপ বৃদ্ধিকরণ ও কমানোর হরমোন কিডনিতে তৈরীকরণ। ৮. মূত্রথলে শিথিলকরণ। ৯. মলনালী সংকোচন।

প্যারাসিম্পাথেটিক ব্রাঞ্চঃ একে বাংলায় **'অসংবেদনশীল শাখা'** বলা যায়। এই শাখার কাজ হলো উপরোক্ত সিম্পাথেটিক শাখার ক্রিয়ার বিপরীত ক্রিয়া সম্পাদন করা। যেমনঃ ১. চোখের মণি শুকানো। ২. জিহ্বায় লালা সৃষ্টি। ৩. হৃদযন্ত্রের কম্পন মাত্রা কমানো। ৪. ফুসফুসের মধ্যে বাতাস ঢুকানো কঠিন করা। ৫. পরিপাকতন্ত্রের ক্রিয়া শুরু করা। ৬. পিত্তাশয় সক্রিয়করণ। ৭. মূত্রথলে সংকোচন। ৮. মলনালী শিথিলকরণ।

মোটকথা, অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমের মাধ্যমে আমাদের দেহের শ্বাসক্রিয়া, রক্তসঞ্চলন, হজমক্রিয়া এবং মূত্রতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হয়। বলা যায় দেহ পরিচালনের এই চারটি তন্ত্রের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করে অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম। যাক, নিউরোলজির উপর আর বেশি কিছু না বলে প্রিয় শ্রোতা বন্ধুদেরকে মানসিক কষ্ট থেকে রেহাই দিতে চাই! যারা এই শাখার উপর দীর্ঘদিন অধ্যয়ন করেন তাদেরকে বলে **'নিউরোলজিস্ট'**। নিশ্চয় এসব বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সাহেবদের কথা আপনারা শুনেছেন। বিষয়টি খুব জটিল, আমি নিজেও এ ব্যাপারে বেশী গভীরে যাওয়ার ক্ষমতা রাখি না। সুতরাং এ্যানাটমির পঞ্চম সিস্টেম স্নায়ুতন্ত্রের উপর সংক্ষিপ্ত এই আলোচনার এখানেই শেষ। আগামী লেকচারে আমরা ষষ্ঠ ও সপ্তম সিস্টেম তথা সামন ও পেছন পেশীর উপর বক্তৃতা প্রদানের আশা রাখছি। সবাইকে এতে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঙ. জীববিদ্যা: পরিচিতি ও কার্যকারিতা

বক্তৃতা ৩৬ : প্রাণীজগৎ

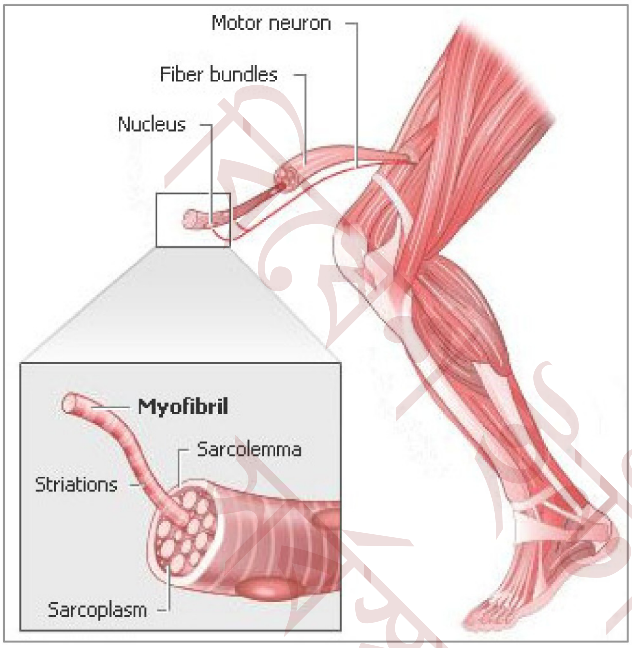
মানবদেহ

'বুঝে নিন আধুনিক বিজ্ঞান' শীর্ষক বক্তৃতামালার ৩৬তম সংযোজনে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক মুবারকবাদ। প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! মানবদেহের সৃষ্টিকৌশলের উপর আমরা ইতোমধ্যে বেশ কিছু তথ্যসম্বলিত আলোচনা করেছি। তবে জানার আরো অনেক কিছু বাকী। বাস্তবে মেডিকেল বিজ্ঞান এখনো আমাদের দেহ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি উদঘাটন করে নি। একই কথা সত্য পুরো বিজ্ঞানজগতের বেলাও। যাক, আজ আমরা মানবদেহের আরো দু'টি তন্ত্রের উপর আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি। এগুলো হলো সামন ও পেছন পেশী। আসলে উভয়টি একই সিস্টেম। তবে বিজ্ঞানীরা দু'টি ভাগে বিভক্ত করে গবেষণা করেন সুবিধার্থে।

৬ ও ৭. সামন ও পেছন পেশীতন্ত্র

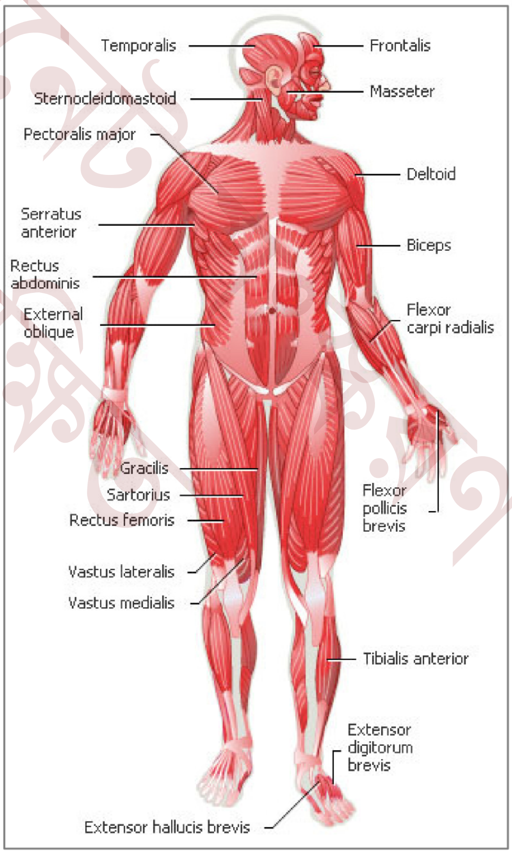
নার্ভাস সিস্টেম বা স্নায়ুতন্ত্র থেকে উদ্ভুত **'স্টিমুলাস'** [stimulus] বা ক্রিয়ার উদ্দীপনা দ্বারাই দেহের যাবতীয় পেশী, টিস্যু কিংবা দেহযন্ত্র সক্রিয় হয়ে ওঠে। আমরা ইতোমধ্যে নার্ভাস সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করেছি। পেশী মূলত চামড়ার নীচে কঙ্কালসারের সাথে সংযুক্ত মাংসাশী বস্তু। এগুলো আসলে **'মাইওফাইব্রিল'** [myofibril] নামক

এক ধরনের সূক্ষ্ম সূতার মতো জিনিষ। এটা গঠিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের জটিল প্রোটিন [protein] থেকে। দেখুন নীচের চিত্রটি।



মানবদেহের মোট ওজনের ৩৫% পেশীর মধ্যে নিহিত। এ সবই সৃষ্ট মাইওফাইব্রিল সুতা থেকে। পেশী যখন প্রয়োজনের তাগিদে সংকোচন হয় তখন এই মাইওফাইব্রিল সক্রিয় থাকে। মনে করুন আপনি হাত মুষ্টিবদ্ধ করবেন। প্রথমে এটা করার ইচ্ছা থেকে স্নায়বিক সিগনাল আসবে হাতের ঐসব পেশীতে যাদের মাধ্যমে এ ক্রিয়াটি সম্পাদন হয়। সিগনাল পাওয়ার সাথে সাথে মাইওফাইব্রিল সক্রিয় হয়ে ওঠবে। সংকোচন করবে পুরো পেশী সিস্টেমকে। আপনার হাত তখন মুষ্টিবদ্ধ হবে।

সামন পেশী: মানবদেহের সামনের পেশীতন্ত্র সবগুলোর মতোই বেশ জটিল একটি নেটওয়ার্ক। এই পেশীজাল দ্বারা আবৃত পুরো মানব-কঙ্কালসার। দেখুন নীচের চিত্রটি।



ডানের চিত্রে বিভিন্ন অংশের **'ডাক্তারি'** নাম ইংরেজীতে লিখিত আছে। এসব শব্দের বঙ্গানুবাদ করতে যাচ্ছি না- কারণ, আমাদের তথ্যানুসন্ধান তেমন গভীর নয়! আমরা তো আর ডাক্তার হবো না! তবে এটুকু জানা দরকার, চিহ্নিত ও নামকরণকৃত জায়গাসমূহে বিশেষ কিছু পেশী অংশ আছে, যাদের কাজ হলো বিশেষ কিছু ক্রিয়া করা। আসলে, এসব অংশের পেশী দ্বারাই আমরা নড়াচড়া, হাটা-চলা ও প্রতিপক্ষের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধ কিংবা কুস্তি-লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে সক্ষম হই। বিজ্ঞানের ভাষায় এসব ক্রিয়াকে বলে **'ভলোন্টারী মুভমেন্ট'** [voluntary movement] যার বাংলা হলো **'ঐচ্ছিক বিচলন'**। আপনার ইচ্ছা হলো দেহের পেশীশক্তি কাজে লাগাবেন। যেমন: হরতালের আগের দিন ককটেল ফাটাবেন কিংবা কারো গাড়ি পুড়াবেন! মগজে পেশীশক্তি এভাবে কাজে লাগানোর ইচ্ছা তখনই কার্যকরী হবে যখন আপনার শরীরের প্রয়োজনীয় অংশে পেশীগত সংকোচন শুরু হবে। আপনার হাত ককটেল ছুঁড়ে মারবে পেশীর সংকোচন ও শিথিলতার মাধ্যমে। সুতরাং যে কোনো পেশীশক্তি প্রয়োগ নির্ভর করে **'মানব মন'** [human mind] এর উপর। আর ইচ্ছাশক্তি মনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইচ্ছার উদ্রেক হলেই দেহের স্নায়ুতন্ত্র থেকে নির্দিষ্ট পেশীকে সক্রিয় করতে সিগনাল আসে। আর তা থেকেই শেষ ক্রিয়া সম্পাদন হয়। এভাবে আমরা দেহকে কাজে লাগাই।

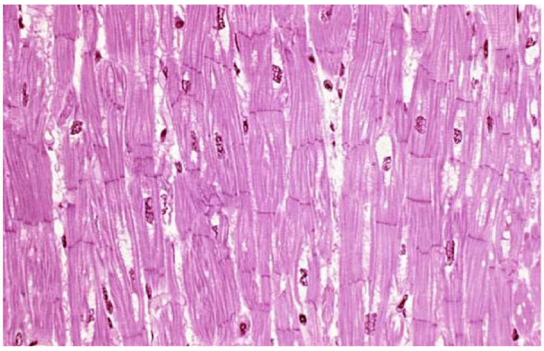
৬ ও ৭. ক. বিভিন্ন ধরনের পেশী

তিন ধরনের পেশী আছে মানবদেহে। **১. কঙ্কালসার পেশী, ২. হৃদযন্ত্রের পেশী ও ৩. মসৃণ পেশী**। পেশী মানুষকে শক্তি দান, ব্যালান্স, চলাচল ক্ষমতা, দাঁড়ানো ও দেহব্যাপী তাপ নিশ্চিত রাখে। আমরা এবার উক্ত তিন ধরনের পেশীর উপর আরো কিছু জানার চেষ্টা চালাবো।

১. কঙ্কালসার পেশী [skeletal muscle]: মেরুদণ্ডী প্রাণীদেহের মূল পেশী এটি। এসব পেশী দেহের হাড্ডির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এতে আছে স্নায়ুকোষ যা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। আংশিকভাবে হলেও কঙ্কালসার পেশী মানুষের চেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ কারণেই এর অপর নাম **'ঐচ্ছিক পেশী'** [voluntary muscle]। যেসব টিস্যুর মাধ্যমে হাড্ডির মধ্যে এই পেশী সংযুক্ত থাকে তাদের নাম হলো **'টেন্ডন'** [tendon]। এগুলো বড় আয়তনের রশির মতো। স্কেলেটেল পেশী সংকোচনের মাধ্যমেই পুরো কঙ্কালে নড়াচড়া নিশ্চিত হয়। সুতরাং আমাদের হাটা, চলা, পা-হাত বাঁকা করা ইত্যাদি কাজ ওসব পেশী সংকোচনের দ্বারা সম্ভব হচ্ছে।



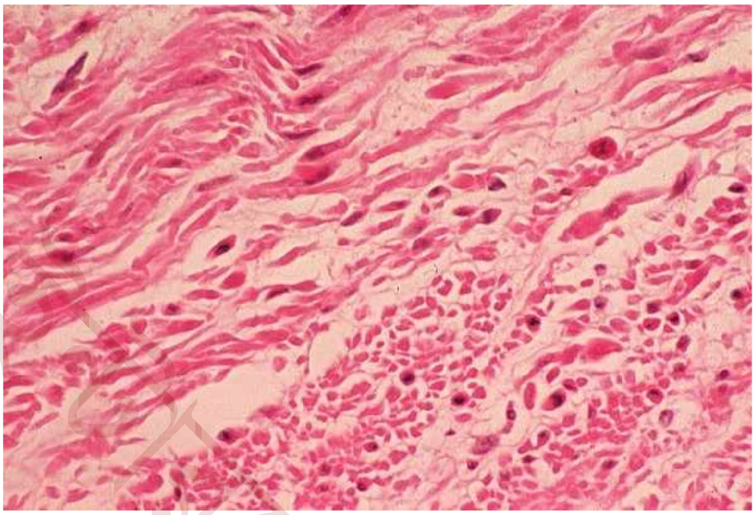
২. হৃদযন্ত্রের পেশী [heart muscle]: এর অপর নাম **কার্ডিয়াক মাসল** [cardiac muscle]। বুঝতেই পারছেন এটা কোন্ গুরুত্বপূর্ণ পেশী। মানবদেহে রক্ত চলাচল যে পাম্প নিশ্চিত রাখে তা-ই আমাদের হৃদযন্ত্র বা হার্ট। যে শক্তিশালী পেশীর দ্বারা হৃদযন্ত্র ঘটিত তা-ই হলো কার্ডিয়াক পেশী। দেখুন নীচের চিত্রটি।



কার্ডিয়াক মাসলের সকল কোষ বিশেষভাবে একটা আরেকটার সঙ্গে সংযুক্ত আছে। আমাদের জন্মের বেশ পূর্ব থেকে [অর্থাৎ মায়ের গর্ভে অবস্থানকাল থেকে] মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত হৃদযন্ত্রের পেশী অনবরত সংকোচন ও শিথিল হতে থাকে। এরূপ পারিশ্রমিক কাজের জন্য পেশীর প্রতিটি কোষে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন সাপ্লাই চাই। এটা নিশ্চিত হয় ফুসফুস থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত কোষে কোষে প্রবহমান থাকার মাধ্যমে। সুতরাং এই রক্ত-প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হলে বিরাট সমস্যা হবেই। আর সমস্যা যখন বেশী হয়ে পড়ে তখনই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ায় গণ্ডগোল বেধে যায়- অর্থাৎ হার্ট এটাক করে।

আমাদের হৃদযন্ত্রের পেশী **'ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণে'** নয়। ইতোমধ্যে বর্ণিত **'অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম'** [autonomic nervous system] দ্বারা এর গতি বা হার্ট-রেট নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এই সিস্টেম এর চালক নয়। হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বা পেশীর সুনির্দিষ্ট ছন্দযুক্ত সংকোচন ও শিথিল হওয়ার সঠিক কারণ ও কৌশল সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনো সীমিত।

৩. মসৃণ পেশী [smooth muscle]: আমাদের দেহের চামড়া, অভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্র, পুনর্জনন তন্ত্র, বড় রগ ও শিরা এবং বর্জ্য নির্গতকরণ তন্ত্রে এসব পেশী পাওয়া যায়। মসৃণ পেশী অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এসব পেশী সংকোচন **ঐচ্ছিক নয়- অনৈচ্ছিক**। প্রয়োজনে এগুলো সংকোচন ও শিথিল হয়। যেমন, আমাদের পরিপাকতন্ত্রের কাজ হলো খাদ্যকে বড় ও ছোট আঁতের ভেতর দিয়ে পরিচালনা করা। এটা করতে যেয়ে আঁতের মসৃণ পেশী ছন্দে ছন্দে সংকোচ ও শিথিল হয়। একইভাবে মূত্রাশয়, গর্ভাশয়, ভাওয়েল, রক্তশিরা এবং অন্যান্য দেহাভ্যন্তরের যন্ত্রাদিতে প্রয়োজনীয় সংকোচন ও শিথিলতা নিশ্চিত করে এই পেশী।

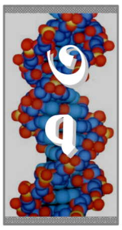


এ লেকচারের ইতি এক্ষুণি হবে। তবে উপসংহারে কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করতে চাচ্ছি যা সকলের জন্য উপকারী হবে বলে আমার বিশ্বাস। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, দেহের পেশী তার নিজের কোষে থাকা কেলসিয়াম ছেড়ে সংকোচন ক্রিয়া শুরু করে। ধারণা করা হয়, কেলসিয়াম রিলিজ হওয়ার মূল কারণ হলো কোষের বাইরের দিকে বৈদ্যুতিক পরিবর্তন। সুতরাং পেশীকে সময় সময় ব্যায়ামের মাধ্যমে সক্রিয় করতে হবে। ব্যায়ামের দ্বারা সক্রিয় পেশী হয়ে ওঠে শক্তিশালী ও কার্যকর। এরূপ পেশীকে বলে **'ইন টোন'** [in tone] বা স্বাভাবিক। অধিক হারে পেশীকে কাজে লাগালে পেশী **'হাইপারট্রোফি'** [hypertrophy] অবস্থায় উপনীত হতে পারে। এর অর্থ পেশীর আয়তন বৃদ্ধি। এ কারণেই নিয়মিত ব্যায়াম দ্বারা পেশী শক্তি বৃদ্ধি পায়, শরীর হয়ে ওঠে **'মাসকুলার'** [muscular]। পেশীর প্রতিটি কোষ বড়ো হয়ে ওঠে। অপরদিকে পেশীকে বেশী অলস বা অকেজো করে রাখলে বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়। পেশী **'এট্রফি'** [atrophy] অবস্থায় পৌঁছে যেতে পারে। এই অবস্থা হলো অত্যন্ত দুর্বলতা। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে পেশীর আয়তন কমে যায়, দেহ শুকিয়ে পড়ে। কোনো কোনো রোগের কারণ এটি। যেমন, **প্যারালাইসিস** [paralysis] বা পক্ষাঘাত রোগ। এ ক্ষেত্রে পেশীর আয়তন এতোই কম হয়ে পড়ে যে, এটা আর কার্যকরী থাকে না।

প্রিয় ছাত্র-বন্ধুরা! আমি আশা করবো আপনারা সর্বদা ব্যায়াম করবেন। ব্যায়ামের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া উন্নততর হয়। প্রতিটি দেহকোষে অক্সিজেন সাপ্লাই নিশ্চিত থাকে এবং পেশী বেড়ে শক্তিশালী হয়। আগামী লেকচারে আবারো দেখা হবে- এই আশা ব্যক্ত করে আজকের মতো শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

৬. জীববিদ্যা: পরিচিতি ও কার্যকারিতা

বক্তৃতা ৩৭ : প্রাণীজগৎ

৩.৮. রেসপিরেটরি সিস্টেম [respiratory system]

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! মানবদেহের উপর আমাদের তথ্যানুসন্ধানের অংশ হিসাবে এ পর্যন্ত মোট ৭টি তন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছি। আজকের লেকচারে অষ্টম সিস্টেম নিয়ে সংক্ষিপ্ত কথাবার্তার আশা রাখি। এই সিস্টেমের নাম 'রেসপিরেটরি সিস্টেম [respiratory system]'। বাংলায় বলা যায়, **'শ্বাসক্রিয়া তন্ত্র'**।

পুরো দেহযন্ত্র সক্রিয় ও বেঁচে থাকার মৌলিক একটি উপাদান হলো অক্সিজেন। এটি সর্বত্র প্রতিনিয়ত সাপ্লাই দিতে একদল অরগ্যান সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং বলা যায়, রেসপিরেটরি সিস্টেম [respiratory system] মানে এসব দেহযন্ত্রের কর্ম-ক্রিয়াকে বুঝায়। আমরা একে একে এসব যন্ত্রের উপর আলোচনা করবো। এর পূর্বে আরো এক দু'টো কথা বলে রাখছি।

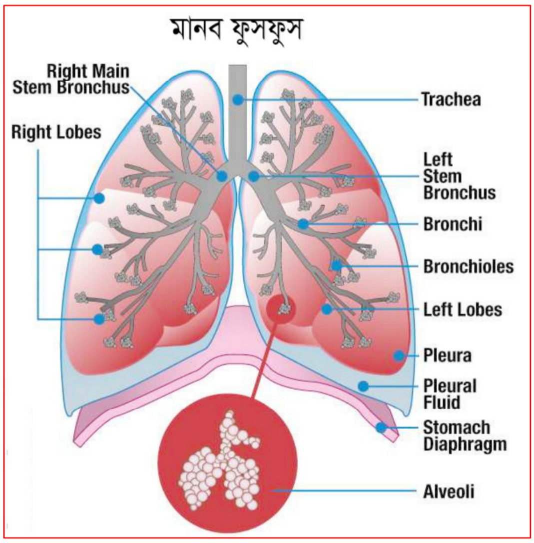
আমাদের দেহ মূলত হাজার হাজার কোটি কোষের সমন্বয়ে সৃষ্ট। সব কোষই অক্সিজেনের উপর নির্ভরশীল। শ্বাসক্রিয়া তন্ত্রের কাজ হলো এসব কোষে অক্সিজেন সাপ্লাই নিশ্চিত করা। সেসাথে কোষের বর্জ্য হিসাবে চিহ্নিত **'কার্বন ডাইওক্সাইড'** [carbon dioxide] গ্যাস সংগ্রহ করে বাইরে নিয়ে আসতে হবে। এই গ্যাসটি বেশিক্ষণ দেহের ভেতর থাকলে মারাত্মক ক্ষতি হবে। এই গ্যাস দেহ থেকে সরিয়ে ফেলার গুরুত্বপূর্ণ কাজটিও শ্বাসক্রিয়া

সম্পন্ন করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। সুতরাং আমরা এই পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকি তার প্রতিটি মুহূর্তে শ্বাসক্রিয়া আমাদের চেতন ও অবচেতন অবস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই **'জীবন রক্ষাকারী'** দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। মাত্র ক'টি মিনিট যদি শ্বাসক্রিয়া তন্ত্রের কাজে বড় ধরনের বাধার সৃষ্টি হয় তাহলে মানুষের মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়বে। কারণ দেহের সকল টিস্যু অক্সিজেনের অভাবে অক্রিয় হয়ে যাবে। আর অক্রিয় দেহ-টিস্যু মৃতের সমান।

যাক, আজ আমরা মানব শ্বাসক্রিয়া তন্ত্রের উপর আলোচনা করবো। অবশ্যই আমাদের আলোচনা সীমিত ও সংক্ষিপ্ত হবে। প্রথমেই আমরা রেসপিরেটরী সিস্টেমের মূল দেহযন্ত্র **'ফুসফুসের'** [lungs] উপর কিছুটা তথ্য তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

৩.৮. ক. আমাদের ফুসফুস [lungs]

নাক ও মুখ দ্বারা বাইর থেকে শ্বাসের মাধ্যমে বাতাস ভেতরে নেওয়া হয়। এটা তো সবার জানা। এরপর এই বাতাস পুনরায় বের করে নিয়ে আসি আমরা। বাতাস ভেতরে নেওয়া ও পুনরায় বের করার মধ্যে রহস্য কি? আসলে বাতাসে বেশ ক'টি গ্যাস বিদ্যমান। এর মধ্যে দেহের জন্য জরুরী গ্যাসটির নাম অক্সিজেন [oxygen]। এটুকু জেনে আমরা বলতে পারি শ্বাসের মাধ্যমে ভেতরে বাতাস নেওয়ার রহস্যের কারণ অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। এই অক্সিজেন গ্রহণের জন্যই শ্বাস গ্রহণ। বাতাসে কিন্তু শুধুমাত্র অক্সিজেন গ্যাস নয়- এতে আরো কয়েকটি গ্যাস আছে। রক্তকোষের মাধ্যমে দেহের প্রত্যেকটি কোষে এই অক্সিজেন যেতে হবে। সুতরাং এমন একটি যন্ত্র চাই যার কাজ হবে বাইর থেকে প্রাপ্ত বাতাস হতে অক্সিজেন আলাদা করে রক্তকোষে সাপ্লাই দেওয়া। এই কাজটিই আঞ্জাম দিচ্ছে আমাদের ফুসফুস। অবশ্য ফুসফুসের কাজ এটুকুই নয়। কোষের বর্জ্য **'কার্বন ডাইওক্সাইড'** গ্যাস রক্তকোষ সমগ্র দেহ থেকে সংগ্রহ করে ফুসফুসে নিয়ে আসে। এই গ্যাস দেহের জন্য ক্ষতিকর। যে কোন উপায়ে এই বর্জ্য দেহ থেকে বের করা চাই। এ কাজটিও ফুসফুস করে থাকে। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে, আমাদের ফুসফুস হলো **'গ্যাস এক্সচেঞ্জ মেশিন'** [gas exchange machine]। নীচের চিত্রটি দেখুন।

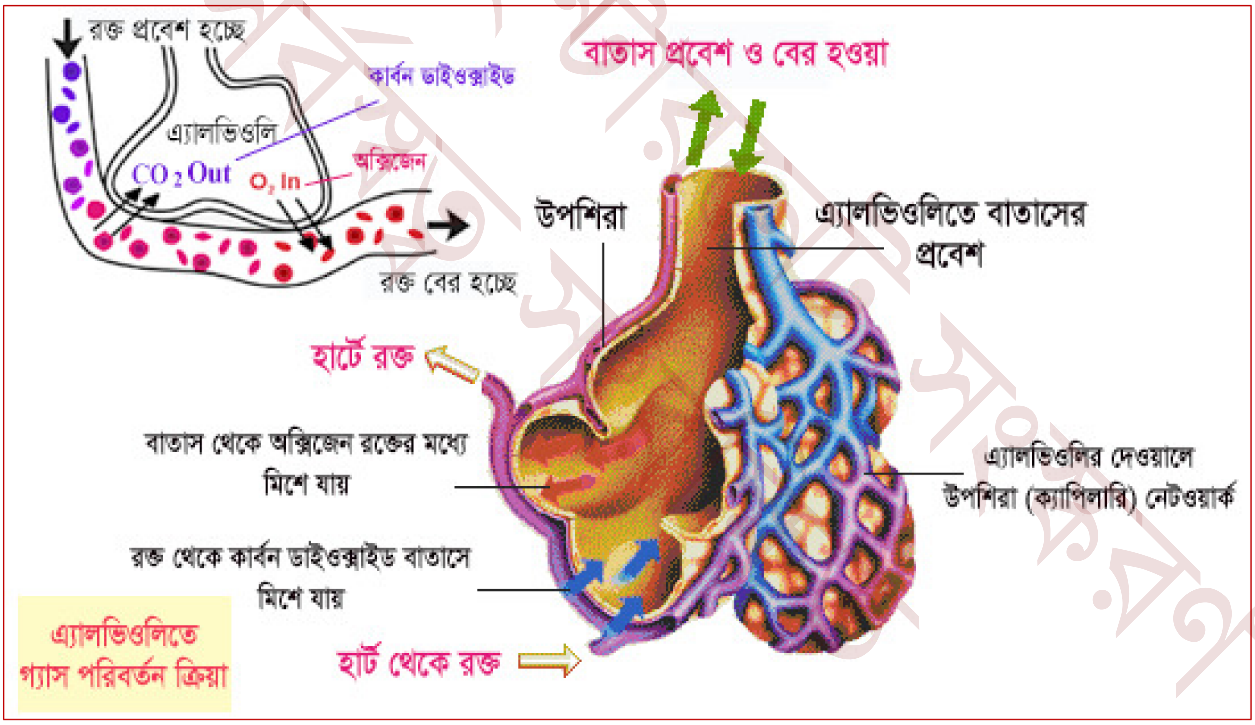


আমাদের ফুসফুস মূলত দু'টি। একটি ডানদিকে ও আরেকটি বামদিকে অবস্থিত। ডানেরটি বায়েরটি থেকে আয়তনে কিছুটা বড়। আয়তনে পার্থক্যের মূল কারণ হলো বায়ের দিকে আমাদের হৃদযন্ত্র অবস্থিত। সুতরাং বায়ের ফুসফুস কিছুটা ছোট্ট হওয়ার দরকার। উভয় ফুসফুস একটা আরেকটার সঙ্গে সংযুক্ত আছে। সংযুক্তির অংশ দিয়েই বাতাস ও রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ ও বের হয়।

গ্যাস এক্সচেঞ্জ এলাকা: বলেছি, আমাদের ফুসফুস একটি গ্যাস এক্সচেঞ্জ যন্ত্র। এবার জেনে নেবো, এই গ্যাস পরিবর্তন কোন্ অঞ্চলে সাধিত হয়। তিনটি আলাদা এলাকায় এই এক্সচেঞ্জ ক্রিয়া কার্যকরী হয়। এগুলো হলো: বাতাস-কক্ষ, রক্ত-কক্ষ ও টিস্যু-কক্ষ। টিস্যু-কক্ষের কাজ হলো বাতাস ও রক্তকে একত্রিত করা। এর ফলে গ্যাস পরিবর্তন ক্রিয়া সম্ভব হয়। একই সময় টিস্যু-কক্ষ উভয়কে যারতার অবস্থানে রাখাও নিশ্চিত করে। উভয় ফুসফুসের ভেতরে টিস্যু কক্ষের মোট অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১৪০ বর্গমিটার। শ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ-হওয়া গ্যাস বাতাস থেকে রক্তে মিশে এবং রক্ত থেকে বাতাসে মিশে। এই কাজটি টিস্যু-কক্ষের ভেতরই সংগঠিত

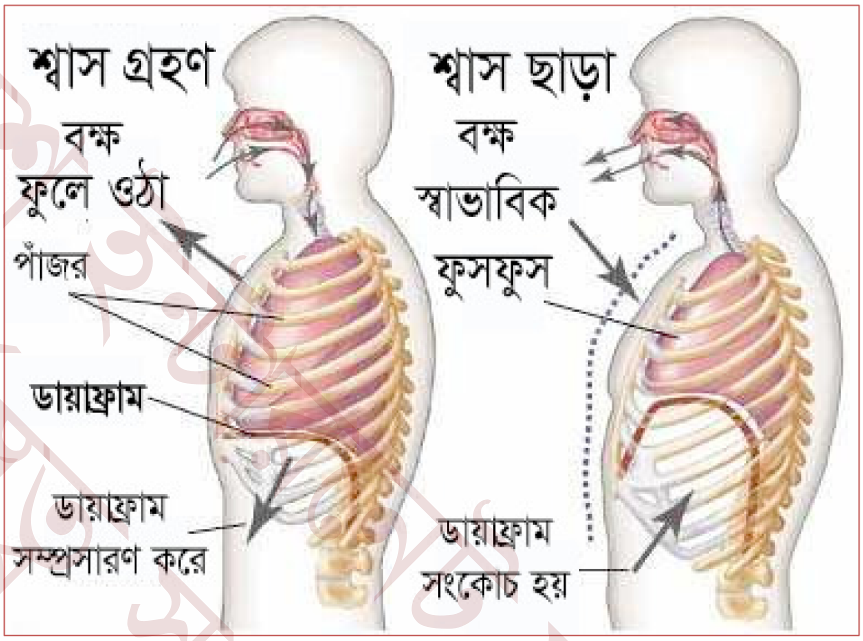
হয়।

মুখ, নাক ও ট্রাকিয়া: ফুসফুসে অক্সিজেন প্রবেশ হওয়া নিশ্চিত রাখতে কয়েকটি দেহযন্ত্র একসাথে সক্রিয় আছে। আগেই বলেছি, মুখ ও নাক দিয়ে বাতাসের সাথে গ্যাস ফুসফুসের ভেতর প্রবেশ করে। পথে থাকে **'লারিংক্স'** [larynx] এবং **'ট্রাকিয়া'** [trachea]। প্রথমটিকে বাংলায় বাগযন্ত্র বলে। বুঝতেই পারছেন, এর অর্থ হলো কথা বলার যন্ত্র। দ্বিতীয়টির বাংলা নাম হলো শ্বাসনালী। এ শব্দটিও স্ব-ব্যাখ্যাত। এই নালী বুকের কাছে যেয়ে দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এই উভয় নালীকে বলে **'ব্রঙ্কাই'** [bronchi]। বাংলায় ব্রঙ্কাই শব্দের প্রতিশব্দ হলো **'শ্বাসনালী!'**। আমি এখানে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দিয়েছি এ কারণে যে, ব্রঙ্কাই শব্দের অর্থ তা-ই লিখা আছে বাংলা একাডেমীর ইংরেজী বাংলা অভিধানে। ব্রঙ্কাই বহুবচন। এর একবচন হলো **'ব্রঙ্কাস'** [bronchus]। প্রতিটি ব্রঙ্কাস আবার অনেকগুলো শাখায় বিভক্ত হয়েছে। সবগুলো মিলে যে টিউব সিস্টেম সৃষ্টি হয়েছে তাকে বলে **'ব্রঙ্কাইয়াল টিউব্‌স'** [bronchial tubes]। আমাদের ফুসফুসের ভেতর এসব টিউব প্রবেশ করে আরো ছোট্ট ছোট্ট অংশে বিভক্ত হয়ে **'এ্যালভিওলি'** [alveoli] নামক অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির ফুসফুসে অন্তত ৬০ কোটি এ্যালভিওলি আছে। শ্বাস গ্রহণের পর এসব থলেতে অক্সিজেন প্রবেশ করে।



রক্তকোষের সঙ্গে অক্সিজেন মিশ্রণ ও কার্বন ডাইওক্সাইড বেরকরণ: এ্যালভিওলির চতুর্দিকে অসংখ্য উপশিরা বা ক্যাপিলারি আছে। সেখানে হৃদযন্ত্রের আরটারির মাধ্যমে রক্ত এসে অক্সিজেন নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। লাল রক্তকোষের সঙ্গে অক্সিজেন মিশে যায়। ইতোমধ্যে রগ বা শিরা থেকে কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস এ্যালভিওলিতে চলে আসে। আমরা যখন নিঃশ্বাসের মাধ্যমে বাতাস বের করি, তখন এই গ্যাস এ্যালভিওলি থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সুতরাং একবার শ্বাস নেওয়া ও বের করার মধ্যে একদিকে অক্সিজেন রক্তকোষে মিশে ও অপরদিকে কার্বন ডাইওক্সাইড বেরিয়ে আসে বাইর বায়ুমণ্ডলে। শিশুর জন্মের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই ক্রিয়া চলতে থাকে।

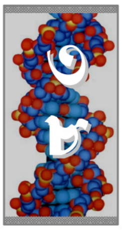
ডায়াফ্রাম [diaphragm]: আমাদের ফুসফুসের মধ্যে অক্সিজেন ঢুকাতে ও ফুসফুস থেকে কার্বন ডাইওক্সাইড বের করতে একটি দেহযন্ত্র সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে। এই যন্ত্রের নাম **'ডায়াফ্রাম'** [diaphragm]। আমাদের বুকের নীচের অংশে ডায়াফ্রামের অবস্থান। শ্বাস গ্রহণের সময় পেশীসর্বস্ব এই ডায়াফ্রাম সম্প্রসারণ করে এবং নিঃশ্বাসের সময় এটি সংকোচ হয়। সুতরাং শ্বাস-নিঃশ্বাস- হোক তা ঐচ্ছিক বা অনৈচ্ছিক, ডায়াফ্রামের সম্প্রসারণ ও সংকোচ ক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। নীচের চিত্রটি দেখুন।



প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আশাকরি রেসপিরেটরী সিস্টেমের মূল কাজ সম্পর্কে আপনারা এখন অনেকটা বেশী জ্ঞানবান হতে পেরেছেন। এই সিস্টেমের আসল কর্ম দেহের ভেতর জীবন রক্ষাকারী উপাদান অক্সিজেন গ্যাস রক্তের মধ্যে যোগান দেওয়া। একই সময় জীবনের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর কোষসৃষ্ট বর্জ্য কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস দেহ থেকে বায়ুমণ্ডলে বের করে ফেলা। আজকের লেকচার এটুকুই। আগামী লেকচারে যোগ দেওয়ার জন্য সবাইকে আবারো আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি। আমরা তখন ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের উপর আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ্! আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঙ. জীববিদ্যা: পরিচিতি ও কার্যকারিতা

বক্তৃতা ৩৮ : প্রাণীজগৎ

৩.৯. ডাইজেস্টিভ সিস্টেম [digestive system]

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! মানবদেহের উপর ধারাবাহিক আলোচনার অংশ হিসাবে আজ আমরা **'পরিপাকতন্ত্র'** [digestive system] নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি। মজাদার খাবার তৈরী করে মুখ-গহ্বরে আমরা প্রবেশ করি। গলদ্ধকরণের পর এই খাবার থেকে পুষ্টিকর দ্রব্য দেহে প্রবেশ করে রক্তের মাধ্যমে। আর বর্জ্য মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঠিক কোন্ উপায়ে এই পুরো তন্ত্রটি কাজ করে তা-ই জানা হবে আজকের লেকচারে- অন্তত এটাই আশা করছি। সুতরাং সবার মনোযোগ একান্ত কাম্য।

৩.৯. ক. পরিপাকতন্ত্রের দেহযন্ত্রাদি

সকল তন্ত্র সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য আমাদের পুরো দেহ তার যাবতীয় যন্ত্রাংশ দ্বারা সরাসরি ও নেপথ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তবে প্রত্যক্ষভাবে কিছু দেহযন্ত্র বিশেষ কোনো তন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে। পরিপাক বা ডাইজেস্টিভ তন্ত্রের সঙ্গে যে ক'টি মূল দেহাংশ জড়িত তাদের নাম ও ডিউটি সম্পর্কে জানা একান্ত দরকার। নিম্নে এ ব্যাপারে তথ্যাদি তুলে ধরছি।

মুখগহ্বর [mouth]: আমাদের মুখগহ্বর থেকেই পরিপাকতন্ত্রের ক্রিয়ার সূত্রপাত। যে মুহূর্তে আপনি মুখের ভেতর খাবার ঢুকিয়ে কামড় দেবেন সে মুহূর্ত থেকেই পরিপাকতন্ত্র সক্রিয় হয়ে ওঠবে। দন্ত দ্বারা কামড়ানোর মাধ্যমে খাদ্যকে ভেঙ্গে গলদ্ধকরণের জন্য উপযোগী করতে হয়। অবশ্য বোনাস হিসাবে আমরা উপভোগ করি খাদ্যের মজাদার স্বাদটুকু।

গলা [throat]: খাদ্যের পরবর্তী স্টেশন হলো গলা। এখান থেকে খাদ্য চলে যায় খাদ্যনালীতে।

খাদ্যনালী [esophagus]: এটা একটি দীর্ঘ পেশীসর্বস্ব টিউব বা নল। একে ইংরেজীতে **'ইসোফাগাস'** [esophagaus] বলে। গলা থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। খাদ্যকে গলা থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত পৌঁছানো এর কাজ। **'পেরিস্টালসিস'** [peristalsis] নামক পদ্ধতিতে খাদ্যনালী সংকোচ হয়ে হয়ে খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে ডেলিভারি দেয়। পাকস্থলীর সঙ্গে খাদ্যনালীর সংযুক্তির একটু আগে **'উচ্চ চাপসম্পন্ন'** একটি এলাকা আছে। এই অঞ্চলকে **'লোয়ার এসোফাগিয়েল স্ফিনস্টার'** [lower esophageal sphincter] বলে। বাস্তবে এখানে একটি কপাটক বা ভাল্ব [valve] আছে। এর কাজ হলো খাদ্যদ্রব্য ইসোফাগাসে ফেরৎ আসতে বারণ করা।

পাকস্থলী [stomach]: মানব পাকস্থলী একটি থলের মতো। তার দেওয়ালগুলো খুব শক্ত পেশী দ্বারা তৈরী। খাবার ধারণ করা ছাড়াও এটি মিশ্রণ ও চুর্ণন-যন্ত্র হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। খাদ্য পরিপাক করতে যেয়ে এ কাজ দু'টো সম্পাদন জরুরী। কিভাবে? ঝাঁকুনি কিংবা আছড়ানোর মাধ্যমে অবশ্যই নয়! পাকস্থলী খুব শক্তিশালী 'অম্ল' [acid] ও 'এনজাইম' [enzyme] বা অনুঘটক তৈরী করে। এগুলো খাদ্যকে ভেঙ্গে ভর্তা ও তরল পদার্থে পরিণত করে ছাড়ে। পাকস্থলী থেকে খাদ্য এই অবস্থায় বেরিয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে বা ছোট্ট আঁতে প্রবেশ করে।

ক্ষুদ্রান্ত্র [small intestine]: এটা একটি দীর্ঘ পাইপ। এতে আছে তিনটি অংশ: **'ডুওডেনাম'** [duodenum]**, 'জেজুনাম'** [jejunum] এবং **'ইলিয়াম'** [ileum]। এসব অদ্ভুত নামকরণ কেন? আমি বলতে পারবো না। তবে এগুলোর কাজ কি তা জেনে নিলেই হয়- তাই না? আপনি যদি ক্ষুদ্র অন্ত্রকে টেনে সোজা করেন তাহলে এর দৈর্ঘ্য হবে ২০ ফুট থেকেও বেশী! পেটের মধ্যে এটি পেঁচানো অবস্থায় আছে।

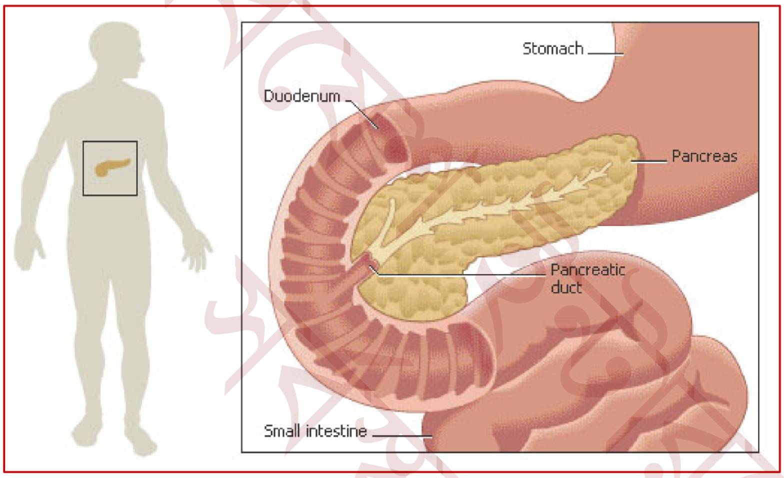
ছোট্ট এই আঁত পাকস্থলীর কাজকে আরো সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিতে থাকে। খাদ্যকে ভেঙ্গে আরো ক্ষুদ্র করে। তাকে সাহায্য করে আমাদের লিভার ও প্যানক্রিস। উভয় দেহযন্ত্র ছেড়ে দেয় বিভিন্ন ধরনের **'এনজাইম'** [enzyme] ও **'বাইল'** [bile] বা পিত্তরস। রক্ত থেকে বর্জ্য সরানো এবং খাদ্যে থাকা মেদকে পরিপাক করতে পিত্তরস সাহায্য করে। ছোট্ট আঁতেও সংকোচন ও **'টিপানোর'** কাজ অব্যাহত থাকে। কারণ পরিপাক করা খাদ্যকে বিভিন্ন রসায়নিক দ্রব্যের সাথে মেশানো ছাড়াও সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে।

ইতোমধ্যে অদ্ভুত নামকরণে ভূষিত ক্ষুদ্রান্ত্রের তিনটি অংশের কথা বলেছি। এবার এদের কাজ কি তা বুঝিয়ে দেবো। প্রথমটি তথা **'ডুওডেনাম'** এর দায়িত্ব হলো খাদ্য পরিপাকের কাজটি অব্যাহত রাখা। **'জেজুনাম'** ও **'ইলিয়াম'** অংশের কাজ হলো শরীরের জন্য উপকারী খাদ্যের মধ্য থেকে চুষে বের করা পুষ্টিকারক দ্রব্যাদি রক্তের মধ্যে যুক্ত করা। আর ক্ষুধা নিবারণ ছাড়া খাবার গ্রহণের মূল উদ্দেশ্যই এটি।

তিনটি দেহযন্ত্র আমাদের পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের সাহায্যার্থে একত্রে সক্রিয় থেকে খাবার পরিপাকের কাজটি

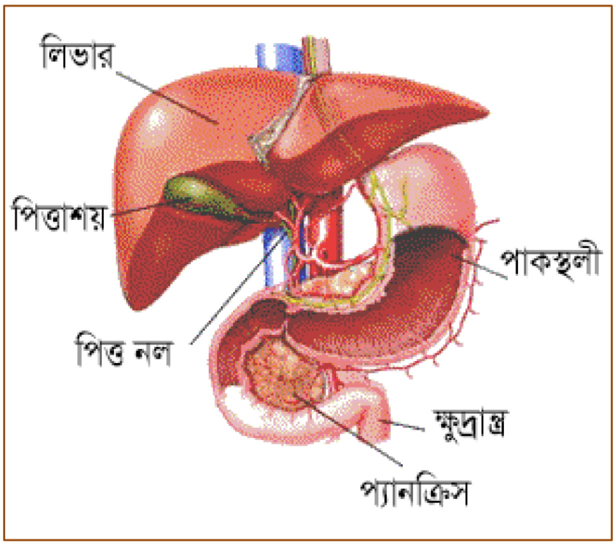
নিশ্চিত রাখে। আমরা এবার এ তিনটির উপর অতি সংক্ষিপ্তভাবে কিছুটা অতিরিক্ত বর্ণনা তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

প্যানক্রিস [pancreas]: একে বাংলায় **'অগ্ন্যাশয়'** বলে। এটি একটি দীর্ঘ, সরু গ্রন্থি। পেটের উপরিভাগে পাকস্থলী ও প্লীহার পেছনে আড়াআড়িভাবে এটি স্থাপিত আছে। প্যানক্রিস একই সঙ্গে পরিপাকতন্ত্রের জন্য জরুরী **'এনজাইম'** [enzyme] ও রক্তে চিনি নিয়ন্ত্রণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ **'হরমোন'** [hormone] **'ইনস্যুলিন'** [insulin] এবং **'গ্লুকেজন'** [glucagon] তৈরী করে। এছাড়া অন্ত্রের জন্য উপকারী **'পলিপেপটাইড'** [polypeptide] এবং **'সোমাটোসটাটিন'** [somatostatin] নামক দু'টি বস্তুও তৈরী করে এই প্যানক্রিস।



আমাদের ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য থাকাকালে প্রটিন, মেদ ও কার্বহাইড্রেট ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজন দাঁড়ায়। প্যানক্রিসে তৈরীকৃত এনজাইম এ কাজটি সারে। ফলে খাদ্যের উপকারী অংশটুকু রক্তের মাধ্যমে দেহের সকল টিস্যু, পেশী ও কোষে যেয়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

লিভার [liver]: বাংলায় লিভারকে **'যকৃৎ'** বলে। এটা মানবদেহের সর্ববৃহৎ গ্রন্থি। তার ফাংশন বা কার্যাবলী অত্যন্ত জটিল ও বহুমুখী। তার মৌলিক কাজ হলো: **ক. প্রটিন, কার্বহাইড্রেট** ও **মেদ** নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহারে সাহায্য করা; **খ.** সে **কলেস্টরেল** ও **পিত্তরস উৎপাদন করে; গ. লাল রক্তকোষ 'হিমোগ্লবিন'** [hemoglobin] ভেঙ্গে **'বাইলিরুবিন'** [bilirubin] নামক বর্জ্য তৈরী হয়, হাড্ডির মজ্জা ও যকৃৎ এটি তৈরী করে থাকে; **ঘ. কিছু ড্রাগ সৃষ্টি ও পরিচালনে যকৃৎ এটি সক্রিয়;** এবং **ঙ. দেহের জন্য উপকারী ও জরুরী কার্বহাইড্রেট পরিচলন ও সংরক্ষণে আমাদের লিভার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।**

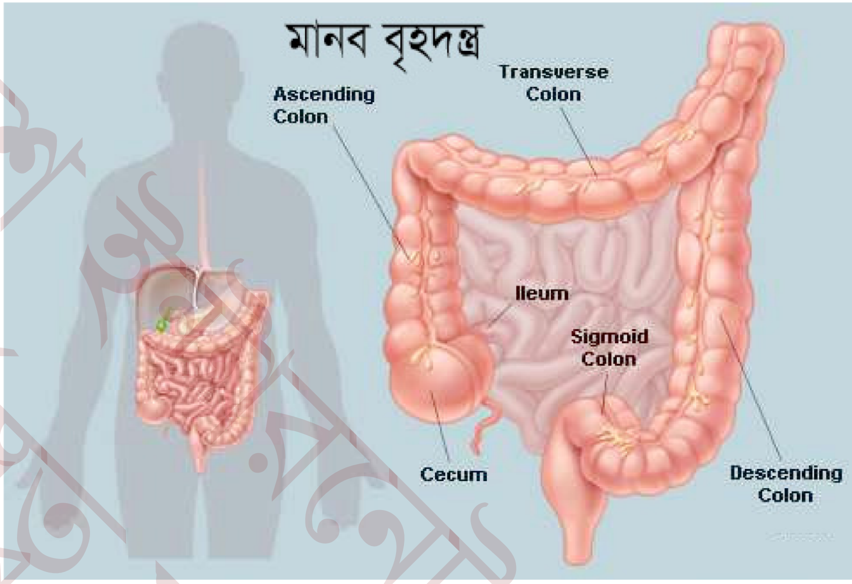


লিভারে সৃষ্ট পিত্তরস আমাদের পরিপাকতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। লিভারে এটি তৈরী হওয়ার পর নিম্নে ব্যাখ্যাত **'গলব্লাডার'** থলেতে জমা হয়।

৩. গলব্লাডার [gallbladder]**:** এটা ছোট্ট একটি থলে। এতে রক্ষিত থাকে লিভারে সৃষ্ট পিত্তরস। বাংলায় গলব্লাডারকে 'পিত্তকোষ' বা **'পিত্তাশয়'** বলে। কথ্য ভাষায় **'পিত'** বলে সম্বোধন করা হয়।

লিভার থেকে পিত্তরস **'সিস্টিক ডাক'** [cystic duct] নামক একটি রাস্তায় পিত্তাশয়ে প্রবেশ করে। আমরা যখন খাবার গ্রহণ করি, পিত্তাশয় কিছুটা সংকোচ হয়। এর ফলে ভেতরে সংরক্ষিত তরল পিত্তরস বেরিয়ে আসে ও প্রবেশ করে ছোট্ট অন্ত্রে। পিত্তরস পরিপাক কার্যে সহায়তা করে।

বৃহদন্ত্র [large intestine]**:** এটাকে বাংলায় ‘ভড়’ও বলে। ইংরেজীতে একে **‘কলন’** [colon] নামেও সম্বোধন করা হয়। ছোট্ট অন্ত্র থেকে তরল খাদ্য এতে প্রবেশ করে। এই অন্ত্রের মূল কাজ হলো খাদ্যের পানি চুষে নেওয়া; বিভিন্ন বস্তুর সল্যুশন যেমন লবণ (সোডিয়াম-ক্লোরিন) নিয়ন্ত্রণে রাখা; মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত খাদ্যের বর্জ্য (মল) গুদামজাত করে রাখা; এবং **‘মিউকাস’** [mucus] নামক পিচ্ছিল তরল পদার্থ বানানো। এই পদার্থ অন্ত্রের বস্তুকে চলন্ত রাখতে সাহায্য করে।

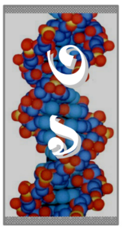


ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের সংযুক্তি স্থলে একটি কপাটক আছে। এই ভাল্ব দিয়ে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ অন্ত্রে প্রত্যেক দিন অন্তত দেড় থেকে দুই লিটার খাদ্যদ্রব্য প্রবেশ করে। তবে বৃহদন্ত্র এ থেকে অধিকাংশ পরিপাকযোগ্য বস্তু বের করে দেহের মধ্যে চুষে নেয়। বাকী যা থাকলো তা-ই **‘মল’** হিসাবে গণ্য। এই অংশ আর দেহের জন্য পরিপাকযোগ্য কিংবা উপকারী নয়। মলদ্বার দিয়ে তা অবশেষে বেরিয়ে আসে। মলের মধ্যে অপরিপাকযোগ্য বস্তু ছাড়াও আরো থাকে অকেজো মিউকাস কোষ, মৃত ব্যাক্টেরিয়া বা জীবাণু এবং ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা পরিপাক হয় নি এমন খাদ্যাংশ।

প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ! আজকের লেকচারের ইতি এক্ষুণি টানবো। মানবদেহের বাকী তিনটি তন্ত্রের উপর আলোচনার দরকার। লেকচার ৩৯ ও ৪০ দ্বারা তা কাভার করার আশা রাখি। এটাও আশা করে বিদায় নিচ্ছি, আপনারা সবাই ওসব লেকচারে উপস্থিত হবেন ও মনোযোগসহ শ্রবণ করবেন। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

৬. জীববিদ্যা: পরিচিতি ও কার্যকারিতা

বক্তৃতা ৩৯ : প্রাণীজগৎ

৩.১০. ইমিউন সিস্টেম [immume system]

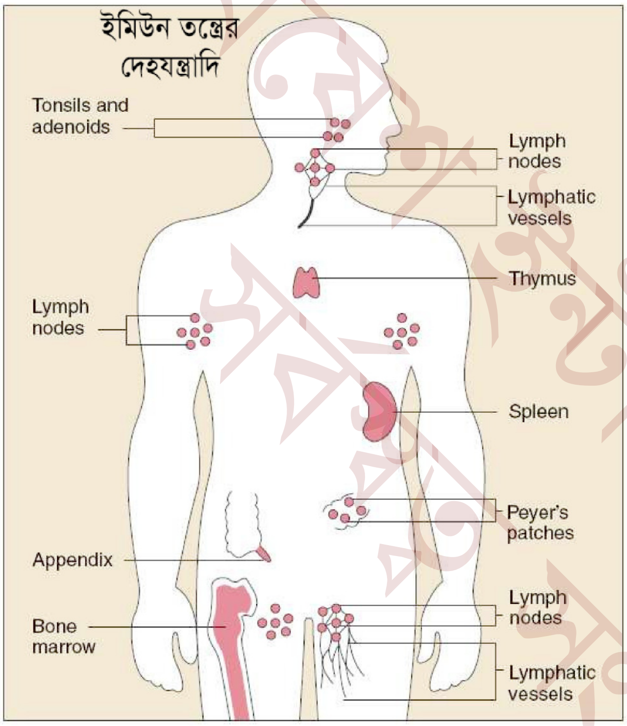
শ্রোতা বন্ধুরা! ওয়েলকাম টু লেকচার ৩৯। মানবদেহের উপর আমাদের আলোচনা আজও অব্যাহত থাকবে। বিজ্ঞানীরা মানবদেহের ফাংশনকে মোট ১২টি তন্ত্রে বিভক্ত করে গবেষণা করে থাকেন। ইতোমধ্যে আমরা ৯টি তন্ত্রের উপর তথ্যানুসন্ধান চালিয়েছি- অতি সংক্ষেপে অবশ্যই। আজকের লেকচারের ফোকাস হবে দশম তন্ত্র **'রোগ প্রতিরোধ'** [immune] নিয়ে- অতি সংক্ষেপে অবশ্যই! আশা রাখি সকলের মনোযোগ সুদৃঢ় থাকবে।

৩.১০. ক. ইমিউন পরিচিতি

আমাদের পারিপার্শ্বিকতায় অসংখ্য বস্তু আছে যা আমাদের দেহের জন্য ক্ষতিকর ও রোগ-ব্যাধির কারণ। পুরো দেহযন্ত্র সঠিকভাবে কার্যকরী হওয়া ও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত রাখতে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী ডিফেন্স সিস্টেমের। এই ডিফেন্স সিস্টেমের নামই **'ইমিউন'** [immune] বা রোগ প্রতিরোধ।

প্রতিরক্ষার মূল হলো **'দুশমন সনাক্তকরণ'**। হামলার পূর্বে দুশমনকে চিনতে হবে। দেহের জন্য ক্ষতিকর সকল বস্তুকে বলে 'এ্যান্টিজেন' [ধহঃরমবহ]। কোষ, ভাইরাস, ফাঙ্গি (ছত্রাক) ও ব্যাক্টেরিয়ার (জীবাণু) উপরে এ্যান্টিজেন

বস্তু অবস্থান করে। ইমিউন সিস্টেম এই এ্যান্টিজেন সনাক্ত করার পর ওসব ক্ষতিকর উপাদান ধ্বংস করে দেয়। ফরেন (অপরিচিত) বস্তু, ড্রাগ, কেমিক্যাল, বিষদ্রব্য ইত্যাদিতেও এ্যান্টিজেন থাকতে পারে। যে কোন বস্তুতে এ্যান্টিজেন থাকলেই 'ইমিউন প্রতিক্রিয়া' [রসসঁহব ৎবংঢ়ড়হংব] হয়। এ্যান্টিজেনই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় করে তুলে। অর্থাৎ এ্যান্টিজেন যুক্ত দ্রব্যাদি দেহের জন্য ক্ষতিকর। ইমিউন সিস্টেম এসব দ্রব্য ধ্বংস করে দেয়। আমাদের দেহে প্রটিন নামক কোষ আছে। এগুলো দেহের জন্য উপকারী। প্রটিনেও এ্যান্টিজেন আছে। কিন্তু ইমিউন সিস্টেম এসব এ্যান্টিজেন কি তা বুঝে। সুতরাং এ্যান্টিজেন যুক্ত প্রটিন ইমিউন সিস্টেমের আক্রমণ থেকে নিরাপদ।



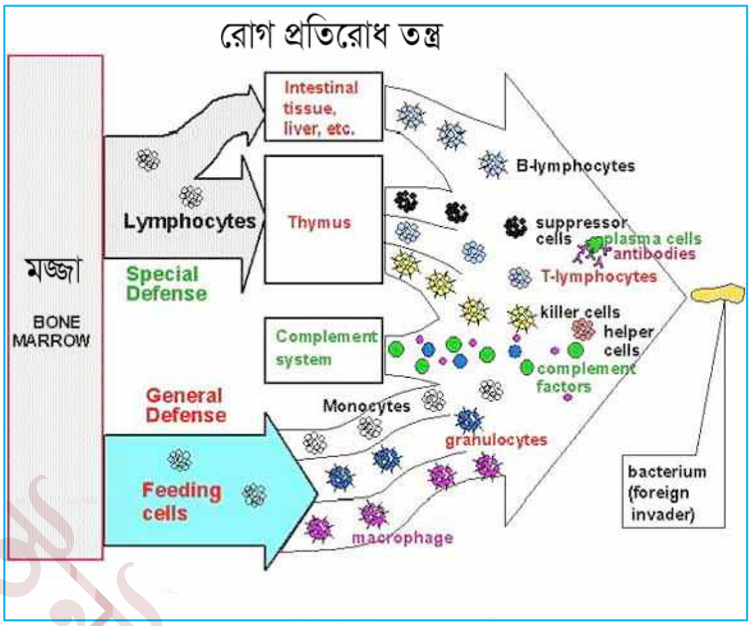
৩.১০.খ. রোগ প্রতিরোধে সক্রিয় বিভিন্ন দেহযন্ত্র ও কোষ

দেহের ভেতর একদল কোষ ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিশেষ দেহযন্ত্র আছে। রোগ-ব্যাধি প্রদানকারী বিভিন্ন উপাদান যেমন রোগ জীবাণু কিংবা দেহের জন্য ক্ষতিকর এ্যান্টিজেন যুক্ত কোন বস্তু ইত্যাদির উপর এগুলো আক্রমণ চালায়। ফরেন ক্ষতিকর বস্তু ধ্বংস করে আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়তা করে।

আমাদের দেহে জীবাণু, ভাইরাস ও ছত্রাক জাতীয় রোগসৃষ্টিকারী উপাদান যাতে সহজে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা দেহের চামড়া নিশ্চিত করে রেখেছে। কিন্তু এরপরও রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষতিকর উপাদান দেহের ভেতর বিভিন্ন উপায়ে প্রবেশ করে ফেলে। সুতরাং দেহকে রক্ষার্থে দলে দলে কোষ, মলিকিউল এবং অরগ্যান বা দেহযন্ত্র মিলে আক্রমণকারী বস্তুকে ধ্বংস করার কাজে নিয়োজিত আছে। রোগ প্রতিরোধ সিস্টেম কতটুকু সফল তার উপর নির্ভর করে কোনো ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষা।

দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দু' ধরনের। প্রথমটি হলো জন্মগত এবং দ্বিতীয়টি অভিযুজ্য তথা প্রয়োজনমাফিক। জন্মগত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা হলো সাধারণ- যেমনঃ চামড়া, অশ্রু, শ্লেষ্মা, থু-থু, কাটা-পোড়ার পর দ্রুত টিস্যু ফুলে ওঠা ইত্যাদি প্রাথমিক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করে। সুতরাং প্রাথমিক এসব জন্মগত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আমাদের জন্য বিশেষ উপকারী। কিন্তু এরপরও এগুলো যথেষ্ট নয়। কারণ আত্মরক্ষার এই প্রথম প্রতিরক্ষা লাইন যদি কোন ক্ষতিকর উপাদান অতিক্রম করে বসে- যা প্রায়ই ঘটে, তাহলে কী হবে? এ ক্ষেত্রে ওসব বিশেষ মলিকিউল, কোষ ও যন্ত্রাদি মিলে আরেক প্রতিরক্ষা লাইন তৈরী করে। এই ডিফেন্স সিস্টেম অনেকটা শত্রুর স্বরূপ-নির্ভর- অর্থাৎ বিশেষ শত্রুকে পরাজিত করার একটি নতুন উপায়। আর এখানেই শেষ নয়। অনুরূপ শত্রু দ্বারা আবারো আক্রান্ত হলে একই ভাবে ডিফেন্স তৈরীর একটি স্থায়ী ব্যবস্থাও রোগ প্রতিরোধ সিস্টেম করে রাখে। শেষোক্ত এই অভিযুজ্য ক্ষমতা আমাদের দেহে থাকার দরুনই স্থায়ী ভেকসিনেশন (টিকাদান) সম্ভব হয়।

অভিযুজ্য রোগ প্রতিরোধ সিস্টেমের চারটি আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ আক্রমণকারী দেহে প্রবেশের পর এটা সক্রিয় হয়ে ওঠে- এর আগে নয়। দ্বিতীয়তঃ এটা একমাত্র ঐ বিশেষ আক্রমণকারীকে হামলা করে। তৃতীয়তঃ প্রথমবার হামলার পর সফল হওয়ার পরে এই ক্ষমতাটি সংরক্ষিত থাকে যাতে ভবিষ্যতে অনুরূপ আক্রমণকারীকে ধ্বংস করা যায়। বছরের পর বছর পর্যন্ত এই ব্যাপারটি সংরক্ষিত থাকে এবং দ্বিতীয়বার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তা আরো সফলতা অর্জন করে। চতুর্থতঃ এটা সাধারণ দেহ-বস্তুকে আক্রমণ করে না- শুধুমাত্র ওসব জিনিসই হামলার শিকার হয় যেগুলো নন-আত্ম (আমাদের দেহের নয়, বা এলিয়েন) বলে পরিচিত হয়।



অভিযুজ্য রোগ প্রতিরোধ সিস্টেমের দু'টি উপশাখা আছে। এগুলো হলো হিউমোরাল ও কোষ মধ্যস্থতাকারী রোগ প্রতিরোধ প্রতিক্রিয়া। প্রথম ধরনের প্রতিক্রিয়ার সময় 'এ্যান্টিবডি' [ধহঃরনড়ফু] নামক এক ধরনের প্রোটিন দেহের তরল পদার্থ ও রক্তের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। এসব প্রোটিন আক্রমণকারীর দেহে জড়িয়ে ধরে তাকে খতম করে ছাড়ে। হিউমোরাল প্রতিক্রিয়া কোষের বাইরে সংঘটিত হয়- যেমন জীবাণু এবং বিষাক্ত জিনিস ধ্বংসকরণ। এই একই প্রতিক্রিয়া কোষের ভেতর ভাইরাস প্রবেশেও বাধাদান করে থাকে।

যখন কোষ-মধ্যস্থতাকারী প্রতিরোধ ক্রিয়াশীল হয় তখন, যেসব কোষ অন্য কোষকে ধ্বংসের ক্ষমতা রাখে ওগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। তবে এরা বেপরোয়াভাবে কোষ ধ্বংসের কাজে লেগে যায় না- একমাত্র ওসব কোষকে তারা আক্রমণ করে ধ্বংস করে, যাদের ভেতর থেকে ক্ষতিকর 'এ্যান্টিজেন' [ধহঃরমবহ] (রোগ জীবাণুর মতো উপাদান) বেরিয়ে আসে কিংবা যেসব কোষ নষ্ট হয়ে পড়েছে। এভাবে বেছে বেছে কোষ ধ্বংসের ক্ষমতা এরা রাখে। বিজ্ঞানীরা বলেন, এসব কোষ এরূপ 'বুদ্ধিসম্পন্ন' ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে আমাদের দেহকে সংরক্ষণের নিমিত্তে। শুধু তাই নয়- ক্যান্সারের মতো রোগ দ্বারা 'কপি' করা কিছু কোষকেও এরা ধ্বংস করে দিতে পারে। আমরা অন্যত্র রোগ-প্রতিরোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত এসব কোষ নিয়ে আলোচনা করেছি। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আবারো কিছু তথ্য তুলে ধরলাম।

সাদা রক্তকোষঃ এই গ্রুপে আছে **'লিমফোসাইট'** [lymphocyte], **'মনোসাইট'** [monocyte], **'ইওসিনোফিল'** [eosinophil], 'বেসোফিল' [basophil] এবং **'নিউট্রোফিল'** [neutrophil] কোষসমূহ। এগুলো মূলত দেহের রোগ-প্রতিরোধ তন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত। **'লিমফোসাইট'** ক্যান্সার কোষকে হামলা করে বিভিন্ন এ্যান্টিবডি তৈরী করে। এছাড়া এটাই ফরেন টিস্যু অগ্রাহ্যের জন্য দায়ী। **'মনোসাইট'** হাড্ডির মজ্জা ছাড়াও প্লীহায় তৈরী হয়। এর কাজ হলো মৃত কোষাংশ ও ফরেন বস্তু গিলে ধ্বংস করা। **'ইওসিনোফিল'** [eosynophil] এলার্জিক প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী। এছাড়া পরজীবী জীবাণু ধ্বংসে এ কোষগুলো ভূমিকা রাখে। **'বেসোফিল'** রক্তের মধ্যে দোষ-ত্রুটি থাকলে সক্রিয় হয় ও তা নিশ্চিহ্ন করে। রক্তের মধ্যে বেশী পরিমাণ কোষ হলো **'নিউট্রোফিল'**। এটা দেহের

রোগ-প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে ইনফেকশন থেকে রক্ষার্থে এটা বিশেষ কার্যকরী।

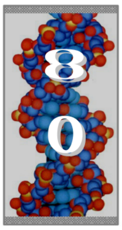
প্লেটলেট [platelet] এর মূল কাজ হলো রক্তের মধ্যে জমাট সৃষ্টি করা। চামড়া বা টিস্যু কেটে গেলে জমাট বাঁধা একান্ত জরুরী। অন্যথায় রক্তঝরা বন্ধ হবে না। প্লেটলেট ছাড়া তা সম্ভব নয়।



প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! মানবদেহের ইমিউন বা রোগ প্রতিরোধ তন্ত্রের উপর বক্তৃতা এটুকুই। অতিরিক্ত আর কিছু বলা যাচ্ছে না। বাস্তবে, মানব বায়োলজি [যঁসধহ নরড়ষড়মু] বিজ্ঞানের একটি 'স্পেশালাইজ্‌ড' বিষয়। এটা আসলে মেডিকেল বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং এ বিষয়টির উপর আমার নিজেরও জ্ঞান সীমিত! আমরা যা আলোচনা করছি তা 'পরিচিতিমূলক' তথ্যাদি মাত্র। আর এ কারণেই আগামী লেকচারেও মানবদেহের পুনর্জনন তন্ত্র নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন। আশারাখি সবাই উপস্থিত হবেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

ঙ. জীববিদ্যা: পরিচিতি ও কার্যকারিতা

বক্তৃতা ৪০ : প্রাণীজগৎ

৩. ১১. পুরুষ রিপ্রোডাক্টিভ [male reroductive] এবং ১২. মহিলা রিপ্রোডাক্টিভ [female reproductive] তন্ত্র

লেকচার ৪০-এ সবাইকে জানাচ্ছি উষ্ণ স্বাগত। প্রিয় সন্ধানী বন্ধুরা! আজকের লেকচারের বিষয়বস্তু কিছুটা স্পর্শকাতর। ভাবছিলাম এর উপর বক্তব্য প্রদান করবো না। কিন্তু আমরা বিজ্ঞানের উপর আলোচনা করছি। মানবদেহের সম্ভবত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি তন্ত্রকে উপেক্ষা করা আদৌ ঠিক হবে না, যদিও বিষয়টি খুব **'টাচি'!** যাক গুরুত্বপূর্ণ এই তন্ত্রটি হলো পুনর্জনন। ইংরেজীতে বলে 'reproduction'। আশাকরি শ্রোতা বন্ধুরা আমাকে ক্ষমা করবেন। বিভিন্ন বিষয় বুঝাতে যেয়ে ইচ্ছাকৃতভাবেই **'ছবি'** ও **'চিত্রাঙ্কন'** নোটে সম্পৃক্ত করি নি। দু'টি মাত্র ছবি আছে। এ দু'টো দ্বারা পুরুষ ও নারীর যেসব দেহাংশ পুনর্জননের সঙ্গে জড়িত শুধু ওগুলোই দেখানো হয়েছে।

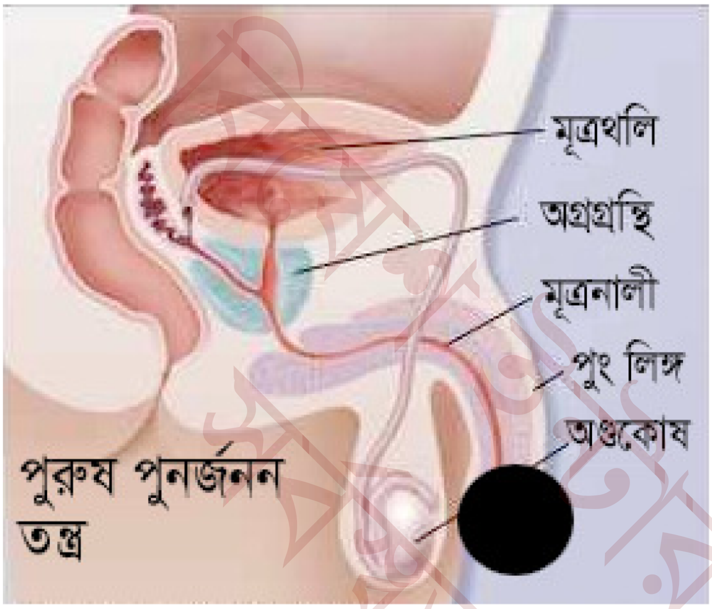
৩. ১১. ক. পুরুষ পুনর্জনন দেহযন্ত্র [organs]

পুরুষের পুনর্জনন দেহযন্ত্রগুলোর মূল কাজ ৩টি:

১. শুক্র কোষ ও পিচ্ছিল তরল পদার্থ [sperm and semen] তৈরী এবং এগুলোকে পরিবহন নিশ্চিত করা।

২. যৌনক্রিয়ার সময় মহিলা পুনর্জনন পথে শুক্রকোষ ছেড়ে দেওয়া।

৩. পুরো পুনর্জনন ক্রিয়াকে সক্রিয় ও প্রাণবন্ত রাখতে **‘পুরুষ যৌন উদ্দীপক রস’** [male sex hormones] তৈরী করা।



পুনর্জননের সঙ্গে সম্পৃক্ত দেহযন্ত্রাদি পুরুষদের ক্ষেত্রে মূল দেহের বাইরে অবস্থান করে। অপরদিকে মহিলাদের ক্ষেত্রে ওগুলোর অবস্থান দেহের ভেতর। পুরুষদের দেহযন্ত্রাদির উপর এবার একে একে ব্যাখ্যা তুলে ধরবো।

পুং লিঙ্গ [penis]: যৌনক্রিয়ার মূল পুরুষাঙ্গ এটি। এর মধ্যে তিনটি অংশ আছে: ১. মূল: তলপেটের দেওয়ালে এটি সংযুক্ত, ২. কাণ্ড: সম্পূর্ণ বাইরের অংশ এবং ৩. মাথা: এটা আকারে মোচাকার। জন্মক্ষণে এই অংশটুকু পাতলা চামড়ায় আবৃত থাকে। স্বাস্থ্যরক্ষার্থে এই চামড়াটুকু কেটে ফেলা হয়ে থাকে। এভাবে কাটার নামই **খত্না**। মাথায় একটি ছোট্ট রাস্তা আছে যার মধ্য দিয়ে প্রস্রাব ও শুক্রকোষ বেরিয়ে আসে।

পুং লিঙ্গ সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা বলেছি তা শ্রোতাদের কারো অজানা আছে বলে আমি মনে করি না। এরপরও পরিপূর্ণতার খাতিরে এসব কথা বলতে হলো। অজানা আরো অনেক ব্যাপার আছে যা এখনই বুঝিয়ে দেবো। আপনারা যদি অনুমতি দেন! যেমন:

ক. পুরুষ লিঙ্গের মধ্যে আছে বেশ কিছু অতিসংবেদী **‘স্নায়ুকোষ’** [nerve cell]।

খ. তিনটি বৃত্তাকার কক্ষ মিলে এটি তৈরী হয়েছে। এসব চেম্বার বিশেষ ধরনের স্পঞ্জের মতো টিস্যু দ্বারা সৃষ্ট। এসব টিস্যুর মধ্যে বড়ো বড়ো ফাঁকা জায়গা আছে। যৌন উত্তেজনা হলেই এসব ফাঁকা জায়গা রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

গ. পুনর্জনন কোষের নাম শুক্র। যে তরল পদার্থে সকল শুক্র থাকে তার নাম **‘সিমেন’** [semen]। অসংখ্য শুক্রকোষসহ সিমেন বেরিয়ে আসে। শুক্রকোষ নারীদের ডিম্বকোষের ভেতর প্রবেশ করলেই গর্ভধারণ ক্রিয়া শুরু হয়। সিমেন বের হওয়ার সময় এর সাথে প্রস্রাব যাতে যুক্ত না হয় সেজন্য অগ্রগ্রন্থির মুখ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

খ. **অণ্ডকোষের থলে [scrotum]:** একে বাংলায় **‘মুষ্ক’** বলে। এটি একটি বিশেষ ডিজাইনের থলে। অণ্ডকোষ এরই মধ্যে অবস্থান করে। অনেক নার্ভ সেল ও রক্তশিরায় পরিপূর্ণ পুরো থলেটি। এটা **‘আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের’** কাজও করে। কারণ একটি বিশেষ তাপমাত্রায় পুরুষের শুক্রকোষ উৎপাদন হয়ে থাকে। আমাদের দেহের অন্যান্য অংশের তাপমাত্রা থেকে কিছুটা কম তাপ থাকতে হবে অণ্ডকোষে। মুষ্কের দেওয়ালে কিছু বিশেষ পেশী আছে। এদের কাজ হলো প্রয়োজনে পুরো থলেকে সংকোচ কিংবা বড়ো করা। এভাবে করার উদ্দেশ্য হলো বেশী ঠাণ্ডার সময় অণ্ডকোষকে দেহের তাপ দ্বারা উষ্ণকরণ ও গরমের সময় ঠাণ্ডাকরণ। সুতরাং গ্রীষ্মকালে অণ্ডকোষের থলের আয়তন বৃদ্ধি ও শীতে সংকোচন হওয়ার কারণ এখন সবার নিকট স্পষ্ট হলো। ঠিক না?

গ. অণ্ডকোষ: ইতোমধ্যে শ্রোতাবন্ধুরা অণ্ডকোষের মূল কাজ কি তা অবশ্য জেনে নিয়েছেন: এটা তৈরী করে পুরুষ পুনর্জনন তন্ত্রের মূল উপাদান শুক্রকোষ। মুষ্কে থাকা উভয় অণ্ডকোষ আকারে ডিম্বাকৃতির। **'স্পারমেটিক কর্ড'** [spermatic cord] নামক কিছু টিস্যু দ্বারা উভয়টি সংরক্ষিত। আমি জানতাম সকল পুরুষের দু'টি অণ্ডকোষ আছে। কিন্তু এ লেকচারের নোট লেখার সময় তথ্য বেরিয়ে আসলো, কিছু মানুষের নাকি একটি মাত্র অণ্ডকোষ আছে! যাক শুক্রকোষ সৃষ্টির কারখানা এসব অণ্ডকোষ **'টেস্টোস্টেরোন'** [testosterone] নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ যৌন উদ্দীপক রসও [sex hormone] বানায়। অণ্ডকোষের ভেতর অসংখ্য ঘোরানো পেঁচানো **'পাইপ'** আছে। এগুলোকে বলে **'সোমনিফেরাস টিউবিউল্'** [somniferous tubule]। এসব পাইপই শুক্রকোষ সৃষ্টির কাজটি আঞ্জাম দেয়।

৩. ১২. মহিলা পুনর্জনন দেহযন্ত্র [organs]

পুনর্জনন একটি যৌথ ক্রিয়ার নাম। অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর পুনর্জনন তন্ত্র একটা আরেকটার সম্পূরক ব্যবস্থা। আমরা ইতোমধ্যে পুরুষদের পুনর্জনন তন্ত্রের উপর আলোচনা করেছি। এবার নারীদের পুনর্জননের উপর কিছুটা তথ্য তুলে ধরবো। এবারও বলে রাখি, বিজ্ঞানের উপর এই লেকচারসমূহ অপূর্ণ থেকে যাবে যদি আমরা **'টাচি'** এই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে যাই। তবে শ্রোতা বন্ধুদেরকে আশ্বস্ত করছি এই বলে যে, আমাদের আলোচনা হবে সীমিত ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানভিত্তিক। মহিলা পুনর্জননের তন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি মাত্র চিত্র এখানে তুলে ধরবো। সঙ্গত করণেই এই স্বেচ্ছা-সীমিতকরণ।

সকল দেহতন্ত্রের মতো মহিলা পুনর্জনন তন্ত্রটিও কয়েকটি বিশেষ কার্য সাধনে ডিজাইন করা হয়েছে। এটার মূল কাজ হলো পুনর্জননের জন্য গুরুত্বহ **'নারী ডিম্বকোষ'** [female egg cell] তৈরী করা। সঠিক স্থানে এই ডিম্বকোষ পৌঁছানোর জন্য একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা তন্ত্রের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়েছে। যেখানে ডিম্বকোষ পুরুষের শুক্রকোষ দ্বারা ফলনশীল হবে সে স্থানকে আমরা **'ফলনশীলতার এলাকা'** [site of fertilization] বলতে পারি। **ফ্যালোপিয়ান টিউব** [Fallopian tube] নামক একটি পাইপ হলো এই এলাকা। এখানেই **'গর্ভধারণ'** [pregnant] ক্রিয়াটি সংঘটিত হয়।



গর্ভধারণ মুহূর্ত শেষে ডিম্বকোষটি **'ফলনশীল'** [fertilized] হলো। নারীদের গর্ভাশয় [uterus] হলো শিশু বেড়ে ওঠার স্থান। ফলনশীল ডিম্বকোষ গর্ভাশয়ের দেওয়ালে যেয়ে লটকে থাকে। এ পর্যায়ই হলো গর্ভধারণের প্রাথমিক স্তর। কিন্তু এ স্তরে না পৌঁছলে এই ডিম্বকোষ ও অন্যান্য বস্তুর কি হবে? অর্থাৎ পুরুষের শুক্রকোষ দ্বারা ফলনশীল না হলে গর্ভধারণের জন্য প্রস্তুতি সংক্রান্ত বস্তুসমূহ তো বর্জ্য হয়ে গেল। তন্ত্রকে এরূপ ডিজাইন করা হয়েছে যে, প্রতি মাসে গর্ভধারণে ব্যর্থ হওয়ার পর যাবতীয় অকেজো বস্তু **'পিরিওডের'** বা **'মাসিকের'** [menstrual cycle] মাধ্যমে বাইরে নির্গত হয়ে যায়। মহিলা পুনর্জনন তন্ত্র খুব জরুরী একটি যৌন উদ্দীপক রসও তৈরী করে। আমরা এবার পুনর্জননের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন দেহযন্ত্র ও ব্যবস্থার উপর আরো কিছুটা আলোচনা করবো। আশা করি শ্রোতা বন্ধুরা এ থেকে অতিরিক্ত জানতে সক্ষম হবেন মানব পুনর্জনন ক্রিয়াটি সম্পর্কে।

৩. ১২. ক. মহিলা পুনর্জনন দেহাংশ [organs]

মহিলা পুনর্জনন তন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে বেশ কয়েকটি দেহাংশ। এর মধ্যে **'ইউটারাস'** [uterus], **'অভারিজ'** [ovaries] এবং **'ফ্যালোপিয়ান টিউব্‌স'** [fallopian tubes] এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা একে একে এ তিনটির উপর আরো কিছু তথ্য তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

'ইউটারাস' [uterus]: একে বাংলায় গর্ভাশয় বলে। এটা ভেতরে ফাঁকা একটি কক্ষ যেখানে শিশু বেড়ে ওঠে জন্মের পূর্ব পর্যন্ত। গর্ভের শিশুকে বিজ্ঞানের ভাষায় **'ফিটাস'** [fetus] বলে। বাংলায় শব্দটির অর্থ ভ্রূণ।

গর্ভাশয় দু'টি অংশে বিভক্তঃ ছোট্ট নিম্নাংশ যাকে **'সার্ভিক্স'** [cervix] বলে। এ অংশ যোনির সঙ্গে সংযুক্ত। দ্বিতীয় অংশের নাম **'কর্পাস'** [corpus]। গর্ভাশয়ের মূল অংশ এটি। এটা শিশু বেড়ে ওঠার সময় প্রয়োজনে আয়তনে বড় হতে পারে। পুরুষের শুক্রকোষ সার্ভিক্সে স্থাপিত একটি নালা দিয়ে প্রবেশ করে। একই নালা দিয়ে পিরিওডের রক্তও বের হয়ে যায়।

'অভারিজ' [ovaries]: একে বাংলায় ডিম্বাশয় বলে। এটা ডিম্বাকৃতির গ্রন্থি। গর্ভাশয়ে উভয় দিকে এই গ্রন্থির অবস্থান। বুঝাই যাচ্ছে, অভারিজের কাজ হলো ডিম্বকোষ ও উদ্দীপক রস তৈরী করা।

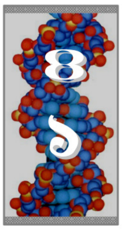
ফ্যালোপিয়ান টিউব্‌স [fallopian tubes]: এগুলো সরু পাইপের মতো। গর্ভাশয়ের উপরের অংশে উভয়টি সংযুক্ত। ডিম্বকোষ এদের ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করে। ফ্যালোপিয়ান টিউব্‌স মূলত সুড়ঙ্গ পথের মতো। ডিম্বকোষ ডিম্বাশয় থেকে এসব সুড়ঙ্গ পথে গর্ভাশয়ে আসে। অবশ্য **'ফলনশীন'** হওয়ার জন্য ডিম্বকোষকে গর্ভাশয়ে পৌঁছা জরুরী নয়- পথে ওসব সুড়ঙ্গে থাকাবস্থায়ই শুক্রকোষ তাদের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই হয়। ডিম্বকোষের ভেতর সাধারণত একটি মাত্র শুক্রকোষ প্রবেশ করলেই গর্ভধারণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।

ডিম্বকোষ ফ্যালোপিয়ান টিউবসে **'ফার্টিলাইজ্‌ড'** [fertilized] হওয়ার পর ধীরে ধীরে গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে। প্রথমে এই ফলনশীন ডিম্বকোষ গর্ভাশয়ের দেওয়ালে যুক্ত হয়ে কোষ বিভক্তির মাধ্যমে বেড়ে ওঠতে থাকে। দীর্ঘ ১০ মাস ১০ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে থেকে নতুন এক শিশুসন্তান পৃথিবীর আলোবাতাসে আত্মপ্রকাশ করে। জন্ম-নেওয়া শিশু কিন্তু বাড়তে থাকে পূর্ণ বয়সে পদার্পণের পূর্ব পর্যন্ত।

প্রিয় ছাত্র বন্ধুরা! আজকের বক্তৃতার ইতি টানার আগে আরো এক দু'টো কথা যুক্ত করতে চাচ্ছি। মানব শিশু কিভাবে মহিলাদের গর্ভে বেড়ে ওঠে তা সঠিকভাবে জানার বিজ্ঞানকে বলে **'এম্ব্রিওলজি'** [embryology]। বাংলায় বলে ভ্রূণ-বিজ্ঞান বা ভ্রূণবিদ্যা। উপরে বর্ণিত তথ্যাদি এই বিরাট বিষয়ের উপর ধারণা প্রদান বৈ নয়। এখানে এম্ব্রিওলজির উপর আলোচনা আদৌ সম্ভব নয়। বাস্তবে এটা লেকচারের ব্যাপ্তির বাইরেও বটে। মানব দেহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রমসহ পড়াশুনা করে **'ডাক্তার'** হতে হয়। শিক্ষার্থীদের কেউ যদি এ বিষয়ের উপর অধ্যয়ন করে থাকেন তাহলে উপরোক্ত ক'টি লেকচার হয়তো তার জন্য খুব একটা সহায়ক হবে না। তবে আমার মতো যারা ডাক্তার নই, তাদের জন্য অবশ্য এ চেষ্টা একেবারে বিফলে যাবে না, আশাকরি। যাক, পরবর্তী লেকচারে উপস্থিত হতে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম





বক্তা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, নেশন্যাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।

স্থান: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।

চ. গণিত শাস্ত্রের গুরুত্ব

বক্তৃতা ৪১ : গণিত

চ. ১. বিজ্ঞানের 'মা' গণিত শাস্ত্র

প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! ওয়েলকাম! ওয়েলকাম! একচল্লিশতম লেকচারে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। বিজ্ঞান জগতের উপর আমাদের সংক্ষিপ্ত বিচরণের এটাই সর্বশেষ চেষ্টা। ইতোমধ্যে চল্লিশটি বক্তৃতা উপস্থাপন করেছি। হ্যাঁ, সবগুলো লেকচারই ছিলো **'গণিতমুক্ত'**। কিন্তু বাস্তবে বিজ্ঞান শুধু গণিতযুক্ত নয়, বলা হয় বিজ্ঞানের **'মা'** হলো গণিত। যাকিছু আগের ৪০টি লেকচারে উপস্থাপন করেছি তার প্রত্যেকটির সঙ্গে গণিতশাস্ত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গণিতেরই নির্যাস। সুতরাং শেষ এই লেকচারে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা জটিল-কঠিন ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে **'চিত্তাকর্ষকহীন'** [boring] কিছু তথ্য তুলে ধরতে হচ্ছে। গণিতের গুরুত্ব না বুঝলে বিজ্ঞানীদের গবেষণার স্বরূপই আঁচ করা সম্ভব নয়। তাহলে আসুন, অঙ্ক নিয়ে কথা হোক!

চ. ২. গণিত কি জিনিষ?

শিরোনামের প্রশ্নের জবাব এক কথায় দেওয়া যায়: গণিত সব জিনিষ! আরবী ভাষায় গণিতকে **'ইলমুল হিসাব'** বলে। গণিত হিসাব-বিজ্ঞান, এটাই গণিতের যথার্থ সংজ্ঞা। জগতের সৃষ্টিকৌশলে গণিতের ব্যবহার সর্বত্র। প্রতিটি

অণু থেকে মহাকাশের তারামণ্ডল তথা পুরো বিশ্বজগতে গণিতের ছড়াছড়ি। মানুষ আদি যুগ থেকে গণিতকে ব্যবহার করে আসছে- স্বাভাবিক কারণেই। প্রাত্যহিক জীবনচলার ক্ষেত্রে মাপজোখ তো একান্ত অপরিহার্য। গণনা, মাপা, ওজন করা, বস্তুর গঠন-আয়তন নির্ণয় ইত্যাদি গণিত দ্বারাই সম্ভব।

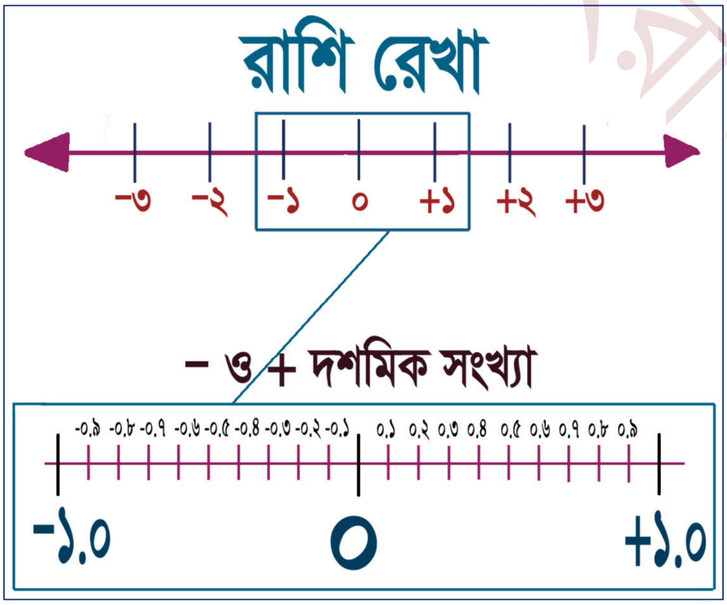
আধুনিক যুগে **‘প্রযুক্তি’** ও **‘পদার্থ বিজ্ঞান’** গণিতের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে এবং হচ্ছে। এমনকি গত ক’টি লেকচারে ব্যাখ্যাত **‘জীববিদ্যা’** বিষয়েও গণিতকে বিজ্ঞানীরা কাজে লাগাচ্ছেন। কম্পিউটার বিজ্ঞান তো পুরোটাই হিসাব-নিকাশ তথা অঙ্ক শাস্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কম্পিউটারের **হার্ডওয়্যার** ও **সফট্ওয়্যার** উভয়টি অঙ্ক ছাড়া মোটেই আত্মপ্রকাশ করতো না। মুসলিম বিজ্ঞানী **মূসা আল-খোয়ারিজমি** [৭৯০-৮৫০] সেই অষ্টম শতকে **‘আল-জাবরা’** বা বীজগণিত আবিষ্কার করে কম্পিউটার বিজ্ঞানের উদ্ভাবনকে সুগম করে গিয়েছিলেন। তাঁর অবদানকে মানুষ ভুলে নি। কম্পিউটার বিজ্ঞানের গণিতকে নামকরণ করা হয়েছে **‘আলগরিথম’** [algorithm]। শব্দটি মূলত আল-খোয়ারিজম শব্দের বিকৃত রূপ।

চ. ৩. গণিতের মূল শাখাসমূহ

সকলেই অবগত আছেন, গণিত বা অঙ্কের মূল চারটি শাখা আছে। এগুলো হলো: ১. পাটিগণিত [arithmetic], ২. জ্যামিতি [geometry], ৩. ত্রিকোণমিতি [trigonometry] ও ৪. বীজগণিত [algebra]। প্রতিটির আবার একাধিক উপশাখা আছে। আমরা গণিতের কঠিন [কিংবা সরল] কোনো **‘অঙ্ক’** কষতে যাচ্ছি না। এটা নিশ্চিত হওয়ায় হয়তো অনেকে **‘হাফ ছেড়ে রক্ষা পেয়েছেন!’**। তবে আমরা অবশ্যই উক্ত চারটি বিষয়ের উপর কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত আলোচনা করবো। এগুলোর মূল উদ্দেশ্য, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে এদের ব্যবহারের গুরুত্ব ইত্যাদি উপলব্ধি করা একান্ত জরুরী।

চ. ৩. ক. পাটিগণিত

প্রাত্যহিক হিসাব-নিকাশে সংখ্যার ব্যবহার করতে হয়। বিশেষকরে যোগ, বিয়োগ, ভাগ ও পূরণ অঙ্ক আমরা সর্বদা করে থাকি। এছাড়া গড় ও শতাংশ নির্ণয়ও সময় সময় দরকার পড়ে। সংখ্যা নিয়ে এভাবে অঙ্ক কষার নামই হলো পাটিগণিত। বাস্তবে গ্রীক শব্দ **‘এ্যারিথমোস’** [arithmos] যা থেকে **‘এ্যারিথমেটিক’** [arithmetic] শব্দের উৎপত্তি অর্থই হলো **‘সংখ্যা’** [number]। মোটকথা সংখ্যা নিয়ে সকল অঙ্কই মূলত পাটিগণিতের আওতাধীন।



অকৃত্রিম রাশি [natural numbers]: সংখ্যাকে গণনা করতে হয়। ০, ১, ২, ৩ .... ইত্যাদি সকল সংখ্যাকে বলে অকৃত্রিম রাশি। অকৃত্রিম রাশি বা সংখ্যা হতে পারে পজিটিভ [+ চিহ্নযুক্ত] কিংবা নেগিটিভ [− চিহ্নযুক্ত]। পাশের **‘রাশি রেখাটি’** দেখুন।

যোগ ও বিয়োগ: যোগের সংজ্ঞা হলো **'ক + খ = গ'**। **গ**-কে বলে **ক** ও **খ** এর যোগফল। প্রতিটি অক্ষর হলো একেকটি যোগক। '+' চিহ্নকে **'যোগ'** [plus] বলে। আর '=' বলে **'সমান'** [equal]।

বিয়োগ অঙ্ক দ্বারা একটি রাশি থেকে আরেকটি কমানো হয়। সুতরাং **'ক − খ = গ'** একটি বিয়োগ অঙ্ক। এখানে '−' চিহ্নকে বলে 'বিয়োগ' [minus]। বিয়োগফল [difference] **গ** হতে পারে পজিটিভ কিংবা নেগিটিভ। যদি **ক** এর মান **খ** থেকে ছোট হয় তাহলে বিয়োগফল নেগিটিভ, অন্যথায় পজিটিভ।

পূরণ ও ভাগ: সংখ্যাকে গুণ করার নাম পূরণ। যেমন: **৫+৫+৫ = ১৫**। এখানে আমরা একই সংখ্যাকে তিনবার যোগ করেছি। অর্থাৎ **৩** গুণ করেছি। সুতরাং আমরা বলতে পারি **৩ x ৫ = ১৫**। এখানে সংখ্যা **'৫'** এবং **'৩'** হলো গুণক [multiplicand or multiplier]। আর **'১৫'** হলো গুণফল [product]। চিহ্ন 'x' -কে 'পূরণ' [times] বলে।

ভাগ অঙ্ক মূলত পূরণের বিপরীত ক্রিয়া। **ক / খ = গ** - এখানে **খ** রাশিকে কতোবার যোগ দিলে রাশি **ক** হবে সেটাই নির্ণয় হবে। আমরা দেখিয়েছি **'৫+৫+৫ = ১৫'** -এই অঙ্ককে **৩ x ৫ = ১৫** লিখা যায়। এখন যদি আমরা লিখি, **১৫/৫** তাহলে ফল হবে **৩**। এটা দ্বারা বুঝানো হচ্ছে **'১৫'** সংখ্যা হবে **৫**-কে তিনবার যোগ দিলে।

আস্ত বা পূর্ণ সংখ্যা [integer]: সকল অকৃত্রিম সংখ্যাকে বলে **'পূর্ণ সংখ্যা'** [integer]। যেমন, ১, ২, ৩, ৪ ... ইত্যাদি। এই সেটের নাম পজিটিভ পূর্ণ সংখ্যা [ঢ়ড়ংরঃরাব রহঃবমবৎ]। আর -১, -২, -৩, -৪ .... ইত্যাদি হলো নেগিটিভ পূর্ণ সংখ্যা [negative integer]।

লক্ষ্য করুন, পজিটিভ কিংবা নেগিটিভ পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা যোগ কিংবা বিয়োগ করলে ফলাফল পজিটিভ কিংবা নেগিটিভ পূর্ণ সংখ্যা হবে। যেমন: **−৩+৫ = ২** এবং **৭−৯ = −২**। একই কথা সত্য পূরণ অঙ্কের ক্ষেত্রেও। যেমন: **−৯ x ৭ = −৬৩** বা **৮ x ৩ = ২৪**। কিন্তু ভাগ অঙ্কের ক্ষেত্রে ভাজক ও ভাজ্য উভয়টি [পজিটিভ কিংবা নেগিটিভ] পূর্ণ সংখ্যা হলেও ফলাফল পূর্ণ সংখ্যা না-ও হতে পারে। যেমন: **৬/৪ = ১.৫** - এখানে ফলাফল দশমিক সংখ্যা।

পাওয়ার [power - exponent]: কোন রাশি যদি বার বার যোগ করা হয় তাহলে একে আমরা ভিন্নভাবে লিখতে পারি। যেমন: **ক+ক+ক = ৩ক**। অনুরূপ কোন রাশি যদি বার বার গুণ করা হয়- যেমন: **ক x ক x ক x ক** $= ক^{৪}$। এভাবে লিখাই হলো পাওয়ার। আমরা বলি **'ক টু দ্যা পাওয়ার অব ৪'**। আমরা যদি বলি রাশি **ক**-কে রাশি **গ** পাওয়ারে তুলা হবে- তাহলে লিখবো $ক^{গ}$। এভাবে লিখা অনেকটা সহজ ও এগুলো নিয়ে অঙ্ক কষাও সুবিধাজনক। যেমন: $২^{৩} \times ২^{৫} = ২^{(৩+৫)} = ২^{৮}$। এখানে একটি **'ইন্ডিসেস আইন'** [rules of indices] ব্যবহার করেছি। নীচে সব ক'টি আইন তুলে ধরলাম।

১. গুণ: $ক^{খ} \times ক^{গ} = ক^{(খ+গ)}$

২. ভাগ: $ক^{খ}/ক^{গ} = ক^{(খ-গ)}$

৩. পাওয়ার: $(ক^{খ})^{গ} = ক^{খগ}$।

৪. রুট: $\sqrt[খ]{ক} = ক^{১/খ}$।

৫. নেগিটিভ পাওয়ার: $ক^{-খ} = ১/ক^{খ}$

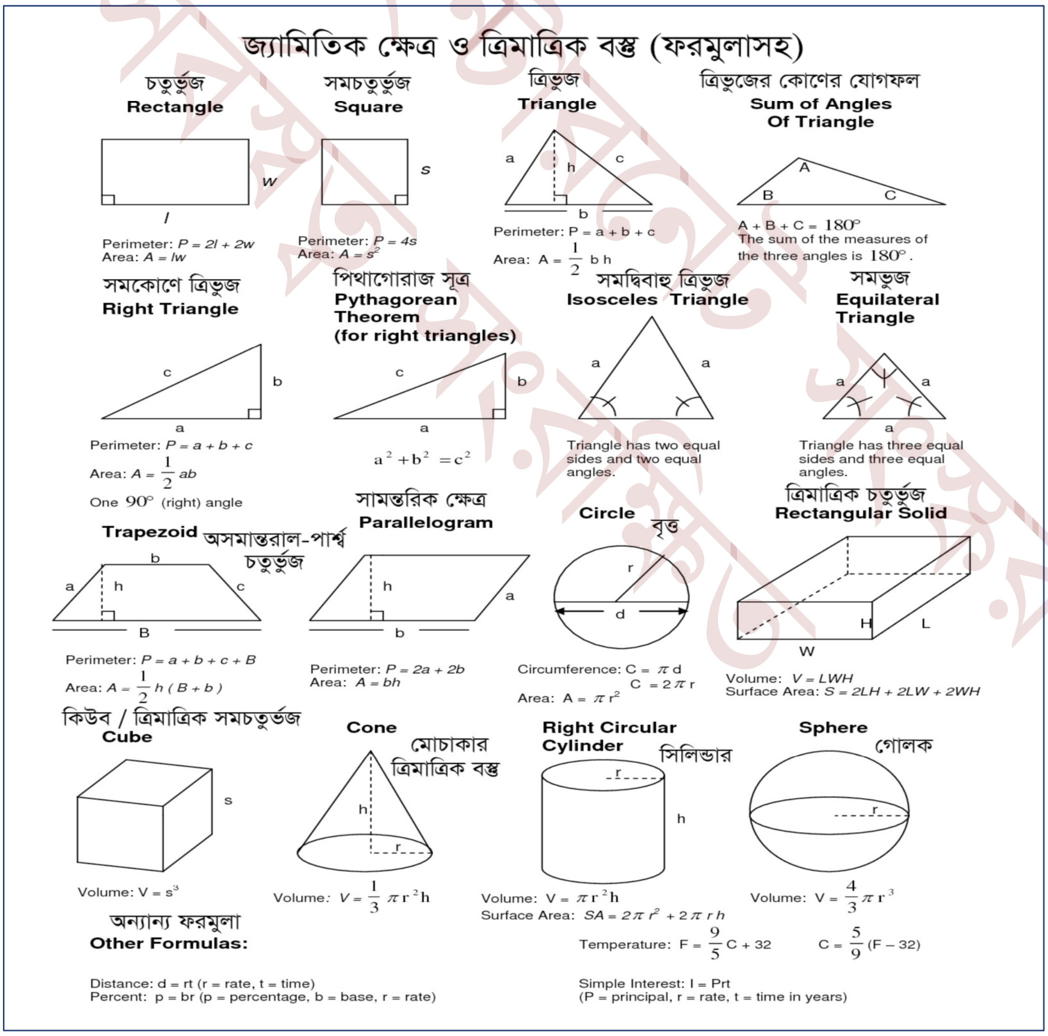
৬. পাওয়ার ভগ্নাংশ: $ক^{গ/ঘ} = (\sqrt[ঘ]{ক})^{গ}$

ছাত্রবন্ধুদেরকে নিশ্চিত করেছিলাম, অঙ্ক কষতে যাবো না। তাই পাটিগণিতের আরো এক দু'টো বিষয় উল্লেখ করে গণিতের অন্যান্য শাখার উপর কিছুটা আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি।

ভগ্নাংশ: যে কোন রাশি অপর কোনো রাশি দ্বারা ভাগ করতে যেয়ে আমরা লিখতে পারি: **ক/খ** এবং ফলাফলও **ক/খ** হিসাবে রেখে দেওয়া যায়। এভাবে করার নামই **ভগ্নাংশ** [ভাগের অংশ]। যেমন: **৫/১৫ = ১/৩**। ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, ভাগ ও পূরণ করা যায়।

যেমন: **১/২ + ১/৪ = ৩/৪; ২/৫ - ৪/১৫ = ২/১৫; ১/৯/৬/৭ = ১/৯ x ৭/৬ = ৭/৫৪ এবং ১/২ x ৫/৮ = ৫/১৬**।

উপরের চারটি ভগ্নাংশ অঙ্ক কষতে যেয়ে কিছু আইন-কানুন ব্যবহার করেছি। এ সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু বলছি না। পাটিগণিতের উচ্চতর পর্যায়ে কিছু **'রাশি থিওরী'** [number theory] আছে যেগুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই।



চ. ৩. খ. জ্যামিতি

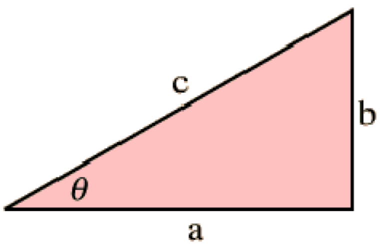
এটি গণিতের আরেকটি বিরাট বিষয়। এ প্রসঙ্গে জ্যামিতির উপর শুধুমাত্র **‘ভূমিকা’** প্রদান ছাড়া আর কিছু সম্ভব নয়।

জ্যামিতি শব্দের অর্থ **‘জমিনের মাপজোখ’**। এটা ঠিক তা-ই। বস্তুর সারফেস বা পৃষ্ঠদেশ নিয়ে অঙ্ক কষার নাম **‘সমতল জ্যামিতি’** [plane geometry]। বস্তুর ত্রিমাত্রিক মাপজোখের উপর অঙ্ক কষার নাম **‘ত্রিমাত্রিক জ্যামিতি’** [solid geometry]। জ্যামিতির মূল কয়েকটি শাখা আছে। যেমন: ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতি, এ্যানালিটিক জ্যামিতি, প্রজেক্টিভ জ্যামিতি, ডিফ্রানশিয়্যাল জ্যামিতি, নন-ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতি এবং টপোলজি। আমরা এগুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না।

উপরের (আগের পৃষ্ঠার) চিত্রে আমরা বিভিন্ন **‘ফিগার’** [figure] দেখতে পাচ্ছি। জ্যামিতির মাধ্যমে এগুলোর ক্ষেত্রফল, ঘনফল, রেখার মাত্রা, পরিধিরেখা ইত্যাদি বের করতে পারি। প্রতিটি মান বের করার সূত্র বা সমীকরণ চিত্রে দেওয়া আছে। শ্রোতাবন্ধুরা! অবসর সময়ে এগুলো দেখে নেবেন।

চ. ৩. গ. ত্রিকোণমিতি

শিক্ষার্থীদের যারা স্কুল-কলেজে পড়েছেন তারা তো অবশ্যই **ত্রিকোণমিতি** [trigonometry] কি জানেন। গণিতের এই শাখার কাজ হলো **‘কোণ’** নিয়ে অঙ্ক কষা। গ্রীক শব্দ **‘ট্রাইগোনোন’** [trigonon] থেকে **‘ট্রিগোনোমেট্রি’** [trigonometry] শব্দের উৎপত্তি। ট্রাইগোনোন অর্থ **‘ট্রায়াঙ্গল’** [triangle]। কোণের মোট ৬টি ফাংশন আছে। এগুলো ত্রিকোণমিতিতে ব্যবহৃত হয়। এগুলো হলো: ১. সাইন [sine - sin], ২. কোসাইন [cosine - cos], ৩. টানজেন্ট [tangent - tan], ৪. কোটানজেন্ট [cotangent - cot], ৫. সিকেন্ট [secant - sec] ও ৬. কোসিকেন্ট [cosecant - csc]। আমরা ব্রাকেটে সংক্ষেপ শব্দগুলোও উল্লেখ করেছি যা সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এই ৬টি ত্রিকোণমিতির ফাংশন সমকোণে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যেভাবে উপস্থাপন হয় তা দেখানো হয়েছে।



$$\text{sine}: \sin\theta = \frac{b}{c} = \frac{\textit{side opposite } \theta}{\textit{hypotenuse}}$$

$$\text{cosine}: \cos\theta = \frac{a}{c} = \frac{\textit{side adjacent } \theta}{\textit{hypotenuse}}$$

$$\text{tangent}: \tan\theta = \frac{b}{a} = \frac{\textit{side opposite } \theta}{\textit{side adjacent } \theta} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

$$\text{cotangent}: \cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{1}{\tan\theta}$$

$$\text{secant}: \sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}$$

$$\text{cosecant}: \csc\theta = \frac{1}{\sin\theta}$$

ত্রিকোণমিতি গণিতের খুব ব্যবহারোপোযোগী একটি শাখা। মহাকাশবিজ্ঞান, মানচিত্র তৈরী, সার্ভে কাজ ইত্যাদিতে ত্রিকোণমিতি ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন কোণ ও দূরত্ব নির্ণয়ে। ত্রিকোণমিতির মূল শাখা দু'টি: ১. সমতল ত্রিকোণমিতি ও ২. গোলকাকার ত্রিকোণমিতি।

চ. ৩. গ. বীজগণিত

ফার্সি মুসলিম গাণিতিক **মুসা আল-খোয়ারিজমি** গণিতের এই গুরুত্বপূর্ণ শাখার জন্মদাতা। পুরো বিজ্ঞানজগৎ অচল হয়ে পড়বে বীজগণিত ছাড়া। এই গণিতের মৌলিক কথা হলো, সংখ্যার বদলে অক্ষরের ব্যবহার। এর ফলে যে কোন সমীকরণকে **'জেনারেলাইজ'** [generalize] করা যায়। এই সার্বজনীনকরণ একান্ত জরুরী।

ইক্যুয়েশন [equation] বা সমীকরণ শব্দের অর্থ হলো একটি '=' [equal] চিহ্নের উভয় দিক গাণিতিকভাবে সমান। একটি অজানা রাশি **ক**-এর সঙ্গে আরেকটি অজানা রাশি **খ** যোগ করলে ফল হয় আরেকটি অজানা রাশি **গ**। এই কথাগুলো আমরা এভাবে লিখতে পারি: **ক + খ = গ**। এই সমীকরণটি সাধারণ ও সার্বজনীন। **ক** ও **খ** যে কোন রাশি হতে পারে। ফলাফল সর্বদাই **গ** হবে। আমরা এই সাধারণ সমীকরণে রদবদল আনতে যেয়ে একটি আইন অনুসরণ করতে পারি: **"সমান চিহ্নের বায়ে যা করবো, সমান চিহ্নের ডানেও তা-ই করতে হবে।"**

উপরের আইন মতে যতি বলি: **৩ক+৩খ = ৩গ**, তাহলে সমীকরণ সঠিক থাকবে। এখানে সকল অজানা রাশিকে ৩ গুণ করেছি। অনুরূপ যদি বলি: **ক/ক + খ/ক = গ/ক** তাহলেও সমীকরণ সঠিক থাকবে। এখানে আমরা উভয় দিক **ক** দ্বারা ভাগ করেছি। বাস্তবে এরূপ করার মাধ্যমেই **'সমীকরণের সমাধান'** বের করতে হয়।

আল-খোয়ারিজমির পূর্ব পর্যন্ত বীজগণিতের **'সমীকরণ'** ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তখন পর্যন্ত **'০'** এর কোন ধারণা কারোর ছিলো না। শূন্য আবিষ্কৃত হয়েছিল ভারতে। এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় মুসলিম বিজ্ঞানীদের দ্বারা। আমরা যে সমীকরণ নিয়ে কথা বলছি তাকে এভাবেও লিখা যায়: **(ক+খ)-গ = ০**। আমরা যোগফল **গ**-কে সমান [=] চিহ্নের বায়ে নিয়ে যাওয়ায় তার সাইন [sign - + or −] বদলে দিয়েছি। ডানে **'কোন কিছু নাই'** তাই শূন্য বসেছে। যে কোনো এক বা একাধিক অক্ষরকে সমান চিহ্নের ডানে কিংবা বায়ে নিয়ে গেলে তার সঙ্গে জড়িত সাইন [+ কিংবা −] পাল্টাতে হবে। এটা বীজগণিতের একটি আইন। আসলে অধিকাংশ সমীকরণ ডানে শূন্য দিয়েই লিখা হয়। যেমন:

1. $3x^2 - 9x + 12 = 0$
2. $x^3 + cx = 0$

প্রিয় অনুসন্ধানী বন্ধুরা! বীজগণিতের উপর আর তেমন কিছু বলতে যাচ্ছি না। এটার সঙ্গে সমীকরণ জড়িত। আমরা যেহেতু অঙ্ক কষবো না তাই আর অতিরিক্ত কিছু বলার নেই। বাস্তবে পুরো লেকচারের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য- বিজ্ঞানের উপর আমাদের তথ্যানুসন্ধানের ইতি হতে যাচ্ছে এই লেকচারের মাধ্যমে। আপনারা নোটগুলো পাঠ করবেন। অনেক ছবি, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদিসহ সুদীর্ঘ এই নোটগুলো সাজিয়েছি। আমি আশা করছি আপনারা সময় সময় এগুলো অধ্যয়ন করে উপকৃত হবেন। এটুকু বলেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।

সমাপ্ত